পরিচয়

৬২ বর্ষ ১-৩ সংখ্যা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯২, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৯৯

সম্পাদক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী

ধনঞ্জয় দাশ কার্তিক লাহিড়ী বাসব সরকার বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

শুভ্র বসু

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ

রঞ্জন ধর

উপদেশকমণ্ডলী

গোপাল হালদার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায়

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা ১৭ থেকে প্রকাশিত।

সম্পাদকীয়'র পরিবর্তে

সাম্প্রদায়িকতা আজ যে ভারতীয় সমাজকে হিন্দু ও মুসলমান, দুটি মূল অংশে বিভক্ত করতে চলেছে, সে বিষয়ে কার্যতঃ আর বিতর্ক নেই। সম্প্রদায়-গত চেতনা যে সমাজে এতো'দূর বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল বাবরি মসজিদ ভাঙাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক দাঙ্গা হাঙ্গামা না ঘটে গেলে হয়তো সমস্যার গভীরতা বোঝা যেত না। তাই এখন আর সমস্যার তাত্ত্বিক আলোচনায় চুলচেরা তর্ক অর্থহীন। সমস্যার ভয়াবহ চেহারা দেখে একাজটাই জরুরী হয়ে পড়েছে, কিভাবে সমস্যার মোকাবিলা করা যাবে, তারই সমাধান সূত্র খোঁজা।

মানুষের মনের গভীরে সাম্প্রদায়িক চেতনার বিষ দীর্ঘদিন ধরেই ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ম সেবক সংঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দল, একত্রে "সংঘ পরিবার" তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্যপূরণের দিকে এতোটা এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছে, সেটা অজানা ও অবিশ্বাস্য ছিল। ৬ ডিসেম্বরের পরবর্তী এক সপ্তাহে কলকাতা শহর ও শহরতলীতে যে তাণ্ডব ঘটে গেছে সেটা দেশের বিশেষতঃ—শহর অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের একটা খণ্ডিত অংশমাত্র। শহরের যে সব অঞ্চলে দাঙ্গা হয়নি, সেখানেও যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সমান বিস্ফোরক আকারে ছিল, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ গুজবের ব্যাপকতা। গুজব যখন মুখে মুখে ছড়াতে থাকে তাতে বোঝা যায় যারা রটনাকারী তারা গুজবের মৌল বক্তব্য বিশ্বাস করেছে। তাই নানা ভাবে ও ভাষায় রঙের উপর রসান চড়িয়ে তাকে আরও স্ফীতকায় করে তুলছে। যে কোন সংকটে গুজবের শক্তি তাই উপেক্ষনীয় নয়।

সুতরাং ডিসেম্বরের সেই দ্বিতীয় সপ্তাহে গুজবের ব্যাপকতা থেকে বোঝা যায় ঠনঠনিয়া কালী মন্দির, হালসিবাগানের পরেশনাথের মন্দির আক্রমণ ও ধ্বংস করা মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব, হিন্দুদের পক্ষেও সম্ভব নাখোদা মসজিদ আক্রমণ ও ধ্বংস করা। লালবাজারে পুলিশের সদর দপ্তরে দুই সাম্প্রদায়ের উৎপীড়িত, বাস্তুচ্যুত মরীয়া মানুষ অবরোধ করতে পারে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মুখে সে কথা ভাবা হয়তো অসম্ভব নয়। কিন্তু কলকাতা শহরে এক অঞ্চল থেকে হাজার হাজার সশস্ত্র মানুষ অন্য অঞ্চলে হামলা করতে ছুটে আসছে

বা আসতে পারে, তেমন ঘটনা ১৯৪৬ সালের ভয়াবহ দিনগুলিতে না ঘটলেও, এবার মানুষ বিশ্বাস করতে চেয়েছে যে সেটা অসম্ভব নয়। সাম্প্রদায়িক চেতনার ব্যাপকতা এর মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে।

অথচ পশ্চিম বাংলার গ্রামাঞ্চলে, বিশেষতঃ সীমান্ত জেলাগুলিতে যেখানে বহুক্ষেত্রেই উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি বাস করে, যাদের নানা ধরনের স্বার্থদ্বন্দ্বে ছোটখাটো বিরোধ মাঝে মাঝেই ঘটে থাকে, তারা কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার জঙ্গীরূপ সার্থকভাবে এখনো রুখে দিতে পেরেছে। তার কারণ সম্ভবতঃ এই যে দৈনন্দিন জীবনের স্বার্থ দ্বন্দ্বে তাদের যে বিরোধ ঘটুক না কেন, সেটা তারা একজন ব্যক্তির সঙ্গে আরেক জন ব্যক্তির বিরোধ বলেই চিনতে পারে, তাদের জাতপাত ও ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে এক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে আরেক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের বিরোধ বলে মনে করে না। জীবন যাপনের গ্লানি, প্রাত্যহিক জীবন সংগ্রাম, তাদের চেতনাকে যেমন শ্রেণীচেতনায় পরিণত করতে পারেনি, তেমনই সাম্প্রদায়িকতার হীনতায় টেনে নামিয়ে আনতে পারেনি। তা না হলে এইসব সীমান্ত এলাকায় সাম্প্রদায়িক প্রচারের, উত্তেজনা সৃষ্টির প্রচেষ্টায় কোন ঘাটতি ছিল না। এক কথায় বলা যায় গ্রাম বাংলার মানুষ অন্ততঃ এবারের প্রচণ্ড উত্তেজনা ও প্ররোচনার মধ্যেই সাম্প্রদায়িকতার মতো বিস্ফোরক সমস্যায় প্রতিক্রিয়াশীলতার চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছে। অথচ শহরের মানুষ পারেনি সেই অতি প্রয়োজনীয় কাজে মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দিতে। আমাদের সমস্যা সেই খানে।

শহর ও শহরতলীতে পূর্ব বাংলা থেকে আসা মানুষের নস্টালজিয়া সাম্প্রাদায়িক চেতনার অস্তিত্ব ও ব্যাপকতার কারণ, এটা অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা। পূর্ববাংলায় যারা কোন পুরুষেও ছিলনা, তেমন সব পরিবারে মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষের কারণ এই যুক্তিতে দাঁড় করানো যায় না। তাদের একাংশে ছেড়ে আসা গ্রাম, ভূ-সম্পত্তির জন্য যেমন বেদনাবোধ ও মুসলমানদের সম্পর্কে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ কিছুটা আছে, ঠিক তেমনই তেমন আরেক অংশ আছে যারা আদ্যান্ত অসাম্প্রদায়িক। সুতরাং দেশভাগ হিন্দু চেতনার বাড়বাড়ন্ত ঘটিয়েছে এটাই বিশেষ ব্যাখ্যা হতে পারে না। তাছাড়া দেশভাগের তিক্ত অভিজ্ঞতা যে প্রজন্মের মধ্যে তীব্র থাকার কথা, তারা আজ বৃদ্ধের দলে। বিগত চার সাড়ে চার দশকে তারা এই বাংলায় নিজের সামর্থ্য অনুসারে থিতু হয়ে বসেছেন। স্মৃতিতে ছেড়ে আসা গ্রাম বা বাল্য কৈশোরের

কোন স্মৃতি ব্যথা বেদনার একটা পুরানো ক্ষতের মতো থেকে গেলেও সজ্ঞাগ ও সচেতনভাবে সেই স্মৃতি বিলাসে সাম্প্রদায়িক হয়ে পড়া কার্যতঃ অধিকাংশের পক্ষেই অসম্ভব।

বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিক্রিয়ায় সাম্প্রদায়িকতার নগ্ন প্রকাশে এবারে যা বিশেষভাবে দেখা গেছে সেটি হলো তরুণ প্রজন্মের সংকীর্ণ হিন্দুয়ানা। তাদের পরিবারে বয়স্ক মানুষেরা কে ওপার বাংলার আর কেই বা এপার বাংলার, এই সব তথ্য ও অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ ভাবেই তরুণ প্রজন্মে সাম্প্রদায়িক চেতনার বিস্তার ঘটেছে। স্বাধীনতার প্রথম দুই বা তিন দশকে যে তরুণ প্রজন্মের মনে অসাম্প্রদায়িকতা প্রবলভাবে লক্ষ্য করা যেত, যারা আজ প্রৌঢ় কিম্বা বার্ধক্যের সীমায় এসে পড়েছে, এবং সেই চেতনাকে এখনো লালন করে, তাদেরই পরবর্তী বংশধররা সাম্প্রদায়িক মানসিকতার শিকার হয়ে পড়েছে, এটাই হলো চরম আশংকার কথা।—বলা বাহুল্য তার কারণ দেশভাগ হতে পারে না।

আরো একটা কথা বলা দরকার। সাম্প্রদায়িক মানসিকতা স্বচ্ছল, সম্পন্ন পরিবারের মানুষদের মধ্যে যতো ব্যাপক, নিম্নবিত্ত, খেটে খাওয়া মানুষদের মধ্যে ততো ব্যাপক নয়। বিত্তবান পরিবারের তরুণ প্রজন্ম এক ধরণের protected existence-এর মধ্যে বাস করে বলেই জীবন যাপনের সংগ্রামী বাস্তবতা তাদের দেখতে, মোকাবিলা করতে হয় না। ফলে জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যভোগের প্রায় জন্মগত অধিকার ধারণা থেকে তারা নিজের জন্য এমনই এক আত্মসুখসর্বস্ব, উচ্চাভিলাষী মানসিকতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যেখানে সামান্য কোন আঘাত এলে বা আঘাতের সম্ভাবনা দেখা দিলে হতাশ ও দিশেহারা মনোভাব থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এরাই তাগা-তাবিজ মাদুলী, নীলা-পলা-চুনী গোমেদ, গুরুমা-গুরু বাবা, জ্যোতিষী-তান্ত্রিকের শরণ নেয়। ধর্মীয় মানসিকতা প্রসারে তারাই হলো প্রথম soft target, যাদের জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বিশ্বাসের ঘাটতি যতো বেড়েছে ততোই অতিপ্রাকৃত নানা শক্তি থেকে দেবতা ও গুরুতে বিশ্বাসের বহর ততোই বেড়ে চলেছে। ভোলে বাবা পার করেগার মিছিল প্রতি বছর যে দীর্ঘতর হয়ে উঠেছে, সেটা সকলের চোখের সামনেই ঘটেছে।

ফলে হিন্দু হয়ে জন্মাবার জন্মগত সংস্কার যে এই পরিস্থিতিতেই ধর্মকেন্দ্রিক বিচার বিবেচনার দিকে ঝুঁকবে তাতে অবাক ও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

বিগত এক দশকে ভোগবাদ ও ইহকালিক ইন্দ্রিয়গত সুখের আকর্ষণ মানুষকে যতোটা নীতি ও বিবেকহীন করেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নৈতিক অবক্ষয় তার তুলনায় নিতান্তই তুচ্ছ। এই ভোগবাদ মানুষকে যতো সহজে সংস্কার বিশ্বাসী, মানসিক দিক থেকে ভীত, সন্ত্রস্ত করে তুলতে পারে, নিজের অস্তিত্বের সংকটে মানুষ ততোটা মানসিক দিক থেকে দুর্বল হয় না। ভারতীয় জনতা পার্টির সাম্প্রদায়িক প্রচার তার পূরো সুযোগ নিয়েছে।—যেমন ভারতে (১) মুসলমানদের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে, অচিরে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পড়বে; (২) মুসলমানরা চারটি বিবাহ করতে পারে, সুতরাং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা ধর্মের অনুশাসন সম্মত, অথচ হিন্দুদের ক্ষেত্রে আইনগত ও সামাজিক নানা বাধা রয়েছে; (৩) সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলি মুসলমানদের স্বার্থরক্ষায় অতিমাত্রায় সচেতন কারণ এই বিশেষ সংখ্যালঘুকে তারা ভোট ব্যাঙ্ক রূপে ব্যবহার করতে চায়; (৪) সরকারের আইন ও শাসননীতি মুসলমানদের প্রতি অহেতুক সদয়; (৫) মুসলমানরা ভারত বিদ্বেষী ও পাকিস্তানপন্থী; (৬) কাশ্মীরের মুসলমানদের তোষণ করার জন্যই সংবিধানের বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৩৭০ ধারা বজায় রাখা হয়েছে; (৭) মুসলমানরা সংখ্যালঘু হিসাবে বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থা চায় শিক্ষায়, চাকরিতে ইত্যাদি। এর সবই হলো হিন্দু স্বার্থ বিরোধী। অথচ সরকার ও বিভিন্ন দল "নকলি সেকুলারইজম" অনুসরণ করে এগুলি বজায় রেখে চলেছে। সুতরাং বিপন্ন হিন্দু সমাজের স্বার্থরক্ষায় হিন্দুত্বের পুনরুভ্যুদয় দরকার। একমাত্র বি জে- পি. ও সংঘ পরিবার যে কাজ করতে পারে।

দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা যতো গভীর হয়েছে, বেকারত্ব ও জীবনের অনিশ্চয়তা যতো বেড়েছে, যুব সমাজ যতো হতাশা ও বঞ্চনার শিকার হয়ে পড়েছে ততোই বি. জে. পি.র সুকৌশল হিন্দুত্বের প্রচার তাদের আকৃষ্ট করেছে। শহরের বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজে মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট ও তপশীলীদের সম্পর্কে সদর্থক সংরক্ষণ নীতি, এইসব শহরবাসী বর্ণহিন্দুদের বি. জে পি'র প্রতি আকৃষ্ট করেছে। শুধু একথা মনে রাখলেই যথেষ্ট হবে যে এই দল মণ্ডলের বিপরীতে মন্দিরের শ্লোগান দিয়েই ১৯৯০ সাল থেকে রাজনীতির আসরে নেমে পড়েছে।

এই প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ করা দরকার, ভারতে মুসলমানদের একটা অংশ যে সাম্প্রদায়িকতার তত্ত্বে এখনো বিশ্বাস করে, সেটা অস্বীকার করা যায় না।

পাকিস্তানের প্রতি আকর্ষণ তাদেরই বেশি। এদের বেশির ভাগ হলো শিক্ষিত, জীবনে প্রতিষ্ঠিত, নানা সুবিধা ভোগী, যারা নিজেদের সংখ্যালঘুত্বকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করতে চায়। তারাই মুসলমানদের স্ব-নিযুক্ত নেতা সেজে বহু সময়েই সাধারণ নাগরিক জীবনের সমস্যায় সাম্প্রদায়িক মাত্রা যোগ করে, সরকার ও সব দলের কাছ থেকে সুযোগ সুবিধা আদায় করতে দর কষাকষি করে। এরাই ভারত-পাকিস্তানের রাষ্ট্রিক সম্পর্কের তিক্ততাকে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের তিক্ততায় পরিণত করেছে নানাভাবে। যার থেকে বলা যায় হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের মৌলবাদী শক্তি দেশের বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষের অস্তিত্বের সংকটে নিকৃষ্ট ধরনের স্বার্থ-গোষ্ঠী ছাড়া আর কিছু নয়।

হিন্দু সমাজের যে অংশ মুসলমানদের সম্পর্কে **উপরোক্ত কারণের** জন্য বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছে নিছক পরিসংখ্যানের বিচারে সেই কারণগুলির একটাও ধোঁপে টেকে না। যেমন দেশভাগের সময় থেকে মুসলমানদের জন্মহার হিন্দুসহ অন্যদের জন্মহারের তুলনায় বেশি নয়। সুমারির প্রতিটি রিপোর্টে তার প্রমাণ রয়েছে। আগামী হাজার বছরেও হিন্দু মুসলমানের সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু হিসাবে আপেক্ষিক অবস্থানে কোন পরিবর্তন ঘটবে না। মুসলমানরা ধর্মীয় অনুশাসনে চারটি করে বিবাহ করতে পারে বলেই প্রতিটি মুসলিম পরিবারে সন্তানের সংখ্যা সম মানের হিন্দু পরিবারের তুলনায় বেশি নয়। তাছাড়া প্রতিটি মুসলমান পুরুষের চারটি স্ত্রী না থাকলেও, সেই সব মহিলার এক পুরুষ এক স্ত্রী নিয়মে সন্তান ধারণ ক্ষমতা একই থাকতো। অর্থাৎ চারটি মহিলার চারজন স্বামী থাকলেও নিছক জনসংখ্যার বিচারে বিশেষ হেরফের হতো না। বস্তুতঃ অধিকাংশ সাধারণ মুসলমান দেশের অন্যান্য নিম্নবর্গের মানুষের মতোই এমন দীনহীন যে, চারটি স্ত্রী রাখার ব্যাভিচারী বিলাসিতা করার মতো সম্বল তাদের নেই। আর এর মধ্যে মুসলিম নারীর যে দুর্দশার কাহিনী রয়েছে, তারা যে পুরুষ শাসিত সমাজে অসহায় শিকার, সেই প্রশ্নটি সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়। আসলে শিক্ষায়, সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তিতে, পেশায়, চাকরিতে মুসলমানরা গড়ে নিম্নবর্গের হিন্দুদের সমতুল্য। হিন্দু মৌলবাদীরা একথাটাই এড়িয়ে যায়।

হিন্দুত্ব আর মধ্যযুগের ব্রহ্মণ্যবাদ একই বস্তু। অধিকাংশ হিন্দুর জীবনে এই হিন্দুত্ব অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি

দেবদেবী এই ব্রহ্মণ্যবাদের আওতায় পড়ে না। তারা জলচল ঠাকুর নয়। দরিদ্র পূজারী ব্রাহ্মণ দু'পয়সার আশায় সেই সব জল অচল দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করলেও ব্রহ্মণ্যবাদ তাদের স্বীকৃতি দেয়নি। আজকের ভিন্নতর পরিস্থিতিতে তাদের জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক অনৃতভাষণ সুরু হতে পারে, কিন্তু তাদের অপাংক্তেয় দশা এর থেকে ঘুচবে না।

আসলে হিন্দুত্ব, রাম মন্দির বি. জে. পি.র ক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক তরুপের তাস। সরকারের দুর্বল নীতি আর পর্যায়ক্রমে কখনো মুসলিম কখনো হিন্দু মৌলবাদীদের দলে টানার অপচেষ্টা—শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়কে পাশ কাটানোর জন্য আইন থেকে অযোধ্যায় শিলান্যাসের অনুমতি দান পর্যন্ত মৌলবাদের কাছে আত্ম সমর্পণের একটানা নীতি বি. জি. পি.র রাজনৈতিক কৌশলকে বিশ্বাস্য করেছে। ফলে হিন্দি বলয়ের দল বি. জে. পি. অহিন্দি-ভাষী অঞ্চলে নিজেকে ছড়াতে পেরেছে। আর তার সঙ্গে রয়েছে সমকালীন মূল্যবোধ ও মতাদর্শের অবক্ষয়, শাসন ব্যবস্থায় আমলাতান্ত্রিকতা, দুর্নীতি, লোভও স্বার্থপরতার, ক্ষমতা অপব্যবহারের, স্বজন পোষণ নীতির লাগামছাড়া প্রকাশ। মধ্যবিত্তের আত্মকেন্দ্রিক সুবিধাবাদী মানসিকতা যে এই অবস্থায় ধর্মের জোরালো প্রচারের কাছে আত্মসমর্পণ করবে, এই রাজ্যে তারই চিত্র দেখা গেছে। দেশের অন্য অঞ্চলে অবশ্যই অন্য কারণ আছে, যেমন মহারাষ্ট্রে মাফিয়া রাজনীতি ও শিবসেনার নির্ভেজাল মারাঠিকরণের নীতি। আসলে এসবই হলো চরম স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি পর্ব। সংঘ পরিবারকে যারা টাকার যোগান দেয়, তাদের লক্ষ্য সেই স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা। শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত যে স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠার সহায়ক উপাদান হবে, সেটাই বিস্ময়ের, দুশ্চিন্তার বিষয়। এটাই হলো দেশের বর্তমান অনিশ্চিত ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে ফ্যাসি-বাদের ভারতীয় সংস্করণ প্রতিষ্ঠার মরীয়া প্রচেষ্টা।

—বাসব সরকার

হুতোম প্যাঁচার নকশায় উপন্যাসের পথরেখা

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

এক

মঙ্গলকাব্যের কাহিনীকথনের দেশজ ধারা নতুন রূপ পেয়েছিল টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলা'ল-এ এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'এ, বাঙলা উপন্যাসের দেশীয় রূপের সম্ভাবনার ইংগিত ফুটে উঠেছিল এই দুটি রচনার সমাজের অনুভূমিক রূপ পর্যবেক্ষণের কথ্যভাষাশ্রয়ী দেশজ রীতির গদ্যবিবরণে—বাঙলা উপন্যাসের বিকাশের এই সম্ভাবনাময় দিকটি সাহিত্যসমালোচনায় উপেক্ষিতই থেকে গিয়েছিল। এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেছেন দেবেশ রায়। মিখাইল বাখতিন-নির্দেশিত বহুস্বর বিবরণকে (Poly phonic discourse) উপন্যাসের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্যরূপে গ্রহণ করে তিনি বলেছেন : 'আলালে কলকাতার বাস্তবতা যে শুধু বর্ণনায় নথিভুক্ত হয়েছে তাই নয়, এমনকি চরিত্রদের সংলাপেরও সেই প্রামাণিকতা লেখক যে রাখতে পেরেছিলেন তার কারণ, উপন্যাসটির গদ্যবিবরণে লেখকের নিজের ভূমিকা ছিল স্পষ্ট। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ বক্তা বা বিবরণকার হিশেবে লেখকের কোনো আড়াল নেই। একেই মিখাইল বাখতিন তাঁর 'ডায়ালজিক ইমাজিনেশন'-এ উপন্যাসের বিবরণ বলেছেন। লেখকের উপস্থিতি এমন প্রত্যক্ষ হওয়ায় আমরা 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ বহু স্বর শুনতে পাই। কারণ লেখক এখানে তাঁর প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে তাঁর বিবরণ তৈরি করেছেন বহু চরিত্রের এই স্বরের অভিঘাতগুলো দিয়েই।' কিন্তু সে দিকে ইংরেজিশিক্ষিত শহুরে বাঙালির কান ছিল না, ভিক্টোরিয়ার শাসনে প্রায় ইংরেজ প্রজার সমতুল্যতা দাবির আত্মাভিমানে সে তখন অন্য এক আত্ম-জীবনীপাঠে আগ্রহী হয়েছিল, তাতে নিজেকে আবিষ্কার করতে চেয়েছিল 'এক বিস্তৃত ইতিহাসের পটভূমিতে আগামী ইতিহাসের বিস্তারের পুরোভূমিতে' : "'আলালের ঘরের দুলাল' বা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' সেই পটভূমি বা পরিপ্রেক্ষিতের কথা বিন্দুমাত্র বলে না—এ-রচনা দুটি বড় বেশি সেই বর্তমানে গ্রথিত। সে বর্তমানের সবটুকু তখন বাঙালি স্বীকার করতেও

চায় না। চায় না বলেই বাঙালি বা কলকাত্তাই কণ্ঠের যে বহুস্বর 'আলালের ঘরের দুলাল' বা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'কে আধুনিক উপন্যাসের মর্যাদা দেয়—সেই বহুস্বরও আর শোনা যাচ্ছিল না।'

বাঙালির সেই আত্মজীবনীর প্রত্যাশা বঙ্কিমচন্দ্র পূরণ করলেন তাঁর একস্বর-প্রধান কাহিনীবিবরণে, উপন্যাসের কাহিনীর সুযোগে তাকে ঐতিহাসিক-পরিপ্রেক্ষিত ও পুরোপ্রেক্ষিত দুটোই দিতে চেয়ে : 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে এই পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া গড়ে উঠতে চায় না। সেই পরিপ্রেক্ষিতের গুণে বাঙালি নিজেকে শুধু ভিক্টোরিয়ার ইংরেজপ্রজার সমতুল্য ভাষার সমর্থনই পায় না, এমনকি সেই ইংরেজ প্রজার অতীত গৌরবের সমতুল্যতাও যেন অনেকখানি অর্জন করে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ইংরেজিশিক্ষিত নতুন যুবকদের ভাল লেগেছিল কাহিনীর গুণে, সঙ্গে-সঙ্গে সংস্কৃতিশিক্ষিত প্রবীণ পাঠকদের, ভাল লেগেছিল ভাষার সংস্কৃত নির্ভরতার গুণে। তারই অভিঘাতে 'আলালের ঘরের দুলাল' বা 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র দৈনন্দিন জীবন ও ভাষা, যে-জীবন আমরা যাপন করছি সেই জীবন সম্পর্কে কৌতুক মেশানো মানবিকবোধ ও উপন্যাসের এক নতুন দেশীয় বিবরণ উপন্যাসের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল।'[১]

দেবেশ রায়ের এই বক্তব্যের প্রতিবাদে কলকাতার তিনশ' বছর পূর্তি উপলক্ষে রচিত এক প্রবন্ধে মালিনী ভট্টাচার্য বলেছেন : বর্তমানে একটি গোষ্ঠীর চিন্তা অনুযায়ী 'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' প্রভৃতি নকশা জাতীয় রচনা বাঙলা আখ্যানসাহিত্যে একটি খাঁটি দেশীয় বাস্তবতার ভিত্তি স্থাপন করছিল, যা বঙ্কিমচন্দ্রের সমুন্নত, কৃত্রিম ভাষাশৈলীতে ব্যাহত হয়। এই গোষ্ঠীর মতে, সাধারণ মানুষদের জীবনের বাস্তবতার চিত্রণে হুতোমের কথ্যভাষাই অধিকতর উপযোগী হত, অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় সেটি রহিত হয়েছে, এই ভাষা বাঙালি ভদ্রলোকদের বিচ্ছিন্নতার প্রতিরূপ। রিয়ালিজমের সঙ্গে কথ্যভাষার এই অভিন্নরূপত্ব নির্দেশ মেনে নেওয়া কঠিন। যে দেশে সাক্ষরতা সীমাবদ্ধ এবং একটি মৌখিক সংস্কৃতিই প্রধান, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকতর মার্জিত আখ্যানের তুলনায় হুতোমের বিদ্রূপ রচনাকৌশলের একই ধরনের কৃত্রিম পদ্ধতির ওপর কম নির্ভরশীল নয় এবং পাঠক হিশেবে নাগরিক ভদ্রলোকশ্রেণী তার কম উদ্দিষ্ট নয়। বস্তুত হুতোম ও তার গোষ্ঠীর সীমিত রচনাকৌশলের তুলনায় বঙ্কিমের আলংকারিক তথা কথ্য ভাষা থেকে দূরবর্তী ভাষারীতি বাঙালিমানসে তার আশা-

আকাঙ্ক্ষা ও নৈরাশ্যের সামগ্রিকস্তরের প্রতিধ্বনি হয়ত আরো ব্যাপকভাবে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।[২] দুর্ভাগ্যবশত শ্রীযুক্তা ভট্টাচার্য দেবেশের বক্তব্যকে ভুল বুঝেছেন, শুধু হুতোমের কথ্যভাষায়ই বাঙলা উপন্যাসে রিয়ালিজমের প্রবর্তন সম্ভব ছিল, এমন অযৌক্তিক নির্দেশ শ্রীরায়ের আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসে না। হুতোম তাঁর নকশার কথ্যভাষায় দেশীয় কাহিনী-কথনের ঐতিহ্যের অনুগামী কথকের ভূমিকাঘটিত জীবনভাষ্যের বহুস্বরসংবলিত সমাজের আনুভূমিক রূপচিত্রণের বাস্তবনিষ্ঠ শিল্পপ্রকরণ ও তার সম্ভাবনাকে যেভাবে উন্মোচিত করেছেন, তিনি কি তার প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান নি ?

হুতোমের লক্ষ্য ছিল নাগরিক শ্রেণীর পাঠকসমাজ, তাঁর ভাষাও 'কৃত্রিম', তাতো প্রত্যক্ষ সত্য, কিন্তু এই প্রসঙ্গে সেকথা বলার কি কোনও সার্থকতা আছে ? এক অর্থে, শুধু সাহিত্যের কেন; মুখের ভাষা ওতো কৃত্রিম, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণের দৌলতে আমাদের ভালোভাবেই জানা হয়ে গেছে। কিন্তু ন্যারেটিভ, তা সে যে ধরনেরই হোক শুধু তার লেখকের শ্রেণী-গত অবস্থান ও উদ্দিষ্ট পাঠকসমাজের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকে, তার তথা-কথিত 'কৃত্রিম' ভাষাভঙ্গিতে তথা শিল্পপ্রকরণে বাস্তবজীবনের মুখোমুখি হবার চেষ্টায় দেশকালের পটে মানবজীবনের বৃহত্তর তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাসকে রূপ দিতে পারে না যা তার নিজের সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে কালোত্তীর্ণতার মর্যাদা অর্জন করে ? তার অনেক দৃষ্টান্তই দেওয়া যেতে পারে, আপাতত একটিই দেওয়া যাক লুসিয়েন গোল্ডমানের জবানিতে: আমরা নিজেরা একবার তলস্তোয় সম্পর্কে লুকাচ্-এর এক বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলাম, একজন কৃষক লেখকরূপে যাঁকে তিনি বর্ণনা করেছিলেন, তাতে, একজন গ্রন্থকার যাঁর চরিত্রগুলি প্রধানত অভিজাত, বুর্জোয়া ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারি, তাঁর এই চরিত্রবর্ণনার বিরুদ্ধে একজন শ্রোতা উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করেন। লুকাচ সঠিকভাবেই উত্তর দিয়েছিলেন, এইসব শাসকশ্রেণীর চরিত্র কল্পনা ও বর্ণনার সময় যে অদৃশ্য কৃষক কাউন্ট তলস্তোয়ের পেছনে থেকে তাঁর কলম পরিচালনা করছিল তাকে যদি তিনি অনুভব না করে থাকেন তবে তিনি কিভাবে (তলস্তোয়ের উপন্যাস) পাঠ করবেন জানেন না।[৩]

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অসামান্য শিল্পপ্রতিভায় শরৎচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বাঙলা উপন্যাসের রূপ নির্ধারিত করে গিয়েছিলেন, মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের

গত্যন্তর নেই। তবু প্রশ্ন থেকেই যায়। তাঁর উপন্যাসে নাগরিক বাঙালি, আরো সুনির্দিষ্টভাবে বলা উচিত, হিন্দু মধ্যবিত্ত বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা নৈরাশ্য ধ্বনিত, কিন্তু তা ই কি আমাদের সমাজসংস্কৃতির সবকিছু? আর বাইরে অশ্রুত থেকে গেল যেসব সাধারণ নারীপুরুষ, তাদের দৈনন্দিন জীবন, আশা-নৈরাশ্য, নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, বাঁচার সংগ্রাম, যার দিকে অঙ্গুলিসংকেত করেছিলেন টেকচাঁদ, হুতোম, কিংবা ভিন্ন মাধ্যমে (প্রহসনে) মধুসূদন ও (নাটকে) দীনবন্ধু, উপন্যাসের বিষয় হিশেবে তা কি কম গুরুত্বপূর্ণ? সেই লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতি বাঙলা উপন্যাসে যে উপেক্ষিত হয়েছিল ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্তজীবনের বিড়ম্বনায় তাকে কি মর্মান্তিক ক্ষতি বলা যাবে না, সে বিষয়ে আমাদের সজাগ করার প্রয়াস কি অযৌক্তিক? কোন সাহিত্যকর্ম কখন পাঠকদের অবহেলায় অমনোযোগে ইচ্ছাপূরণের তৃষ্ণায় হারিয়ে যায়, সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও জলুসময় মূল স্রোতে তার ঠাঁই হয় না, আবার কখন সে ফিরে আসে যত স্বল্পসংখ্যকই হোক ইতিহাসের বিকাশের ধারার সঙ্গে যুক্ত পাঠক ও লেখকদের চৈতন্যে, তার এমন আপাতক্ষুদ্র অন্তঃশীল স্রোতে যার মধ্যেই নিহিত থাকে সৃষ্টির প্রকৃত শক্তি, মূলস্রোতের বৈষয়িক লাভ ও লোভের ঘোলা জলে নয়—আমরা কি তার কোনও সূত্র নিশ্চিতভাবে নির্দেশ করে দিতে পারি? অষ্টাদশ শতাব্দীর লরেন্স স্টার্নের ট্রিসট্র্যাম স্যাণ্ডি কিংবা উনবিংশ শতাব্দীর এমিলি ব্রন্টির উদারিং হাইটস্ ও গোত্রছাড়া রচনা, ইংরেজি উপন্যাসের মূল ধারার সঙ্গে সংযোগবিহীন। পরবর্তীকালে দুটি রচনাই তো গভীর স্বীকৃতি পেয়েছে সমালোচনায় যেমন তেমনি বিভিন্ন লেখকের সৃষ্টিকর্মে, ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে একজন লেখিকা (Anna L' Estrange) রিটার্ন টু উদারিং হাইট্স্ নামে এমিলির উপন্যাসের পরিশিষ্ট লিখেছেন, তাঁর অঞ্চলের প্রকৃতির রূপে এবং তার সম্পর্কিত বইপত্র সাময়িক পত্রপত্রিকায় লেখিকার জীবন ও রচনার পরিবেশ সন্ধানে নিমজ্জিত হয়ে। আমাদের দেশের লেখক জগদীশচন্দ্র গুপ্ত সাম্প্রতিককালে বহুলআলোচিত, তিনিতো অবহেলিতছিলেন দীর্ঘকাল। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিকতার প্রবল প্লাবনেও 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' বাঙলা আখ্যান সাহিত্য থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি, তাদের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতি এবং দেশীয় কাহিনীকথনের বহুমাত্রিকতা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে দু একটি বিশিষ্ট রচনায়। সেই প্রসঙ্গে পরে আসছি।

দুই

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীর লেখকেরা হুতোম প্যাঁচার নকশাকে নিছক সমাজচিত্র হিশেবেই দেখেছিলেন।[8] 'টেকচাঁদ ঠাকুরের' পদাংক অনুসরণে আমরা অন্যান্য লেখকদের দেখা পাই যাঁরা সমান অথবা বৃহত্তর সাফল্য লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আমরা নামকরতে পারি ঔপন্যাসিকরূপে কালীপ্রসন্ন সিংহ, কবি রূপে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং নাট্যকার রূপে দীনবন্ধু মিত্রের'—১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ক্যালকাটা রিভিউয়ে প্রকাশিত বাঙলা সা হত্যের সমীক্ষার এই অংশে বঙ্কিমের হুতোম প্যাঁচার নকশার লেখককে ঔপন্যাসিক আখ্যাদান প্রণিধানযোগ্য, রচনাটির সঙ্গে তাঁর রুচি ও মানসিকতাগত যে বিরোধই থাক, তার উপন্যাস লক্ষণ কি তিনি অনুভব করেছিলেন, হয়ত নিজের অজ্ঞাতসারেই ? অবশ্য কিছু পরেই তিনি রচনাটির বর্ণনায় তাকে নাগরিক জীবনের নকশার একটি সংকলনরূপে উল্লেখ করেছেন : '...a collectio · of sketch-s of city-life something after the manner of Dickens' Sketches by Boz, in which the follies and peculiaritus of all classes, and not seldom of men actually living, are described in racy vigorous language, not seldom disfigured by obscenity.'[5] আমাদের কালের ঐতিহাসিক-সমালোচকেরাও হুতোম প্যাঁচার নকশাকে সমাজচিত্ররূপেই গ্রহণ করেছেন, যেমন, সুকুমার সেন বলেছেন, ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী বিশেষ লেখকের ব্যঙ্গের লক্ষ্য হলেও কলকাতা শহরের বাঙালি অঞ্চলের জনযাত্রার যে ছবি আছে তার অনেক অংশই ফোটোগ্রাফের মত : 'যখন বইটি বাহির হয় তখন নক্শার ছবিগুলি পাঠকদের পরিচিত ছিল তাই ব্যঙ্গবিদ্ধ ব্যক্তিরাই তাহাদের দৃষ্টি অধিকার করিয়াছিল। এইজন্য সমসাময়িক সহৃদয় সমালোচকেরা হুতোম প্যাঁচার নক্শাকে প্রশংসা করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমাদের কাছে এখন হুতোমের কলিকাতা দূর-অতীতের কল্পনা দৃশ্যে পরিণত। ব্যঙ্গের যাঁহারা লক্ষ্য তাহাদের জীবনধারা কবে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাই হুতোমের নিন্দাপংকে আজ গ্লানিগন্ধ নাই। শুধু পুরানো দিনের কলিকাতার ছবিই এখন আমাদের সামনে ফুটিয়া উঠে। এই ঐতিহাসিক রসটুকু হুতোম-প্যাঁচার-নকশার স্থায়ী মূল্য। উনবিংশ শতাব্দের কলিকাতার ও নিকটবর্তী অঞ্চলের পূজা-পার্বণ ও সামাজিক উৎসবের বিবরণ ইহাতে যেমন

আছে তেমন আর কোথাও নাই।' অন্য একটি মন্তব্যে তাঁর সমালোচনা আরো তীক্ষ্ণ: 'কলিকাতার সামাজিক উৎসবাদির বর্ণনা উপলক্ষ্যে হঠাৎ-বাবুদের উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শনই হুতোম-প্যাঁচার-নকশার বিশেষ উদ্দেশ্য। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলিকাতার ধনিসমাজের এবং কলিকাতা শহরের যে চিত্র বইটিতে আঁকা আছে তাহার ঐতিহাসিক মূল্য তুচ্ছ নয়। তবে নকশাগুলি ব্যঙ্গাত্মক, এবং বর্ণনা জার্নালিজমের উপরে উঠে না। চরিত্রগুলি হয় ছাঁচে গড়া, নয় সঙ-সাজা। সুতরাং আলালের-ঘরের-দুলালের সঙ্গে হুতোম-প্যাঁচার-নকশার ঠিক তুলনা হয় না। এখনকার দিনের পক্ষে রুচি-বিরুদ্ধ এমন অনেক কিছু হুতোম-প্যাঁচার-নকশার কোন কোন প্রস্তাবে আছে।'[৬] প্রথম আলোচনাটিতেও অধ্যাপক সেন নকশার অভব্য (slang) শব্দ ও বাক্যাংশ উল্লেখ করেছেন।

সেকালে ও বটেই, একালেও হুতোম প্যাঁচার নকশার সামাজিক দলিলগত মূল্য বা সার্থকতার ওপর সমস্ত দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করে রাখা হয়ত অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত নয়। উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার হঠাৎ-বাবুদের জীবন ও আচরণ, চড়ক, বারোইয়ারি দুর্গাপুজো, মাহেশের স্নানযাত্রা, রথ, রামলীলা প্রভৃতি উৎসব, হোক আখড়াই, যাত্রা, পাঁচালি, কবি, কীর্তন, খ্যামটা বাহিনী বিয়ে ও শ্রাদ্ধ, সমাজ ও ধর্মসংস্কার আন্দোলন, ইংরেজি শিক্ষা, আধুনিক সভাসমিতি ইত্যাদির কেন্দ্র কলকাতায় গুজবের প্রচণ্ড প্রভাব—নাগরিক জীবনের বহুস্তরসংবলিত আনুভূমিক রূপ অজস্র নিখুঁত অনুপুংখে এখানে যেভাবাস্তব ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে বাঙলা সাহিত্যেসত্যই তুলনাহীন। আখ্যান-সাহিত্যে ন্যারেটিভের ধারাবহির্ভূত কোনও রচনার ঐতিহাসিক তথ্য বা দলিলগত প্রভাবও সুফলপ্রসূ হতে পারে, বিশেষত বাঙলা উপন্যাসে, আয়ান ওয়াট কথিত খুঁটিনাটি পরিস্থিতিগত অনুপুংখের (minute circumstantial details) দিক থেকে যার দৈন্য প্রথম থেকেই অত্যন্ত প্রকট। যে কলকাতা শহরে এদেশের অধিকাংশ ঔপন্যাসিক আবাল্য লালিত পালিত, তার বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য সকাল সন্ধ্যা দুপুর বা রাত্রির, বর্ষা বা গ্রীষ্মের রূপ, রাস্তাঘাট গলিখুঁজি দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, বিভিন্ন ধরণের জীবিকা—তাঁদের রচনায় খুঁটিনাটি অনুপুংখে তার বাস্তব চেহারার সামগ্রিক চিত্রণ দুর্লভ। সেদিক থেকেও হুতোম প্যাঁচার নকশা বাঙালি লেখকদের কাছে শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারত।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র, যিনি শিল্পপ্রতিভার প্রবল শক্তিমত্তায় বাঙলা উপন্যাসের রূপ নির্দিষ্ট করে দিয়ে গেলেন, সেদিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নি। হুতোম যে কিভাবে আলালের ঘরের দুলাল এবং ডিকেন্সের স্কেচেস বাই বজ-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন অন্যত্র আলোচনা করেছি। ডিকেন্সের এই রচনার বিভিন্ন নকশায় ন্যারেটিভের ধাঁচ অত্যন্ত স্পষ্ট কোনও কোনও চরিত্রের উপন্যাসসুলভ আলেখ্য নির্মাণের প্রয়াসে তাদের হৃদয়-বেদনার বিবরণে ও গল্প তৈরি করার ঝোঁকে কিংবা সংলাপে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের উদ্বেজিত মেজাজে হুতোম কিন্তু ন্যারেটিভ তৈরি করার প্রতি আগ্রহ বোধ করেননি, নকশার যাথার্থ্যকে তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট করতে গিয়ে জেনেশুনেই এমন সব সূত্র বা ইঙ্গিত রেখে গেছেন যাতে তাদের বাস্তবজগতের মডেলগুলি সমকালীন বুদ্ধিজীবীরা সন্দেহাতীতভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। 'কলিকাতার চড়কপার্বন' এর বাগাম্বর মিত্র যে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠির দিগম্বর মিত্র আমরা দীর্ঘকাল থেকেই জানি। বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের কাছে হুতোম প্যাঁচার নকশার আক্ষরিক অর্থ বড়ো বেশি স্পষ্ট হয়ে পড়েছিল, তার অন্তর্লীন কথা-কাঠামোকে (fictive structure) উপেক্ষা করে তাঁরা তাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ভিক্টোরিয়ো পিউরিটান রুচি শাসিত ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে ইংরেজিশিক্ষাভিমানী বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে দেশজ ভাষা ও সংস্কৃতির বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছিল। দেশজ মানসে ও ভাষায় যে নৈতিক শুচিবায়ুগ্রস্ততা শিষ্ট-অশিষ্ট ভাষার সংকীর্ণ ছুতমার্গীয় ব্যবধানবোধ ছিল না তাঁরা তা-ই আমদানি করেছিলেন বাস্তবজীবন সংস্পর্শভীরু অতিমাত্রায় সংস্কৃত নির্ভর আলংকারিক মার্জিত ভাষাভঙ্গিতে, দেশীয় ভাষার যে সব লব্জে, প্রবাদ-প্রবচনে, বিশেষ বাগ্‌ভঙ্গিতে, বর্ণনার রঙ্গব্যঙ্গপরিহাসে বাস্তব-জীবন পরিগ্রহণের সজীব প্রাণশক্তি ও পেশল স্বাস্থ্য ছিল, অশ্লীল অমার্জিত জ্ঞানে বর্জন করা হল। ইংরেজ সাম্রাজ্যের উচ্ছিষ্টলব্ধ আর্থিক কৌলীন্যের ওপর সে যুগের কলকাতার উচ্চ বর্গ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পরিবারগুলোর সামাজিক প্রতিষ্ঠা, প্রতাপ, সম্ভ্রান্ততা ইত্যাদির যে চোখধাঁধানো জৌলুস তৈরি হয়েছিল, হুতোমের মত আর কোনও লেখকই সেই ভাষাভঙ্গির নির্মম শ্লেষে তাকে ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়ে তাদের ঔপনিবেশিক অস্তিত্বের ক্লেদগ্লানি মিথ্যাচারকে এমন নগ্নভাবে, নিছক আক্ষরিক অর্থের স্তরেই উদ্ঘাটিত করেন নি। বেশির ভাগ বাঙালি বুদ্ধিজীবীর পক্ষে তাকে মেনে নেওয়া কঠিনই ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র তো ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিত্বকেই অশ্লীলতাদুষ্ট মনে করেছিলেন, হুতোমের 'অশ্লীলতা' ও পরোয়াহীন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবদ্ধ ব্যঙ্গবিদ্রূপকে যে তিনি বরদাস্ত করতে পারবেন না তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সেই জন্যেই তিনি ঈশ্বরগুপ্তের ব্যঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ইয়োরোপের 'ব্যঙ্গকুশল লেখক'দের 'হিংসা, অসূয়া, অকৌশল, নিরানন্দ, এবং পরশ্রী-কাতরতাপূর্ণ' রচনার নজির টেনে এই মন্তব্য করেন: 'ইউরোপীয় অনেক কুসামগ্রী এই দেশে প্রবেশ করিতেছে—এই নরঘাতিনী রসিকতাও এদেশে প্রবেশ করিয়াছে। হুতোম প্যাঁচার নক্সা বিদ্বেষ-পরিপূর্ণ।' 'অকৌশল' এই শব্দটি ব্যবহারের সময় বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ইংরেজি আর্টলেস বা এই জাতীয় কোনও শব্দ ঘুরছিল অনুমান করা চলে, এই শব্দে তিনি হুতোমের ব্যঙ্গকেও শিল্পকৌশলবর্জিত রূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন।

তিন

'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র টুকরো টুকরো সমাজচিত্রের অন্তর্নিহিত উপন্যাসের পথনির্দেশক কল্পনাসৃজিত কথাকাঠামোর (fictive structure) চিনে নেবার জন্য মেট্যাফার ও মেট্যানিমির আলোচনা স্মরণ করা প্রয়োজন। মেট্যাফার বা রূপক অলংকারে এক বস্তুকে সাদৃশ্যের সূত্রে অন্য বস্তুরূপে বর্ণনা করা হয়, এটি একটি বস্তুর ওপর এমন নাম বা বর্ণনার প্রয়োগ যা আক্ষরিক-ভাবে প্রযোজ্য নয়; তার ভিত্তি তাৎপর্য বা অর্থের স্থানান্তরীকরণ। যেমন, আক্ষরিক অর্থে জাহাজ এমন একটি যান যা সমুদ্রের ওপর চলে বা সমুদ্রকে অতিক্রম করে; একটি মরুভূমি বালির সমুদ্র, জাহাজের সমুদ্র অতিক্রম করার মতই উট সেই সমুদ্র অতিক্রম করে, সুতরাং রূপকে বা অর্থের স্থানান্তরী-করণে উটকে অভিহিত করা হয় 'সমুদ্রের জাহাজ' রূপে। মেট্যানিমিতে গুণ ধর্ম অংশ বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির নাম উদ্দিষ্ট বস্তুর প্রতিকল্প (substitute) হিশেবে স্থাপন করা হয় যেমন রাজার প্রতিকল্প হিশেবে মুকুট, এখানে উদ্দিষ্ট শব্দ এবং তার প্রতিকল্পরূপে ব্যবহৃত অন্য শব্দের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বা সন্নিধি (contiguity) লক্ষ্য করা যায়। সিনেকড্যাকি মেট্যানিমির অন্তর্ভুক্ত, এই অর্থালংকারে একটি সমগ্র বস্তুর পরিবর্তে তার একটি অংশ বা অংশের পরিবর্তে সমগ্র বস্তু উল্লেখ করা হয়, যেমন সাধারণভাবে খাদ্য অর্থে রুটি,

বুদ্ধিমান ব্যক্তির পরিবর্তে মস্তিষ্ক ইত্যাদি। মেটাফ্যারের ভিত্তি সাদৃশ্য, মেট্যানিমির সন্নিধি বা নৈকট্য। কবিতার ঝোঁক মেটাফ্যার বা রূপকের দিকে বাস্তবতা প্রধান উপন্যাসের লেখকেরা মেট্যানিমির বা লক্ষ্য থেকে শব্দ-ব্যবহারের বস্তুগুলির পারস্পরিক সন্নিহিত সম্পর্কের ছকটির অনুসরণে প্লট ও চরিত্রচিত্রণে সম্পূর্ণ আবদ্ধ না থাকে, তাদের থেকে একটু সরে গিয়ে স্থান কালগত পরিবেশের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, সেই জন্যই সিনেকড্যাকিক অনুপুংখ তাঁদের প্রিয়।

ডিকেন্সের স্কেচেস বাই বজ-এর মেডিটেশন্‌স্ ইন মনমাউথ স্ট্রীট নকশায় পুরনো পোষাক পরিচ্ছদের দোকানের রেখাচিত্রে এই বাস্তবতা-প্রধান রচনারীতির উদাহরণ মেলে; বজ সেখানে মৃত ব্যক্তিদের কোট, ট্রাউজার, চকচকে ওয়েস্ট কোট ইত্যাদি দেখতে পায়, এই পোষাকগুলিই একদা যারা তাদের পরিধান করেছিল, সেই মানুষগুলির প্রতিভূ হয়ে দাঁড়ায়। বজের দৃষ্টির সামনে সারি সারি কোটগুলো তাদের জায়গা ছেড়ে তাদের কাল্পনিক পরিধানকারীদের কোমর ঘিরে নিজেদের বোতাম বন্ধ করে, তাদের সঙ্গে মেলবার জন্য ট্রাউজারগুলো লাফিয়ে আসে, জুতোগুলো তাদের পা খুঁজে পায় এবং সশব্দে খট্ খট্ করে রাস্তার ওপর নেমে আসে।'[৯] শহরের মানুষদের প্রতিকল্পরূপে পোষাকের এই চিত্রে, বা, সমালোচনার পরিভাষায়, মেট্যানিমির বস্তুজগতের সন্নিহিত সম্বন্ধপাতের ছকে কাহিনীকথক লণ্ডন শহরের পোষাক পরিচ্ছদের কেতাসর্বস্ব কর্মব্যস্ত নাগরিক জীবনের বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলেছেন। বিভিন্ন বস্তুর বর্ণনায় নাগরিক পরিবেশকে চিত্রিত করার এই পদ্ধতি ডিকেন্সের পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে অনুসৃত ও পরিণত হয়েছে। হুতোম স্পষ্টতই ডিকেন্সের এই মেট্যানিমিক রচনারীতির অনুসরণে পোষাক পরিচ্ছদের ঠাটবাট-সর্বস্ব কলকাতার নাগরিক জীবনের বাস্তবতাকে রূপ দিয়েছেন বারোয়ারি পুজোয় হাফ আখড়াই-এর আসরে ধোপাদের কাছ থেকে ভাড়া-করা পোষাকে সজ্জিত মানুষদের বর্ণনায়—'চায়নাকোট ক্রেপের, লেটের ও ডুরে ফুলদার ট্যারচা চাদরেরা—পিঁপড়ের ভাঙ্গা সারের মত ছড়িয়ে পড়লেন, আসর শেষ হবার পর—'ভাড়া ও চেয়ে নেওয়া চায়নাকোট, ধুতি-চাদর জামা ও জুতোরা কাজ সেরে আপনার আপনার মনিব বাড়ি ফিরে গ্যালো', 'ছোট ছোট ট্যামল,' 'হামামা' ও 'তাজিয়া' এ কোণ থেকে ও

কোণ, এ চৌকি থেকে ও চৌকি করে ব্যাড়াচ্চেন' (অধ্যক্ষদের ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে ও মেয়েরা) ইত্যাদি।

কিন্তু এহো বাহ্য, আমাদের আর একটু গভীরে যেতে হবে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ শাসকদের মহারানীর কৃষ্ণাঙ্গ প্রজাদের মঙ্গলবিধানের সদিচ্ছা ও সহযোগিতার ছত্রচ্ছায়ায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তা. বৈষয়িক সমৃদ্ধির সুযোগলাভ, সমাজ ও ধর্মসংস্কার আন্দোলন, ইংরেজি শিক্ষারবিস্তার, স্ত্রীশিক্ষা—চাহিদা অনুযায়ী চাকরির সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি না পাওয়ার জন্য ক্ষোভ-অভিযোগ-অনুযোগসহ এসবের মধ্য দিয়ে সামাজিক অগ্রগতির ডিসকোর্স বা বয়ান কলকাতার উচ্চবর্গ সমাজে প্রাধান্য পেয়েছিল, অবশ্যই দু একটি ব্যতিক্রম বাদে। সিপাহী বিদ্রোহের পরে ইংরেজ প্রভুদের মনোভাব ও সাম্রাজ্যশাসননীতি পাল্টে গেলেও সেই বয়ানের গুরুতর রকমের কোনও হেরফের ঘটে নি। তার সম্পূর্ণ বিপরীতে, যেন তার প্যারডি রূপে সেই সংশয়দ্বন্দ্বপ্রশ্নহীন, আত্মতৃপ্তি ও আত্মাভিমানের রোশনাইয়ের জগতের সম্পূর্ণ বিপরীতে হুতোম তাঁর পাঠকদের নিয়ে আসেন হঠাৎ-বাবু, ইংরেজিনবিশ ইয়ংবেঙ্গল, গোস্বামী পণ্ডিত, ব্রাহ্ম প্রভৃতি উচ্চবর্গ সমাজের বিভিন্ন স্তরের ভদ্রলোক, যারা সকলেই কোনও না কোনও ভাবে ইংরেজ সাম্রাজ্যশাসনের সঙ্গে গাটছড়াবাঁধা ছিল, তাদের ধর্মকর্মের নামে আমোদ-ফূর্তির ভ্রষ্টাচার, নীতিহীন সুবিধাবাদী দলাদলি, ভোগবিলাসব্যাভিচারে, শ্রাদ্ধ বা বিয়ের মত অনুষ্ঠানের আড়ম্বরে অর্থের অপচয়, গুরুগিরির আড়ালে লালসাতৃপ্তির ফন্দিফিকির সন্ধান, মুখের বুলি এবং সর্বসাধারণের চোখের সামনে জাহির করা সামাজিক ভূমিকার সঙ্গে আচরণের বৈষম্যের মিথ্যাচার প্রভৃতির অন্ধকারময় জগতে। তার নকশার জন্যে তিনি দুটি ন্যারেটিভ পার্সোনা বা কাহিনী-কথকরূপ সৃষ্টি করেছেন, হুতোম প্যাঁচা এবং সওরূপে কাহিনীতে অংশ-গ্রহণকারী কথক।

গ্রন্থকার বা লেখক তথা কাহিনী কথকের হুতোম প্যাঁচা এই নামকরণই তো অর্থপূর্ণ : প্যাঁচার অন্ধকারভেদী দৃষ্টির মতই সজাগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই তিনি কলকাতা শহরের হঠাৎ-বড়লোক বাবুসহ অন্যান্য বাবুদের অন্ধকার জীবন পর্যবেক্ষণ করছেন, পাঠকদের চিনিয়ে দেবার জন্য তার বিভিন্ন ছবি বা দৃশ্য তথা নকশা বুনছেন, 'হঠাৎ অবতারে'র বড়লোকের ছেলের বিয়ের শোভা-যাত্রার এই বর্ণনায় সে বিষয়ে নিজেই বলেছেন : 'ব্যাগু, ঢাক, ঢোল ও

নাগরার শব্দে, লোকের রল্লা ও অধ্যক্ষদের মিছিলের চীৎকারে কলকেতা কাঁপতে লাগলো, অপর পাড়ার লোকেরা তাড়াতাড়ি ছাতে উঠে মনে কল্লে ওদিকে ভয়ানক আগুন লেগে থাক্‌বে, রাস্তার দুধারি বাড়ির জানালা ও বারান্দা লোকে পূরে গ্যালো, বেশ্যারা "আহা দিব্বি ছেলেটি যেন চাঁদ!" বলে প্রশংসা কত্তে লাগ্‌লো, হুতোম অন্তরীক্ষ থেকে নক্‌শা নিতে লাগলেন—ক্রমে বর কনেবাড়ি পৌঁছিল।' বিভিন্ন ছবি বা দৃশ্যগুলি লেখকের এই ভূমিকার সঙ্গে সম্পর্কান্বিত। অন্যদিকে, হুতোম নিজেই সঙ বা ভাঁড়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, কথকতার আসরের শ্রোতাদের মত পাঠকদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি কল্পনা ও অনুভব করে নিয়ে তাদের সম্বোধন করেছেন কখনও 'তুমি'-র ঘনিষ্ঠতায়, কখনও 'আপনি'র আপাত সম্ভ্রমপূর্ণ দূরত্বের শ্লেষে, তাদের উদ্দেশে বিবৃতি দিয়েছেন, ব্যাখ্যা মন্তব্য ইত্যাদি উচ্চারণ করেছেন—কাহিনীকথকের এই ডিসকোর্স বা বয়ানে তাদের কণ্ঠস্বর শোনা না গেলেও তাঁর সঙ্গে তাদের আদানপ্রদানের সজীব সম্বন্ধ আমাদের অনুভব না করে উপায় থাকে না। এই প্রসঙ্গে বাহুল্য হলেও বলে নেওয়া ভালো, দৃশ্য বা ছবি এবং এই বয়ান এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে থাকে যে তাদের স্বতন্ত্র স্তর হিশেবে চিহ্নিত করা যায় না, ন্যারেটিভের সার্থক শিল্পকর্মের গুণেই।

হুতোম প্যাঁচার নকশায় কাহিনীকথকের ভূমিকার বিশিষ্ট রূপটি যে এদেশের সঙের আদর্শেই পরিকল্পিত, লেখক নিজেই তার নির্দেশ রেখে যান। কাহিনীকথক অন্তরালে থেকে, তাঁর নকশার মানুষদের থেকে সম্মানজনক বা নিরাপদ দূরত্বের ব্যবধান বজায় রেখে ব্যঙ্গবিদ্রূপের নকশায় কলকাতার বাবুদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেননি, তিনি নিজেও তাঁর সঙ্গে জড়িত, সমাজের অধোগতির দুঃখগ্লানির অংশীদার, ভূমিকায় পাঠকদের জানিয়েছেন…'সত্য বটে অনেকে নকশাখানিতে আপনারে আপনি দেখতে পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক সেটি যে তিনি নন বলাই বাহুল্য, তবে কেবল এইমাত্র বলতে পারি যে আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরই লক্ষ্য করিচি, এমনকি স্বয়ংও নকশার মধ্যে থাকিতে ভুলি নাই।' তিনি পাঠকদের সঙের দর্শকরূপে কল্পনা করে নিয়ে নিজেই যে সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ, পরবর্তী অংশে সে সম্বন্ধে আরো স্পষ্টভাবে বলেন 'নকশা খানিকে আমি একদিন আরসি বলে পেশ কল্লেও কত্তে পাত্তেম, কারণ পূর্বে জানা ছিল যে, দর্পণে আপনার মুখ কদর্য

দেখে কোন বুদ্ধিমানই আরসিখানি ভেঙ্গে ফেলেন না, বরং যাতে ক্রমে ভালো দেখায় তারই তদ্বির করে থাকেন, কিন্তু নীলদর্পণের হ্যাঙ্গাম দেখে শুনে—ভয়ানক জানোয়ারদের মুখের কাছে ভরসা বেঁধে আরসি ধত্তে আর সাহস হয় না, সুতরাং বুড়ো বয়সে সংসেজে রং কত্তে হলো—পূজনীয় পাঠকগণ বেয়াদপি মাফ করেন।' আর কথনভঙ্গিতে হুতোম তার আদর্শ খুঁজে পান বাঙলা-দেশের মঙ্গলকাব্যের মত প্রাচীন আখ্যানসাহিত্যের কাহিনীকথক, বিশেষতঃ কথকতা আসরের শ্রোতারূপেই কল্পনা করে নিয়েছেন, কথক রূপে তিনি এক দিকে তাদেরও তাঁর বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, আর এক দিক থেকে আধুনিক সচেতনতায় বর্ণনীয় বিষয় ও পরিবেশ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ইতিহাসের বৃহত্তর দৃষ্টিতে বা পরিপ্রেক্ষিতবোধে তার নির্মম, ক্ষুরধার বিশ্লেষণে তৎপর। সেইজন্যই হুতোম তাঁর নকশার অন্যান্য অংশের মতই বিদ্রূপের স্বরভঙ্গিতেই আত্মসমালোচনায়ও কুণ্ঠিত হন না: 'ক্রমে কি উপায়ে আমাদের পাঁচজনে চিনবে, সেই চেষ্টাই বলবতী হলো, তারই সার্থকতার জন্যেই যেন আমরা বিদ্যোৎসাহী সাজলেম—গ্রন্থকার হয়ে পড়লেম—সম্পাদক হতে ইচ্ছা হলো—সভা কল্লেম—ব্রাহ্ম হলেম—তত্ত্ববোধিনী সভায় যাই—বিধবা বিয়ের দালালি করি ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি বিখ্যাত দলের লোকদের উপাসনা করি—আন্তরিক ইচ্ছে যে, লোকে জানুক যে আমরাও ঐদলের একজন ছোটখাট কেষ্টবিষ্টুর মধ্যে।' সেকালের ইংরেজিশিক্ষিত উচ্চবর্গদের অনেকেই সে খ্যাতি সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রলোভনে, হুজুগমত্ততায় সমাজসংস্কার ও তার মত অন্যান্য কর্ম-কাণ্ডে অংশগ্রহণ করতেন, আত্মসমালোচনার সূত্রে সেই ক্ষীণায়ু, চারিত্র্যবর্জিত ও আত্মপ্রচারের আড়ম্বরসর্বস্ব সামাজিক ভূমিকা গ্রহণের স্বরূপ হুতোম এখানে এক আশ্চর্য তীক্ষ্ণতায় উদ্ঘাটিত করেছেন।

সেই জন্যেই হুতোমের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল এই নকশায় উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার সমাজের বিভিন্ন স্তরের চিত্রসংবলিত তার আনুভূমিক রূপচিত্রণ, বাঙলা কথাসাহিত্যে যার তুলনা মেলেনা। ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর ঔপনিবেশিক অর্থব্যবস্থার অনিবার্যতায় দেশের প্রকৃত ধনসম্পদ উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে নয়, ইংরেজ প্রভুদের চাকরিতে কিংবা তাদের বাণিজ্যের অংশীদার সঠিক-ভাবে বলতে গেলে তাদের বেপরোয়া লুণ্ঠনের হিস্সাদার হিসেবে ব্যাপক

দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে এদেশের কিছুসংখ্যক মানুষ যে ভাবে বিপুল অর্থ উপার্জন করে বাবুতে পরিণত হয়েছিল এবং বাবুয়ানিতে তাদের অর্থ বিষয় সম্পত্তি জীবন সব কিছুকে আবর্জনাস্তূপ করে তুলেছিল, কাহিনীকথক ঐতিহাসিক পটভূমির ইঙ্গিতসহ তার বিবরণ দিয়েছেন : 'কোম্পানির বাংলা দখলের কিছু পারে, নন্দকুমারের ফাঁসি হবার কিছু পূর্বে আমাদের বাবুর প্রপিতামহ নিমকের দাওয়ান ছিলেন, সে কালে নিমকীর দাওয়ানীতে বিলক্ষণ দশটাকা উপায় ছিল ; সুতরাং বাবুর প্রপিতামহ পাঁচবৎসর কর্ম করে মৃত্যু-কালে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা রেখে যান—সেই অবধি বাবুরা বনেদী বড় মানুষ হয়ে পড়েন। বনেদী বড় মানুষ কব্‌লাতে গেলে বাঙ্গালী সমাজে যে সরঞ্জাম-গুলি আবশ্যক, আমাদের বাবুদের তা সমস্তই সংগ্রহ করা হয়েছে—বাবুদের নিজের একটি দল আছে, কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কুলীনের ছেলে, বংশজ, শ্রোত্রিয়, কায়স্থ, বৈদ্য, তেলী, গন্ধবেণে আর কাঁসারী ও ঢাকাই কামার নিতান্ত অনুগত'···(কলিকাতার চড়ক পার্বণ)। কলকাতার তথাকথিত বনেদী বাবুদের অভ্যুদয়ের এই ইতিবৃত্তকথনে নন্দকুমারের ফাঁসির উল্লেখে প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ ও বেদনা অনুভব না করে থাকা যায় না।

কথকতার আসরের শ্রোতাদের সামনে কথনরত কথকঠাকুরের মতই হুতোম তাঁর পাঠক সমাজের সামনে উপস্থিত হয়ে তাদের প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করে এই ধনীদের আবির্ভাবের ঐতিহাসিক পটভূমি সম্পর্কে বলেছেনঃ 'পাঠক! নবাবী আমল শীতকালের সূর্যের মত অস্ত গ্যালো। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠলো। বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো। নবো মুনৃসি, ছিরে বেণে, পুঁটে তেলি রাজা হলো' (কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা)। এখানে হয়ত লেখকের বংশগত আভিজাত্যসচেতন রক্ষণশীল ভাবাদর্শের ছায়াপাত লক্ষ্য করা যেতে পারে, কিন্তু তাকে প্রাধান্য দিয়ে হুতোম যেভাবে তাঁর কথন-ভঙ্গিতে জাতীয় জীবনের ট্র্যাজেডিরূপে এই পরিবর্তনের উপস্থাপনায় তার বেদনাময় বোধ পাঠকদের মনে সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছেন, তার মূল্য অস্বীকার করা উচিত নয়। প্যারাট্যাক্সিস অর্থাৎ সমন্বয় (co-ordination) ও মূল বাক্যের (subordination) আনুগত্যমূলক বিন্যাস-নির্দেশক সংযোজক শব্দগুলি ছাড়াই উপবাক্য ইত্যাদির পর পর স্থাপন, যা বৈশিষ্ট্য-বাচক বিশেষ্যপদগুলির পরম্পরায় (সমালোচনার পরিভাষায় যাকে সিরিজ

বলা হয়) হুতোম এই বাবুদের পরগাছা, অন্তঃসারশূন্য জীবন ও চরিত্রকে তীক্ষ্ণ রূপ দিয়েছেন, যেমন কলিকাতার বারোইয়ার পূজা-র বীরকৃষ্ণ দাঁর বর্ণনাঃ 'বীরকৃষ্ণ দাঁ কেবলচাঁদ দাঁর পুষ্যিপুত্তুর হাটখোলায় গদি ; দশ বারোটা খন্দ মা'লের আড়ত, বেলেঘাটায় কাটের ও চুণের পাঁচখান গোলা, নগদ দশ বারো লাক টাকা দাদন ও চোটায় খাটে! কোম্পানির কাগজেরও মধ্যে মধ্যে লেনদেন হয়ে থাকে, বারোমাস প্রায় সহরেই বাস, কেবল পূজোর সময় দশ বারো দিনের জন্যে বাড়ি যেতে হয়, একখানি বগি, একটি লাল ওয়েলার, একটি বাঁড়, দুটি তেলি মো-সাহেব, গড়পাড়ে বাগান ও ছ-ডেঁড়ে এক ভাউলে ব্যাভার, আয়েস ও উপাসনার জন্যে নিয়ত হাজির। ... হাতে সোনার তাগা, কোমরে মোটা সোনার গোট, গলায় এক ছড়া সোনার ইষ্টিকবচ পরে থাকেন, গঙ্গাস্নানটি প্রত্যহ হয়ে থাকে, কপালে কণ্ঠায় ও কানে ফোটাও ফাঁক যায় না।' 'দুর্গোৎসবে' বাবুর ঐশ্বর্যের এই দফাওয়ারি প্রদর্শনীর ব্যঙ্গ আস্তা কুড়ের কুকুরের উপমায় সত্যি নির্মম : 'বাবুর সামনে একটা সোনার আলবোলা, ডাইনে একটা পান্নাবসান ফুরসি, বাঁয়ে একটা হীরে বসান টোপ্‌দার গুড়গুড়ি ও পেছনে একটা মুক্তোবসান পেঁচুয়া পড়লো ; বাবু আঁস্তা কুড়ের কুকুরের মত ইচ্ছা অনুসারে আশেপাশে মুখ দিচ্চেন ও আড়ে আড়ে সামনে বাজে লোকের ভিড়ের দিকে দেখচেন—লোকে কোন্‌টার কারিগরির প্রশংসা কচ্চে ; যে রকমে হোক, লোককে দেখান চাই যে, বাবুর রূপো সোনার জিনিস অঢেল, এমন কি বসাবার স্থান থাকলে আরো দুটো ফুরসি বা গুড়গুড়ি স্থাখান যেতো।'

সঙের চিত্র বা বর্ণনা হুতোম প্যাচার নকশার কোনও কোনও রচনার মূল মোটিফ। 'কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা'র বীরকৃষ্ণ দাঁ ও তাঁর ম্যানেজার কানাইধন দত্ত বারোইয়ারি পুজোর প্রধান উদ্যোক্তা, সঙের প্রদর্শনী উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ, সেইজন্যেই : 'আজ এসময় বীরকৃষ্ণ দাঁর গদিতে বড় ধুম—অধ্যক্ষরা একত্রে হয়ে কোন্ কোন্ রকম সং হবে, কুমোরকে তারই নমুনো দেখাবেন। কুমোর নমুনো মত সং তৈয়ের করবে, দাঁ মহাশয় ও ম্যানেজার কানাইধন দত্তজা নমুনোর মুখপাত।' কলকাতার এই বাবুরাও যে সঙ বিশেষ, হুতোম এখানে সেই বিদ্রূপাত্মক ইঙ্গিত দেন। কোনও কোনও সঙে ভারতবর্ষের পুরাণ কাহিনী ও প্রাচীন ইতিবৃত্তকে রূপ দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যেও ঔপনিবেশিক জীবনের বিকৃতি হুতোমের ব্যঙ্গদৃষ্টির পর্যবেক্ষণে

স্পষ্ট হয়ে উঠেছে : 'কোথাও নবরত্নের সভা—বিক্রমাদিত্য বত্রিশ পুতুলের সিংহাসনের উপর আফিমের দালালের মত পোশাক পরে বসে আছেন। কালিদাস, ঘটকর্পর, বরাহমিহির প্রভৃতি নবরত্নেরা চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—রত্নদের সকলেরই এক রকম ধুতি, চাদর ও টিকি ; হঠাৎ দেখলে বোধ হয় যেন একদল অগ্রদানী ক্রিয়াবাড়ী ঢোকবার জন্যে দরওয়ানের উপাসনা কচ্চে!' এবং—'কোনখানে রাম রাজা হয়েছেন—বিভীষণ, জাম্বুবান, হনুমান ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরেরা সহুরে মুচ্ছুদী বাবুদের মত পোষাক পরে চারদিকে দাঁড়িয়ে আছেন।' ঔপনিবেশিক আর্থসামাজিক কাঠামোয় কিছুসংখ্যক নির্দিষ্ট জীবিকাহীন উচ্ছিষ্টজীবী মানুষ এদেশে দেখা দিয়েছিল, তাদের বাবুয়ানির জলুসের অন্তরালস্থিত অন্তঃসারশূন্য জীবনকে কাহিনীকথক সঙের বিদ্রূপাত্মক নকশায় তীক্ষ্ণভাবেই উদ্ঘাটিত করেছেন : 'বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন' সং বড় চমৎকার!—বাবুর ট্যাসল দেওয়া টুপি' পাইনাপেলের চাপকান, পেটিও সিল্কের রুমাল, গলায় চুলের গার্ডচেন অথচ থাকবার ঘর নাই, মাসীর বাড়ি অন্ন লুসেন, ঠাকুরবাড়ি শোন, আর সেনেদের বাড়ি বসবার আড্ডা। পেটভরে জলখাবার পয়সা নাই অথচ দেশের রিফর্মেশনের জন্যে রাত্তিরে ঘুম হয় না। (মশারির অভাবও ঘুম না হবার একটি প্রধান কারণ)। পুলিস বড় আদালত, টালার নিলেম, ছোট আদালতে দিনের ব্যালা ঘুরে বেড়ান সন্ধ্যে ব্যালা ব্রহ্ম সভার মিটিং ও ক্লাবে হাঁফ ছাড়েন —গোয়েন্দাগিরি, দালালি, খোসামুদি ও ঠিকে রাইটারিকরে যা পান, ট্যাসল-ওয়ালা টুপি, পাইনাপেলের চাপকান রিপু কত্তে ও জুতো বুরুসেই সব ফুরিয়ে যায়।'

হুতোম এখানে শুধু সঙের বর্ণনা দেননি, পৌরাণিক ও প্রাচীন সঙগুলির পোষাকে ও ভঙ্গিতে আফিমের দালাল, মুৎসুদ্দি প্রভৃতি ইংরেজ বণিক-সাম্রাজ্য থেকে উদ্ভূত বাবুদের কিংবা এই ধনীশ্রেণীর প্রসাদপ্রার্থী ব্রাহ্মণদের মানসিকতা ও আচরণের প্রতিফলন পর্যবেক্ষণে এবং আধুনিক সঙের স্বরূপব্যাখ্যার অনুপুংখে তাদের ব্যাঙ্গাত্মক সমালোচনাই করেছেন। এই সমালোচনা আরো স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ রূপ পেয়েছে এই বাবুরাও যে সঙ তার বিদ্রূপাত্মক উল্লেখে, যার উদাহরণ আমরা বীরকৃষ্ণ দাঁ ও কানাইধন দত্তের প্রসঙ্গে দেখেছি। আরো দু একটি উদাহরণ দেওয়া যায়······'বারো ইয়ারিতলা লোকারণ্য হয়ে উঠলো —একদিকে কাঠগড়া ঘেরা মাটির সং—অন্যদিকে নানা রকম পোষাক পরা

কাঠগড়ার ধারে ও মধ্যে জ্যান্ত সং। বড় মানুষরা ট্যাসলওয়ালা টুপি, চাপকান পেটি ও ইষ্টিকে চালচিত্রের অসুর হতেও বেয়াড়া দেখাচ্চেন।' এবং—'অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুর গৌরবর্ণ, দোহারা—মাথায় খিড়কীদার পাগড়ি—জোড়াপরা পায়ে জরির লপেটা জুতো, বদমাইসের বাদসা ও ন্যাকার সর্দ্দার। বাই, রাজা দেখে কাছে বাগে সরে এসে নাচতে লাগলো, "পূজোর সময় পরবস্তি হই যেন' বলেই তবলূচী ও সারেঙ্গীরা বড় রকমের সেলাম বাজালে, বাজেলোকেরা সং ও বাই ফেলে কোন অপরূপ জানোয়ারের মত রাজা বাহাদুরকে এক দৃষ্টে দেখতে লাগলেন।'

মফঃস্বল শহরেও পূজোর মত্ততার বিবরণ দিতে হুতোম ভোলেন নি: 'পূর্বে চুঁচড়োর মত বারোইয়ারি পূজো আর কোথাও হতো না, "আচাভো" "বোম্বাচাক" প্রভৃতি সং প্রস্তুত হতো; সহরের ও নানা স্থানের বাবুরা বোট, বজ্‌রা, পিনেস ও ভাউলে ভাড়া করে সং দেখ্‌তে যেতেন; লোকের এত জনতা হতো যে, কলাপাত এক টাকায় একখানি বিক্রি হয়েছিলো, চোরেরা আন্তীল হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু গরিব দুঃখী গেরস্তোর হাঁড়ি চড়ে নি—এই বর্ণনার শেষ অংশে পূজোর হুজুক মত্ততার সুযোগে চোরদের 'আন্তীল' অর্থাৎ প্রচুর ধনশালী হওয়ার বিপরীতে তাকে ধিক্কার দিয়ে অনাহারক্লিষ্ট গরিব দুঃখি গৃহস্থদের দীর্ঘশ্বাসকে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতে অনুভব করি। বারোয়ারি পূজো নিয়ে শান্তিপুরওয়ালা ও গুপ্তিপাড়াওয়ালাদের বিকারগ্রস্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার এই বিবরণের রঙ্গব্যঙ্গময়ভঙ্গিতেই সঙ্গতি উৎপাদনের শক্তিসঞ্চারী কর্মকাণ্ড এবং দেশজসংস্কৃতির প্রাণবন্ত ধারার সংস্রববিহীন সমাজের সময়-অর্থের শোচনীয় অপচয়কে হুতোম তীক্ষ্ণ রূপ দান করেন: 'একবার শান্তিপুরওয়ালারা পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ করে এক বারোইয়ারি পূজো করেন; সাত বৎসর ধরে তার উজ্জুগ হয়, প্রতিমেখানি ষাট হাত উঁচু হয়েছিল, শেষে বিসর্জনের দিকে প্রত্যেক পুতুল কেটে কেটে বিসর্জন কত্তে হয়। তাতেই গুপ্তিপাড়াওয়ালারা "মার" অপঘাত মৃত্যু উপলক্ষে গণেশের গলায় কাচা বেঁদে এক বারোইয়ারি পূজো করেন, তাতেও বিস্তর টাকা ব্যয় হয়' (কলকাতার বারোইয়ারী পূজো)। 'আলালের ঘরের দুলালে' এই পূজো বার-ওয়াড়ি পূজা রূপে উল্লিখিত হয়েছে, হুতোম ইয়ারি শব্দটির সচেতন নির্বাচনে যেমন তেমনি তার এই ইতিবৃত্তেও তার চরিত্র নির্দেশ করেছেন: 'বারো জনে একত্র হয়ে কালী বা অন্য দেবতার পূজা করার প্রথা মড়ক হতেই সৃষ্টি হয়—ক্রমে সেই অবধি

"মা" ভক্তি ও শ্রদ্ধার অনুরোধে ইয়ার দলে গিয়ে পড়েক। মহাজন, গোলদার দোকানদার ও হেটোরাই বারোয়ারি পূজার প্রধান উদ্যোগী।' বীরকৃষ্ণ দাঁ ও অন্যান্য বাবুদের বারোয়ারি পূজো শেষ হলে প্রতিমা আটদিন রেখে দেওয়ার পর তার বিসর্জনের এই বর্ণনাও সেই বিকার, ধর্মকর্ম তথা হিন্দুয়ানির অন্তঃসারশূন্যতা ও অপচয়কে শাণিত রূপ দেয়: 'দৃশ্যরচনা এবং তার মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট কাহিনী কথকের টীকা মন্তব্যের বয়ানে: 'চারদল ইংরেজ বাজনা, সাজা তুরুক সোয়ার, নিশেন ধরা ফিরিঙ্গি, আশাসোঁটা ঘড়ি ও পঞ্চাশটা ঢাক একত্র হলো। বাহাদুরী কাট তোলা চাকা একত্র করে গাড়ির মত করে তাতেই প্রতিমে তোলা হলো; অধ্যক্ষেরা প্রতিমের সঙ্গে সঙ্গে চল্লেন, দু পাশে সঙেরা সার বেঁদে চল্লো। চিৎপুরের বড় রাস্তা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো, রাঁড়েরা ছাতের ও বারাণ্ডার উপর থেকে রূপো-বাঁদান হুঁকোয় তামাক খেতে খেতে তামাশা দেখতে লাগলো, রাস্তার লোকেরা হাঁ করে চল্‌তি ও দাঁড়ানো প্রতিমে দেখ্‌তে লাগলেন। হাটখোলা থেকে যোড়াসাঁকো ও মেছোবাজার পর্যন্ত ঘোরা হলো, শেষে গঙ্গাতীরে নিয়ে বিসর্জন করা হলো। অনেক পরিশ্রমে যে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিল; আজ তারি শ্রাদ্ধ ফুরুলো।'

'ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক' রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়, 'স্বয়ং ব্রাহ্ম-সমাজের ট্রাষ্টি' মায়ের শ্রাদ্ধের বিপুল আয়োজন করে বিভিন্ন দলভুক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণ করেন, তিনি সদরের প্রধান উকিল, সাহেবসুবোদের বাবুর প্রতি যে রকম অনুগ্রহ তাতে তিনি আরও কত কি হয়ে পড়বেন তার ঠিক নেই, সুতরাং তাঁর নিমন্ত্রণ পত্র ফিরিয়ে দেওয়াটাও ভাল হয় না, কিন্তু তিনিও ত * * * * (এই তারকাচিহ্নগুলোর ব্যবহারে তিনি যে ব্রাহ্ম তাই নিয়ে আড়ালে-আবডালে নীচু স্বরে ফুসফাস গুজগুজ করার ব্যঙ্গাত্মক ইংগিত দেওয়া হয়েছে, ব্রাহ্মই হন আর যাই হন' শাসক প্রভুদের অনুগৃহীত ক্ষমতাবান ব্যক্তি তো বটেন!)। কয়েকটি দলের দলপতিরা সেই শ্রাদ্ধে যোগ না দেবার জন্য তাঁদের দলস্থ পণ্ডিতদের ওপর নির্দেশ জারি করলেন: 'প্রোক্লেমেশন্ পেয়ে ভট্টাচায্যি ও ফলারেরা ডুব্ মাল্লেন; কেউ কেউ ফল্গু নদীর মত অন্তঃশীলে বইতে লাগলেন, ডুবে জল খেলে শিবের বাবার সাধ্যি নাই যে টের পান; তবুও অনেক জায়গায় চৌকি, থানা ও পাহারা বসে গ্যালো, কিছুতেই কিছু পাল্লেন না, টাকার খোসবো প্যাঁজ রসুনের গন্ধ ঢেকে তুল্লে—শ্রাদ্ধসভা

পবিত্র হয়ে উঠ্‌লো, বাগবাজারের মদনমোহন ও শ্রীপাট খড়দর শ্যামসুন্দর পর্যন্ত ব্রজের রজে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন।' এবং—'সপিণ্ডনের দিন সকালে রমাপ্রসাদ বাবু বারাণসী গরদের জোড় পরে ভক্তি ও শ্রদ্ধার আধার হয়ে পড়লেন। ব্যালার সঙ্গে সভার জনতা বাড়তে লাগলো, একদিকে রাজভাটেরা সুর করে বল্লালের গুণগরিমা ও আদিশূরের গুণ কীর্তন কত্তে লাগলো, একদিকে ভট্টাচার্যদের তর্ক লেগে গ্যালো, দুদশজন ভেতরমুখো কুলীন দলপতিরা ভয় ও লজ্জায় সোয়ার হয়ে সভাস্থ হতে লাগলেন, দল দল কেত্তন আরম্ভ হলো, খোলের চাটিতে ও হরিবোলের শব্দে ডাইনিং রুমের কাচের গ্লাস ও ডিশেরা যেন ভয়ে কাঁপতে লাগলো—বৈমাত্র ভাই ধুম করে মার শ্রাদ্ধ কচ্চেন দেখে জ্ঞাতিত্ব নিবন্ধন হিংসাতেই ব্রাহ্মধর্ম কাঁদতে লাগলেন, দেখে অ্যাম্‌বিশন হাসতে লাগলেন (রমাপ্রসাদ রায়)।' 'হুতোম' তাঁর বাস্তবসত্যসন্ধানী ব্যঙ্গের দৃষ্টি থেকে হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারীদের যেমন, তেমনি আধুনিকতার আলোকপ্রাপ্ত ও ইংরেজি কেতায় অভ্যস্ত ব্রাহ্মনেতাদেরও রেহাই দেন নি।

পূজোপার্বণ উপলক্ষ্যে আমোদফূর্তি ও তার উপকরণের প্রতিযোগীতা-মূলক প্রদর্শনীর নেশার বিকার সমাজের নিম্নস্তরেও সংক্রামিত হয়েছিল, তার প্রতিও হুতোম পাঠকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। 'রামলীলা'র এই বর্ণনা যে ক্ষুরধার মন্তব্য বা ভাষ্যে শেষ হয় তা লক্ষণীয়ঃ 'মাড়ওয়ারী খোট্টা ও বেশ্যারা খাতায় খাতায় ছক্কর ও কেরাঞ্চীতে রামলীলা দেখতে চলেচে; যাঁরা গোত্রহীন, তাঁরাও সখের অনুরোধ এড়াতে না পেরে হেঁটেই চলেচেন—কল্‌কেতা সহরের এই একটি আজব গুণ যে মজুর হতে লক্ষপতি পর্যন্ত সকলের মনে সমান সখ। বড়লোকেরা দানসাগরে যাহা নির্বাহ করবেন, সামান্য লোককে ভিক্ষা বা চুরি পর্যন্ত স্বীকার করেও কায়ক্লেশে তিলকাঞ্চনে সেটির নকল কত্তে হবে।'

'মাহেশের স্নানযাত্রা' সেই সামাজিক অধোগতির বাস্তব ও জীবন্ত রেখাচিত্র। তার নায়ক একজন সাধারণ শ্রমজীবী মানুষঃ 'গুরুদাস গুঁই সেরুড কোম্পানির বাড়ির মেট মিস্তিরি। তিরিশ টাকা মাইনে, এসওয়ায় দুশ টাকা উপরি রোজগারও আছে—গুরুদাসের চাঁপাতলা অঞ্চলে একটি খোলার বাড়ি ছিল; পরিবারের মধ্যে এক বুড়ো মা, বালিকা স্ত্রী ও বিধবা পিসিমাত্র। গুরুদাস বড় সাখরচে লোক, যা দশটাকা রোজগার করেন, সকলই খরচ হয়ে যায়; এমনকি কখন কখন মাস কাবারের পূর্বে গয়নাখানা ও জিনিসটে পত্তরটাও বাঁদা পড়ে; বিশেষত শ্রাবণ মাসে ইলিস মাছ ওঠবার পূর্বে চ্যা

ফ্যালা পার্বণে গুরুদাসের দু মাসের মাইনেই খরচ হয় — । তারা পাঁচজন ইয়ার মিলে স্নানযাত্রার আমোদের উদ্যোগ আয়োজন শুরু করে দেয়, কেউ বজরা ভাড়া করে আসে, কেউ নবীন আতুরী, আমিস, রম ও গাঁজার ভার নেয়. 'গোলাবি খিলির দোনা, মোমবাতি ও মিটে কড়া তামাক ও আর আর জিনিষপত্র গুরুদাস স্বয়ং সংগ্রহ করে রাখে। আগামীকাল রাত্রির জোয়ারে নৌকোয় ওঠা হবে স্থির হল। ভোর হতে না হতেই গুরুদাসের ইয়ারেরা সেজে গুজে তৈরি হয়ে তার বাড়িতে উপস্থিত হয়: 'গোপাল এক জোড়া লাল রঙের এষ্টকীং (মোজা) পায়ে দিয়েছিলেন, পেতলের বড় বড় বোদাম দেওয়া সবুজ রঙের একটি ফতুই ও গুলদার ঢাকাই উড়ুনি তাঁর গায়ে ছিল, আর একটি বিলিতী পেতলের শিল আংটিও আঙ্গুলে পরেছিলেন - কেবল তাড়াতাড়িতে জুতো জোড়াটি কিনতে পারেন নাই বলেই স্বদু পায়ে আসা হয়।' গুরুদাস তামাক খেয়ে হাতমুখ ধুতে যায়? 'এমন সময় ঝম্ ঝম্ করে এক পসলা, ভারী বৃষ্টি' আসে, ক্রমে ক্রমে থেমে যায়: 'গুরুদাসও হাত মুখ ধুয়ে এসেই মাকে খাবার দিতে বল্লেন; ঘরে এমন তৈরি খাবার কিছুই ছিল না, কেবল পান্তাভাত আর তেঁতুল দিয়ে মাছ ছিল, তাঁর মা তাই চারখানি মেটে খোরায় বেড়ে দিলেন, গুরুদাস ও তাঁর ইয়ারেরা তাই বহুমান করে খেলেন।' গুরুদাসের সাজ সজ্জার এই বর্ণনায়ও ঘর ও বাইরের পার্থক্যকে হুতোম, রাশিয়ান ফর্মালিস্টদের পারিভাষিক শব্দের অনুসরণে বলতে পারি, পুরোভূমিতে স্থাপন করে বা পুরোভূমীকরণে (foregrounding) অর্থপূর্ণ করে তোলেন: 'গুরুদাসের পোসাকটিও নিতান্ত মন্দ হয় নি. তিনি একখানি সরেস গুলদার উড়ুনি গায়ে দিয়েছিলেন, উড়ুনিখানি চল্লিশ টাকার কম নয়—কেবল কাটের কুচো বাঁদবার দরুণ চার পাঁচ জায়গায় একটু একটু খোঁচে গেছলো—তাঁর গায়ে একটি লাল বিলিতী ঢাকা প্যাটনের পিরান ছিল, তার ওপর বুলু রঙের একটি হাপ চায়নাকোট—তিনি "বেঁচে থাকুক বিদ্দেসাগর চিরজীবী হয়ে" পেড়ে এক শান্তিপুরে ফরমেসে ধুতি পরেছিলেন, জুতো জোড়াটিতেও রূপোর বকলস দেওয়াছিল।' নৌকোয় ওঠার পর গোপাল তাদের স্নানযাত্রায় আমোদের প্রধান উপকরণ মেয়েমানুষের অভাবের কথা বলে, নারায়ণ সায় দেয়: 'বাবা, যে নৌকোখানায় তাকাই, সকলি মালভরা, কেবল আমরা ব্যাটারাই নিরিমিষযি! আমরা যেন বাবার পিণ্ডি দিতে গয়া কাশী যাচ্চি।' কিন্তু চার দিকে ঘোরাঘুরি করেও তারা মেয়েমানুষ জোগাড় করতে পারে না,

অবশেষে গুরুদাস অনেক অনুরোধ-উপরোধে তার বিধবা পিসিকে তাদের স্নান-যাত্রার সঙ্গী হতে রাজি করিয়ে নিজেদের মান রক্ষা করে। গভীর রাত্রি পর্যন্ত হৈ-হুল্লোড় নেশাভাঙের পর ভোর হয়, কোনো নৌকো থেকে 'গলাভাঙ্গাস্বরে' পাঁচালি বা হাফ-আখড়াইয়ের গান শোনা যায়—'কোনখানি কফিনের মত নিঃশব্দ—কোনখানিতে কান্নার শব্দ—কোথাও নেশার গোঁ গোঁ ধ্বনি কফিনের উপমা সংবলিত এই আশ্চর্যরকমের মর্মঘাতী ইঙ্গিতময় বর্ণনায় উচ্ছৃংখল, অমানুষিক আমোদ প্রমোদের মনুষ্যত্ব-বিধ্বংসী মত্ততার পর গ্লানিময় অবসাদে স্বাস্থ্যশক্তি অর্থের অপচয়, যন্ত্রণা (এই কান্নার শব্দ কি একাধিক পুরুষের পাশবিক নিপীড়নে বিধ্বস্ত কোনও দুর্ভাগিনী নারীর ?) ইত্যাদিকে আভাসিত করে হুতোম তাঁর পাঠকদের চেতনাকে আঘাত করেছেন।

ইংরেজ শাসকেরা এদেশীয়দের মিথ্যাচার অসততা ইত্যাদি নৈতিক দুর্গতির বিপরীতে নিজেদের ন্যায়পরায়ণতা, সততা, নৈতিকতা, সভ্যসমাজের আইনব্যবস্থা প্রভৃতির মহিমার যে বয়ান তৈরি করেছিল, এদেশের বুদ্ধিজীবী-দের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তাকে তাঁদের বাঙালিসমাজের আধুনিকীকরণের বয়ানের অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন। তাঁরই প্রচ্ছন্ন কিন্তু কঠিন প্রতিবাদমূলক প্রতিন্যাসে (Counterpoint) হুতোম ইংরেজ শাসনশক্তির স্বরূপ এবং তার কাছে বাঙালিদের আত্মসমর্পণ উদ্‌ঘাটিত করেছেন একাধিক নকশায়, মুখ্যভাবে 'মিউটিনি' 'জষ্টিস্‌ ওয়েল্‌স্‌' 'পদ্রিলং' ও 'রেলওয়ে-'তে। এখানে বিস্তৃত বিশ্লেষণের সুযোগ নেই, দু-তিনটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। হিন্দুদের ধর্মকর্ম পালপার্বণের উৎসাহ উত্তেজনাও যে কিভাবে নিরস্ত হয়ে যেত কোম্পানির দোর্দণ্ডপ্রতাপ-শাসনে, 'কলিকাতার চড়ক পার্বন'-এর এই ব্যঙ্গাত্মকচিত্রে তার বাস্তব রূপ মেলে: 'ক্রমে পুলিসের হুকুম মত সব গাজন ফিরে গেল। সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট রাস্তায় ঘোড়া চড়ে বেড়াচ্ছিলেন, পকেটঘড়ি খুলে দেখলেন, সময় উতরে গ্যাচে; অমনি মার্শল ল জারি হলো, ঢাক বাজালে থানায় ধরে নিয়ে যাবে। ক্রমে দুই একটা ঢাকে জমাদারের হেতে কোঁৎকা পড়বামাত্রই সহর নিস্তব্ধ হলো। অনেকে ঢাক ঘাড়ে করে চুপে চুপে বাড়ি এলেন—দর্শকেরা কুইনের রাজ্যে অভিসম্পাত কত্তে কত্তে বাড় ফিরে এলেন।' বাবু পদ্মলোচন দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতারে সাহেবদের অনুগ্রহে বিনা টাকায় মুৎসুদ্দি হয়ে পদ্মলোচন দীনদরিদ্র অবস্থা থেকে ধনী হন, ক্রমে নানা উপায়ে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় কত্তে লাগলেন, শহরের বড়মানুষ হলে যে সব জিনসপত্র ও

উপাদান প্রয়োজন, তাঁর আত্মীয় ও মোসাহেবরা ক্রমশ সেগুলো সংগ্রহ করে 'ভাণ্ডার ও উদর' পূর্ণ করে ফেলল, 'বাবু স্বয়ং পছন্দ করে (আপনচক্ষে স্বুবর্ণ বর্ষে) একটি রাঁড়ও রাখলেন, 'প্রকৃত হিন্দুর মুকোস পরে সংসার রঙ্গভূমিতে নাবলেন—ব্রাহ্মণের পাদ্‌ধুলো খান—পা চাটেন—দলাদলির ও হিন্দুধর্ম্মের ঘোঁট করেন' তাঁর-'বৈঠকখানায় ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপক ধরে না।'

তাঁর ছেলের বিয়ের শোভাযাত্রার বর্ণনায়—'মধ্যে বাবুর মোসাহেব, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, পরিষদ, আত্মীয় ও কুটুম্বরা। সকলেরই একরকম শাল, মাথায় রুমাল জড়ান, হাতে এক একগাছি ইষ্টিক; হঠাৎ বোধ হলো যেন এক কোম্পানি ডিজার্মড সেপাই—সিপাইবিদ্রোহের ব্যর্থতার পর নিরস্ত্রীকৃত সিপাহীদের উপমায় পরাধীনতার যন্ত্রণার অগ্নিময় আভাসে হুতোম শুধু বাবুর প্রসাদ প্রার্থীর অনুচরদেরই নয়, সমগ্র জাতীয় জীবনের হীনতা ও দৈন্যকেই রূপকায়িত করেছেন।

'রেলওয়ে' শীর্ষক নকশায় ইংরেজ শাসকদের ভারতবর্ষকে সভ্য করে তোলার সব থেকে গৌরবময় কীর্তিরূপে উল্লিখিত রেলওয়ে পরিবহন ব্যবস্থায় সাধারণ যাত্রীদের শোচনীয় দুর্গতির যে চিত্র হুতোম এঁকেছেন বাস্তব অনুপুংখে সত্যি তুলনাহীন: 'টুনুনাংটাং টুনুনাংটাং করে রেলওয়ে ইষ্টিম ফেরী ময়ুরপঙ্খীর ছাড়বার সংকেত ঘণ্টা বাজচে, থার্ডক্লাস বুকিং আপিসে লোকের ঠেল মেরেচে, রেলওয়ের চাপরাসীরা সপাসপ্ বেত মাচ্চে, ধাক্কা দিচ্চে ও গুঁতো লাগাচ্চে তথাপি নিবৃত্তি নাই। "মশাই শ্রীরামপুর!" "বালি বালি!" "বর্ধমান মশাই"! 'আমার বর্ধমানেরটা দিন না'শব্দ উবচে চারিদিকে কাঠের বেড়াঘেরা বুকিংক্লার্ক সন্ধ্যাপূজার অবসরমত ঝোপ বুঝে কোপ ফেলচেন। কারো টাকা দিয়ে চার আনার টিকিট ও দুই দোয়ানি দেওয়া হচ্চে, বাকি চাবামাত্র 'চোপ রও' ও 'নিকালো', কারো শ্রীরামপুরের দাম নিয়ে বালির টিকিট বেরুচ্চে, কেউ টিকিটের দাম দিয়ে দশ মিনিট চীৎকার কচ্চে, কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই।……যদি চীৎকার করে ক্লার্ক বাবুর চিত্তাকর্ষণ কত্তে চেষ্টা করে, তখনি রেলওয়ে পুলিসের পাহারাওয়ালা ও জমাদারেরা গলা টিপে তাড়িয়ে দেবে।' সাহেব বিবিদের টিকিট কাটার কাউণ্টারের চিত্র কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত: 'ফাষ্ট ক্লাস সাহেব বিবির স্থল, সেখানে টুঁ শব্দটি নাই, ক্লার্ক রিক্তহস্তে টিকিট বেচতে আসেন ও সেই মুখেই ফিরে যান, পান তামাকের পয়সাও বিলক্ষণ অপ্রতুল থাকে।' 'মিউটিনি শীর্ষক নকশায় সিপাহী বিদ্রোহের

পর ইংরেজ শাসকদের মনোভাব ও ইংরেজ শাসনের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে অসাধারণ তীক্ষ্ণতায়। এই বিদ্রোহের জন্য ইংরেজদের আক্রোশ থেকে বাঙালিরাও রক্ষা পায় নি :……'শ্রীবৃদ্ধিকারী সাহেবরা (হিঁদুর দেবতা পঞ্চানন্দের মত) বড় ছেলের কিছু কত্তে পাল্লেন না, ছোট ছেলের ঘাড় ভাঙ্গবার উজ্জুগ পেলেন—সেপাইদের রাগ বাঙ্গালিদের উপর ঝাড়তে লাগলেন। লর্ড ক্যানিংকে বাঙ্গালিদের অস্ত্রশস্ত্র (বঁটি ও কাটারি মাত্র) কেড়ে নিতে অনুরোধ কল্লেন! বাঙ্গালিরা বড় বড় কাজকর্ম না পায় তারও তদ্বির হতে লাগলো,… নীলকরেরা অনরেরী মেজেষ্টর হয়ে মিউটিনি উপলক্ষ করে (চোর চায় ভাঙ্গা ব্যাড়া) দাদন, গাদন ও শ্যামচাঁদ খ্যালাতে লাগলেন। শ্যামচাঁদ সামান্নি নন, তাঁর কাছে আইন এগুতে পারেন না – সেপাইত কোন ছার! এই সব আক্রমণের মুখে সন্ত্রস্ত বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ইংরেজ শাসকদের করুণালাভের কাতর প্রয়াসের বর্ণনায় তাঁদের আত্মমর্যাদাবোধহীন মনোভাবের প্রতি কঠিন ধিক্কার সুস্পষ্ট : 'বাঙ্গালিরে ক্রমে বেগতিক দেখে গোপাল মল্লিকের বাড়িতে সভা করে সাহেবদের বুঝিয়ে দিলেন যে, যদিও একশ বছর হয়ে গ্যালো, তবুও তাঁরা আজও সেই হতভাগা ম্যাড়া বাঙ্গালিই আচেন—বহুদিন ব্রিটিশ সহবাসে ব্রিটিশ শিক্ষায় ও ব্রিটিশ ব্যবহারেও আমেরিকানদের মত হতে পারেন নি। (পারবে কিনা, তারও বড় সন্দেহ!) তাদের বড় মানুষদের মধ্যে অনেকে তুফানের ভয়ে গঙ্গায় নৌকো চড়েন না—রাত্তিরে প্রস্রাব কত্তে উঠ্‌তে হলে স্ত্রীর বা চাকর চাকরানীর হাত ধরে ঘরের বাইরে যান অস্তরের মধ্যে টেবিল ও পেননাইফ ব্যবহার করে থাকেন, যাঁরা আপনার ছায়া দেখে ভয় পান—তাঁরা যে লড়াই করবেন একথা নিতান্ত অসম্ভব। বলতে কি, কেবল আহার ও গুটিকতক বাছালো বাছালো আচারে তাঁরা ইংরেজদের স্কেচমাত্র করে নিয়েছেন। যদি গবর্ণমেণ্টের হুকুম হয়, তাহলে সেগুলিও চেয়ে পরা কাপড়ের মত এখনই ফিরিয়ে দ্যান—রায় মহাশয়ের মগ বাবুর্চিকে জবাব দেওয়া হয়—বিলিতী বাবুরা ফিরতি ফলারে বসেন—ও ঘোষজা গাঁজা ধরেন, আর বাগাম্বর মিত্র বনাতের প্যানটুলন ও বিলিতী বদমাইশি থেকে স্বতন্ত্র হন।'[১০]

এই আলোচনার প্রথমাংশে মেটাফ্যার ও মেট্যামিমি সম্পর্কে যে কথা বলেছি সেই প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা যাক। মেট্যামিমি অর্থাৎ চরিত্র ও পরিবেশগত বাস্তবতাবোধক অনুপুংখের নকশায় হুতোম বাস্তবজীবনচিত্রণের

শিল্প-প্রকরণের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও তার প্রয়োগের সার্থক দৃষ্টান্তই শুধু তুলে ধরেননি, তাঁর আধুনিক সচেতনার সূত্রে দেশীয় ঐতিহ্যাশ্রয়ী কাহিনী কথকের ভূমিকাঘটিত ভাষ্যে বা সমালোচনায় সেইসব অনুপুংখ, দৃশ্য, বর্ণনা, বিবরণ ইত্যাদি নিছক বাস্তবের প্রতিফলনমূলক দলিলচিত্রে সীমাবদ্ধ না থেকে এদেশের ঔপনিবেশিক জীবনের বিড়ম্বনা-অসঙ্গতি-অভিশাপ-দুর্গতি ও আত্মপরিচয় সন্ধানের রূপক হয়ে উঠেছে, সেই রূপকার্থেই কথাকাঠামোর (fictive) বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, টুকরো টুকরো নকশাগুলো কোলাজের মত অল্পবিস্তর পরিমাণে তার সামগ্রিক রূপ পেয়েছে। কেনেথ বার্ক যথার্থই বলেছেন, রূপকের অর্থ পরিপ্রেক্ষিত রচনা, সমাজ সমালোচনা বা জীবনভাষ্যেই তার মূল নিহিত।

চার

হুতোম প্যাঁচার নকশা স্বাধীনতা লাভের চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় কেটে যাওয়ার পরও হুতোম-বর্ণিত এদেশের সেই ঔপনিবেশিক আর্থ-সামাজিক রূপের কোনও মৌলিক পরিবর্তন কি আমাদের চোখে পড়ে, বাইরের চেহারার অদলবদল ছাড়া সঙ্গতি-উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কিত অসাধু ব্যবসায়িক লেনদেনে যথেচ্ছ মুনাফা-লুণ্ঠনে ফুলে-ফেঁপে ওঠা ধনীশ্রেণী, তাদের অপরিমিত ভোগবিলাসে বা ঐশ্বর্যের প্রদর্শনী—পারিবারিক-সামাজিক অনুষ্ঠানে অর্থের অপচয়—হুতোমের সেই অন্ধকার জগৎ কি আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ নয়?

সে কথা থাক, আমাদের মূল বিষয়ে ফিরে আসি। উপন্যাসের যে ইয়োরোপীয় রূপ সে যুগের বাঙালি পাঠক-সমালোচক-লেখকদের কাছে প্রত্যক্ষগোচর হয়েছিল, সেই ব্যক্তিজীবন ও তার প্রেমপ্রণয়ের মডেলচর্চা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে বাঙলা উপন্যাসের মূলস্রোত হয়ে উঠলেও সেটাই তার শেষ কথা নয়। 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র দেশজ কাহিনী কথনের ধারায় সমাজের আনুভূমিক রূপচিত্রণের রীতিকে নতুনভাবে উজ্জীবিত হতে দেখি তারাশঙ্করের গণদেবতায় ও পঞ্চগ্রামে, নায়ক দেবুপণ্ডিত, উপন্যাসের সব থেকে দুর্বল অংশ, তার মধ্যে ব্যক্তিজীবনের সেই প্রথাবদ্ধ মডেলের ছায়াপাত সত্ত্বেও। তারাশঙ্কর উনবিংশ শতাব্দীর ঐ দুটি

রচনার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন একথা বলা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক আসলে তাঁদের শেকড়ের লোকায়ত জীবন ও সংস্কৃতি নানা দুর্যোগ, পরতন্ত্রতা ও সংস্কৃতিক অবক্ষয়ের চাপের মধ্যেই প্রবাহিত হয়ে এসে মুক্তিবহ শক্তিরূপে তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। কিন্তু, সাম্প্রতিক কালের বাঙলা আখ্যান সাহিত্যে সব থেকে গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ শিল্পকর্ম তিস্তাপারের বৃত্তান্তে কি সেই দেশজ কাহিনী কথনের আদর্শই সচেতনভাবে অনুসৃত হয়েছে বলে মনে হয় না? বাঘারু যতই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক. সে এতাবৎকালের উপন্যাসের প্রথাশোভন নায়ক নয়, লেখক প্রচণ্ড দুঃসাহসে সেই ব্যক্তিজীবন ও প্রেমপ্রণয়ের মডেল ভেঙ্গে দিয়ে একটি নদী ও তার জনপদের আনুভূমিক রূপ চিত্রিত এবং অনেকটা হুতোমের নকশার মতই প্যারডির ধাঁচে আধুনিকীকরণের ইয়োরোপীয় মডেল-নির্ভর বৃহৎ নদী-বাঁধপ্রকল্পের আড়ম্বরময় প্রদর্শনী ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির অন্তঃসারশূন্য তা উদ্ঘাটিত করেছেন।

সূত্র

১. বাংলা উপন্যাস, দেবেশ রায় : উপন্যাস নিয়ে, জানুয়ারি ১৯৯১

২. Malini Bhattacharya : Calcutta : A quest for Cultural Identity, Economic And Political weekly, May 5-12, 1990, পৃ : 1007.

৩. Lucien Goldmaun : Dialectical Materialism and Literary History, New Left Review, No 92. July-August 1975, পৃ: 47. এই মূল্যবান লেখাটি দেখার সুযোগ পেয়েছি দেবেশ রায়ের সৌজন্যে।

৪. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত হুতোম প্যাঁচার নকশা, ভূমিকা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পুনর্মুদ্রণ, মাঘ, ১৩৬৩

৫. Bengali Literature, Bankim Rachanavali, Edit. by Jogesh Chandra Bagal, Calcutta, March 1969, পৃ: 112.

৬, সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা,

পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৭০, পৃঃ ১৯৯ এবং বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, কলিকাতা, পঞ্চম সংস্করণ ১৩৮৩, পৃঃ ৬১-৬২.

৭. এ সম্পর্কে মূল্যবান কাজ করেছেন অরুণ নাগ তাঁর সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশায়; কিন্তু বইটি হাতের কাছে না পাওয়ায় তাঁর পরিশ্রমী গবেষণালব্ধ তথ্যাদি উল্লেখ করা গেল না।

৮. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ—ভূমিকা, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬১ পৃঃ ৮৫১

৯. Charles Dickens : Ch VI, Meditations in Monmouth street Sketches By Boz, Everyman Library, 1968, পৃ: Street 42-43

১০. হুতোম প্যাঁচার নকশা থেকে এই উদ্ধৃতিগুলি দেওয়া হয়েছে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ থেকে। আমার পূর্বপ্রকাশিত একটি রচনার কিছু অংশ এই প্রবন্ধে ব্যবহার করেছি।

বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষা প্রসঙ্গে

মৃণালকান্তি ভদ্র

আন্তোনিও গ্রামশি

আন্তোনিও গ্রামশি—বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষা, সম্পাদনা ও অনুবাদ—সৌরীন ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্ল পাবলিশার্স, ২০৬ বিধান সরণী কলিকাতা-৭০০০৬

১

আন্তোনিও গ্রামশি ছিলেন ইতালির অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক নেতা। ১৯৯১-এ তাঁর জন্মের শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হলো। এই উপলক্ষে পার্ল পাবলিশার্স তাঁর নির্বাচিত রচনাবলী ও তাঁর তাত্ত্বিক চিন্তা সম্বন্ধে বিচার বিশ্লেষণ অনুবাদের মধ্য দিয়ে বাংলাভাষায় প্রকাশ করার এক বিরাট কর্মোদ্যোগ নিয়েছেন। বর্তমান প্রেক্ষিতে এই উদ্যোগের একটি অংশ শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌরীন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ও অনুবাদিত গ্রামশির "জেলখানার নোটবই" এর দুটি ছোট সুসম্বদ্ধ রচনা "বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষা" পর্যালোচনা করা হবে। প্রসঙ্গতঃ, উল্লেখ করা যেতে পারে, সৌরীন ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামশির নির্বাচিত রচনা সংগ্রহের বাংলা অনুবাদের সম্পাদক ও অন্যান্যদের সঙ্গে অনুবাদকও। গ্রামশির রচনা দুটিতে আলোচনায় আসার আগে এই মহান বিপ্লবীর জীবন ও রাজনৈতিক কর্মধারার সঙ্গে কিছুটা পরিচিতি প্রয়োজন।

আন্তোনিও গ্রামশির জন্ম হয় ১৮৯১-এর ২২শে জানুয়ারী, ইতালির মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা সার্দিনিয়া দ্বীপের একটি গ্রামে। তবে প্রায় সেই সময় থেকেই তাঁরা একটি ছোট শহর ঘিলার্জায় চলে যান। আন্তোনিওর বাবা ঐ শহরে একটি অল্প বেতনের চাকরী করতেন। সে যুগে ইতালিতে মেয়েদের লেখাপড়ার বিশেষ প্রচলন ছিলনা। তবু আন্তোনিওর মা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিলেন। অল্পবয়স থেকেই আন্তোনিওর শরীর খুবই রুগ্ন ছিল, তাছাড়া মেরুদণ্ডের গঠন স্বাভাবিক না হওয়ায় একটা দৈহিক বিকৃতি ছিল। এই বিকৃতি দূর করতে ডাক্তাররা তাঁকে কড়িকাঠ

থেকে ঝুলিয়ে রাখতেন। বিকৃতি দূর হল না, কিন্তু তাঁর দেহ ঠিকমত বৃদ্ধি পেল না। দৈহিক বিকৃতিসহ তাঁর উচ্চতা পাঁচ ফুটের মত ছিল। তিনি লেখাপড়ায় খুবই মেধাবী ছিলেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় খুবই ভাল করেছিলেন। তারপর অর্থাভাবে অনেকদিন স্কুলে পড়তে পারেন নি। তাঁর যখন পনের বছর বয়স, তিনি মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি হলেন। এখানে পড়ার সময়ই তাঁর সমাজবাদী তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁর দাদা গেনারো সামরিক শিক্ষার জন্য তুরিন শহরে যায়। ঐ শহরেই তার সমাজবাদী আন্দোলনে দীক্ষা হয়। গেনারো ছোট ভাইকে রাজনীতির বই-পত্র পাঠাত। এর পরে ১৯১১-এর মাঝামাঝি আন্তোনিও তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এখানে পড়বার সময় তিনি মার্ক্সবাদের সঙ্গে পরিচিত হন। অন্যান্য যে সব মতবাদ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, তার মধ্যে ছিল বেনেদেত্তো ক্রোচের দর্শন। ইতালিতে যিনি মার্ক্সবাদের চর্চা শুরু করেছিলেন, ক্রোচে ছিলেন সেই আন্তোনিও লাব্রিওলার ছাত্র। ক্রোচে অবশ্য খুব শীঘ্রই মার্ক্সবাদ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তখনকার যুবসমাজে ক্রোচের প্রভাব ছিল অপরিসীম। তিনি নৈতিক পুনর্জাগরণের কথা বলতেন, কিন্তু বিশের দশকের গোড়ায় মুসোলিনির ফ্যাসীবাদের প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল। তবু সংস্কারপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগ থাকায় অনেকে মনে করতেন, তাঁর দর্শন বামপন্থী হতে পারে। প্রথমদিকে নিজেকে কিছুটা ক্রোচেবাদী মনে করলেও আন্তোনিও নিজেকে পরে তা থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। তাঁর "জেলখানার নোটবই"-তে মার্ক্সীয় দর্শনের সঙ্গে তুলনায় ক্রোচেবাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন।

এছাড়া গ্রামশির চিন্তায় অন্য যাঁরা কিছুটা পরোক্ষ প্রভাব ফেলেছিলেন তাঁরা হলেন জিওভান্নি জেনতিল ও রোদোলফো মোন্দোলফো। জেনতিল মার্ক্সের "থীসিস অন্ ফুয়্যারবাখ্" অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু তিনি ভাববাদী রীতিতে জ্ঞানপ্রক্রিয়ার ওপর জোর দেন, বাস্তব জগৎ ও মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ককে অবহেলা করেন। মোন্দোলফোও মার্ক্সের ভাববাদী ব্যাখ্যায় রত ছিলেন। গ্রামশি যে মার্ক্সের দর্শনকে "কর্মের দর্শন" বলতেন, তার অনুরূপ কথা মোনদোলফোর রচনায় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে মার্ক্সের বস্তুবাদী তত্ত্বের উপস্থিতি ছিল নামমাত্র। গ্রামশির চিন্তা ছিল অধিবিদ্যা-বিরোধী, তা জগতের বাস্তবতায় আবদ্ধ ছিল।

মনে হয়, ১৯.৩ নাগাদ গ্রামশি ইতালীয় সোশ্যালিস্ট পার্টির সদস্য হন। কোন জীবনীকার মনে করেন, ১৯১৫র শেষ ও ১৯১৬-র গোড়ার মধ্যেই "পেশাদারী বিপ্লবী" হিসাবে তাঁর নবজন্ম হয়। ১৯১৪ থেকে তাঁর সাংবাদিক জীবন শুরু হয়। তিনি সোশ্যালিস্ট পত্রিকা "ইল গ্রিদো দেল পোপোলোতে"-প্রথম লেখেন ঐ বছরের ৩১শে অক্টোবর। তাছাড়া বহুল প্রচারিত "অবন্তি"-তেও তিনি লিখতেন।

ইতালির তুরিন শহরের একটি বৈপ্লবিক ইতিহাস ছিল। ১৯১৩-তে ৯৩ দিনের একটানা শ্রমিক আন্দোলনে শ্রমিকরা অনেক দাবী আদায় করেন। এই আন্দোলন, ইতালিতে যুদ্ধ-বিরোধী প্রদর্শন, ১৯১৫-র সাধারণ ধর্মঘট, এবং ১৯১৭-র আগস্টে' তুরিনের গণ-অভ্যুত্থান গ্রামশির বিপ্লবী চেতনাকে গঠন করে। কিন্তু ইতালীয় সোশ্যালিস্ট পার্টির ভূমিকা মোটেই বিপ্লবের অনুকূল ছিলনা। পার্টির নেতৃত্ব বিভিন্ন ধরণের মতামতকে ঐক্যবদ্ধ করবার চেষ্টা করত, যদিও তা করতে সফল হত না। একদিকে ছিল দক্ষিণপন্থী সংস্কারপন্থী মনোভাব, অন্যদিকে ছিল চরম বামপন্থী কার্যকলাপ, দুইএর মাঝখানে পার্টি একটি মধ্যবর্তী অবস্থানে থাকবার চেষ্টা করত। কিন্তু এই প্রয়াস মুসোলিনির ফ্যাসীবাদী শক্তির কাছে ধ্বংস হয়ে যেতে লাগল।

১৯১৭-তে রাশিয়ার ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের কথা পৌঁছে যায়। এপ্রিল ২৯ তারিখে গ্রামশি" ইল গ্রিদো দেল পোপোলো"-তে লিখলেন, "রাশিয়ায় বিপ্লব নিঃসন্দেহে শ্রমিক শ্রেণীর জয় এবং তা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে।" অক্টোবর বিপ্লবের পর তিনি লিখলেন, "বলশেভিকরা তথাকথিত মার্ক্সবাদী নয়। তারা মার্ক্সবাদকে জীবনে রূপায়িত করেছে। তাকে যান্ত্রিকতা ও জড়তা থেকে মুক্তি দিয়েছে।" এরপর ১৯১৮-র ১৯শে অক্টোবর "ইল গ্রিদো দেল পোপোলো" বন্ধ হয়ে যায়। ১৯১৯-এর মে মাসে গ্রামশি তিনবন্ধুর সহযোগিতায় "লোর্দিনে নোভো" পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন পালমিরো তোগলিয়ত্তি, যিনি গ্রামশির সঙ্গে একই স্কুলে পড়েছিলেন। এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই কিছুদিনের মধ্যে গ্রামশি তাঁর "ফ্যাক্টরী কাউন্সিলে"র তত্ত্ব প্রচার করতে শুরু করলেন।

গ্রামশি মনে করলেন, ফ্যাক্টরী কাউন্সিল গুলি হবে ইতালীয় সোভিয়েট, এবং এইগুলির মধ্য দিয়েই পার্টি আন্দোলন করবে। এই ফ্যাক্টরী কাউন্সিলগুলিকে প্রোলেতারীয় আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু করলেও সোশ্যালিস্ট

পার্টির বাম অংশের নেতা আমাদেও বোর্দিগা গ্রামশির মতবাদকে সংস্কারপন্থী মনে করতেন। ১৯২০-এ এপ্রিলে তুরিনে মেটাল শ্রমিকদের ধর্মঘট হয়। সেই সময় গ্রামশি গণ-প্রতিষ্ঠান এবং বিপ্লবী পার্টির সম্পর্কটা ঠিক বুঝতে পারলেন। শ্রমিক আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ায় আত্ম-সমালোচনার মধ্য দিয়ে গ্রামশি তাঁর তাত্ত্বিক ভুল উপলব্ধি করতে পারলেন। বোর্দিগার সাথে তাঁর পার্থক্য দূর করে কম্যুনিস্ট পার্টি গঠনে প্রয়াসী হলেন।

১৯১৯-এর জানুয়ারীতে লিভোরনোতে সোশ্যালিস্ট পার্টির সপ্তদশ সম্মেলনে দল ভেঙে গেল। এক অংশ, যদিও এই অংশ সংখ্যালঘিষ্ট, বোর্দিগার নেতৃত্বে কমুনিস্ট পার্টি গঠন করল। বোর্দিগার মতবাদ সবটাই গ্রামশি সমর্থন করতেন না। তবু তাঁর নেতৃত্ব এবং ব্যক্তি-চরিত্রের প্রতি তাঁর অবিচল শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু নেতৃত্বের ফ্যাসীবাদ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ সঠিক ছিলনা। এঁরা মনে করতেন, ফ্যাসীবাদী একনায়ক স্থায়ী হতে পারেনা, এবং সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা ছিল ফ্যাসিস্ত দলের বামপন্থী অংশ কিন্তু কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেসে বলা হল, বুর্জোয়া রাষ্ট্রক্ষমতা চূর্ণ করে শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠার সময় এখন নয়। বরং কর্তব্য হচ্ছে সোশ্যালিস্টদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা। কিন্তু ইতালির কমুনিস্ট পার্টির রোম সম্মেলনে ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গঠনের প্রস্তাব বিশেষ সমর্থন পেল না। এই সময় গ্রামশি মস্কোতে কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যকরী সমিতিতে ইতালীয় পার্টির প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিতে গেলেন। এখানেই চিকিৎসার জন্য তিনি স্যানাটেরিয়ামে ভর্তি হন। সেখানে জুলিয়ার সঙ্গে তাঁর তাঁর আলাপ হয়। জুলিয়ার সঙ্গেই তাঁর বিয়ে হয়।

১৯২২-এর ২২শে অক্টোবর মুসোলিনি রোম অভিযান করেন এবং পরদিন তিনি ইতালি সরকারের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। চতুর্থ কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকে আবার শ্রমিক শ্রেণীর সবদলকে মিলিত করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কথা বলা হল। গ্রামশি এই নীতির পক্ষপাতী ছিলেন, যদিও তাঁর দলের নেতৃত্ব তা সমর্থন করতে রাজী ছিলনা। তবু তিনি ব্যাপকতর ঐক্য প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিলেন। ১৯২৩-এ কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বোর্দিগাকে অপসারণ করা হয়। এদিকে ফ্যাসিস্ত সরকার গোপন আস্তানায় হানা দিয়ে পুরো কমিটিকেই গ্রেপ্তার করল। এর ফলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, ভিয়েনায় ঘাঁটী করে সেখান থেকে গ্রামশি পার্টিকে পরিচালনা করবেন।

রাশিয়ায় ১৯২৪-এ লেনিন মারা যান এবং স্ট্যালিন ও ট্রটস্কির মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়। শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য প্রসারণের জন্য কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রস্তাব কারারুদ্ধ বোর্দিগা অগ্রাহ্য করে পার্টির নেতৃত্বের আন্তর্জাতিকের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে বলেন। গ্রামশি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। এই বছরের ৬ই এপ্রিলে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি পার্লামেন্টের সদস্য হন। ১২ই মে দেশে ফিরে আসেন। পার্টির এক গোপন সম্মেলনে তাঁর প্রস্তাব অধিকাংশের সমর্থন পেলনা। দক্ষিণপন্থী প্রস্তাবই বেশির ভাগ সদস্যই সমর্থন করলেন। গ্রামশি বুঝতে পারলেন, তাঁর ভাবধারা প্রসারের জন্য অধিকতর ক্ষমতা দরকার এবং রুগ্ন দেহে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন। তাঁর ইতালিতে ফেরার কিছুদিন পরেই সোশ্যালিস্ট পার্টির জেকোমো মাতিওতি, যিনি পার্লামেন্টের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন, পার্লামেন্টের অধিবেশনে মুসোলিনির কার্যকলাপ ও ফ্যাসিস্ত গুণ্ডামির নিন্দা করেন। এর পরে তিনি গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। পুলিশ কম্যুনিস্ট পার্টির পত্রিকা "লুনিতা''র অফিসে এসে শাসিয়ে যায়। এই ঘটনা নিয়ে যেন বাড়াবাড়ি করা না হয়। কিন্তু গ্রামশির নির্দেশে "এই গুপ্ত ঘাতকের সরকার নিপাত যাক'' শিরোনাম দিয়ে কাগজ বেরুল। পারিস্থিতি এমন হল যে, সমাজতন্ত্রের দিকে সরাসরি অগ্রসর হওয়া সম্ভব ছিল না। গ্রামশি বুঝতে পারলেন, প্রথমে চাই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন এবং তার জন্য দরকার সমস্ত ফ্যাসিস্ত বিরোধী শক্তির ঐক্য। কিন্তু কম্যুনিস্ট পার্টি বা অন্যান্য ফ্যাসিস্ত বিরোধী শক্তি এই ঐক্যের জন্য প্রস্তুত ছিল না।

দেশের রাজনৈতিক অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়। গ্রামশির মনে আশা জাগে, ফ্যাসিস্ত সরকারের পতন ঘটবে। কিন্তু মুসোলিনি সরকার বুর্জোয়াদের সমর্থনে আগের মত হামলা চালিয়ে যেতে লাগল। ১৯২৫-এর গোড়ায় তিনি পার্লামেন্টে ঘোষণা করলেন, যে সমস্ত অপরাধমূলক ঘটনা ঘটছে, সবই তাঁর নির্দেশে হচ্ছে। এই সময় গ্রামশির মনে জুলিয়ার বড় বোন তাতিয়ানার আলাপ হয়। তাতিয়ানা পরবর্তী জীবনে আন্তোনিওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহায়ক হন। ১৯২৫-এর ২১শে মার্চ মস্কোতে অনুষ্ঠিত কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিকের অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য গ্রামশি সেখানে যান। জুলিয়ার সঙ্গে তাঁর আবার দেখা হয়। ইতিমধ্যে তাঁদের প্রথম সন্তানের জন্ম হয়েছে। ঐ বছরের ১৬ই মে পার্লামেন্টে আধা গুপ্ত সমিতির কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণের

জন্য যে বিল আসে গ্রামশি তার বিরোধিতা করেন। তবে পার্লামেন্টে গ্রামশির এই প্রথমবার ও শেষবার বক্তৃতা। পুলিশের কাছে মুসোলিনিকে হত্যার এক পরিকল্পনার খবর আসে। এর পর থেকেই ফ্যাসিস্ত তাণ্ডব বেড়ে যায়। জুলিয়া রোমে দূতাবাসে চাকরী নিয়ে আসে। ইতালীর কম্যুনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে গ্রামশির থীসিস আলোচিত হয়। কংগ্রেস ফ্রান্সের লিওঁতে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামশি গোপনে সীমান্ত পার হয়ে লিওঁতে যান। তাঁর থীসিস ৮০ শতাংশেরও বেশি ভোট পায়। বোর্দিগা-পরিচালিত 'বাম' মতবাদ চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। পার্টির মধ্যে গ্রামশি পরিচালিত রাজনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

জুলিয়া ১৯২৫-এর ৭ই আগস্ট মস্কো ফিরে যান। এর পরে জুলিয়া ও বড় ছেলের সঙ্গে গ্রামশির আর দেখা হয়নি। পরে মস্কোতে ছোট ছেলের জন্ম হয়। এই ছেলের সঙ্গে তাঁর কোনদিন দেখা হয়নি। ১৯২৬-এর ৮ই নভেম্বর গ্রামশি নিজের বাসস্থানে গ্রেপ্তার হন। এর পরে তাঁকে বিভিন্ন জেলে রাখা হয়। সব জায়গাতেই কড়া পাহারার ব্যবস্থা ছিল। জেলে তিনি বই-পত্র পেতেন না। চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ১৯২৮-এর ২৮শে মে তাঁর বিচার শুরু হল। বিচার চলে ৪ঠা জুন পর্যন্ত। সরকারী উকিল তাঁর অভিযোগে জানান, "বিশ বছরের জন্য ওই মস্তিষ্ককে অকেজো করে দিতে হবে।" গ্রামশির বিশ বছরের কারাবাস শাস্তি হয়। ১৯২৯-এর ফেব্রুয়ারীর গোড়ায় তিনি তাঁর 'সেলে' বসে লেখা পড়ার জন্য অনুমতি পেলেন। এই সময় তিনি তাতিয়ানাকে লিখলেন, এমন কিছু তিনি লিখবেন, যা "fur ewig" (চিরকালের জন্য) হবে। তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক স্তরেও দাবী উঠল। ১৯৩৪-এ তাঁকে সাময়িকভাবে মুক্তি দেওয়া হন। কিন্তু যা হল, ঘরের সামনে থেকে পাহারা তুলে ক্লিনিকের দোরগোড়ায় বসান হল। আর তিনি তাতিয়ানা বা অন্য কারও সঙ্গে কিছুটা ঘুরে আসতে পারতেন। সাময়িক মুক্তি পাবার মাস দশেক বাদে তাঁকে ১৯৩৫-এর ২রা আগস্ট রোমের এক বিখ্যাত ক্লিনিকে পাঠান হল। ১৯৩৭-এর ২১শে এপ্রিল তাঁর কারাবাসের মেয়াদ শেষ হল। তার ছয়দিন পরে ২৭শে এপ্রিল তিনি মারা যান। গ্রামশির শবানুগমনে মাত্র দুজন সহযাত্রী ছিল—একজন তাতিয়ানা, অন্যজন ছোট ভাই কার্লো। তাতিয়ানা গ্রামশির চিন্তাভাবনাকে, যা তিনি জেলে বসে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, সেই ২,৮৪৮ পৃষ্ঠা

সম্বলিত নোটবই পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে মস্কোতে সোভিয়েত দূতবাসে পাঠিয়ে দেন। মুসোলিনির পতনের পর ইতালির কম্যুনিষ্ট পার্টির হাতে লেখাটি আসে এবং ধীরে ধীরে সব রচনাবলী প্রকাশিত হতে থাকে।

২

গ্রামশির রাজনৈতিক তত্ত্বের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, ১৯২৪-২৬এ তিনি শ্রমিক ও কৃষকের একটি গণতান্ত্রিক ঐক্য চেয়েছিলেন। এই শ্রমিক-কৃষক ঐক্যই ইতালির দক্ষিণ অঞ্চলে যে কৃষকরা অত্যাচারিত হত, তাদের সংগ্রামকে জোরদার করবে এরকম বিশ্বাস তাঁর ছিল। তিনি চেয়েছিলেন, কম্যুনিস্ট পার্টিকে একটি বিরাট জনগোষ্ঠীর সমর্থন পেতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন শ্রমিক-কৃষকের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। ইতালিতে দক্ষিণ অঞ্চলে কৃষকদের অভ্যুথান ঘটাতে হবে। পার্টির মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষাকে সঙ্ঘবদ্ধ করে মতাদর্শের পার্থক্যকে দূর করতে হবে। এর সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাক্টরী কাউন্সিল গঠন করতে হবে এবং ফ্যাসিস্ত সরকারের পতন ও প্রোলেতারীয় বিপ্লবের মধ্যবর্তী স্তরগুলি সম্বন্ধে ভালোভাবে চিন্তা করতে হবে। তিনি মনে করতেন, সমাজ-গণতান্ত্রিক পর্ব স্বল্পকাল স্থায়ী হবে, যেমন সোভিয়েত রাশিয়ায় কেরেনেস্কিক সরকারের বেলায় ঘটেছিল। তারপরে যে গৃহযুদ্ধ হবে, তার জন্য প্রোলেতারিয়েতকে প্রস্তুত থাকতে হবে। তাঁর এরকম মনে হত, ফ্যাসীবাদের পতনের পর সমাজ-গণতন্ত্রের পক্ষে সমর্থন বেড়ে যাবে। তিনি তাঁর "দক্ষিণী সমস্যা" প্রবন্ধে লিখেছিলেন, ফ্যাসীবাদ ইতালির শাসকদের ঐক্যবদ্ধ করেছে, মধ্যবিত্তরা ফ্যাসিস্ত সমর্থন থেকে সরে আসবে। তিনি মনে করতেন, উত্তরের শ্রমিকরা ও দক্ষিণের কৃষকরা বিপ্লবের দুটি প্রধান স্তম্ভ। এই দুই স্তম্ভের ঐক্যই বিপ্লবকে সম্ভব করবে, এই ছিল তাঁর ধারণা।

তুরিন জেলে থাকার সময় গ্রামশি সহবন্দীদের সঙ্গে যে আলোচনা করেছিলেন, তা থেকে জানা যায়, তিনি মনে করতেন, পার্টি হচ্ছে প্রোলেতারিয়েত-দের জৈব বুদ্ধিজীবী। ক্ষমতা দখলের জন্য বুদ্ধিজীবীদের প্রয়োজন। একটি সামরিক সঙ্ঘের প্রয়োজন, যা বুর্জোয়া শাসন থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবে।

গ্রামশির জীবন ও তত্ত্বের এই পটভূমিকায় আমরা বর্তমান রচনা দুটি আলোচনা করতে পারি। আমাদের মনে রাখতে হবে, তাঁর চিন্তাধারা

তিন পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্বে আছে, ১৯১০ থেকে ১৯২০-র মধ্যে তিনি যা লিখেছিলেন। দ্বিতীয় পর্বে আছে ইতালিতে কম্যুনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার পর থেকে তাঁর গ্রেপ্তারের পূর্ব পর্যন্ত রচনাগুলি। তৃতীয় পর্বে আছে "জেলখানার নোটবই"। জেলখানায় তিনি কোন বইপত্র পেতেন না। পুলিশের চোখ এড়ানোর জন্য তাঁকে বহুকথা অস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হত। বহুসময়ই তিনি তাঁর বক্তব্যকে শেষ করতে পারতেন না। তবে তিনি যে সব বই পেতেন, সেসব গোগ্রাসে গিলতেন। মার্কসের রচনাবলী জেলকর্তৃপক্ষ তাঁর কাছে যেতে দিত না। "জেলখানার নোটবই"-তে তাঁর বিভিন্ন রচনায় যেখানে মার্কসের কথা উল্লেখ আছে, সেগুলি ক্রোচের বই থেকে নেওয়া মনে হয়। যখন তিনি বই পড়তে পেতেন না, তিনি সাময়িক পত্রিকা পড়তেন। এগুলি থেকে তিনি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংবাদ সংগ্রহ করতেন। এই সব উপাদানকে তিনি বুর্জোয়া ভাবধারার সমালোচনার কাজে লাগাতেন। ফ্যাসিস্ত আমলে বুদ্ধিজীবীরা ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে, সেদিকেই তিনি দৃষ্টি নির্দেশ করতে চাইতেন।

বর্তমান অনুবাদ দুটিতে গ্রামশির "বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষা" সম্বন্ধে মতামত উপস্থাপিত করা হয়েছে। অনুবাদকরা নিউইয়র্ক ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স-এর ইংরাজী অনুবাদ অনুসরণ করেছেন। তাঁরা ইতালীয় রচনার সঙ্গেও মিলিয়ে লিখেছেন বলে জানিয়েছেন। আমার কাছে ইতালীয় গ্রন্থ নেই, থাকলেও কিছু সুবিধা হত না, কারণ আমি ইতালীয় ভাষা জানি না। তাই ইংরাজী অনুবাদকে যথার্থ ধরে নিয়ে আলোচনা করব, যদিও তাতে প্রামাণ্য সম্বন্ধে সংশয় দেখা দিতে পারে।

অনুবাদকরা প্রত্যেক অনুবাদের পূর্বে একটি করে সম্পাদকীয় ভূমিকা দিয়েছেন। এতে গ্রামশির চিন্তাধারা ও ইতালির আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে বুদ্ধিজীবী কে বা কারা? সকলেই বুদ্ধিজীবী, না, কেউ কেউ বুদ্ধিজীবী? যাঁরা বিশেষ শ্রেণীবিকাশে উদ্ভূত হন, সেই শ্রেণীর সঙ্গে অভিন্নতা অনুভব করেন, তার গতিপ্রকৃতিকে লক্ষ করতে পারেন, এবং তার লক্ষ্যকেই নিজের লক্ষ্য মনে করেন, তাঁরাই বুদ্ধিজীবী। কেউ কেউ বলেছেন, বুদ্ধিজীবীরা সমাজের শ্রেণী বা গোষ্ঠী থেকে নিজেদের আলাদা রেখে অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে পারেন। এরকম স্বতন্ত্র বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নাম

করা হয়েছে জোলিও কুরি, বারট্রাণ্ড রাসেল, জঁা-পল সার্ত্র, নোয়াম চমস্কি ইত্যাদির। এঁদের বিভিন্ন আচরণে ও প্রতিবাদে জনসাধারণের বিবেক আন্দোলিত হয়েছে। কিন্তু সম্পাদকীয় মতে, সত্তর থেকে নব্বই-এর দশকে এই স্বতন্ত্র বুদ্ধিজীবীদের ধারণা অর্থহীন প্রতিপন্ন হয়েছে। আজকের বুদ্ধিজীবীরা কোন না কোন শ্রেণীস্বার্থকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেন। একথা ঠিক যে, বুদ্ধিজীবী একা কোন আন্দোলনকে সফল করতে পারেন না। তাঁর পেছনে থাকা চাই, জনগোষ্ঠীর সমর্থন। আমরা তাই দেখি, জঁা-পল সার্ত্র তাঁর "দ্বান্দ্বিক যুক্তির বিচারে"-র তত্ত্বকে প্রয়োগের পরিস্থিতি খুঁজেছিলেন। ১৯৬৮-র মে মাসে ফ্রান্সে যে যুববিদ্রোহ হয়, তিনি তার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করলেন। সে বিদ্রোহ ফ্রান্সের বহু শিল্প-নগরীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থ হয়। এরই মধ্য দিয়ে সার্ত্র উপলব্ধি করলেন, এতদিন তিনি ছিলেন বামপন্থী বুদ্ধিজীবী এখন থেকে তিনি হবেন বুদ্ধিজীবী বামপন্থী।

গ্রামশি তাঁর "জেলখানার নোটবই"-তে সোভিয়েত রাশিয়ার বিবর্তন, ফ্যাসীবাদের উদ্ভব, তার অন্তর্নিহিত স্ববিরোধ উল্লেখ করেছেন এবং তার সঙ্গে বিবৃত করেছেন মার্কসবাদের কিছু মৌলিক প্রশ্ন ও সমস্যা। তিনি সেগুলিকে পুনর্বিবেচনা করেছেন। এর মধ্যে আছে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা ও শিক্ষার লক্ষ্য। তিনি মনে করতেন, রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রশক্তির একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ। শ্রেণী থেকে উদ্ভূত যে-সব বুদ্ধিজীবীকে তিনি জৈব বুদ্ধিজীবী মনে করতেন, সেই বুদ্ধিজীবীরাই রাজনৈতিক দলের সরকার। চেতনা ও কর্মক্ষমতার বিকাশ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে এঁরা শ্রেণীর স্বার্থ, ভূমিকা ও লক্ষ্যের সঙ্গে নিজেদের অঙ্গীভূত করবেন এবং শ্রেণীর জনগোষ্ঠির সামগ্রিক অস্তিত্ব ও লক্ষ্য রূপায়নে এগিয়ে যাবেন। এই বুদ্ধিজীবীরা "কৃষাণের জীবনের শরিক যে-জন (কিংবা কৃষকের শ্রমিকের শরিক যে জন) কর্ম ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন।" দুভাবে এঁরা কাজ করতে পারেন। এক ক্ষমতা দখল করে, যার ফলে সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে তাঁদের ভাবাদর্শ প্রোথিত করা যায়। এই কাজকে গ্রামশি বলেছেন "ডোমিনেশন"—বাংলায় এর প্রতিশব্দ করা হয়েছে "প্রাধান্য"। আর একটি হল "হেগিমনি", যার লক্ষ্য হল জনসমাজের ওপর নতুন শ্রেণীর শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দেওয়া। এর ফলে বৃহৎ জনগোষ্ঠিই যে নতুন শ্রেণী-সংস্কৃতিতে উজ্জীবিত হবে তা নয়। যাঁরা প্রথাগত বুদ্ধিজীবী এবং যাঁরা এতকাল শাসক সংস্কৃতিতে নিমজ্জিত ছিলেন, তাঁদের সম্মতি আদায় করে

তাঁদেরও নতুন শ্রেণীর স্বপক্ষে আনা সম্ভব হবে। এই "হেগিমনি"-র বাংলা করা হয়েছে "আধিপত্য"। কিন্তু কেউ কেউ "আধিপত্য" কথাটি রাখলেও "ডোমিনেশন"-কে "প্রভুত্ব" বলেছেন। সম্পাদকীয় ভূমিকায় দেখান হয়েছে, যাঁরা প্রথাগত বুদ্ধিজীবী তাঁরাও স্পষ্ট না হলেও, প্রচ্ছন্নভাবে কোন না কোন শ্রেণীর সমর্থক। বুর্জোয়া আন্দোলনের গোড়ায় ফরাসী বিপ্লবে, ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লবে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা গ্রামশি উল্লেখ করেছেন। জার্মানীতে ইয়ুংকাররা কিভাবে শিল্প-আন্দোলন প্রতিহত করেছে, তাও তিনি দেখিয়েছেন। সম্পাদকীয় ভূমিকায় এ সবেরই প্রতিধ্বনি করে আমেরিকায় যে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রলোভন দেখিয়ে তাদের কিনে নেবার চেষ্টা করা হয়েছে, তার কথা বলা হয়েছে। ইতালীয় ইতিহাসে পীদমন্ত যে নেতৃত্বের পুরোভাগে উঠেছিল আফ্রিকার রাষ্ট্রে সেরকম নেতৃত্ব স্থাপিত হয়নি। বিভিন্ন দেশের বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সুস্পষ্ট রূপরেখাও পাওয়া যায়। কিন্তু সম্পাদকীয় ভূমিকায় যা নেই, তা হল ভারতবর্ষীয় বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে একটি তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা। এর ফলে আমাদের মনে বিভিন্ন প্রশ্ন থেকে যায়।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাতে পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে যে রেনেসাঁস আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, তার গতি কোন দিকে ছিল? শোনা যায়, রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখ যে সমস্ত সংস্কার আন্দোলন করেছেন ও তার স্বপক্ষে ছিলেন, তা বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে নতুন পৃথিবীর আলো দেখিয়েছিল। কিন্তু যাকে বলে বুর্জোয়া শিল্প আন্দোলন, তার আবির্ভাব ছিল খুবই সীমিত। তবু এঁরা সাম্য ও স্বাধীনতার কথা বলেছেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর স্বাধীনতার যে আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করল, তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্রিটিশের শাসন-পাশ থেকে ভারতকে মুক্ত করা। কিন্তু দেশের যে বিরাট জনসাধারণ অন্যায় ও অত্যাচারে লাঞ্ছিত ছিল, তাদের কথা তাঁরা ভোলেন নি। তবু আজও যখন আমরা তাঁদের বিচার করতে বসি, বারে বারে এ প্রশ্নের কাছে আমাদের হোঁচট খেতে হয়, এঁরা কি "জৈব" বুদ্ধিজীবী ছিলেন না কি এঁরা ছিলেন "প্রথাগত" বুদ্ধিজীবী? এঁরা ব্রিটিশ স্নেহধন্যে পুষ্ট ছিলেন নিঃসন্দেহে, কিন্তু এঁরা কি স্বীয় শ্রেণীর স্বার্থ ও ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন? এই সব প্রশ্নের উত্তর ১৯৪৭ থেকে দেওয়ার চেষ্টা চলেছে কিন্তু

এখনও তার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়নি। ফলে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখগণ কখনও হয়েছেন প্রগতিশীল, কখনও আধা বুর্জোয়া, আধা সামন্ততান্ত্রিক, কখনও বা অন্তরে প্রতিক্রিয়াশীল, যদিও মুখে তাঁদের প্রগতির বুলি ছিল। গ্রামশির তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলি ভাল করে আলোচনা হওয়া দরকার। কিন্তু সম্পাদকীয়তে এগুলি অনুপস্থিত। তাই জিজ্ঞাসা থেকে যায়। হয়ত কোন যোগ্য ব্যক্তি এগুলি নিয়ে পরে চর্চা করবেন।

আর একটা কথা যা গ্রামশির তত্ত্বের আলোকেই মনে হয়। গ্রামশি যে "জৈব" বুদ্ধিজীবীর কথা বলেছেন, যাঁরা রাজনৈতিক দলের অগ্রগণ্য অংশ, আবার যে রাজনৈতিক দল শ্রমিক-কৃষকের প্রতিভূ, তাকেও নিশ্চয়ই যথার্থ রূপে "জৈব" হতে হবে। কিন্তু আজ পৃথিবীর দেশে দেশে যেখানেই শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন সংঘটিত হচ্ছে, সেখানে পার্টির ক্ষমতায় যাঁরা আছেন, তাঁরা যান্ত্রিক ভাবে পার্টির পরিচালনা করেন। দলের ও শ্রেণী স্বার্থের যে দ্বান্দ্বিকতা উপলব্ধি করে শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, সে ক্ষমতা তাঁদের নেই। তাঁরা দলে উচ্চক্ষমতাবিশিষ্ট পরিচালনা-গোষ্ঠী এবং তাঁরা ফতোয়া দেন, দলকে আগামী নির্বাচনে জেতাতে দলের কার্যসূচী জনসাধারণের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে। ফলে, যাঁরা "যথার্থ অর্থে জৈব" বুদ্ধিজীবী হতে পারেন, তাঁরা বেতনভোগী কর্মচারীতে পরিণত হন। তাঁরা পার্টির থীসিসকে মুখস্থ করে যেরকম ভাবে মহড়া দেওয়া হয়েছে, সেইভাবেই বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। সেখানে বুদ্ধিজীবীর কোন সক্রিয় ভূমিকা নেই। অথচ গ্রামশি এরকম কথা বলেন নি। আর যাঁরা রাজনৈতিক দল পরিচালনা করেন, তাঁরা বুদ্ধিজীবী হবার ভান করেন, তাঁরা মেকী বুদ্ধিজীবী। কিন্তু যাঁদের দিয়ে পার্টির যথার্থ পরিচালনা সম্ভব, তাঁদের অকেজো করে রেখে গ্রামশি ও মার্ক্স বিবৃত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে দূরে সরিয়ে রাখা হচ্ছে। সম্প্রতি একটি রচনায় ই, এম্, এস্ নাম্বুদ্রীপাদ যা বলেছেন, তার বাংলা করলে দাঁড়ায়, "প্রোলেতারীয় একনায়কত্ব বা জনগণতন্ত্রের একনায়কত্বের কোন প্রয়োজন নেই, অন্য দেশে কিংবা আমাদের ভারতবর্ষে। বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারীর গণতন্ত্রকে কার্যকরী করার অনুকূল পরিস্থিতি এখানে আছে, এবং প্রোলেতারীয় রাষ্ট্রের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠায় তা অগ্রগতি লাভ করবে। আমাদের সাধারণ লোকের স্বার্থকে জোরালো করার কাজে এবং বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধিতে কাজ করতে হবে।" আমার মনে হয়,

শ্রমিক-কৃষকদের দলকে যাঁরাই পরিচালনা করেন, তাঁদের সকলেরই অভিমত এই ধরণের। কিন্তু আমরা ত জানি, আমাদের দেশে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নির্বাচন কি প্রহসনে পরিণত হয়েছে। সার্ত্র একবার কোথায় যেন বলেছিলেন, "নির্বাচন বুর্জোয়াদের খেলা, শ্রমিকরা এই খেলায় বুর্জোয়া ব্যবস্থাকেই মেনে নেয়।"

আর একটা কথা মনে হয়েছে। আজকের ভারতবর্ষে কেন্দ্রের শাসক দল ও রাজ্যের শাসক দল অনেক সময়ই এক নয়। কেন্দ্রের সরকার কোন অন্যায় নীতি ঘোষণা করলে তার বিরুদ্ধে রাজ্যের শাসকদলের বুদ্ধিজীবীরা স্বাভাবিক ভাবেই প্রতিবাদ করেন। কিন্তু রাজ্যে যখন ঐ ধরণের কোন অন্যায় নীতি চালু করা হয় এবং বলা হয়, জনগণের স্বার্থেই তা করা হচ্ছে, যদিও সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ থাকে, তখন এই বুদ্ধিজীবীরা বিভ্রান্ত হন। এবং তখন তাঁদের সেই নীতির সমর্থনে কূট দ্বান্দ্বিকনীতির ছায়ায় যুক্তি খুঁজে বেড়াতে হয় অনেকটা সৌখীন বিতর্কসভার তার্কিকদের মত। এই প্রশ্নগুলি আমার মনে উঠেছে। হয়ত অনেকে আমার সঙ্গে একমত হবেন না। সম্পাদকরাও হয়ত শুধু গ্রামশির তত্ত্বে আবদ্ধ থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে কিছুই ত বিচ্ছিন্ন নয়।

বুদ্ধিজীবীদের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে গ্রামশি পুরোহিত শ্রেণীর কথা বলেছেন। এঁরা অভূতপূর্ব ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এঁরা নিজেদের স্বতন্ত্র মনে করতেন। এঁরা যে অবস্থানে নিজেদের উপস্থাপিত করেছিলেন, তা থেকে ভাববাদী দর্শন জন্ম নেয়। তবে সঙ্গে সঙ্গে এঁরা শাসকশ্রেণীর সঙ্গে আঁতাত রক্ষা করেছেন—ক্রোচে ও জেনতিলের ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়। আসলে বুদ্ধিজীবীর স্বরূপ অনুসন্ধান করতে আমাদের সামাজিক সম্পর্কের জটিলতার মধ্যে যেতে হবে। বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা নির্দেশ করতে গিয়ে গ্রামশি বলেছেন, তাকে হতে হবে নির্মাতা ও সংগঠক, তাঁর কাজকে বিজ্ঞানে পরিণত হতে হবে। এবং পৌঁছে যেতে হবে ইতিহাসের মানবিকবাদী ধারণায়। কারণ এই ধারণা ছাড়া বুদ্ধিজীবী বিশেষজ্ঞ থেকে যাবেন, "অগ্রগণ্য" ভূমিকায় পৌঁছাতে পারবেন না, অর্থাৎ মানবিক-গুণ সম্পন্ন হবেন না, রোবোটে পরিণত হবেন। বুদ্ধিজীবীরা যে দায়িত্ব পালন করেন, তার মধ্যে আছে, যাঁরা সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয়ভাবে সম্মতি দেয় না, তাদের ওপর বলপ্রয়োগ। তবে অনেক ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক কারণে

"সম্মতি আদায়" সম্ভব হয়। এরকম লক্ষ করা যায় যে, উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্ক ততটা প্রত্যক্ষ নয়। কিন্তু সমাজের সমগ্র বিন্যাস দ্বারা এই সম্পর্ক নানা মাত্রায় প্রকাশিত হয় এবং বিভিন্ন পরিকাঠামোর জটাজাল দ্বারাও তা প্রভাবিত হয়। বুদ্ধিজীবীরা আসলে ঐ উপরিকাঠামো-গুলিরই প্রয়োগকর্তা।

গ্রামশি নাগরিক ও গ্রামীণ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। নাগরিক বুদ্ধিজীবীরা শিল্প ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছেন। সাধারণ স্তরের নাগরিক বুদ্ধিজীবীরা, যাঁরা শিল্পোদ্যোগের জেনারেল ষ্টাফ, তাঁরা একেবারে গড়পড়তা। গ্রামীণ বুদ্ধিজীবীরা যেমন পুরোহিত, আইনজীবী, শিক্ষক জনসাধারণের সঙ্গে স্থানীয় ও রাষ্ট্রীয় শাসনের সম্পর্ক স্থাপন করেন। কোন গোষ্ঠীবিশেষের জৈব বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে প্রথাগত বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে প্রথাগত বুদ্ধিজীবীদের সুদৃঢ় বন্ধন স্থাপন করা রাজনৈতিক দলেরই দায়িত্ব। একজন বুদ্ধিজীবী যখন বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দেন, তখন তিনি ঐ গোষ্ঠীর জৈব বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে আরও সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। কোন রাজনৈতিক দলের সব সদস্যই বুদ্ধিজীবী হতে পারেন না। কিন্তু বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা হতে হবে নিয়ামক ও সাংগঠনিক, শিক্ষকোচিত তথা মননধর্মী।

এরপরে গ্রামশি বিভিন্ন দেশে বুদ্ধিজীবীদের ইতিহাস ও ভূমিকা আলোচনা করেছেন। মার্কিন দেশে ইউরোপ থেকে আসা নতুন অভিবাসীজন যে সংস্কৃতি বয়ে এনেছিল, তারই মাধ্যমে তাঁরা নতুন "জৈব" বুদ্ধিজীবী গড়ে তোলেন। কিন্তু এই বুদ্ধিজীবীরাও যে ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ বহন করে এনে একটা পুরানো সংস্কৃতির ধ্বংস করেছেন, একথা হয়ত গ্রামশির মনে হয়নি। আর আজ তাঁরাই সমস্ত জগতকে অর্থনৈতিক তথা উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী নিগড়ে বাঁধতে বদ্ধপরিকর। তবে মার্কিন সংস্কৃতি যে কৃষ্ণাঙ্গদের অবদমিত করে রেখেছে, তা খুবই হতাশাব্যঞ্জক। অথচ লাইবেরিয়াই হয়ে উঠতে পারত কৃষ্ণাঙ্গদের জাইঅন বা তাদের শীদ্‌মন্ত। এ থেকেই গ্রামশি ইতালিয়ান "Resorgimento" বা পুনরুজ্জীবনের কথা বলেছেন, যাতে শীদ্‌মন্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। কিন্তু আমেরিকার বা লাতিন আমেরিকার দেশে সেই নেতৃত্ব গড়ে ওঠেনি। ভারতের কথা বলতে গিয়ে গ্রামশি বলেছেন, এখানে বুদ্ধিজীবী ও জনগণের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান, এমনকি

ধর্মের ক্ষেত্রেও। বিভিন্ন বিশ্বাস ও একই ধর্ম ঘিরে বুদ্ধিজীবী সমাজ ও জনগণের মধ্যে বিভাজন গড়ে ওঠে। পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ক্যাথলিক ধর্ম সংস্কার নানা বিভাজন সৃষ্টি করেছে। পূর্ব এশিয়ায় এই প্রবণতা এক অসারতায় পর্যবসিত। জনসাধারণের আচরিত ধর্মের সঙ্গে বইতে লিপিবদ্ধ ধর্মের কোন মিল নেই।

আমাদের দেশে যাঁরা বুদ্ধিজীবী, তাঁরা ধর্মকে একটা পবিত্রক্ষেত্র বলে মনে করায় সেখানে যতরকমের কুসংস্কার, ভ্রান্ত বিশ্বাস বেড়ে ওঠার সুযোগ দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু শ্রমিক-কৃষককে অগ্রণী শ্রেণী হিসাবে নেতৃত্ব দিতে গেলে বুদ্ধিজীবী পরিচালিত রাজনৈতিক দলকে বিজ্ঞানমনস্কতা বৃদ্ধি করতে হবে। মানবতাবাদের মাপকাঠিতেই অবৈজ্ঞানিক চিন্তা দূর করতে হবে। এ দায়িত্ব "জৈব" বুদ্ধিজীবীদের যাতে তাঁরা শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীকে প্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু সে দায়িত্ব পালন করা হয়না। সম্পাদকীয় মন্তব্যে এ প্রসঙ্গে কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু এটি একটি মৌলিক বিষয়, যাকে কোন বুদ্ধিজীবীই অবহেলা করতে পারেন না।

অনুবাদের ভাষা ইংরাজী অনুবাদের অনুসারী। আমি আশা করি ইতালীয় ভাষার সঙ্গেও কোন দূরত্ব নেই। তবু মনে হয়েছে, ইংরাজী ভাষার স্বচ্ছ বহতা বাংলায় সব জায়গায় নেই। হয়ত আক্ষরিক অনুবাদের জন্য তা হয়েছে। তবে অনুবাদে সব ক্ষেত্রেই কিছু কিছু শব্দ আমদানী করতে হয়, যা আমাদের কাছে কিছুটা অপরিচিত। ঠিক ঠিক প্রতিশব্দ পেতে এটা করতেই হয়। এ থেকে মুক্তি পেতে হলে অনুবাদকে হতে হবে "অনুসৃষ্টি"। তাতে আবার মূলের অর্থান্তর ঘটার সম্ভাবনা। তবে এই অংশের অনুবাদক যথাসাধ্য চেষ্টায় গ্রামশির বক্তব্যকে আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়েছেন।

৩

শিক্ষা প্রসঙ্গের ভূমিকায় লেখা হয়েছে, মুসোলিনি ক্ষমতা দখল করে ইতালির শিক্ষা ব্যবস্থার এক আমূল পরিবর্তন সূচনা করেন। গ্রামশির শিক্ষা সম্বন্ধে প্রবন্ধ এই প্রেক্ষাপটে বিবেচিত হওয়া দরকার। মুসোলিনি তাঁর ফ্যাসিস্ত কাঠামো কায়েম রাখতে এক শিক্ষককুল চেয়েছিলেন। ১৯২৯-এ ক্রোচে যে শিক্ষণনীতি প্রবর্তন করেছিলেন, জেনতিল তাকেই পূর্ণরূপ দেওয়ার

চেষ্টা করেন। তিনি পুরানো শিক্ষাব্যবস্থা পাল্টে একটা গণতন্ত্রীকরণের চেষ্টা করেছিলেন। তার মধ্যে ১৮৫৯-এ প্রবর্তিত কাসাতি কানুনের পরিবর্তনের চেষ্টা ছিল। এই ব্যবস্থায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে যে ভাগ ছিল, তাতে মাধ্যমিক স্তরে নতুন কিছু শেখান হত না। ধরে নেওয়া হত। ছাত্রছাত্রী বয়স অনুযায়ী পরিণত হয়েছে। সেইভাবে শিক্ষা দিয়ে তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্বের জন্য প্রস্তুত করা হত। তবে এই ব্যবস্থায় দুটি পর্বেই লাতিন ভাষা শেখানর ওপর জোর দেওয়া হত। জেনতিল এই শিক্ষাধারা পাল্টে ক্ল্যাসিকাল ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর জোর দেন। সমস্ত স্কুলে ধর্মশিক্ষা আবশ্যিক করা হয়। এটা ঠিক হল যে, বুদ্ধিজীবী ও প্রধান শ্রেণীর জন্য হবে ক্ল্যাসিকাল স্কুল, নিম্নশ্রেণীর জন্য থাকবে বৃত্তিমূলক শিক্ষা আর মাঝামাঝি থাকবে কারিগরী শিক্ষার স্কুল। এটা বৃত্তিমূলক হলেও কায়িক শ্রমভিত্তিক নয়। এই রকমভাগ থাকার ফলে অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রীরা কোন দিনই রাষ্ট্র-পরিচালনা বা গণতান্ত্রিক ক্রিয়াপ্রক্রিয়ায় অংশ নেবার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে না। শাসক শ্রেণীর জৈব বুদ্ধিজীবীদের হাতেই ক্ষমতা থাকবে কিন্তু গ্রামশি মনে করেন, শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হওয়া দরকার, যাতে "ব্যবহারিক কার্যকারিতার পাশাপাশি" "কর্তব্য ও অধিকারের শিক্ষারও সুযোগ থাকবে। শিক্ষার শেষ পর্বে "মানবিকতার মূল্য বোধ" সৃষ্টি করা দরকার। তার সঙ্গে যুক্ত হতে হবে "বৌদ্ধিক শৃঙ্খলাবোধ ও "নৈতিক স্বাধীনতা বোধ।"

গ্রামশি জেনতিল লাতিন ভাষার যে ব্যাকরণ-নির্ভর যান্ত্রিক মুখস্থ বিদ্যার কথা বলেছিলেন তার পরিবর্তে জীবনের সঙ্গে সংস্কৃতিকে যুক্ত করার জন্য আকর্ষণীয়ভাবে লাতিন শেখাবার ওপর জোর দেন। লাতিন, তাঁর মনে হয়েছে, ইতালীয় জাতির সমগ্র সংস্কৃতি-জীবনের ধারক ও বাহক। সম্পাদকীয় ভূমিকায় এখানে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। তাহল আমাদের বৃত্তিমুখী বিদ্যার ওপর বেশি জোর দেওয়া ও সংস্কৃতকে মাধ্যমিক স্তর থেকে বিলোপ করা। হয়ত ইংরাজীতে নব্য শিক্ষিতেরা সংস্কৃতকে পশ্চাতমুখী অতীতবিলাসী মনে করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর সংস্কৃতের মাধ্যমেই "পরাশর সংহিতা"-র সাহায্যেই প্রাচীন পণ্ডিতদের যুক্তিকে খণ্ডন করে বিধবা-বিবাহকে শাস্ত্রবিরোধী নয় বলে প্রতিপন্ন করেছিলেন। আজকের দিনে মৌলবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য সংস্কৃত শিক্ষার অপরিহার্যতা অস্বীকার করা যায় না। ভূমিকায় বোধ হয় আরও

একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল। ইংরাজী ভাষাও আমাদের দুশো বছরের সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তি রচনা করেছে। অথচ আজকের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরাজীকে অপাঙ্‌তেয় করে রাখার,ফলে শিক্ষা জগতে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। শিক্ষায় যে স্বাধীনতার কথা বলা হয়, ইংরাজীকে প্রাথমিক স্তরে নিষিদ্ধ করায় ও পরবর্তী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক যথোপযুক্ত মর্যাদা না দেওয়ায় বা যতটা যত্নসহকারে শেখানর দরকার, ততটা যত্ন না দেওয়ায়, বহু ছাত্রছাত্রীর মৌলিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। অথচ, বিত্তবানদের সন্তান সন্ততিকে ইংরাজী স্কুলে শিক্ষিত করার সুযোগ দেওয়ায় দুটি শ্রেণীর উদ্ভব হচ্ছে। এই শ্রেণী-সংঘর্ষ সমাজের অগ্রগতির বিরুদ্ধে ও অধিকাংশ জন-গোষ্ঠীর স্বার্থের পরিপন্থী।

শিক্ষার একটি লক্ষ্য শৃঙ্খলা গড়ে তোলা। শ্রম ও শৃঙ্খলা শিক্ষার আবশ্যিক শর্ত হওয়া উচিত। তা না হলে, শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবীর মধ্যে দুস্তর পার্থক্য দেখা দেবে। ক্ল্যাসিক্যাল স্কুলের যে আদর্শ ছিল, ব্যক্তিত্বের আন্তর বিকাশ ও ইয়োরোপীয় সভ্যতার সমগ্র সাংস্কৃতিক অতীতকে আয়ত্ত করে চরিত্র গঠন করা, শিক্ষা ব্যবস্থায় তা অন্তর্ভুক্ত করে গ্রামশি তাকে মানবিক মাত্রা থেকে সমাজ রূপান্তরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। তিনি বিরোধের দার্শনিক তত্ত্বে আগ্রহী। তবে ক্রোচের মত-এই বিরোধকে ধারণার দ্বন্দ্বে আবদ্ধ না রেখে সমাজের বাস্তব অবস্থায় দেখতে যান। ক্রোচে সামাজিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করেছেন।

ফ্যাসিস্ত আমলে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরী করবার একটা ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। এই শিক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গ্রামশি একটি মানবিক ভাষায় শিক্ষাকে যুগোপযোগী করতে চান। এই শিক্ষা শুধু বিদ্যালয় চত্বরে সীমাবদ্ধ থাকবে না। সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে এই শিক্ষাকে তিনি ব্যাপ্ত করতে চান। তিনি শিক্ষার মধ্যে দিয়ে পূর্ণ মানব গড়ে তোলার কথা বলেন। শিক্ষার মানবিক লক্ষ্য, পর্ব নির্ভর উত্তরণ, গণতান্ত্রিক চেতনা, শ্রম ও শৃঙ্খলা সবই গ্রামশি বিপ্লবী শ্রেণীর স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত করতে চান।

সম্পাদকীয় ভূমিকায় গ্রামশির শিক্ষাতত্ত্বের পূর্বাভাস পাওয়ায় তাঁর শিক্ষাতত্ত্ব আমাদের বুঝতে সুবিধা হয়।

গ্রামশি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যে পুনর্বিন্যাস করতে চেয়েছেন,

তার প্রতি আমরা দৃষ্টি দিতে চাই। প্রাথমিক স্তরের মেয়াদ তিন-চার বছরের বেশি হওয়া উচিত নয়। এই স্তরে যে সব বিষয় কার্যকারিতার দিক থেকে প্রয়োজনীয়—যেমন পড়া, লেখা, অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস—এ ছাড়া কর্তব্য ও অধিকার, রাষ্ট্র ও সমাজ সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা দিতে হবে। এগুলি থেকেই পৃথিবী বিষয়ে নতুন চেতনা গড়ে উঠবে। পরের স্তর ছ'বছরের বেশি দরকার নেই। মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যাচর্চায় স্বাধীনতা থাকবে। বৌদ্ধিক আত্মনিয়ন্ত্রণ ও নৈতিক স্বাধীনতা এই স্তরে প্রয়োজন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শেষ পর্বে মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করার দরকার। এর সঙ্গে বৌদ্ধিক শৃংখলা-বোধ ও নৈতিক স্বাধীনতাবোধ যুক্ত হলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানার্জনের পক্ষে অনেক সহজ হবে। কর্মমুখী বিদ্যালয়ের শেষ পর্বে আসে সৃজনশীল পর্ব। কর্মমুখী পর্বে যে সামাজিক চরিত্র গঠিত হয়েছে, তার ভিত্তিতে এই শেষ পর্বে ব্যক্তিত্বের বিস্তার ঘটাতে হবে। ছাত্ররা এখানে স্বতস্ফূর্ততায় স্বনির্ভর প্রচেষ্টায় গবেষণা ও জ্ঞানের চর্চা করবে। শিক্ষকের দায়িত্ব হবে সহৃদয় নির্দেশকের। এই পর্বে গ্রামশি মনে করেন, বিদ্যাচর্চার প্রধান কাজকর্ম হবে সেমিনারে গ্রন্থালয়ে ও পরীক্ষার গবেষণাগারে। জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যও শিক্ষার্থী সংগ্রহ করতে পারবে। এর ফলে সমাজজীবনের সর্বত্র সংস্কৃতির সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এক বিরাট রূপান্তর সাধিত হবে।

গ্রামশি স্বতস্ফূর্ত সম্মতির মধ্য দিয়েই জৈব ক্রিয়ায় আইনগত বিন্যাসের কথা বলেন। এই বিন্যাস বাইরে থেকে চাপান চলবে না। তবে মানুষের জীবনে এই আইনগত-নিয়ন্ত্রণ নিজেদের স্বাধীনতার জন্যই প্রয়োজন। তা যেন সেইভাবে স্বীকৃতি পায়। শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে দুটো ভাগ করা হয়, "নির্দেশন" ও "শিক্ষাদান'। দুটো একেবারে আলাদা করা যায় না। নির্দেশন শিক্ষা থেকে আলাদা হলে ছাত্র সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে ও শিক্ষা হবে যান্ত্রিক। শিক্ষকই তার সজীব কাজকর্মের মধ্য দিয়ে দুটোকে অখণ্ড প্রক্রিয়া করে তুলতে পারেন। শিক্ষককে তার নিজের সমাজ সংস্কৃতি ও স্থানের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে খেয়াল করতে হবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়েসাহিত্য ও দর্শনের পাঠ্যক্রম থাকায় ছাত্র তথ্য নিয়ে মাথা ঘামায় না। সেদিকে শিক্ষককে নজর রাখতে হবে। ইতালির পুরাতন শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যালয়গুলি জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তাই বিদ্যালয়কে জীবনের সঙ্গে অন্বিত করতে হবে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে,

পুরানো শিক্ষাব্যবস্থায় লাতিন শেখান হত ব্যাকরণের মাধ্যমে যান্ত্রিকভাবে। এই যান্ত্রিকভাব নিশ্চয়ই পরিহার করতে হবে, তবে লাতিন যে সমগ্র রোমক সভ্যতা ও সংস্কৃতিক বাহক, তা অস্বীকার করা যায় না। ভাষাটা হয়ত মৃত, তাকে কাটা ছেঁড়া করে বিশ্লেষণ করা দরকার। কিন্তু ভাষাটা গল্প ও উদাহরণের মধ্য দিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে। এই ভাষা চর্চার মধ্য দিয়েই শিশু বুঝতে পারে সে ইতিহাসে নিমজ্জিত এবং তার মধ্যে যে ইতিহাস-আশ্রিত বোধ জেগে ওঠে সেইটাই তার দ্বিতীয় স্বভাব হয়ে দাঁড়ায়। এই ভাষাশিক্ষার মধ্য দিয়েই শিশু বাস্তব ও ঐতিহাসিক বিকাশের সুগভীর সংশ্লিষ্ট ও দার্শনিক এক প্রেক্ষাপট অর্জন করে।

গ্রামশি এক গঠনমূলক বিদ্যালয়ের কথা বলেছেন, যা শিশুকে একেবারে তার বৃত্তিনির্বাচনের মুখোমুখি পৌঁছে দেয়। তাকে এমনভাবে তৈরী করতে হবে, যাতে সে পরিপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে ওঠে। শুধু কুশলী শ্রমিক ও সুদক্ষ চাষী তৈরী করা শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু শিক্ষার গণতন্ত্র বলতে গ্রামশি যা বুঝেছেন, তা হল প্রত্যেক নাগরিক যেন শাসন করতে পারে এবং সমাজ যেন এই অবস্থাটা সৃষ্টি করতে পারে যাতে প্রত্যেকের পক্ষে তা সম্ভব হয়। কিন্তু ফাসিস্ত ব্যবস্থায় বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ছে এবং শিক্ষাপদ্ধতির ছাপটা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। দর্শনের পাঠক্রমে এই নতুন ব্যবস্থা শিক্ষাকে আরও ম্লান করে তুলেছে। গ্রামশি এক বর্ণনাত্মক দর্শনের সঙ্গে দর্শনের ইতিহাস যুক্ত করে কয়েকজন দার্শনিকের মূল রচনা পড়ার কথা বলেছেন। বর্ণনাত্মক ও সংজ্ঞামূলক দর্শন হয়ত একটু বেশি রকম বিমূর্ত, তবে তা শিক্ষাগত দিক দিয়ে অতীব প্রয়োজনীয়। যুক্তিবিজ্ঞানের সূত্রগুলিও লেখা দরকার এবং শিক্ষার এইসব আঙ্গিকের সঙ্গে শিশুর মনের সৃজনমূলক সম্বন্ধ ঘটাতে হবে। তা যেন শ্রমিকের সঙ্গে তার যন্ত্রপাতির সক্রিয় ও সৃজনমূলক সম্বন্ধের মত হয়।

লেখাপড়ার মধ্যে যে শ্রম রয়েছে, তার মধ্যে পেশীশক্তি, স্নায়ুশক্তি ও ধীশক্তির সম্মিলন প্রয়োজন। দেখা যায়, মননমুখী পরিবারের শিশুরা যত সহজে শিক্ষাকে আয়ত্ত করতে পারে, কৃষক বা শ্রমিকের পরিবারের সন্তানরা তা পারেনা। তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক, শিক্ষার শ্রমের মধ্যে একটা "চালাকি" লুকানো আছে, যার জন্য তারা পারছে না। গ্রামশি শিক্ষার যে উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন, তা হল কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী থেকে বুদ্ধিজীবী ও

বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করা। এবং তা করতে গেলে অভূতপূর্ব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে ঠিক। তবে সেই অসুবিধার মোকাবিলা করাই শিক্ষার সংগ্রামের দিক।

৪

আগেই বলেছি, "বুদ্ধিজীবী" অনুবাদ অংশে হয়ত স্বচ্ছ বহতা কিছুটা কম হয়েছে কিন্তু তা অনুবাদের দোষে হয়েছে, একথা বলা ঠিক হবে না। আসলে এই অংশে ভাবের বিমূর্ততা অনেকাংশে দায়ী। বাংলা ভাষায় উপযোগী শব্দ অনেক সময়ই অলভ্য এবং অনুবাদের জন্য কিছু নতুন শব্দ সৃষ্টি করতে হয়। শব্দগুলি অচেনা বলে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। "শিক্ষা" অংশের অনুবাদ অনেক বেশি সাবলীল। দুটি মিলিয়ে গ্রামশির তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের একটি স্পষ্ট ধারণা হয়। যার জন্য অনুবাদকরা আমাদের ধন্যবাদার্হ। অনুবাদের শেষে যে সমস্ত টীকা দেওয়া হয়েছে, সেগুলি মূল বিষয়কে বুঝতে সাহায্য করে। শুধু ইতালীয় ভাষায় যে "Resorgimento" শব্দটি আছে, যার অনুবাদ কেউ কেউ "পুনরুজ্জীবন" করেছেন তা বোধ হয় ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল। এবং এই প্রসঙ্গে পীদমন্ত নেতৃত্ব স্পষ্ট করা হলে "বুদ্ধিজীবী" প্রসঙ্গ আরও সুবোধ্য হত। তবু গ্রামশির যে রচনাবলী আমাদের কাছে অপরিচিত এবং যার অনেক লেখাই সব সময় স্বচ্ছ নয় সেগুলিকে বাংলায় উপস্থাপিত করার যে উদ্যোগ প্রকাশক ও সম্পাদক-অনুবাদকরা নিয়েছেন; তা প্রশংসার যোগ্য। আমরা এঁদের পরবর্তী প্রকাশনাগুলির জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকব।

পরিশেষে, "বুদ্ধিজীবী" প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা মনে হওয়ায় বলছি: গ্রামশি রাজনৈতিক দলকে বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে এক করে দেখেছেন, এবং বুদ্ধিজীবীদের কৃষক-শ্রেণীর অগ্রগণ্য অংশ হিসাবে পরিচালনায় দেখতে চেয়েছিলেন, এরকম আমার মনে হয়েছে। কিন্তু আজকের জাগতিক পটভূমিকায় রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা যাদের করায়ত্ত তাঁরা বুদ্ধিজীবী কিনা জানিনা, তবে বুদ্ধিজীবীরা তাদের দ্বারা পরিচালিত হন। গ্রামশি তাঁর "কর্মের দর্শন"—রচনায় বলেছেন, বুদ্ধিজীবীদের যুক্তি প্রয়োগ করে সমস্ত বিষয়কে ভালভাবে বুঝে সংগ্রামে অংশ নিতে হবে। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নিশ্চয়ই বিতর্ক হবে, কিন্তু যুক্তির অকাট্যতাই শেষ পর্যন্ত তত্ত্বকে প্রয়োগের যথাযথ পথে চালিত করবে। ইতালি কম্যুনিস্ট পার্টিতে গ্রামশিকে দক্ষিণ

পন্থা ও সংকীর্ণ বামপন্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছে এবং সেটা যুক্তির বাস্তব প্রয়োগের সংগ্রাম। শেষ পর্যন্ত তাঁর থীসিসই অধিকাংশের সমর্থনে গৃহীত হয়েছে। গ্রামশি এই যুক্তিবাদী সমালোচনার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি মার্ক্সের এই উক্তির মর্যাদা দেবার চেষ্টা করেছেন, "সমালোচনার অস্ত্র অবশ্যই অস্ত্রের সমালোচনার স্থান অধিকার করতে পারে না, স্থূলশক্তিকে স্থূলশক্তি দিয়ে অপসারিত করতে হবে। কিন্তু কোন তত্ত্ব যদি জনগণকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করতে পারে, তাহলে তা অবিলম্বে স্থূলশক্তির পর্যায়ভুক্ত হবে।" গ্রামশি এই কথা মেনেই বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রে যুক্তিবাদী সমালোচনাকে প্রধান স্থান দিয়েছেন, যদিও শ্রমিক-কৃষক অভ্যুত্থানকে তিনি অগ্রাহ্য করেননি।

জাঁ-পল সার্ত্রে মনে করতেন যে রাজনৈতিক দলের পরিচালনায় তিনি অংশ নিতে পারেন না, তিনি তার সদস্য হতে পারেন না। কথাটা হয়ত একটু বাড়াবাড়ি। কিন্তু আজকে যেখানে রাজনৈতিক দলগুলিতে মুষ্টিমেয়ের কেন্দ্রীয় একাধিপত্য সেখানে গণতন্ত্রীকরণ বিষয়ে গ্রামশির "বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষা" খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি দেখিয়েছেন শিক্ষার শ্রম ও শৃংখলা কিভাবে শ্রমিক-কৃষকের পরিবার থেকেই 'জৈব'' বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি করে। মানবিক চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে এঁরা হতে পারে যথার্থ বুদ্ধিজীবী, অন্য শ্রেণী থেকে আগত বুদ্ধিজীবীরা হয়ত আত্মীকরণের সাহায্যে "জৈব" বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারেন, তবু শ্রেণীস্বার্থ "অন্তর্গত রক্তের ভিতরে" থেকে যায়। এবং তা তাঁদের লোভ ও ভয়ের উর্ধে দাঁড় করাতে নাও পারতে পারে, যদিও সব সময় কিছু কিছু বুদ্ধিজীবী থাকতে পারেন যাঁরা শ্রেণীস্বার্থের গণ্ডী অতিক্রম করে মহাজনসমাজের সঙ্গে নিজেদের অভিন্ন করে তুলতে পারেন। আমরা আজকের ভারতবর্ষে সেই সব "জৈব" বুদ্ধিজীবীদের আবির্ভাবের জন্য উন্মুখ হয়ে আছি।

বঙ্গের প্রথম মহিলা নাট্যকার

বসন্তকুমার সামন্ত

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বঙ্গমহিলা-রচিত প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'চিত্ত-বিলাসিনী'র ভূমিকায় লেখিকা কৃষ্ণকামিনী দাসী বলেছিলেন : "আমার পুস্তক রচনা করিবার এই এক প্রধান উদ্দেশ্য যে উৎকৃষ্ট হউক বা অপকৃষ্ট হউক একটা দৃষ্টান্ত পাইলে স্ত্রীলোক মাত্রেই বিদ্যানুশীলনে অনুরাগী হইবে···।"[১] বাস্তবিকই স্ত্রীশিক্ষার প্রতি ক্রমশ অনুরাগ লক্ষিত হচ্ছিল। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে পরবর্তী দশ বৎসরে বঙ্গ সাহিত্য জগতে সাতজন লেখিকার আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁরা হলেন বামাসুন্দরী দেবী, হরকুমারী দেবী, কৈলাসবাসিনী দেবী, মার্থা সৌদামিনী সিংহ, রাখালমণি গুপ্ত, কামিনী সুন্দরী দেবী ও বসন্তকুমারী দাসী। এঁদের মধ্যে শিবপুর-বাসিনী কামিনী সুন্দরী দেবী ছিলেন প্রথম মহিলা নাট্যরচয়িত্রী। ইনি প্রথমে 'দ্বিজতনয়া' ছদ্মনামে জৈমিনীয় সংহিতায় উল্লিখিত দণ্ডীপর্বের কাহিনী অবলম্বনে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 'উর্ব্বশী' নাটক রচনা করেন। এর দু'বৎসর পরে প্রকাশিত তাঁর 'বাল্যবোধিকা' গ্রন্থে 'দ্বিজতনয়া' স্বনামে প্রকাশিত হয়েছিলেন। তিনি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে 'উষা' নাটক, পরে 'রামের বনবাস' নাটক এবং ১২৮৮ বঙ্গাব্দে 'কল্পনা-কুসুম' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধে বঙ্গ সাহিত্যে মহিলা-প্রণীত প্রথম নাটক তথা কামিনী সুন্দরী দেবীর প্রথম সাহিত্যকর্ম 'উর্ব্বশী' আমাদের আলোচ্য।

৮৫ পৃষ্ঠার এই নাটকটি কলিকাতার ডি রোজারিও কোম্পানীর মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত ; দাম ধার্য হয়েছিল এক টাকা মাত্র। গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' (ভূমিকায়) লেখিকা দ্বিজতনয়া মন্তব্য করেছেন—"দণ্ডী পুরাণের বৃত্তান্তে উর্ব্বশী ও দণ্ডী রাজাই প্রধান। আমিও নাটকে তাঁহাদিগেরই প্রাধান্য রাখিয়াছি। সুতরাং আমার গ্রন্থে অপবিত্র প্রণয়ের ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু কেবল তাহা বলিয়াই সূক্ষ্মদর্শী পাঠকমণ্ডলী আমার গ্রন্থকে অনাদর করিবেন না।"[২] গ্রন্থকর্ত্রী 'উর্ব্বশী' নাটকে 'ভূরি ভূরি দোষ' আছে স্বীকার করেছেন। তিনি 'অশিক্ষিতা', তবু তাঁর 'প্রথম রচনা' পাঠক সমাজে হাজির করার সময় পাঠকের সহৃদয়

দাক্ষিণ্য প্রার্থনা করেন নি। কারণ, তাঁর ধারণা 'গ্রন্থকারের অবস্থা বিবেচনার দ্বারা নয়, গ্রন্থের উৎকর্ষের উপর তাঁর প্রকৃত মূল্য বা সমাদর নির্ভর করে। তাই কোন সানুনয় প্রার্থনার বদলে লেখিকা কামিনী সুন্দরী দেবী সাহসের সঙ্গে এ-বিষয়ে আপ্তবাক্য ঘোষণা করেছেন : "পাঠক সমাজ অপক্ষপাত বিচারপতি সদৃশ। তাঁহাদের অনুগ্রহও নাই নিগ্রহও নাই ; অতএব বৃথা অনুনয় বিনয়ের ফল কি? তথাপি প্রবোধের নিমিত্ত এই এক ভরসা যে, যদিই আমার গ্রন্থ নিতান্ত নীরস হইয়া থাকে তবে ইহা আপনিই অচিরাৎ লয় পাইবে, ও আমিও পাঠকমণ্ডলীর তিরস্কার হইতে উদ্ধার পাইব।"[৩] তবে 'দ্বিজতনয়া'র আশঙ্কা অমূলক ছিল। কারণ, 'উর্ব্বশী' নাটকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। একইভাবে সমাদর পেয়েছিল তাঁর 'রামের বনবাস' নাটক—যার দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে। লেখিকার 'বিজ্ঞাপন' থেকে জানা যায় যে 'মুদ্রারাক্ষস' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা হরিনাথ ন্যায়রত্ন 'উর্ব্বশী' নাটকে প্রয়োজনীয় সংশোধনাদি কর্ম করেছিলেন। তা ছাড়া, উক্ত 'বিজ্ঞাপন' রচনায় লেখিকা 'অপর যে মহাশয়' অর্থাৎ তাঁর স্বামীর সাহায্য পেয়েছিলেন বলে স্বীকার করেছেন।

যে কাহিনী অবলম্বনে কামিনী সুন্দরী দেবী ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 'উর্ব্বশী' নাটক রচনা করেছিলেন, সেই একই আখ্যায়িকা নিয়ে স্বনামধন্য নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে লিখেছিলেন 'পাণ্ডব-গৌরব' নাটক। গিরিশচন্দ্রের জনপ্রিয় 'পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে 'জনার' পরই 'পাণ্ডব-গৌরব' এর স্থান। তাঁর এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়েছিল ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি ক্লাসিক থিয়েটারে। নাটকে কঞ্চুকী নামে যে নূতন চরিত্র গিরিশচন্দ্র সৃষ্টি করেছিলেন তিনি স্বয়ং সেই ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। একই বিষয় বস্তুর উপর রচিত দু'টি নাটকের মধ্যে কোন তুলনামূলক আলোচনা না করেও একথা বলা যায় প্রথম নাট্যরচয়িত্রী 'দ্বিজতনয়া'কে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয়েছিল দণ্ডীপর্বের কাহিনীর উপর। সেক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের সামনে ছিল পদ্যবন্ধে রচিত উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'দণ্ডীপর্ব'। তা ছাড়া, দণ্ডীর কাহিনী নিয়ে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের আগে রচিত আরও চারটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—রোহিনী নন্দন সরকারের 'দণ্ডীপর্ব' (মহর্ষি বেদব্যাসের রচনা অবলম্বনে), প্রাণকৃষ্ণ ঘোষের

'দণ্ডীচরিত' বা 'উর্ব্বশীর অভিশাপ', বঙ্কুবিহারী ধর লিখিত 'উর্ব্বশী উদ্ধার' এবং অহিভূষণ ভট্টাচার্যের লেখা 'দণ্ডীপর্ব'।

এখন আলোচ্য নাটক 'উর্বশী'র কাহিনী অনুসরণ করা যাক। দুর্বাসা মুনি ইন্দ্রালয়ে গিয়েছিলেন স্বর্গীয় নৃত্যগীত উপভোগের জন্য। কিন্তু তাঁর জটাজুট, পক্ক শ্মশ্রু ইত্যাদি দেখে নৃত্যগীত পটীয়সী উর্বশীর মনে বিতৃষ্ণা এসেছিল। অন্তর্যামী মুনি সুন্দরী উর্বশীর এই বিতৃষ্ণার কথা জেনে তাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে মর্ত্যে তার পতন হবে এবং সেখানে রাতে স্বরূপ ধারণ করলেও দিনে অশ্বিনীরূপে তাকে থাকতে হবে। শেষ পর্যন্ত দেবরাজ ইন্দ্রের অনুনয়ে মুনি উর্বশীর শাপমুক্তির একটা ব্যবস্থা রাখেন। প্রায় অসম্ভব সেই ব্যবস্থাতে থাকল—উর্বশীর মুক্তির জন্য প্রয়োজন হবে অষ্ট বজ্র সম্মেলনের। অভিশপ্ত উর্বশী অশ্বিনীরূপে মর্ত্যে বনে বনে ঘোরার সময় অবন্তীরূপ দণ্ডীর আশ্রয় লাভ করেন। অশ্বিনীর যে উর্বশীরূপ রাতে দেখা যেত তার জন্য দণ্ডী অশ্বিনীতে বিশেষভাবে আসক্ত হন। নাটকের প্রথম অঙ্কে দেখা যাচ্ছে উর্বশীর অভাবে ইন্দ্র ও ইন্দ্রলোক কাতর। দ্বিতীয় অঙ্কের সূচনায় দেবর্ষি নারদ তাঁর স্বভাব অনুসারে অশ্বিনী উর্বশী নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টির মতলব করে দ্বারাবতীতে গিয়ে অসাধারণ অশ্বিনীর খবর শ্রীকৃষ্ণকে জানালেন। শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডীর কাছে অশ্বিনী চেয়ে পাঠালে দণ্ডী তা প্রত্যাখ্যান করলেন এবং পাছে অশ্বিনীকে শ্রীকৃষ্ণ ছিনিয়ে নেন সেই ভয়ে তিনি অশ্বিনীকে নিয়ে রাজ্য ত্যাগ করলেন। তৃতীয় অঙ্কে জানা যাচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে দণ্ডীকে কোন রাজাই আশ্রয় দেন নি। অরণ্যচারী দণ্ডী অশ্বিনীকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা না করতে পেরে প্রাণ বিসর্জনের কথা ভাবছেন। অশ্বিনীরূপী উর্বশীও তার মর্ত্যজীবন থেকে মুক্তির সর্ত অষ্টবজ্র সম্মেলনের কোন সম্ভাবনা না দেখে ক্রমশ নিরাশ হচ্ছেন। চতুর্থ অঙ্কে ঘটনা নাটকীয়ভাবে মোড় নিল। দণ্ডীরূপকে আত্মহত্যার পথ থেকে নিবৃত্ত করে সুভদ্রা ও ভীম তাঁকে অশ্বিনীসহ আশ্রয় দিলেন। ফলে আশ্রিত দণ্ডী ও তাঁর উর্বশী-অশ্বিনী নিয়ে বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠল। একপক্ষে আশ্রিত রক্ষার জন্য পাণ্ডবগণ ও সহযোগী কৌরবগণ এবং অন্যপক্ষে শ্রীকৃষ্ণবলরামের নেতৃত্বে যাদবশক্তি। স্বর্গের দেবগণও আমন্ত্রিত হয়ে যাদব পক্ষে যোগ দিয়েছেন। অত্যাশ্চর্য এই মহাসমরে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ পরাজিত হলেন। শেষ পর্যন্ত ভগবতী পার্বতী যাদবপক্ষে যুদ্ধ করতে এগিয়ে এলেন। তখন যে যুদ্ধ শুরু হল তাতে অষ্টবজ্র

সম্মেলন ঘটল এবং উর্বশী অশ্বিনীরূপ থেকে মুক্তিলাভ করে বিরহ তাপিত দণ্ডীরাজকে কোনরকমে সান্ত্বনা দিয়ে স্বর্গে ফিরে গেলেন। নিরানন্দ স্বর্গে আবার আনন্দ ফিরে এল ;—এখানেই পড়েছে 'উর্বশী' নাটকের যবনিকা।

পৌরাণিক এই কাহিনীর মধ্যে অষ্টবজ্র সম্মেলনের ঘটনা ব্যাঘাত হওয়ার অবকাশ রাখে। এ-দিক থেকে 'দ্বিজতনয়া'র নাটক থেকেই প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে :

"উর্বশী (স্বগত) এই যে সকল দেবতা দাসীর প্রতি সুপ্রসন্ন হয়েছেন। দেখি দেখি অষ্ট বজ্র গণনা করে দেখি। (মস্তক উত্তোলন করিয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন ও বজ্র গণনা) বিষ্ণুর চক্র এক, ব্রহ্মার অক্ষ দুই, শিবের শূল তিন, চন্দ্রের বজ্র চারি, কার্ত্তিকের শক্তি পাঁচ, বরুণের পাশ ছয়, যমের দণ্ড সাত, পার্বতীর খড়্গ আট।

[উর্বশীর স্বরূপ ধারণ] "[৪]

পরবর্তীকালে রচিত কোন কোন গ্রন্থে 'কার্ত্তিকের শক্তি'র স্থলে অন্যতম বজ্র হিসাবে 'বলরামের হলায়ুধ' এর উল্লেখ আছে।

উর্বশী উদ্ধারের ঘটনা পরম্পরার মূল নায়ক শ্রীকৃষ্ণ—যাঁর সম্বন্ধে লেখিকা তাঁর 'বিলাপন'-এ (ভূমিকায়) উল্লেখ করেছেন : "দণ্ডী পুরাণে দণ্ডী রাখার বৃত্তান্ত সকলেই পড়িয়াছেন ভগবান্ চক্রী কি প্রণালীতে সৃষ্টি পালন করেন, পুরাণ-কর্ত্তা এই গ্রন্থে তাহা বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ব্যাসদেব সমুদায় মহাভারতে ভগবানকে চক্রীরূপে বর্ণন করিয়াছেন।..."[৫] উক্ত পটভূমিকায় 'দ্বিজতনয়া' তাঁর গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে কিভাবে চিত্রিত করেছেন সে বিষয়ে উল্লেখ করি। "ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু সে কেবল প্রসঙ্গতঃ মাত্র। বিস্তৃত প্রস্তাবে ভগবানের বর্ণনার চেষ্টা পাওয়া কেবল মুনি-ঋষিদেরই সম্ভব। এই হেতু অধিক সাহস করি নাই।"[৬] এবিষয়ে লেখিকার মনোভাব তাঁর 'উর্বশী' নাটকের মহাদেব চরিত্রের মুখে প্রতিভাত :

"আছিল তুরঙ্গী, হইল চার্ব্বঙ্গী, দেখে লাগে চমৎকার।
দণ্ডী দণ্ড ধরে, চাহ দণ্ডিবারে, বুঝিলাম হেতু তার ॥
পাণ্ডব সুভক্ত, তব অনুরক্ত, বাড়াইলে তারি মান্য।
আশ্চর্য্য সমর, পরাস্ত অমর, তব কৃপা ধন্য ধন্য ॥
সত্য দ্বিজ বাক্য, করি কমলাক্ষ, অষ্ট বজ্র মিলাইলে।
উর্বশী উদ্ধার, করে সাধ্য কার, অসাধ্য কার্য্য সাধিলে ॥"[৭]

চার অঙ্কের এই নাটকে কোন অঙ্কেই গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্য ভাগ নেই। কিন্তু দৃশ্যান্তর হয়েছে বহুবার, অনেক সময় স্বল্প ব্যবধানে—যেরূপ চলচ্চিত্রে দেখা যায়। যেমন, প্রথম অঙ্কে নাটক শুরু হয়েছে অমরাবতীর বৈজয়ন্ত তোরণে ইন্দ্র ও তাঁর সারথির কথোপকথন দিয়ে; তাঁদের কথাবার্তা মহর্ষি দুর্বাসাকে নিয়ে—যাঁর অভিশাপে উর্বশী স্বর্গচ্যুত হয়ে বর্তমানে মর্ত্যে অশ্বিনীরূপে আসীন। এর পরই দৃশ্যান্তর হয়েছে—অমরাবতীর অন্তঃপুর, দেবসভা, নন্দন-কানন ও শচীতীর্থের মধ্যে। এইভাবে অন্য তিনটি অঙ্কেও; দৃশ্যান্তরকে দৃশ্য হিসাবে ধরে গণনা করলে নাটকের চার অঙ্কে দৃশ্যসংখ্যা হবে মোট বত্রিশ।

'উর্ব্বশী' নাটকে 'রঙ্গস্থলে প্রবিষ্ট ব্যক্তিগণ' অর্থাৎ নাটকের কুশীলবের সংখ্যা, বিশেষত স্ত্রী-চরিত্রের সংখ্যা খুবই বেশী; পুরুষ ও স্ত্রী-চরিত্র যথাক্রমে ২২ ও ৩২ এর কম নয়। অথচ অনুরূপ ঘটনা নিয়ে লেখা গিরিশচন্দ্রের নাটকে পুরুষ চরিত্রের সংখ্যা প্রায় সমান হলেও স্ত্রীচরিত্রের সংখ্যা মাত্র সাত। 'দ্বিজতনয়া'র নাটক সে যুগে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়নি; তাই এও অধিক-সংখ্যক (৩২) স্ত্রীচরিত্র থাকার অসুবিধা কোন সময়ে বোঝা যায়নি।

কামিনী সুন্দরী দেবীর 'উর্ব্বশী' নাটকে মূলত গদ্য সংলাপই ব্যবহৃত হয়েছে; তবে মাঝে মাঝে কবিতার ব্যবহারও আছে। বলা যায়, নাটকের পাত্রপাত্রীগণ গদ্যের বদলে স্থানে স্থানে কবিতায় কথা বলেছেন। নাটকে এধরণের কবিতা-সংলাপ আছে এগারটি। অবশ্য ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'—দ্বিতীয় খণ্ডে 'উর্ব্বশী'তে কবিতার সংখ্যা পাঁচ বলেছেন। এই বৈষম্যের কারণ কি? মনে হয় নাটকে ত্রিপদী ও পয়ার চিহ্নিত পাঁচটি কবিতাকেই ডঃ সেন স্বীকৃতি দিয়েছেন। দ্বিতীয় অঙ্কে সত্যভামা, জাম্বুবতী ও রতির বলা তিনটি কবিতা, দণ্ডী ও উর্বশীর মুখের দুটি কবিতা এবং তৃতীয় অঙ্কে দণ্ডীর কবিতা-সংলাপকে তিনি হিসাবের মধ্যে আনেন নি। তবে উল্লিখিত দু'টি সংলাপ ত্রিপদী ও চৌপদী ছন্দে রচিত, যদিও কবিতার মাথায় লেখিকা সেভাবে চিহ্নিত করেন নি। বাকী পাঁচটি সংলাপ—যাদের প্রথম দু'টি পয়ার ও বাকী তিনটি ত্রিপদী ছন্দে লিখিত বলে লেখিকা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছেন তাদের কথাই ডঃ সেন তাঁর আলোচনায় উল্লেখ করেছেন।

নাটকে মোট দশটি গান আছে—প্রথম অঙ্কে দু'টি, দ্বিতীয় অঙ্কে একটি, তৃতীয় অঙ্কে দু'টি ও চতুর্থ অঙ্কে পাঁচটি। ডঃ সেন তাঁর লেখায় ন'টি গানের

কথা বলেছেন। এক্ষেত্রে মনে হয় উর্বশী ও দণ্ডী-রাজার গান দু'টিকে (পৃ. ৪১) তিনি একটি গান ধরেছেন।

লেখিকা 'দ্বিজতনয়া' তাঁর 'উর্বশী' নাটকে 'ভূরি ভূরি' দোষের উপস্থিতির কথা বলেছেন। তবে নাটকটি পড়লে সেইরূপ বেশী সংখ্যায় দোষ বা অশুদ্ধির সন্ধান মেলে না। যেগুলি মেলে তার কিছুটা সে সময়কার ভাষা ও বাগ্‌ভঙ্গীর জন্য (যেমন, চুল বাঁধা অর্থে 'মাথা বাঁধা' অশ্বিনী বোঝাতে 'ঘুঁড়ি' লাথি মারলেই অর্থে 'লাথি মেরেই' ইত্যাদি) এবং কিছুটা মুদ্রণজাত বর্ণাশুদ্ধির ('যেমন চতুর্দ্দিক স্থলে 'চত্ত‌দ্দিক', 'লইতে' স্থলে 'হইতে' ইত্যাদি) কারণে। তবে যে দুএকটি ক্ষেত্রে 'অসঙ্গতি' লক্ষ্য করা যায় তা উল্লেখ করা হচ্ছে। ২৪ পৃষ্ঠায় কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নকে ভালভাবে দেখে কৃষ্ণজায়া রুক্মিনী বলছেন—এ যে মদন। প্রদ্যুম্ন মদনরূপী হলেও এখানে কেন 'মদন' এর কথা হঠাৎ এল তা বোঝা যাচ্ছে না। আর একটি কথা, মায়াবলে বলরামকে নিদ্রিত অবস্থায় অন্যত্র অপসারণ নাটকের কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করেনি। কাজেই এ-প্রসঙ্গে বলরাম, রেবতী ও চিত্রলেখা চরিত্রের সংলাপ নাটকের বাঁধুনি আলগা করে দিয়েছে বলা চলে। তাছাড়া, যুদ্ধস্থলে অশ্বিনী-রূপ থেকে মুক্তিপ্রাপ্তা অপরূপা উর্বশীকে দেখে বিমুগ্ধ দেবাদিদেব মহাদেব,' ও পাণ্ডবপক্ষে উপস্থিত বর্ষীয়ান বীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্যের যে বর্ণনা নাটকে উপস্থিত করা হয়েছে তাতে শালীনতা রক্ষিত হয় নি। (যেমন, উর্বশীর মুখপানে চেয়ে দেব দিগম্বরের বাঘাম্বর অমনি খসে পড়ল'-পৃঃ ৭৮)। স্ত্রীচরিত্রগুলির পারস্পরিক কলহের ক্ষেত্রেও সংলাপে বাড়াবাড়ি লক্ষ করা যায়ঃ সেখানে চরিত্র নিয়ে খোঁচা দেওয়া হয়েছে একটু বেশী মাত্রায় যেমন, 'আমরা তেমন মেয়ে নই যে ভেয়ের সঙ্গে বেরিয়ে যাব'-পৃঃ ৬৪)। তবে লেখিকা যে-যুগে এগুলি ব্যবহার করেছেন তখনকার সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিচার করলে এগুলিকে 'দোষ' বলা যাবে কি?

প্রথম মহিলা নাট্যকারের নাট্যসংলাপে অনেকক্ষেত্রেই পাকা হাতের ছাপ আছে। এ বিষয়ে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে রাজা দুষ্মন্ত যেমন অন্তরাল থেকে এসেছিলেন শকুন্তলাকে ভ্রমরের হাত থেকে বাঁচাতে, তেমনভাবে এই নাটকে গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ হঠাৎ হাজির হয়েছেন অনুরূপ বিপদ থেকে রম্ভা তিলোত্তমাকে রক্ষা করতে। চিত্র-রথের প্রাসঙ্গিক সংলাপ অসাধারণ ;—"সুন্দরি, তোমরা ভয় করো না।' এ শঠ

ষট্‌পদকে আমি নিবারণ করছি,” (পৃঃ ৬) উর্ব্বশীর বর্ণনা প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এক পুত্রবধূর কবিতা সংলাপ উল্লেখনীয় ঃ

“বর্ণিব কি একাননে, রূপবতী ত্রিভুবনে,
তার সমা দেখি না নয়নে।
জানে গীত বাদ্য নৃত্য, দেবের মোহিত চিত্ত,
করে ধনী আপনার গুণে॥
চিরদিন অনাহার, অস্থি চর্ম্ম মাত্র সার,
তপস্যা করেন যেই যোগী।
হেরিলে উর্ব্বশী মুখ, বিসর্জ্জি পবিত্র সুখ
তখনি হয়েন অনুরাগী॥” (পৃঃ ২১-২২)

প্রেমবদ্ধ দণ্ডীরাজ ও উর্ব্বশীর কথোপকথনে দেখা যায়—

“উর্ব্বশী। মহারাজ, যাহাকে ভালবাসা যায় সেই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।” (পৃঃ ৩৪) অন্যত্র উর্ব্বশীর গানে পাই—

“নিতান্ত তব আশ্রিতা, যেন মীন জলাশ্রিতা, চকোরিনী হরষিতা
সুধাকর দরশনে।
চাতকিনী ঘন ঘন, চাহে যেন নব ঘন, তেমতি হে প্রাণধন,
সদাভাবি মনে মনে॥” (পৃঃ ৪১)

সুখের অনুভূতি প্রসঙ্গে উর্বশী বলছেন—

“সেই ত অমরাবতী যথা মম সুখ।” (পৃঃ ৪৬)

অন্যত্র উর্বশীর উক্তি—

“কোন কর্ম্ম অতিশয়, করা ত উচিত নয়,
অতি ভাবে অধিক বিচ্ছেদ।” (পৃঃ ৭৫)

স্বর্গস্পৃতা উর্বশী ভাগ্যবলে অভিশাপমুক্তা হয়ে বলছেন—

“যার প্রতি দেবতা সন্তুষ্ট তার অসম্ভবও সম্ভব হয়,
আর যার প্রতি রুষ্ট, তার সম্ভবও অসম্ভব হয়।” (পৃঃ ৮০)

‘দ্বিজতনয়া’ কামিনী সুন্দরী দেবী তাঁর নাটকের যবনিকা টেনেছেন উর্বশীর পুনরাগমনে আনন্দ মুখর স্বর্গের দৃশ্য উপস্থাপিত করে। লক্ষণীয় তাঁর নাটক

শুরু হয়েছিল নিরানন্দ স্বর্গ থেকে; সেদিক থেকে ঘটনা প্রবাহের বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়েছে বলা চলে। গিরিশচন্দ্র তাঁর 'পাণ্ডব গৌরব' নাটকের সমাপ্তি টেনেছেন যুদ্ধক্ষেত্রে মহাকালী অম্বিকার আবির্ভাব, অষ্ট বজ্র সম্মেলন ও উর্বশীর শাপ-মুক্তি পর্ব শেষ করে এক্ষেত্রে নাটক শেষ হয়েছে মহাকালীর বন্দনায়ঃ

মহাদেবঃ   চক্রি, চক্র সকলি তোমার!
ভক্তাধীন, পাণ্ডবের বাড়ালে গৌরব—
পরাভবি পিনাকধারীরে!

* * * *

কৃষ্ণঃ   জিজ্ঞাস মায়েরে শূলপানি;
লীলা মা'র
আমি মাত্র লীলার আধার।"[৮]

উনিশ শতকের মধ্যভাগে মহিলা চরিত সাহিত্যকর্ম প্রকৃতপক্ষে মহিলাদের দ্বারা রচিত কিনা অনেক সময় সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। এক সময়ে ভুবন মোহিনী দেবী-র কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন অক্ষয় কুমার সরকার, ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে। কিন্তু পরে জানা গিয়েছিল নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐভাবে মহিলা-ছদ্মনামে কবিতাগুলি লিখেছিলেন। 'দ্বিজতনয়া'র ক্ষেত্রে তেমন কোন সম্ভাবনা যে নেই তা পরীক্ষিত হয়েছিল। এ বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন—"বাঙ্গালায় মহিলা রচিত 'নাটক' হইতেছে 'দ্বিজতনয়া'র 'উর্ব্বশী' নাটক (১৮৬৬)। লেখিকার নাম কামিনী সুন্দরী দেবী। সে সময়ে মহিলাদের রচনা বলিয়া যাহা প্রকাশিত হইত তাহার অধিকাংশই পুরুষের বেনামি লেখা। উর্বশী নাটক সম্বন্ধে সে অভিযোগ চলে না। এক সমসাময়িক সমালোচক লিখিয়াছিলেন—"সম্প্রতিকার প্রকাশিত একখানি স্ত্রী রচনার প্রতি সাধারণের সন্দেহ হইয়াছে বলিয়া ইহা বক্তব্য যে প্রস্তাবিত পুস্তক প্রকৃত দ্বিজতনয়ার রচনা বটে; তদ্বিষয়ে কলেজের ক'একজন অধ্যাপক সাক্ষ্য দিয়াছেন, অতএব তাহার সন্দেহ করিবার কোন কারণ নেই।"[৯]

তথ্যসূত্র

১. কৃষ্ণ কামিনী দাসী—চিত্তবিলাসিনী, কলিকাতা ১৮৫৬খ্রীঃ-ভূমিকা পৃঃ ৷৴

২. দ্বিজতনয়া— উর্ব্বশী নাটক, কলিকাতা ১৮৬৬খ্রীঃ- পৃঃ ৷৴

৩. ঐ পৃঃ ।০

৪. ঐ পৃঃ ৭০.

৫. ঐ পৃঃ ৷৴

৬. ঐ পৃঃ ৷৴

৭. ঐ পৃঃ ৭১

৮. গিরিশ গ্রন্থাবলী—প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, আগস্ট ১৯৬৯—পৃঃ ৫৪৯

৯. সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-২য় খণ্ড, ৭ম সংস্করণ, ১৩৮৬ পৃঃ ১০২-৩

অসুখ

সার্থক রায় চৌধুরী

সে তেমন বন্যাও নয়, সে তেমন দুর্যোগো না।
যে সবই ভাসিয়ে দিয়ে টেনে নেবে দূর যমুনা,
সে তো ঠিক আগুনও নয়, আগুনের হাত পা আছে
সে কেমন রহস্যময়, চলনে মুদ্রা নাচে!
কি করে বোঝাই বল? সে ভারি মজার ব্যাধি
শুষে নিল রক্তপ্রবল যাবতীয় হৃদয়বাদীর
তারপর ঠনকো শরীর মাঠে ঘাটে, পথের পাশে
সে রোগের দুর্নীতি সব বুঝিয়ে বলতে আসে,
ও নাকি পুরুষ ধরে দেহে নিচু ঢেউ গুঁজে যায়
ব্যাটাছেলে সাহস ভুলে, মাথা-বুকে কাপড় গোছায়,
রাঙা বৌ ঘোমটা খুলে হো-হো করে হাসতে থাকে
চার রাত খায়নি ছেলে, 'বিবি', ডাকে নিজের মাকে!
ছেলেরা মেয়ে হল তাই মেয়েরা ছেলের মত
হাতে রেখে ধম্মকাহন ছিঁড়ে ফ্যায় বাপের ব্রত,
বুক সব ঝামার মত, পেট খুলে ধরল মেলে
নিজেদের পুং-কেশর আর নাড়ীকাটা নষ্ট ছেলে,
পেট থেকে পড়েই পোলা, পোলা নয় মাংসের তাল
খুঁজে ফেরে ইদিক—সিদিক যদি পায় ক্ষুদ, ভাঙা-চাল,
ফুল যেন কল্মিলতা, গেঁড়ি-খোল খিদের জোয়ার
বাছুরের রক্ত চুষে জলাভাব কি বলবো আর
কুলুঙের লক্ষ্মী ঠাকুর ওপাড়ায় বাসন মাজে,
জামা নেই উদোম হয়ে বহুরূপী মানুষ সাজে;
সে ব্যাটা ফকির অসুখ, সে ব্যাটা তন্ত্র জানে
দীঘিজলও মদ-ঘন হয়ে মেয়েদের কাপড় টানে।

আগুনের অভাব দেখে কার বে-র সাক্ষী দিতে
জোনাকী গেছলিরে তুই? মুখপোড়া দিল্-লাগিতে
আসলে সুদ চড়ে যায়, সুদাসলে আগুন জ্বলে
দড়ি ঘাড়ে কামড় বসায়, দেহ থেকে চামড়া তোলে,
জানি, জানি, হাটবারে মা, নীলামে উঠবে সেসব,
মরা খাল পাঁজর গুনি এইবার ভাসায়ে নে সব
ঘরে যাক নষ্ট পোলা, হেকিমের তেল—শিশিতে
ঘুমায়ে পড়লো গেরাম ছানাদের রাত—হিসীতে;
ও শালা, মসজিদে যায় মাজারে চাদর চড়ায়
ও শালা, মন্দিরে যায় বাঁজাদের ধর্ম পড়ায়,
ও শালা মাসীর সাথে বিয়েতে রঙ্গ মারে,
মজা দেখে পত্ত লেখে শ্মশানে নিজের হাড়ে,
গাঁ-ছাড়া মদ্দ মরদ তাড়ি ঠেকে উল্টো শোয়া
চোখে ঘোরে বিবির দু-বুক ফেনা মারা ভাতের ধোঁয়া
সে অসুখ ভুলিয়ে দেবে কিছু ছিল কাপড় বলে,
শিশুদের ভাসিয়ে দেবে মদ-ঘন দিঘীর জলে,
সে অসুখ? অভাব, অভাব, ধানচিরে বিষ রেখেছে,
আঁধারে তার ছেলেকে 'জানেমান্', মা ডেকেছে।

চার আনায় বার-মুখো হয়ে দেহ বেচে ক্ষেতের মাটি,
মাঠে, ঘাটে, পুতুল ভাঙা, খুকুদের খেলনা বাটি!

পুনশ্চ আগুন

তমিস্রাজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার এই শব্দজন্ম আজ আমি তোমাকে দিলাম
অরাজক আঁধারের চক্র ভেঙে, রঞ্জন! রঞ্জন! তুমি উঠে এসো
এই মৃত্যুভূমে, শরীর সর্বাঙ্গ থেকে একে একে তুলে দাও
আতংকের কাঁটা, ভেঙে দাও বিপর্যস্ত প্রবাস

কারা খুব কাছে ছিলো, ছদ্ম-বিদ্রোহে, কারা খুব একদিন
অনর্গল গেয়েছিলো আগুনের গান ?
কিছুই পড়ে না মনে, শুধু অশরীরী বাতাসের চেয়ে দ্রুত,
নিঃশব্দে, ক্রমিক মুহূর্ত চলে যায়, দিন যায়, রাত্রি নেমে আসে
উদাসীন ঘড়ির কাঁটার নীচে, শীতঘুমে, ভারী হয়ে ঝুলে থাকে
আড়ষ্ট জীবন ;

তুমি তাকে দোলা দাও, রক্তিম উত্থান দাও,
স্বপ্ন দাও, পুনশ্চ আগুন··· ॥

প্রিজমবৃত্ত

শামীমুল হক শামীম

মদিরা জলে
ঝিকমিক করে
আলোঢেউ···
চাঁদআলো
নিয়নআলো
রেটিনা আলোর ত্রিবেনীসংগম ঢেউ খেলে মদিরা জলে।
লোবান গন্ধে মাতোয়ারা,
প্রচ্ছায়া
আধোআলো আধোঅন্ধকার
ঝাপসা চোখ দেখে সাকী হাতে দাঁড়ায়ে দেবী
ভাসিতেছে আবহদৃশ্য নৃত্যঢেউয়ের মুদ্রায়।

অর্ণবতরী তোমাকে নিয়ে যায় তেপান্তরের সমুদ্রদেশে
তুমি হয়ে যাও মৎস্যকন্যা
কখনোবা উদোম সাঁতার কাটো
জল ভেঙে ভেঙে গড়ে তোল সমুদ্র-সাম্রাজ্য
রৌদ্রস্নান সেরে শুয়ে থাকো আয়েশে।

অর্কিড পংক্তিমালায়
আলোঢেউ ঝিকমিক করে মদিরা জলে।

সফেন তরঙ্গে বিহঙ্গ মৎস্তকুমারী
কার খোঁজে দিশেহারা তুমি
পারিজাত হয়ে কাহার জন্যে ছড়াচ্ছ স্বর্গীয় সৌরভ?
পসিডন? সে তো
এ সাম্রাজ্যের দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা, ধরাছোঁয়ার বাইরে।
অথচ আবলুস অন্ধকারে
লিবিডো রাতের প্রহর গোণে মর্ত্যমানব।
মৎস্তকন্যা—
তুমি চলে এসো মর্ত্যে, মর্ত্যমানবের কাছে
এখানে আছে সুবাতাস
বোধ ও বোধির পারঙ্গম
আছে এক শৈল্পিক হৃদয়, দ্যোতনা
সিম্ফনির মৃদুময়তায়
মর্ত্যমানব তোমাকে নিয়ে যাবে সবপেয়েছির দেশে।
ক্ষরিত হৃৎপিণ্ড
ধূ-ধূ মরুভূমি
মর্ত্যমানবের চোখে ক্রোধের বহ্নিশিখা!
পসিডন, তোমার সাম্রাজ্য শুরু করো
ট্রয়ের ধ্বংসযজ্ঞ
সমুদ্রের অফুরন্ত জলরাশি বিলিয়ে দাও মহাশূন্যতায়…
মৎস্তকন্যা, ঘোর কেটে এসো প্রাক-পরিচয়ে।

হায়! সব ভুল, স-ব ভুল
আলোঢেউ ঝিকমিক করে মদিরা জলে।
প্রিজম—

পসিডন

মৎস্তকন্যা মর্ত্যমানব

সমান্তরাল দূরত্বে পারমানবিক ছোটাছুটি
মর্ত্যমানব মৎস্তকন্যার দিকে
মৎস্তকন্যা পসিডনের দিকে ক্রমশঃ
বাহু ভেঙে হয়ে যায় বৃত্ত

বিড়াল

অহনা বিশ্বাস

বটবৃক্ষে উৎসব। আমাদের রোজ দেখাশোনা।

রামজীর দোকানে যে মেয়েটি চা বানায়—বুড়ি
যে তার বারো বছরের টলটলে ঘুম চোখে
উনুনশালে ঝিমোয়
আমি তার ভিতর ফর্দাফাই অশ্ব হয়ে ঢুকি

গতি পেলে মেয়েটির চোখে পড়ে
হস্টেলের টিমটিম আলো
বেঞ্চে সাতটি একেবারে একরকম দেখতে ছেলেমেয়ে

এরপর মেয়েটির ভিতর থেকে একটি
বিড়াল বেরিয়ে বেঞ্চে বসে।

বর্ষার রাতে

ধীমান চক্রবর্তী

কোন এক বর্ষার রাতে
এই পৃথিবী প্রথম ঘুরে উঠেছিল।
সেসময় কে কে ঘুমাচ্ছিল জানি না।
কিন্তু কেউ কেউ তো জেগে ছিলই।—তাই
বর্ষার গান আজ আমাদের এত প্রিয়।
দেখেছি এরকম দিনেই দম্পতিরা
জানলার ওপাশ দিয়ে তাকিয়ে থাকে
দুটি ভিজে কাঠের চেয়ারের দিকে।
কয়েকটি পালক উড়ে যায় ইলেকট্রিক তার
লক্ষ্য ক'রে। আমরা জানতাম
টেব্‌লের উপর অবহেলায় পড়ে আছে

যে ব্রিফকেসটি, তার ভিতর থেকে বেরবে
তৈরী না হয়ে ওঠা দোতলা বাড়ীটি।
জলের গম্বুজটির মধ্যে মহাকাশের হাত ফসকে
এসে পড়ল জ্বলন্ত পাথরটি—সেই মৃতদেহ
সরিয়ে নেওয়ার জন্য শিশুটি চিৎকার ক'রে ওঠে।
বিউটি পার্লার থেকে বিভিন্ন চুল ও
খোঁপা বেরিয়ে এল গোলকের চারপাশে
ছড়িয়ে পড়ার জন্য। লক্ষ্য ক'রি—
যেভাবে বৃষ্টিতে সব গলে গলে পড়ছে
প্রতিবছর, তাতে হয়ত প্রমাণ করা যাবে না
কোনদিন আমাদের বসবাস এখানে ছিল।

বর্ষার রাতে আমাদের যে পৃথিবীটি
প্রথম ঘুরে উঠেছিল, তা হ'ল
আয়নায় ফুটে ওঠা আসল পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি।

এসো, দাঁড়াই

সব্যসাচী সরকার

আমরা, যারা আছি
এসো দাঁড়াই। গীর্জার দড়িতে ঝোলানো
ঘণ্টার মত সব মানুষগুলোকে বাজাই।

এসো, নিজেদের চিরে ফেলি, হৃৎপিণ্ড
চোখের সামনে ধরি, রন্ধ্রগুলো ভরে দিই শ্বাসে।
সর্বাঙ্গে আন্তরিক রক্ত মাখি।

এসো, ধোঁয়া থেকে আগুনে যাই
আগুনে ছাই হয়ে যাই, উত্তাপে বড় যন্ত্রণা
সহনে মুক্ত হই।

স্মৃতি, বুদ্ধি, ভ্রম ধুয়ে ফেলি
নিজেদের প্রিয় অস্তিত্বে চুনকাম করি।
এসো, দাঁড়াই।

তোমাকে বলছি

সুব্রত সিন্‌হা

তোমাকে দেব বলে
নিজস্ব একটা শৈশব
লুকিয়ে রেখেছিলাম আকাশনীল খামে
ঠিকানাবিহীন খাম সেই যে তুমি
ফেলে দিলে নির্জন ডাকবাক্সে
তারপর থেকে
আমার কোন শৈশব নেই
স্মৃতি আক্রান্ত মুহূর্ত আছে শুধু…

ধূপছায়া একটা বিকেল দেব
বলে দৌড়েছিলাম কবে
তার আগেই নেমে এসেছিলো
গাঢ়তম অন্ধকার
ফিরে আসার সময় তীব্র অভিমানে
শান্ত নদীতে ছুঁড়ে ফেলেছি সাধের গুলতি, মার্বেল…

এখন আমার দু'চোখে
ধূসর ক্লান্তি
উপহাস করে যায় বিগত সন্ধেমালা
কাছে নেই কোন
এলেজি লেখার মত বিষন্ন কলম
অনন্ত মরুপথে
শুধু টালমাটাল হেঁটে যাচ্ছি এক ভম্মিত যৌবন

আমার জন্য কোন সম্ভ্রান্ত শোকপ্রস্তাব এনো না, তুমি।

শেষ দর্শক

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

চৌকাঠ ভেঙেছে সবে, ছাগজিহ্ব লকলক করে
কৈবর্তপুরাণ থেকে উঠে আসে অতিকায় ব্যাঙ
মৃত্যুর অনতিদূরে শুয়ে আছে বুনো রাজহাঁস
অপার্থিব চীৎকার যতিচিহ্ন নিয়ে এলে
সাপেরা খোলস ছাড়ে, রক্তে বিন্দু রেখে যায় বিষ,
আয়ুষ্মান নির্মাণ কলস ভরে রাখে, শূন্য করে রাখে
গরল-সদৃশ কোনো অমৃতের ছদ্মবেশী জল।
সেই জলে ডুবে যাবে বলে
ক্ষণেক তাকিয়ে ফিরে পলাতক ব্যর্থ সমীরে
সে দিয়েছে প্রগাঢ় আশ্বাস
ডুবে যেতে যেতে, প্রতিপ্লাবী ভিখারী আলোতে
সে দেখেছে বাঁচার উল্লাস।

টুন শহরের রজার র‍্যাবিটের সঙ্গে একরাত

সুবিমল বন্দ্যোপাধ্যায়

আমিও হয়ত এখনি খুন করবো কাউকে
কোন একজনকে তাচ্ছিল্যে উড়িয়ে দেব।
আগুন মুখে নিয়ে কি করে উদাসীন হতে হয়,
খেলার ব্লেডগুলো কি করে গলতে থাকে
টুন শহরের মানুষ হাত ছাড়িয়ে শিখিয়ে দিতে পারে আজ।
অর্দ্ধেক সোনা মেশানো মাটিতে
ভরপেট চালাতে পারে সারাজীবন।
প্লাস্টিক বলের মতো পড়তে পড়তে
আর রঙ পাল্টাতে পাল্টাতে কিছুতেই
ভাঙে না ঐ খুনে খচ্চরগুলো।

টুন শহরের উপত্যকায় দেখেছিলাম
তির্ তির্ করে চুঁইয়ে পড়া জল
আর নীচে সবুজ পাতাদের টান টান একফোঁটা দুফোঁটা খাওয়া।
টুন শহর, তোমার ঝুলে পড়া চামড়া
আর ঘুপ্‌চি ঘরের অন্ধকারে তুমি
কী ভীষণ তাচ্ছিল্যে দিনের পর দিন ওড়াও
কত সোনা মেশানো মাটি, কত প্লাস্টিক বল।

দরজা

সুদীপ বসু

আপেল গড়িয়ে যায় দিদির ঠোঁটের কোল থেকে—
আমাদের সমুদ্র দেখবার বিনিময় কেনা একরাশ আপেল…
…কাল সারারাত দরজার ভিতরে শুধু আপেল
কাটবার শব্দ—আর বাইরে আমরা চার বোন।
'প্রতি মাসে এত রক্তপাত, আমি যে ভাবতেও পারিনা
ডাক্তার' এ কথা বলতেই প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন জুড়ে শুধু
আপেল আর মোসাম্বির গন্ধ—
তারপর গোটাদিন দরজার ভিতরে শুধু
আপেল কাটবার শব্দ—আর গোপন ভাঁড়ার
খুলে আমরা জমিয়ে রাখি আইভিলতা গাছ ··
ওদিকে বাথরুমে ওড়ে একফালি বিষণ্ণ কাপড়
শ্বেতিদাগ মনে রেখো আমাদের দিদির জখম
শ্বেতিদাগ, লিখে রাখো আমাদের দিদির জখম
শ্বেতিদাগ, ভুলিও না, আমাদের দিদির জখম

নৈবেদ্য কয়েদি

সোমনাথ রায়

কয়েদি বেরিয়ে এলো ; উলঙ্গ নির্বোধ বেশে জড়সড় হ'য়ে
মুক্ত কারাগার থেকে শূণ্য পাথরের মাঝখানে শান্ত পায়ে।
আত্মীয় স্পন্দন ছুঁতে অন্ধকারে কার্মুকে বেঁকেছে মেরু ;

অগোছালো দাড়ি ঢেউ দল বেঁধে পায়ের ওপর ঝর্ণা মুদ্রায় নেমেছে।
চঞ্চল পাখির নীচে সেই নদী মনে হয় অনেকটা প্রৌঢ়া হ'য়ে গ্যাছে।
তুলোর চামড়া ঘেরা টলটলে চোখ ছুটো ভিজে।

বয়স কতটা হ'লো! জানা নেই।
পাথর ডিঙোতে শেখেনি রোদ্দুর; শুধু অন্ধকার কালো রাত
মা-বোনের মতো, সঙ্গে ছিল নিঝুম আদরে—
কপাট খুলতে তারা ম'রে গ্যাছে দ্বিতীয় মৃত্যুতে।

এমন বাতাস. লোমকূপ ভুলে গ্যাছে তাকে; নিতান্ত নতুন এই শীত;
গাছেদের এই রঙ! এই রঙ ছায়াদের! এমন রূপসী আকাশের মেঘ!
এত আলো, তবুও নির্বাক পাথরের ভিড়, লুণ্ঠিত নজর।

কয়েদি এগিয়ে গ্যালো;
প্রৌঢ়া নদী ভেসে যাচ্ছে যৌবনা স্তনের কামধেনু ছুধে
জ্যোৎস্না শাড়ীতে তার ঢেকে গ্যাছে কয়েদির নৈবেদ্য শরীর॥

বর্ষা

সুদীপ্ত মাজি

একবার চকিত বিদ্যুতে
আমাকে সম্রাট করে গেলে

পথে ছিল ভরা শ্রাবণের ঋতু, বৃষ্টিপুরাণের
ভাষ্য, ভেসে আসা মেঘের মহিমা

একবার চকিত বিদ্যুতে
আমাকে আলোয় ভরে দিলে

আমি বজ্রপতনের শব্দ হতে পারি!

নিঃসঙ্গতা

অমিতাভ চক্রবর্তী

আকাশ
ঝরণা,
প্রেম,
ব্যভিচারিনী নিঃসঙ্গতা।

পথ,
শ্রম,
দৈনন্দিনতা,
ব্যভিচারিনী নিঃসঙ্গতা।
এ পাড়ের সমস্ত শিকড় উপড়ে ফেলে
সমস্ত জঞ্জাল সাফ করে
ঘর তৈরীর বাসনায় মগ্ন মানুষটির কান্না…
একলা পথে বেড়িয়েছ কোনদিন ?
রোদে পোড়া তামাটে শরীর,
ফুটপাথের তপ্ত ভয়ঙ্কর কর্কশ আওয়াজ
হজম হয়েছে ?
আজ নয়, অন্য কোনদিন
মাউথ অর্গান বাজিয়ে সূর্যাস্ত দেখার অভিলাষ,
তিতাসের জলে রাকার চুম্বনকে অস্বীকার,
আর…আর কিছু নয় ;
শুধু কিছু মিথ্যা অশ্রু।

খবরের বিশেষ অংশ

বিকাশ গায়েন

খবরের বিশেষ বিশেষ অংশ আরেকবার
বিস্ফোরণে মৃত পাঁচ, তিস্তায় আবার
বন্যার আশংকা—রাজ্যে চেতাবনী জারি
—'নাকটা টিকলো, গালে ব্রণ না ফুসকুড়ি ?'

ফর্সামুখ পাঠিকার চোখ ওঠে নামে
মন্ত্রীর সভায় লাঠি হরিজন গ্রামে
শ'তিনেক বাড়ী ছাই—'কি সুন্দর ভুরু !'—
চোলাই মদের ঠেক থেকে ধৃত গুরু

আহত হাজার ট্রেন লাইন থেকে খালে
পড়ে—'পাঁচপাচি তবে টি ভি-তে দাঁড়ালে
আরও ভাল লাগে, ওটা ক্যামেরার যাদু' —
কেন্দ্রকে বোঝাতে দিল্লি যাচ্ছে পাঁচ সাধু

হংসীগ্রীবা পাঠিকার খাসা উচ্চারণ
কলকাতার আশেপাশে গঙ্গার দূষণ
ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে—'খোঁপা না বিনুনি ?'—
সংবাদ এখনকার…—'আরে মেয়েটাকে চিনি' ।

যাই

অজয় বসু

যাই
আকাশভরা বৃষ্টি হাওয়ার মেঘ এলোচুল
যাই
আলোর হাওয়ার অন্ধকারের ঘোর
যাই
বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে আকাঙ্ক্ষার ঘোর চারপাশে
যাই
রোদের কাছে জীবনের খোলা চিঠি
যাই
মাটির গন্ধে এখনো কঠিন টান
যাই
মাটির কাছে মাটির মতো জীবন
যাই

অপরচুনিস্ট

স্বপন সেন

অমিয়দা অপরচুনিস্ট···

অনির্বাণ হাই তোলে, টেবিলের একধারে বসে সকালের দৈনিক দেখতে দেখতে। কাগজে অমিয়দার লেখা একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে। এক বিপ্লবী নেতাকে নিয়ে লেখা। যিনি ধৃত অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন এখনও। সেই প্রসঙ্গে কথা বলতে বলতে ওরা অমিয়দার সম্পর্কে এই মন্তব্য করে। কথাটা শুনে শুনে হেজে গেছে সে। গত দু'বছরে অমিয়দার প্রসঙ্গ উঠেছে বহুবার আর সব শেষে এরকম এক মন্তব্যেই অমিয়দার ধ্যান-ধারণা, আদর্শ, কাজকর্ম এমনকি মানুষটার চরিত্রকে পর্যন্ত নস্যাৎ করে দিয়েছে তারা। অনির্বাণও একদিন চিৎকার করে এই কথাই আওড়াতো। কিন্তু এখন তার একটা মানুষের এতদিনের জীবন-কর্ম পদ্ধতি মাত্র এক কথায় মানুষটার গোটা অস্তিত্বকে নস্যাৎ করে দিতে অস্বস্তি হয়। এরকম বিশ্লেষণ আর মন্তব্যে কেমন যেন এলার্জি ধরে গেছে। আজকাল এ-সমস্ত কথায় হাই ওঠে তার।

অমিয়দা আগে তাদের পাড়াতেই থাকতেন। তার সঙ্গে পরিচয় বহু দিনের। মাঝে বছর দেড়েক তাদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ না থাকার পর গত ছ'মাসে শুধু তার সঙ্গেই একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আসলে বছর দুই আগে তারাই যোগাযোগটা ছিন্ন করেছিল।

ছেলেবেলা থেকেই সে দেখেছে অমিয়দা বামপন্থী রাজনীতির একনিষ্ঠ কর্মী। পার্টির হোলটাইমার। দিন নেই রাত নেই শুধু মিটিং মিছিল। কনভেনশন-প্লেনাম-আণ্ডার গ্রাউণ্ড-জেলহাজত। অমিয়দা ছিলেন একই সঙ্গে পার্টির তাত্ত্বিক এবং জঙ্গি নেতা। ভাল গল্পও লিখতেন। সেই সূত্রেই অমিয়দার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে তার। সে বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠত অমিয়-দার লেখা পড়তে পড়তে। তখনও সে উচ্চলিঙ্গ স্কুলের গণ্ডি পার হয় নি। সেই বয়সেই সে মাঝে মাঝে চলে যেত অমিয়দার বাড়ি, তার লেখা শোনাতে। অমিয়দা এখনও লেখেন। লেখাই এখন তাঁর প্রধান উপজীব্য।

'আজকাল তো যা পারে তাই লেখে।' অনিন্দ্যর কথাটা তার কানে

যায়। 'কিছুদিন আগে ক্যাবারে ড্যান্সের ওপর একটা আর্টিকেল লিখেছিল। পড়েছিস শ্যামল?'

'হ্যাঁ পড়েছি।' শ্যামল বলে। 'আরে মাঝে মাঝে বিপ্লবের ফেরি। বিপ্লবী থেকে ফেরিওয়ালা, দারুণ উত্তরণ।'

কথাটা অনির্বাণের কানে লাগে।

'বুর্জোয়া ভাইস্। একবার ঢুকলে আর নিস্তার নেই।' বিপুল সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়ার রিং করে। ভঙ্গিটা এমন যেন, এসব তার জানা।

'অমিয়দা কোন দিনই কোন আদর্শে বিশ্বাস করত না। সুবিধেবাদী, দালাল। পার্টি করত নিজের আখের গুছোবার তালে।' প্রণব বলে।

'অমিয়দা কিন্তু পার্টির মাধ্যমে চাকরি পায় নি।' অনির্বাণ এতক্ষণ পরে কথা বলে। প্রণব আড়চোখে তাকায় তার দিকে। অনির্বাণ আবার কাগজে চোখ রাখে।

অনিন্দ্য বলে 'আরে পার্টি তো আজকাল রাবার স্ট্যাম্প। নকশালপন্থী মানেই বিপ্লবী ইন্টেলেক্চুয়াল। বেশ ভাল দামে বিকোয় এই স্ট্যাম্পটা। এখন তো সব জায়গায় এদেরই রমরমা বাজার।'

'তখন নেহাত ছোট ছিলাম। এখন যদি এমন একটা বিপ্লব-টিপ্লব গোছের কিছু হতো, একটা রঙিন সার্টিফিকেট···' শ্যামল মাঝ পথে কথা থামিয়ে মুচকি হাসে।

অমিয়দার ডান পায়ে আর বাঁ কাঁধে বুলেটের ক্ষতচিহ্নগুলো অনির্বাণের চোখের সামনে ভাসে। পালিয়ে যাবার সময় পুলিশ পেছন থেকে গুলি করে। তারপর সাত বছরের জেল। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে সবমিলিয়ে ছত্রিশটা খুনের মামলা। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সব মামলাই তুলে নেয় তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মতো। অমিয়দাও ছাড়া পান অন্যান্যদের সঙ্গে। কিন্তু তার আগেই অমিয়দার হার্টের একটা ভাল্ভ নষ্ট হয়ে যায়, জেলে শারীরিক অত্যাচারে। জামা খুললেই দেখা যায় গোটা বুকটা চেরা। দু'বার ভালভ বদল হয়েছে ইংল্যাণ্ডে। প্রতি চার বছর অন্তর এই কৃত্রিম ভাল্ভটা বদল করতে হয়। 'যে কোন সময় চোক্‌ট হয়ে যাবারও সম্ভাবনা আছে।' একদিন কথা প্রসঙ্গে অমিয়দা বলেছিলেন তাকে।

'কিন্তু এই অপারেশনের খরচ তো অনেক।'

'হ্যাঁ, ইংলণ্ডে যাওয়া-আসা, থাকা, অপারেশনের সমস্ত খরচই দেয় আমার কাগজের অফিস।'

অনির্বাণের মাধ্যমেই অমিয়দার সঙ্গে তার বন্ধুদের আলাপ, জেল থেকে বেরোবার পর। তখন তারা একটা ত্রৈমাসিক পত্রিকার পরিকল্পনা করছে। অমিয়দাকে বলতে গেছিল তাদের কাগজে লেখার জন্যে। আর প্রথম আলাপেই অমিয়দা তার বন্ধুদের সম্পর্কে বেশ উচ্চ-ধারণা পোষণ করেছিলেন।

তার কয়েকদিন পরে কথা প্রসঙ্গে অমিয়দা তাকে বলেছিলেন, 'আরে অনির্বাণ, তোমার বন্ধুরা তো বেশ আদর্শবাদী, বুদ্ধিমান ছেলে। প্রত্যেকেই ভাল পড়াশোনা করেছো রাজনীতি, দর্শনের ওপর, তোমাদের বয়সে আমরা কিন্তু এতটা জানতাম না। একটা তাগিদ অনুভব করতাম, একটা পরিবর্তনের তাগিদ।' অমিয়দার চোখে-মুখে স্বপ্ন আর হতাশার আলো-ছায়া খেলে যায় মুহূর্তে। 'তারপর জেলে অবসরে আরও পড়াশোনা করি।'

জেল থেকে বেরিয়ে অমিয়দা প্রথম প্রথম রাজনীতির কথা বলতেন। তারপর তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, ঘনিষ্ঠতা থেকে বন্ধুত্ব, কিন্তু অমিয়দা তার লেখালিখির বাইরে আর কোনো কথা বলতেন না। পার্টি-রাজনীতি প্রসঙ্গে কোনো কথা বললেও এড়িয়ে যেতেন, পার্টির ভুল ঠিক প্রসঙ্গে বা এতোগুলো দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া সম্পর্কে কোনো কথা বলতেন না।

বছর দু-আড়াই আগের কথা তার মনে পড়ে—

একদিন প্রণব তাকে বলে 'দেখেছিস অনির্বাণ, অমিয়দা চাকরি পাওয়ার পর থেকে আর রাজনীতি নিয়ে কোন কথা বলেন না। এখন শুধু নিজের লেখালিখির হাবিজাবি কথা। আর ওই তো সমস্ত লেখা। ট্র্যাস্। প্রেম, সেক্স আর বিপ্লবের ককটেল। বিপ্লবের নামে চোলাই চালান। এসব লেখা আমরা কেন পড়ব, তুই বল অনির্বাণ।'

অনির্বাণ প্রণবকে সমর্থন করে, 'ঠিকই বলেছিস প্রণব। তাছাড়া তুই কি লক্ষ করেছিস, অমিয়দা আজকাল ফিচার লিখতেই ব্যস্ত বেশি। গল্প তো ইদানীং দেখতেই পাই না।'

'কি করবে বল-? এখন তো প্রত্যেকটা কাগজেই ফিচার লেখকদের কদর বেশি। প্রতেকটা কাগজই মোর ইনফরমেটিভ আর্টিকেল লেখকদের দিকেই নজর দেয়।' বিপুল বলে।

'অমিয়দা আসলে আত্ম-প্রতিষ্ঠা চায়; আত্ম-আবিষ্কারের চেয়ে। আর

তা যে কোনো ভাবেই হোক না কেন। দেখছিস না, গত চার-পাঁচ বছরে অমিয়দার ফ্ল্যাট, গাড়ি, প্রতিষ্ঠা সবই হয়েছে।' অনিন্দ্যর চোয়াল শক্ত হয়।

'অমিয়দার জন্যে কষ্ট হয়।' অনির্বাণ বলতেই প্রণব তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। 'তোর এখনো এইসব সেন্টিমেণ্ট গেল না। অমিয়দার কোনো দিনই আদর্শ বলে কিছু ছিল না। তা না হলে একটা মানুষ, এতবড়ো ইতিহাসের সাক্ষী হয়েও, তাঁর লেখায় সেই গভীরতার ছাপ কোথায়? আমাদের সময়-জীবন উঠে আসে না কেন?'

জেল থেকে ফেরার বছর খানেক পর অমিয়দা চাকরি পান। এই সময় দেখেছে অমিয়দাকে স্ট্রাগল করতে। আগেও দেখেছে। জেলে যাবার আগে। নিজেদের একতলা বাড়িতে মাথা গোঁজার ছাদ। দুটো ছোট ভাই, বোন আর বিধবা মাকে নিয়ে তাদের পরিবার। বাবার ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার সুদ আর অমিয়দার টিউশনের ওপর নির্ভর করেই চলতো সংসার। অমিয়দা তখন বিভিন্ন কাগজে লিখতেন। সবই লিটল ম্যাগাজিন, আর সারাদিন পার্টি করতেন।

'অমিয়দা এমন, চাকরি পাবার পর সব ভুলে গেল। বিধবা মায়ের জন্যে কোনো দায়িত্ব বোধ নেই তার।' শ্যামল বলেছিল একদিন কথা প্রসঙ্গে বছর আড়াই আগে।

'চাকরি পাবার জন্যে একজন আদর্শবাদী লোক নিজেকে এতটা বিকিয়ে দিতে পারে আমরা ভাবতেই পারি না।' অভয় বলেছিল।

অমিয়দা চাকরি পাওয়ার মাস দুয়েক আগে বাড়ি ছেড়েছিলেন। ওদের কাগজের সম্পাদকের বাড়িতে থাকতেন। অমিয়দার বিশেষ বন্ধু। তারপর চাকরি। কয়েকমাস কালিঘাটে একটা ঘরে থেকে অমিয়দা চলে আসেন নিউ-আলিপুরের ফ্ল্যাটে। শুনেছে ফ্ল্যাটের ভাড়া দেয় অমিয়দার অফিসই। অমিয়দা তখন প্রায় রোজই পরিবর্তিত হচ্ছেন। তারপর বিয়ে। কয়েকমাস পরে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে প্রথমবারের অপারেশন।

বছর আড়াই আগে যখন তাদের সম্পর্কে চিড় ধরতে শুরু করে, আর অমিয়দা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন মাথায় ভীড় করতে থাকে তখন একদিন সরাসরি সে প্রশ্ন করেছিল অমিয়দাকে—

'অমিয়দা আপনি তো আগে চাকরির কথা ভাবতেন না।'

অমিয়দা তার চোখে চোখ রেখে শূন্য দৃষ্টিতে বলেছিলেন 'না'।

'আপনি সে সময় বলতেন চাকরি মানেই যুতে জুড়ে যাওয়া। স্বতন্ত্রতা বলে কিছু থাকে না। তখন নিজস্ব ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন মূল্যই থাকে না।'

'হ্যাঁ বলতাম।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বলেন 'কিন্তু অনির্বাণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই বদলায়।'

আপনি তো কমার্শিয়াল কাগজের ধার কাছ দিয়েও যেতেন না। কিন্তু...

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অমিয়দা বলেন 'এখন কমার্শিয়াল কাগজেই চাকরি করছি, এই তো?'

'হ্যাঁ'।

'আচ্ছা অনির্বাণ তুমি কি করো?' আচমকা এরকম প্রশ্নে সে চমকে যায়।

'আমি···আমি গোটা তিনেক টিউশন করি। আর লেখালিখি নিয়েই আছি। আমাদের ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিনটা সম্পাদনা করি।'

'স্বপ্ন দেখো?'

'হ্যাঁ, মানে···'

সেদিন সে অমিয়দার প্রশ্নটার অর্থই ধরতে পারে নি।

আর একই সন্ধ্যেয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হতে সে বেশ গর্বিত স্বরেই বলেছিল 'অমিয়দাকে আজ সরাসরি প্রশ্ন করেছিলাম।'

'কি বললো।' অনিন্দ্যর প্রশ্নে কোন জিজ্ঞাসা ছিল না। যেন সমস্ত কিছুই তার জানা।

তার উৎসাহ কমে যায়। তবু বলে 'বললো সময়ের সঙ্গে অনেক কিছুই বদলায়। তারপর সবটাই হেঁয়ালি।'

'অমিয়দার হেঁয়ালি করা ছাড়া কোন উপায় নেই। কি বলবে? তুই জানিস উত্তর পাবি না তবু প্রশ্ন করতে গেছিস।' প্রণব বলে।

তবু তার মাথায় প্রশ্নগুলো ভীড় করে থাকে। নষ্ট হতে থাকে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব, ঘনিষ্টতা। যোগাযোগটা কমতে কমতে একদিন শেষ হয়ে যায়। তারাই সমস্ত সম্পর্কটা শেষ করে দেয়। ম্যাগাজিনে অমিয়দার লেখা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

(২)

তাদের ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিনটা কিছু দিন আগে পর্যন্ত নিয়মিত প্রকাশিত হত। কিন্তু শেষ কয়েক সংখ্যা থেকে অনির্বাণ ক্লান্ত হতে শুরু করেছে। সে সময় তার মনে হতে থাকে কাগজের জন্যে প্রত্যেকে দায়িত্ব অনুভব করছে না। সবার কাছেই কাগজ তার গুরুত্ব হারাচ্ছে। এটা এখন আর তাদের অস্তিত্বের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত নয়, একদিন যেমন বলেছিল প্রত্যেকে। এখন সব দায়ই যেন তার। অথচ এভাবে কাগজ করার অর্থ কি? আগে কাগজ বেরোবার সময় তারা বন্ধুরা সবাই এক সঙ্গে প্রতিটি লেখা নিয়ে আলোচনা করত। এখন অনেকে আসার সময় পায় না। এলেও অনেকটা সময় কেটে যায় প্রত্যেকের ব্যক্তিগত-সমস্যা আলোচনায়। তারপর কেউ হয়ত বলে, 'অনির্বাণ, ইউ অ্যা এ গুড এডিটর। তুই যা ঠিক করবি তাই হবে।' প্রেসে মাঝে মধ্যে দু'একজন যায় তার সঙ্গে। তার কোন ঠিক নেই। আজ যে গেল পরের দিন সে সময় পায় না। প্রত্যেকের নিয়মিত সান্ধ্য আড্ডায় আসাটাও কমতে থাকে। অনির্বাণ মাঝে মাঝে একাই বসে থাকে বন্ধুদের দীর্ঘ প্রতীক্ষায়। এলেও কেউ আর তাদের নির্দিষ্ট সময়ে আসে না। আগে আগে দেরি হলে অনির্বান প্রশ্ন করত। এখন আর করে না। কেননা সে দেখেছে এসব প্রশ্নে বন্ধুরা অপমানিত বোধ করে। কোন বন্ধু হয়ত বলে, 'আড্ডা নিয়েও তুই ম্যানডেট দিবি অনির্বাণ!' কাগজটাও অনিয়মিত হয়ে যায়। অথচ কারো কোন প্রশ্ন নেই। মাঝে মধ্যে কেউ হয়ত বলে, 'কাগজটা আবার নিয়মিত করতে হবে অনির্বাণ।' সে কোন উত্তর দেয় না। কেননা এ সমস্ত কথায় উত্তর দেওয়া আর না দেওয়া দুইই সমান। তা ছাড়া তার মনে হয় কেউই আর দায়িত্ব থেকে এ সমস্ত কথা বলে না। প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত-সমস্যার জালে জড়িয়ে পড়ে। বিপুল চাকরি পেয়েছে। সারাদিন চাকরির পর সন্ধ্যেবেলা অনীতার বাড়ি যায়। শ্যামল বেকার কিন্তু সন্ধ্যের দিকেই তার বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করার সময়। চন্দ্রানী টালিগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। তাই সারাদিনে তার সময় হয় না শ্যামলের সঙ্গে দেখা করার। অভয় সন্ধ্যেবেলা টিউশান নিয়ে ব্যস্ত। অনিন্দ্য একটা কমার্শিয়াল কাগজে চাকরি করে। প্রণব সেলসে। এমনি প্রত্যেকেই কোন না কোন ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত। সবাই একসঙ্গে মিলিত হয় খুব কম দিনই। আজ যেমন মিলিত হয়েছে। এই মিলনও যেন দৈবচক্রে। আসলে তার মনে

হয় কাগজের প্রতি কেউ আর দায়িত্ব অনুভব করছে না বলেই এই আড্ডা তাদের ক্লান্ত করছে। অনিয়মিত হয়ে যাচ্ছে। অনির্বাণ একমনে সিগারেট টানে। ভাবনার বুদবুদগুলো ধোঁয়ার রিং হয়ে আকাশে উড়তে থাকে। কাগজ বন্ধ হয়ে যায়। একটা ভেঙে পড়া অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার কোনো অর্থই খুঁজে পায় না অনির্বাণ। যদি আবার কখনো তারা একসঙ্গে দায়িত্ব অনুভব করে তখন ভাবা যাবে। এরকম চিন্তাই তার মাথায় পাক খায়।

এদিকে বেকার অবস্থাটাও ক্লান্ত করে অনির্বাণকে। এক এক সময় মনে হয় তার যেন কিছু করার নেই। সারাদিন বই পড়ে আর লেখালেখি করেও সময় কাটে না। গ্রন্থকীটের মতো সারাক্ষণ বইয়ের জগতে মুখ ডুবিয়ে পাতার পর পাতা কেটে যেতে আলস্য লাগে কেমন। আত্মরতি মনে হয় তার। সন্ধেবেলা আড্ডায় গিয়ে কোনদিন কাউকে পায় না। ফেরার পথে ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে।

পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থাও তাকে ভাবায়। আর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই বাবার অবসর নেওয়ার কথা। বাবার অবসরের দিন যত এগিয়ে আসে সমস্ত সংসারটা তত তাকে গ্রাস করে। মা একদিন তাকে বলেন, 'অনু, এবার একটু দায়িত্ববান হ। সংসারে তোর কি কোন দায়িত্ব নেই? তোর বাবার বয়স হচ্ছে, আর কয়েক মাস পরে রিটায়ার। এখনও তুই নিজেকে নিয়ে ভাববি না?'

মায়ের কথার অনেক অর্থই গুলিয়ে ফেলে সে। কোন কথা বলে না। দায়িত্বের কথাই ভাবে।

মা আবার বলেন, 'বয়স হচ্ছে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে তো। আমি তোর লেখালেখি সবকিছু ছেড়ে দিতে বলছি না। কিন্তু উপার্জনের একটা রাস্তাও তো করতে হবে। তোর কাজই যাতে করতে পারিস এমন একটা চাকরি খোঁজ না। তুইই তো বলিস, তোদের অমিয়দা কোন নিউজ হাউসে ভাল পোস্টে চাকরি করেন।'

'বলব' বলে সেদিন সে সরে আসে মায়ের কাছ থেকে। মা জানেন না অমিদার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই।

সে যায় না। কিন্তু তার মাথায় একটা চিন্তা পাক খেতে থাকে। তার আর্থিক প্রয়োজন আর বেঁচে থাকার মত একটা অবলম্বনের চিন্তা। চোখের সামনে তার সমস্ত স্বপ্নগুলো ভেঙে যাচ্ছে। একথা মনে হতেই সে বুঝতে

পারে অমিয়দার প্রশ্নটার অর্থ। অমিয়দা সম্পর্কে আবার একটা আকর্ষণ অনুভব করে। সে ঠিক করে অমিয়দার কাছে যাবে। আরও জানতে হবে অমিয়দাকে এবং একই সঙ্গে জানাতে হবে তার প্রয়োজনের কথা।

৩

মাস ছয়েক আগে সে একদিন সকালে অমিয়দার বাড়ি যায়।

ঢোকার আগে ভেতরে ভেতরে একটা অস্বস্তি কাজ করে। প্রায় বছর দেড়েক অমিয়দার বাড়ি যায়নি সে। বন্ধুরা তো আরও আগে থেকে। অমিয়দা ব্যাপারটাকে কী ভাবে নেবেন এই চিন্তাই পাক খায় তার মাথায়, সমস্ত পথ। তবু বাড়িতে ঢুকে ফ্ল্যাটের দরজার বেলে হাত রাখে সমস্ত অস্বস্তি ঝেড়ে ফেলে।

চাকর এসে দরজা খুলতে সে জিজ্ঞেস করে 'অমিয়দা আছেন?'

'আছেন।'

'বলুন অনির্বাণ এসেছে।'

চাকর ভেতরে চলে যেতেই তার বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে। সে এই দুর্বলতার কারণ বুঝতে পারে। আরও পরিবর্তন হয়েছে। ফ্লোর মোজাইক হয়েছে। বৈঠক খানায় বড় বড় সোফা। চেয়ার। একদিকে দেয়াল আলমারিতে ঠাসা বই। এগুলো আগে ছিল না।

'আরে অনির্বাণ কি খবর?' অমিয়দার প্রশ্নে সে চমকে তাকায়। দু'ধারে রগের ওপর চুলে সামান্য পাক ধরেছে।

'ভাল। আপনি কেমন আছেন?'

'চলে যাচ্ছে একরকম।'

কুশল বিনিময়ের পর সে কথা খুঁজে পায় না। কথা হাতড়ায়। এসেই এরকম হুট করে চাকরির কথা বলাও সম্ভব নয়। রোজের যাতায়াত থাকলে সেটা সম্ভব ছিল।

'তারপর, তোমরা তো আজকাল আমার সঙ্গে আর কোন যোগাযোগই রাখ না। অথচ আমি কিন্তু তোমাদের কথা বলি।'

'আমরাও আপনার কথা বলি অমিয়দা।' সে কথাটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে।

'হ্যাঁ জানি, তোমরা বল অমিয়দাটা বিকিয়ে গেছে।'

সে যেন চাবুক খায়। এতক্ষণের দুর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠে। তবু সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'এটা আপনার দুর্বলতা অমিয়দা।'

'হতে পারে। চারিদিকে এরকম কথাই শুনি। যাক ওসব কথা। তোমাদের ম্যাগাজিনের খবর কি? এখনো নিয়মিত বেরোচ্ছে?'

'না'। তার মুখটা বর্ণহীন ফ্যাকাসে দেখায়। বলে, 'ম্যাগাজিন বন্ধ হয়ে গেছে অমিয়দা।'

'কেন টাকা-পয়সার অভাব?'

'না, ঠিক তা নয়।'

'বিজনেস্ ওয়ার্লড সবকিছু গ্রাস করে নিচ্ছে, এই তো।'

'হ্যাঁ, তা একরকম বলতে পারেন।' ম্যাগাজিন বন্ধ হয়ে যাওয়ার সমস্ত ইতিহাসটা তার মনে পড়ে।

'আমি যদি বলি তোমাদের একাগ্রতা নষ্ট হয়ে গেছে। তোমরা আর দায়িত্ব বোধ করছ না। কাগজকে ঘিরে তোমাদের স্বপ্ন নষ্ট হয়ে গেছে…।'

সে বিস্মিত হয় অমিয়দার কথায়। উত্তর না দিয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে অমিয়দার দিকে। তার পর বলে, 'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। আর আপনার সেদিনের প্রশ্নের অর্থ অনেকটাই পরিষ্কার।'

'না এখনো জানো না অনেককিছুই। যাক্ ওসব কথা। চা খাবে?'

'হ্যাঁ।'

অমিয়দা ফিল্টার উইলসের প্যাকেট বার করে একটা সিগারেট ধরান। টেবিলের ওপর রাখেন প্যাকেটটা। আগে সে অমিয়দার প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে খেত। এখন কেন যেন নিতে পারে না। অফার করেন অমিয়দা। সে একটা সিগারেট টেনে নিয়ে ধরায়। কথা হাতড়ায়। একমনে সিগারেট টানে। অমিয়দা কোন কথা বলেন না। নিঃশব্দ কয়েক মুহূর্ত কেটে যাবার পর সে বলে, 'অমিয়দা আপনার কাছে এসেছিলাম…' মাঝপথে আটকে যায়।

'হ্যাঁ, কেন?'

সে তাও কোন কথা বলতে পারে না।

'বলো না। আমার কাছে এত সঙ্কোচ কেন?'

'আপনার তো অফিসে অনেক সোর্স…।'

চা আসে। চায়ে চুমুক দিয়ে অমিয়দা বলেন, 'চাকরি?'

'হ্যাঁ।'

'একটা অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে যেও। তবে এখনি হবে কি না বলতে পারি না।'

'না, না, আপনি চেষ্টা করবেন।'

'করব।'

চা শেষ করে অমিয়দা বলেন 'আজ আমার একটু কাজ আছে অনির্বাণ। তুমি পরশু অ্যাপ্লিকেশনটা নিয়ে এসো। সেদিন হাতে অনেকটা সময় আছে। তোমার সঙ্গে কথা বলা যাবে।'

সন্ধ্যেয় সে আড্ডায় গিয়ে দেখে প্রণব আর অনিন্দ্য বসে আছে। অনির্বাণ কাফেতে ঢুকে চায়ের অর্ডার দিয়ে তাদের বলে 'আজ সকালে অমিয়দার বাড়ি গেছিলাম।'

প্রণব আর অনিন্দ্য পরস্পরের দিকে তাকায়। তারপর প্রণব প্রশ্ন করে 'হঠাৎ?'

'একটা চাকরির জন্যে।'

'অমিয়দা তোকে চাকরি দেবে! তুই আর লোক পেলি না? অমিয়দাকে তুই আজও চিনলি না অনির্বাণ।' অনিন্দ্য বলে।

তার মনে পড়ে যায় তিন সাড়ে তিন বছর আগে অমিয়দা, অনিন্দ্যকে একটা প্রাত্যহিক সংবাদ পত্রের অফিসে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন। অনিন্দ্যর আজকের চাকরি সেই সূত্রেই।

'না, মানে যদি হয়।'

'যাক গে ওসব কথা। আর কি বলল?' প্রণব জিজ্ঞেস করে।

'কাগজের কথা জিজ্ঞেস করলেন।'

অনিন্দ্য আর প্রণব পরস্পরের দিকে তাকায় আর একবার। কিন্তু কেউ কোন কথা বলে না।

কিছুক্ষণ পরে প্রণব বলে, 'কাগজটা আবার বার করতে হবে অনিন্দ্য।'

অনিন্দ্য সায় দেয়।

অনির্বাণ কোনো কথা বলে না।

যেদিন অনির্বাণের দরখাস্ত নিয়ে যাওয়ার কথা সেদিন সকালে কাগজে অমিয়দার ক্যাবারে ড্যান্সের ওপর লেখাটা বেরোয়। অনির্বাণ লেখাটা পড়ে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। প্রথমে ভাবে যাবে না। কিন্তু আদর্শ আঁকড়ে স্বপ্নের জগতে বসে থাকাও তার পক্ষে আজ আর সম্ভব নয়। বাস্তবকে ফেস করতেই হয়। কেননা সামাজিক জীব হিসেবে সংসার বাঁচানো, টিকিয়ে রাখাও তো এক আদর্শ। সে তাই অমিয়দার বাড়ি যায় অ্যাপ্লিকেশনটা নিয়ে। রাস্তায় সে ঠিক করে আজ অমিয়দাকে আক্রমণ করবে।

অ্যাপ্লিকেশনটা অমিয়দার হাতে দেওয়ার পর সে বলে, 'আজকের কাগজে আপনার লেখাটা পড়লাম।'

'আরে ওসব কাগজে লেখার কথা ছাড়ো।'

'অমিয়দা আপনি অনেক বদলে গেছেন।'

'বদল হওয়াটাই তো মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক।'

'না আমি সে কথা বলছি না। আমি ভাবতে পারি না আপনি ক্যাবারে ড্যান্সের ওপর লিখছেন। আপনি এসব বিশ্বাস করেন?'

'ওটা আমার লেখা নয়।'

'আপনার নামই তো দেখলাম।' সে ধাঁধায় পড়ে যায়। ভুল দেখেছে কি না।

আর এ চিন্তার থেকে অমিয়দা তাকে নিরস্ত করেন, 'হ্যাঁ, আমারই নাম।'

'তবে—?'

'কাগজে চাকরি করতে চাইছো তো। ঢোকো, সব জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

'আমি আপনার কাছে শুনতে চাই।'

'তোমাকে একবার চাকরি প্রসঙ্গে একটা কথা বলেছিলাম, মনে আছে?' তারপর কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়ে অমিয়দা বলেন, 'বলেছিলাম, চাকরি মানেই নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোন মূল্য থাকে না।'

'হ্যাঁ।'

'প্রত্যেকটা কাগজেরই গাইড লাইন থাকে। সেগুলো তাদের বিজনেস পলিসির সঙ্গে যুক্ত।'

সে-যেসব প্রশ্ন করবে ঠিক করেছিল সেগুলো তার মাথায় কেমন যেন জট পাকায়। সে বলে, 'অমিয়দা আপনাকে কিছু পুরোনো প্রশ্ন করব?'

'বল।'

'আপনার লেখায় আমাদের সময়-জীবন উঠে আসে না কেন?'

'দেখো অনির্বান, যে কোনো লেখাতেই তার, লেখকের, সময়-জীবনের ছাপ পড়তে বাধ্য। সে তো আর অন্য সময়ের মধ্যে বা জীবনের বাইরে বাস করে না।'

'আপনার লেখার পার্টির কথা পাই না কেন? আপনি একটা এত বড়ো ইতিহাসের সাক্ষী হয়েও…

অমিয়দা তার কথা টেনে নিয়ে বলেন, 'পার্টির কথা বললেই কি রাজনীতির কথা বলা হয়?'

'আপনার সব লেখাই প্রেম, সেক্স আর বিপ্লবের ককটেল।'

'দেখো, তোমরা যেভাবে জীবনকে দেখো আমি যেভাবে দেখিনা। মানুষের জীবন আসলে এমন ককটেলই। কোনটা বাদ দিয়েই তার জীবন নয়। প্রেম, সেক্স মানেই খারাপ এ ধারনা জন্মাল কি করে? যে মানুষটা বিপ্লব করে তার কি প্রেম করা সাজে না কিংবা তার কি যৌন জীবন নেই? স্বপ্ন, প্রেম এগুলো না থাকলে বিপ্লবের থাকে কি? আসলে আমি বিষয়টা কীভাবে উপস্থাপন করি তার ওপরেই নির্ভর করছে সবকিছু।'

'কিন্তু আপনি কি আপনার পুরোন আদর্শে বিশ্বাস করেন? আপনি যেভাবে চাকরি নিলেন তা আপনার মতো আদর্শবাদী লোকের কাছ থেকে আমরা আশা করি নি।' বুঝতে পারে ভেতরে ভেতরে সে উত্তেজিত হয়ে উঠছে। একথা না বললেই হ'ত। সে অস্থিরতা অনুভব করে।

অমিয়দা কয়েক মুহূর্ত বাকহীন বসে থেকে বলেন, 'অনির্বাণ তোমাকে একটা পুরোন গল্প বলি শোন।' অমিয়দার দৃষ্টিতে শূন্যতা। কোথাও যেন দূরে ভেসে গেছে তার দৃষ্টি। 'ভেবেছিলাম বলব না। তোমরা, অন্তত আমার কাছের যারা, তারা বুঝতে পারবে।' অমিয়দা একটা সিগারেট ধরান। সে নিস্তব্ধ বসে থাকে।

'জেল থেকে বেরোলাম। পার্টির অবস্থা তখন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। জেলের মধ্যেই বুঝতে পারছিলাম আমাদের পার্টি টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে আমার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে গেছে। তখন আর স্বপ্ন দেখি না। আর এখন যা দেখছো তা স্বপ্নহীন কাজ। শুধু আমার নিজস্ব লেখার জগত ছাড়া। জেল থেকে বেরিয়ে পার্টির এই ভেঙে পড়া অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার

কোন অর্থই খুঁজে পেলাম না আমি। অন্তত আমার কাছে রইল না। এদিকে দু'ভাইই প্রতিষ্ঠিত। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। ভাইদেরও। বুঝলাম সংসার তার আপন নিয়মে এগিয়ে চলেছে। আমার জন্যে অপেক্ষা করে নেই। আমার জন্যে ভাইদের প্রতিষ্ঠার পথে অনেক বাধাও এসেছে। বেগ পেতে হয়েছে চাকরি পাওয়ার জন্যে। আমার আত্মগোপনের সময় দিনের পর দিন তাদের পুলিশি জুলুম আর ক্ষমতাসীন ক্ষমতালোভী দলগুলোর দলবদ্ধ অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে। তার ওপর আমি বেকার। তার সব সময় আতঙ্ক থাকত। আবার যদি আমি কিছু করি তো তাদের আরও প্রতিষ্ঠার পথে বাধা হব। তারা ঠিকমত আমাকে গ্রহণ করতে পারে নি। তাদের ধারণা এ সমস্ত ইউটোপিয়া। একদিকে আমার স্বপ্ন, পার্টি, ভেঙে টুকরো টুকরো, অন্যদিকে আমার জন্যে পরিবার বিপন্ন, তাই সংসারেও আমার স্থান সংকীর্ণ। কেননা ভাইরা তখন আরও প্রতিষ্ঠার পেছনে দৌড়চ্ছে। আমার জন্যে তাদের না আবার পিছিয়ে পড়তে হয়, এই ভয় সবসময়। একদিন মায়ের কাছ থেকে কিছু টাকা চাইলাম। মা দিতে পারলেন না। তার হাত বাঁধা জানি। কিন্তু তিনি যে কথা বললেন তার সারমর্ম এই যে, ভাইরা এভাবে দিনের পর দিন বেকার দাদাকে পুষতে পারবে না। তাদেরও সংসার আছে। আর পুরুষ মানুষ অর্থ উপার্জন করতে না পারা অযোগ্যতার নামান্তর। এ অবস্থায় একটা মানুষকে বাঁচতে গেলে যা হোক একটা কিছু আঁকড়ে বাঁচতে হয়। সেটা, ওই যে তোমরা কি বলো না, ব্যাড ফেইথ হলেও। কয়েক দিনের মধ্যে বাড়ি ছাড়লাম। কোথাও জায়গা নেই। প্রবাল, আমাদের কাগজের এডিটর, আমার অনেক দিনের পুরোন বন্ধু। তার বাড়িতে গেলাম, কয়েক দিন থাকার জন্যে। তখনও চাকরির কথা জানতাম না। প্রবালই আমাকে তাদের কাগজে জয়েন করতে বলল। কেননা প্রবাল আমার লেখার সঙ্গে অনেকদিন পরিচিত। বেঁচে থাকার মত একটা উপকরণ পেলাম হাতের কাছে। এখন প্রত্যেকেই, এমন কি বাড়ির লোকেরাও আমাকে সমীহ করে, জানো তো।' এই পর্যন্ত বলে অমিয়দা থামলেন। আর একটা সিগারেট ধরালেন। সেও একটা ধরাল।

'কিন্তু আপনি তো আপনার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্যে আবার চেষ্টা করতে পারতেন। আবার নতুন করে শুরু করতে পারতেন।'

'আমার স্বপ্ন?' অমিয়দা উষ্মতা প্রকাশ করেন। 'আমার স্বপ্ন মানে

কি? আমার স্বপ্ন যদি তোমাদের স্বপ্ন না হয়, সকলের স্বপ্ন না' হয় তবে আমি একাই শুধু দায়িত্ব অনুভব করব? সে দায়িত্ব টেকেও না। আমার এই বয়সেও দায়িত্ব অনুভব করব? আর আমার পরবর্তী জেনারেশন, এই তোমরা, যাদের দায়িত্ব নেওয়ার কথা ছিল, যাদের আবার নতুন করে শুরু করার কথা ছিল, পুরোন ধ্যানধারণাকে ভেঙে দিয়ে, তারা কি করছ? তারা শুধু বসে বসে আমাদের ভুলের সমালোচনা করছ। নতুন করে চেষ্টা কর নি।

অমিয়দা তার কথা শেষ করেন। অনির্বাণ চাবুকের আঘাতে জর্জরিত মাথা নিচু করে বসে থাকে। সে কোন কথা বলে না। অমিয়দা আবার বলেন, 'অনির্বাণ, তোমরা একটা কাগজ চালাতে পারলে না!' তারপর হঠাৎই প্রশ্ন করেন, 'অনির্বাণ, তুমি দাবা খেলতে পার?'

অনির্বাণ বিস্মিত দৃষ্টিতে অমিয়দার দিকে তাকায়। প্রশ্নটার প্রসঙ্গ সে বুঝতে পারে না। তবু উত্তর দেয়, 'পারি।'

'তাহলে দাবার প্রতি আরও মনোযোগ দিও। মানে আমি মনোযোগ দিয়ে খেলাটা দেখার কথা বলছি।'

'হঠাৎ এ প্রসঙ্গ?' অনির্বাণের বিস্ময় কাটে না।

'লেনিনের "ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড টু স্টেপ ব্যাক" নিশ্চয়ই পড়েছ।'

'পড়েছি।'

'বইটা রণকৌশলের ওপর লেখা। আরও মন দিয়ে পড়বে।

কিছুটা সময় দুজনে চুপচাপ বসে থাকে। অনির্বাণের মাথায় দাবার প্রসঙ্গ আর লেনিনের বইটার প্রসঙ্গ জট পাকায়। অমিয়দা আবার প্রসঙ্গ বদল করে স্বাভাবিকভাবে বলেন, 'তোমাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে হয়ত অনির্বাণ, জার্নালিজমে এখন অনেক বেশি কম্পিটিশন।'

'করব।'

বাড়ি ফেরার পথে তার নিজেকে ভীষণ ক্লান্ত মনে হয়। দাবা খেলা আর লেনিনের বইয়ের প্রসঙ্গ তুলে অমিয়দা তাকে কি বোঝাতে চাইলেন? এর অর্থ কি? রণকৌশল? অমিয়দা কি নিজেকে আবার প্রস্তুত করছেন? সাময়িক পিছু হটা শুধু মাত্র, তার মতই। সারাদিন এই চিন্তার মধ্যে বিষন্ন সময় কাটে। সন্ধ্যায় সে আড্ডায় গিয়ে নিশ্চুপ বসে থাকে।

'কিরে অনির্বাণ তোকে খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে ?' শ্যামল জিজ্ঞেস করে।

'জানিস, আজ অমিয়দার কাছে তার পুরো ইতিহাস শুনলাম, মনটা তাই বিষণ্ণ।'

'কি বলল ?' অনিন্দ্য জিজ্ঞেস করে।

সে অমিয়দার বলা কথাগুলো সবই বলল। আর সমস্তটা শোনার পর প্রণব বলে, 'অমিয়দা ভাল গল্প বলতে পারে। আমরা যাইনি বলে দু'বছর ধরে এসব বানিয়েছে।'

'দেখ, একটা মানুষকে সম্পূর্ণ না জেনে তার সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা অনুচিত। আর আমাকে এসব বলে তার লাভ কি ? অমিয়দা আমাকে কিছু নাও বলতে পারতেন।'

'প্রত্যেকটা মানুষ যা কাজ করে তার পেছনে একটা যুক্তি তৈরি করে। আর সেটা করে নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে। নিজের কাজকে নিজের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্যে। আর সেটা কাউকে না কাউকে বলতেই হয়। দায়িত্ব যে যার নিজের প্রয়োজনেই অনুভব করে। আমরা দায়িত্ব পালন করিনি বলে একজন দায়িত্ববান মানুষ একথা বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন কি করে ? আর অমিয়দার ঐ লেনিনের গল্প তুই অনেকের কাছেই শুনবি। অনিন্দ্য ধীরে ধীরে কাউকে বোঝানোর ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে।

অনির্বাণ বলে, 'হ্যাঁ, হয়ত তাই। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের কাজের যুক্তি খুঁজি।'

'কিরে অনির্বাণ তুই কিছু বলছিস না ?'

প্রণবের কথায় অনির্বাণের চমক ভাঙে। সে এতক্ষণ স্মৃতির গভীরে ডুবে ছিল। ভীষণ ক্লান্তি নেমে আসে তার শরীর জুড়ে। সে বলে, 'আমার কি বলার আছে ?

'তোর কিছুই বলার নেই ?' অভয় প্রশ্ন করে।

'দেখ, এসব সমালোচনা আমার ভাল লাগে না।'

'আগে তো লাগত।' শ্যামল বলে।

'লাগত, এখন লাগে না।'

'কেন?', বিপুল জিজ্ঞেস করে।

'দেখ, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই বদলায়।'

'অমিয়দার মত কথা বলছিস!' অনিন্দ্য বলে।

'হয়ত।'

সে চায়ের টেবিল ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসে। সিগনাল পোস্টের লাল সংকেত অগ্রাহ্য করে গাড়ির জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সটান, ঋজু, পায়ে রাস্তা পার হয়।

তাস খেলা

(তামিল গল্প)

জয়কান্তন

অনুবাদ : ঝর্ণা ঘোষ

লেখক পরিচিতি

সমসাময়িক তামিল সাহিত্যে ডি. জয়কান্তনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জয়কান্তন একজন প্রতিভাবান লেখক, তা তামিল সাহিত্য রসিকগণ যে স্বীকার করেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর বিশেষত্ব : তিনি মানব চরিত্র বিশ্লেষণে বিশেষ পটু। বিশেষ করে মানুষের দুর্বলতা ও সামাজিক অনৈতিকতার ব্যাপারে তিনি বাতিকগ্রস্ত বললেও অত্যুক্তি হয় না। এবং হয়ত এই কারণেই তাঁর লেখা নিয়ে এমন সব বিপরীত মনোভাব ও সমালোচনা। কোন কোন সমালোচকের মতে জয়কান্তনের লেখা খুবই বাস্তবধর্মী, শক্তিশালী, তাঁর কলম আর শান দেওয়া ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণ, তাঁর চরিত্র বিশ্লেষণ। জয়কান্তন পঞ্চম দশকের শেষ দিক থেকে লিখছেন। তাঁর লেখা উপন্যাস ও ছোটগল্পের সংখ্যা মন্দ নয়। কিছু ছোটগল্প ইংরেজীতেও অনুবাদ হয়েছে।

ভয়েলের শাড়িটা দড়ি থেকে নামিয়ে গুছিয়ে পরে দেয়ালে যে আয়নাটা আছে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল চুল আঁচড়াতে। আঁচড়ানো হলে দেখে কপালের কুমকুমের ফোঁটাটা ঘামে লেপ্টে গেছে। আঁচলের একটা কোণ একটা আঙ্গুলে জড়িয়ে ফোঁটাটা চারদিক থেকে মুছে গোল করার আকারে ছোট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মনে একটা তৃপ্তির ভাব এল। চুড়ির বাক্সে থাকে লুকানো কিছু টাকা। তা থেকে গোটা কয়েক দু'টাকার নোট নিয়ে আঁচলে বেঁধে বেরোনর জন্য যখন প্রস্তুত তখন পায়ের দিকে শাড়িতে পড়ল টান। চেয়ে দেখে দেড় বৎসরের ছেলে রবি কাপড় ধরে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। পা দুটো অসাড় হওয়ায় নিজে থেকে দাঁড়াতে পারে না।

নীচু হয়ে ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে জানলার নীচের কাঠটায় বসিয়ে একটা পরিষ্কার সার্ট টেনে নিয়ে তাকে পরিয়ে দিল। চুলে হাত বুলিয়ে দেখে

একটু তেলের প্রয়োজন। হাতে সামান্য তেল নিয়ে চুলে মেখে আঁচড়িয়ে, আঁচল দিয়ে মুখটা মুছিয়ে যখন তাকে কোলে নিয়ে দেয়ালে ঝুলানো ঘড়িটার দিকে তাকাল তখন দুপুর দুটো। "এই ভরদুপুরে, গনগনে রৌদ্রে দুধের বাছাকে নিয়ে কি তুমি সিনেমায় চললে?"

শাশুড়ী অসন্তুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তা প্রকাশ করতে সাহস না করায় একটু হেসেই প্রশ্নটা করল। কারণ সরস্বতী আম্বাল জানে যে ছেলের বৌ খুব অল্পেতেই রেগে যায়।

"হ্যাঁ, যাচ্ছি। তাতে হয়েছেটা কি?"

"যাচ্ছ, যাও। কিন্তু এই গরমে, খট্‌খটে রৌদ্রে। বাছা তুমি কি ভাবছ যে আমি শাশুড়ীগিরি ফলাচ্ছি?"

"ফলালে তোমায় আটকাচ্ছে কে? কিন্তু তার আগে নিজের ছেলেকে শাসন কর। সে যাতে সত্যিকার পুরুষের মত ব্যবহার করতে পারে সেই শিক্ষা দাও।"

এমনি সব রূঢ় কথা জানকীর মুখ থেকে বেরোয়। সরস্বতী আম্বাল তা বেশীর ভাগ সময়ই মুখ বুজে সহ্যও করে; কারণ সে জানে যে জানকীর এই দুর্ব্যবহারের পিছনে রয়েছে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা। তাও একবার এমনি এক পরিস্থিতিতে সরস্বতী আম্বাল জানতে চেয়েছে "আমার ছেলে এমন কি করেছে যে এতদিন তার সাথে ঘর করে, এক সন্তানের জন্ম দিয়েও তুমি তাকে সহ্য করতে পার না?"

"এমন ছেলের যে জন্ম দিয়েছ তাতেই তোমার শাস্তি হওয়া উচিত। তার উপর একটা নিরীহ নিরাপরাধ মেয়ের জীবন নষ্ট করেছ, তার জন্য যে তোমার কি সাজা পাওয়া উচিত তা আমার জানা নেই।"

"বাছা, তোমার এই গঞ্জনা আমার পাওনা জানি। কিন্তু নিজের গর্ভকে অভিশাপ দেওয়া ও চোখের জল মোছা ছাড়া যে আমার আর করার কিছু নেই।"

ছেলে কোলে করে বেরিয়ে গেল জানকী। সরস্বতী আম্বাল ভাবল বলে, "সিনেমায় যে যাচ্ছ, তোমার স্বামীর অনুমতি নিয়েছ?" কিন্তু কি ভেবে আর মুখ খুলল না। এমনি কথাই বোধ হয় জানকীর মনেও হয়েছিল তাই সে পিছন ফিরে তাকিয়ে বিদ্রূপের স্বরে বলে উঠল, "স্বামীই বটে।"

সরস্বতী আম্বাল দরজায় দাঁড়িয়ে ছেলের বৌয়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

দেখছে যে মাসের দুপুরের কাঠফাটা রৌদ্রে জানকী খালি পায়ে পীচগলা রাস্তায় হাঁটছে। একি শুধু জানকী সিনেমা পাগল বলে?

যারা বিকলাঙ্গ তাদের মধ্যে সাধারণত একটা নিরাশ ভাব বাসা বাঁধে আর তাতে তারা মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে ছোটখাটো কারণেও। জানকীর মধ্যে যে অতৃপ্তি, কোন স্বপ্ন সফল না হওয়ার যে ব্যথা জমেছে তাতে সেও এমনি ক্ষেপে ওঠে অল্পতেই। এটা হঠাৎ করেই তার মধ্যে চাড়া দিয়ে ওঠে। তখন তাকে এমন কিছু করতে হয় যাতে সেই ভাবটা কমে আসে। সন্দেহ নেই যে একটা চাহিদা তার জীবনটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে এবং এই রগচটা ভাবটা তারই প্রতিক্রিয়া মাত্র।

ছেলের বৌ দৃষ্টির বাইরে চলে যাওয়ার পর সরস্বতী আম্বাল ঘরে ঢুকল। ঢুকতেই ছেলের বিয়ের সময়ের ফটোটায় চোখ গেল। ওই তো তার ছেলে শিবস্বামী। ছেলের ফটোর দিকে তাকিয়ে মায়ের মনে কোন আনন্দ হলো না। সদ্য যৌবনপ্রাপ্তা সুন্দরী জানকীর পাশে শিবস্বামী দেখতে ঠিক যেন একটা কাকতাড়ুয়া। বেঁটে, জানকীর কাঁধ পর্যন্ত পৌছয় কিনা সন্দেহ। মুখে একটা বোকা হাসি। ফটোতে বিশেষ ভাবে তার উঁচু দাত ও কুঁতকুতে চোখই দেখা যাচ্ছে যার জন্য খুবই কুৎসিত লাগছে তাকে দেখতে। "বেচারী জানকী।"

বিয়ের আগে কত স্বপ্নই হয়ত বাসা বেঁধেছিল মেয়েটার। কিন্তু শিবস্বামীর স্ত্রী হয়ে আজ সে-সবই পুড়ে ছাই।

"সব দোষ আমার। নিজের সন্তান বলে এমন একটা সুন্দরী মেয়েকে তার সাথে বিয়ে দিয়ে মেয়েটার জীবনটাই নষ্ট করে দিয়েছি।" স্বগতোক্তি করতে করতে চোখ মুছল সরস্বতী আম্বাল। শিবস্বামীর সাথে জানকীর বিয়েতে পাড়াপ্রতিবেশীরাও খুবই অবাক হয়েছিল। সুন্দরী জানকীর সাথে কিনা শিবস্বামীর বিয়ে! যে শিবস্বামীকে দেখলে পাড়ার ছেলেমেয়েরা সুর করে চিৎকার করে খেপায়, "হাঁদা শিবস্বামী। খেপা শিবস্বামী, পিট্‌পিটে চোখো শিবস্বামী, জাপানী শিবস্বামী।" এইসব নাম ধরে যখন ছোট ছেলে মেয়েরা তার ছেলেকে ডাকে তখন সরস্বতী আম্বালের বুকটা পুড়ে যায়, কিন্তু তা বন্ধ করতে তো সে পারে না।

জানকী সুন্দরী কিন্তু গরীব ঘরের মেয়ে তাই এই বিয়ে সম্ভব হয়েছিল। প্রথমদিকে সবচেয়ে খুশী হয়েছিল সরস্বতী আম্বাল। কিন্তু কিছুদিন পর সে

তার ভুলটা বুঝতে পারে। এ তো শিবস্বামী নামক এক হাঁড়িকাঠে জানকী নামের মেয়েটার বলি ছাড়া আর কিছুই নয়। খুব বেশী সময় লাগলনা জানকীরও তার স্বামীকে চিনতে। শিবস্বামী দেখতেই শুধু কুৎসিত নয় স্বভাবেও সে ভীষণ বদরাগী। তার অত্যাচার এক এক সময় এমন সীমানা ছাড়িয়ে যায় যে জানকী ভেবেছে আত্মহত্যার কথা। কিন্তু সরস্বতী আম্বালের মমতা, স্নেহ, সহানুভূতি এমন একটা মর্মান্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

ছেলের জন্মের পর অবশ্য জানকী বেঁচে থাকার একটা অর্থ খুঁজে পেয়েছে। মা হওয়ার পর থেকে তার মধ্যে একটা বেপরোয়া ভাবও এসেছে। মনে করে সে ভবিষ্যতে ছেলে বড় হলে তার এই অন্ধকার জীবনে একটু আলো দেখা দেবে। এমন একটা আশা মনে বাসা বাঁধার পর সে বাড়ির লোকেদের অবজ্ঞা করতেও ভয় পায় না। মনে প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা তাদের উপর, যারা তার জীবনে ব্যর্থতা ও শূন্যতার জন্য দায়ী। শিবস্বামী এত সব বুঝতে পারে না। তবে সে জানে স্ত্রীর ওপর তার অধিকার আছে। আর এই অধিকার ও প্রভুত্ব ফলায় অমানুষিক অত্যাচার করে। জানকী আর চুপ করে সহ্য করে না। সেও কটুবাক্যে তার অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়। শিবস্বামী সেইসব শ্লেষ মাখানো কথার অর্থ ধরতে পারে না ঠিকই কিন্তু তাতে সে আরো রেগে অত্যাচারের মাত্রা বাড়ায়।

এমন সব অবস্থায় জানকীর বেশী রাগ হয় সরস্বতী আম্বালের উপর আর তখন সে শাশুড়ীর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে, "তোমার ওই কার্ত্তিকের মত সুন্দর ছেলের বৌ করে এনেছিলে যাতে সুখী হও। দেখ, দেখে আনন্দ কর।"

শাশুড়ী তখন দূরে সরে যায়। জানে যে জানকীর সব অভিযোগ সত্যি। বৌয়ের রাগ যতক্ষণ না পড়ে ততক্ষণ সে বিষোদ্গার করবে। অবশ্য খুব কম সময়ই জানকী এমন ফেটে পড়ে। বরং শিবস্বামীই সারাক্ষণ গালাগালি করে সে কেউ তাতে কান দিক আর না দিক।

অফিস থেকে ফিরে ছেঁড়া মাদুর ও এক তাড়া তাস হাতে নিয়ে শিবস্বামী বাড়ির দাওয়ায় গিয়ে বসে তাস খেলতে। পাড়ার কয়েকজনের সাথে প্রত্যেকদিন এসে যোগ দেয় তাম্বরসের রামভদ্রন। এই রামভদ্রন তাস খেলে যতক্ষণ না কেউ তাকে মনে করিয়ে দেয় যে তাম্বরসের লাষ্ট ইলেকট্রিক ট্রেন ছাড়তে আর কয়েক মিনিট বাকী।

এদিকে সন্ধ্যা আটটা বাজলেই জানকী ছেলেকে কোলে নিয়ে শুয়ে পড়ে সংসারের কোন কিছুর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে। এই তার দৈনন্দিন রুটিন। তাই বাধ্য হয়ে সরস্বতী আম্বালকে ছেলের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। চৌকাঠে মাথা রেখে শুয়ে সে ঘড়ির শব্দ শুনে যায়। তারপর সাড়ে দশটা বাজলে ছেলেকে মনে করিয়ে দেয়, "শিবস্বামী, দশটা চল্লিশ হতে চলল যে।" তখন শিবস্বামী খেলা বন্ধ করে, তাস গুটিয়ে উঠবে তার আগে নয়।

"কি ব্যাপার আম্মা? ফটোটার মধ্যে ডুবে গেছ মনে হচ্ছে। ছেলের আবার বিয়ে দিতে ইচ্ছে বুঝি?" কথাগুলোর শব্দে সরস্বতী আম্বালের সম্বিত ফিরে এল। শুনতে পেল ছেলে বলছে "আমারও খুব ইচ্ছা করে। আচ্ছা এখন চার কাপ কফি করে দাওতো।"

সরস্বতী আম্বাল বলল, "বসাচ্ছি, কিন্তু দুধওয়ালা এখনও আসেনি। এলে পাবে কফি," বলে মুখটা কালো করে সে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল। ছেলের এই তামাসা তার ভাল লাগে না। বারান্দায় এর মধ্যেই তাস বাটা আরম্ভ হয়ে গেছে। মাকে রান্নাঘরে যেতে দেখে শিবস্বামী শুধলো, "জানকী কোথায়?"

"সিনেমায় গেছে।"

"কার অনুমতি নিয়ে?"

"কার অনুমতি নিতে হবে আবার? আমায় বলে গেছে।"

"দিন দিন বড় বাড় বাড়ছে। এই গরমে তাকে সিনেমায় যেতে হলো। সাথে আবার পঙ্গু ছেলেটাকে নিয়ে গেছে। আসুক ফিরে, এমন শিক্ষা দেবো! শিবস্বামী হম্বিতম্বি আরম্ভ করে দিল দেখে সরস্বতী আম্বাল বলল, "গেছে তো দোষটা কি হয়েছে শুনি? এই অসহ্য গরমে ঘরে বসে সেদ্ধ না হয়ে সিনেমায় আমিই যেতে বলেছি।"

"বেশ, বেশ, যেখানে খুশী যাক। আমার কি?"

এর মধ্যে একজন বলে উঠল "রামভদ্রন আজও এল না যে? ব্যাপার কি?" অন্য আর একজন তাতে উত্তর দিল, "আসে নি তো হয়েছে কি? চারজন তো আছি। না এলে ক্ষতি তো হচ্ছে না। নাও কাট তাস।"

তাস কেটে বিলিয়ে দিতেই খেলা আরম্ভ হয়ে গেল।

* * *

রূপালী পর্দায়ই কি শুধু এমন আদর্শ দম্পতির দেখা পাওয়া যায়। দু'জনে

কেমন মনের আনন্দে হেসে, খেলে, নেচে, গেয়ে সময়টা কাটিয়ে দিল। এমন আনন্দ কি একমাত্র সিনেমার পর্দায় থাকার কথা ? ছেলে কোলে জানকী যখন সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে আসছে তখন এই সব চিন্তা তার মনে ঘুরপাক খেতে আরম্ভ করল। পাশেই একটা সিল্কের শাড়ির কড়কড়ে আওয়াজ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে এক তরুণ দম্পতি। স্ত্রীকে ভিড় থেকে বাঁচানোর জন্য স্বামীর একটা হাত রয়েছে স্ত্রীর কোমরে আর স্ত্রী স্বামীর গা ঘেঁসে মুখটা হাতে চেপে এগিয়ে চলেছে। সার্ট, ট্রাউজার্সে বেশ স্মার্ট বলতে হয় ছেলেটিকে। মেয়েটি নিশ্চয়ই সুখী। এমন হয়ত অনেকে আছে যারা বিবাহিত জীবন সুখে কাটাচ্ছে। আমার মত পোড়া কপাল নয় সবার। জগতে যে কোথাও সুখ আছে তা এই দুর্বিসহ জীবনে কল্পনায়ও আসেনা।" এই সব কথা মনে হতে তার বুকের ভিতরটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল আর চোখ ভরে গেল জলে। সিনেমায় গিয়ে সবাই যখন নায়ক নায়িকার প্রেম দেখে অভিভূত, যখন সামনের সারিতে বসা কিছু দর্শক শিস দিয়ে তাদের উত্তেজনা প্রকাশ করে, তখনও জানকীর ভিতরটা কুরে খায় এক হতাশা ও রিক্ততার ব্যথা। পর্দায় প্রেমের লীলাখেলা তার চোখে জল আনে। জীবনে সে কিছুই পেল না এক নৈরাশ্য ছাড়া। এই ব্যথার কিছুটা লাঘব হয় চোখের জল ও দীর্ঘশ্বাসের মাধ্যমে। আর তাতে মনে আসে সাময়িক শান্তি। মনোকষ্ট ভুলে থাকতেই সে ফিল্ম দেখা আরম্ভ করেছিল, কিন্তু বুঝতে পারে নি কবে সেটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হল থেকে বেরিয়ে রাস্তার অপর পারে যে রেষ্টুরেণ্টটা আছে সেখানে গিয়ে ঢুকল। একটু নিরিবিলি দেখে একটা টেবিল বেছে নিয়ে একটা মিষ্টি ও কফির অর্ডার দিল। বয় তা দিয়ে গেলে মিষ্টিটা টুকরো করে ছেলের মুখে দিয়ে কফিটা নিল বাটিতে ঢেলে ঠাণ্ডা করার জন্য। আর তখনই অনুভব করল কেউ তারদিকে তাকিয়ে আছে। শিবস্বামী কি? মনে হতেই চোখ তুলল আর তাতেই হলো চোখাচোখি।

একে কোথায় যেন দেখেছে। মুখটা চেনা মনে হচ্ছে। একটু সময় নিল চিনতে। তার স্বামীর সাথে যারা তাস খেলে তাদের একজন, রামভদ্রন। জানকীকে তাকাতে দেখে রামভদ্রন একটু মৃদু হেসে পরিচয়টা যেন পাকা করল। উত্তরে জানকীর ঠোঁটেও খেলে গেল মৃদু হাসি। এই প্রথম জানকী

রামভদ্রনকে এত কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছে। চেহারা বেশ ভালই বলতে হয় তায় মার্জিত বাবুয়ানা।

কিছুদিন ধরে রামভদ্রন জানকীর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছে। খাওয়া শেষে হাত ধোয়ার জন্য উঠতেই রামভদ্রন জানকীর টেবিলের দিকে এগিয়ে এল যেন কতকালের পরিচয়।

"ফিল্ম দেখতে যাচ্ছ ?"

"দেখে ফিরছি।"

তখন ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রামভদ্রন জানতে চাইল, "কি খোকা, তুমিও গিয়েছিলে ফিল্ম দেখতে ? ছবি ভাল ছিল ?" বলে ছেলেকে তুলে টেবিলের উপর দাঁড়া করিয়ে দিতেই ছেলেটার পা দুটো গেল বেঁকে।

"ও দাঁড়াতে পারে না ?"

"না, বয়স প্রায় দেড় হয়ে গেল কিন্তু এখন পর্যন্ত পারে না। কত ওষুধ, কত টনিক খাওয়াচ্ছি, কিন্তু কোন ফল তো হচ্ছে বলে মনে হয় না। প্রতিবেশীরা বলে শরীরে পুষ্টির অভাব। কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি নেই। এর মধ্যেই ওর বাবা ওকে পঙ্গু বলে ডাকতে আরম্ভ করেছে। আমার এত ভয় হয় শেষ পর্যন্ত না সত্যি করেই ও পঙ্গু হয়ে যায়।" "ভয় পাচ্ছ কেন ? দুর্বলতা বলেই তো মনে হচ্ছে। সময়ে নিশ্চয়ই সেরে উঠবে আর হাঁটতেও পারবে। খোকা তোমার আপ্পা যদি আবার তোমায় পঙ্গু বলে তাহলে কি বলে উত্তর দেবে জান ? বলবে তোমার মত নই।" কথাগুলো বলল সে ছেলেটাকে কিন্তু চোখ ছিল জানকীর দিকে। বলেই এমন হাসল যে তা দেখে জানকীর ভিতরে কথাগুলো কাঁটার মত বিঁধল। তা সত্ত্বেও সে অর্থটা হালকা করার জন্য হাসিতে যোগ দিল।

বয় এল বিল নিয়ে। "আমি দিচ্ছি" বলে রামভদ্রন যেমন হাত বাড়াল বিলটা নিতে তেমনি জানকীও সেটার জন্য হাত বাড়াল আর তাতে মুহূর্তের জন্য দু'জনের হাতে হাত লাগতেই জানকীর মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। সে হাতটা সরিয়ে নিতেই হাওয়ায় বিলটা মাটিতে গিয়ে পড়তে রামভদ্রন সেটা কুড়িয়ে দাম মিটিয়ে দিল। জানকীর অস্বস্তি কিছুতেই যাচ্ছে না। এইটুকু সময়ের মধ্যে অন্য পুরুষের ছোঁয়া। ছেলে কোলে নিয়ে বেরিয়ে এলে রামভদ্রনও সাথে এল এবং তার সাথে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "দেখ তোমার ছেলেকে যদি প্রত্যেকদিন সমুদ্রের তীরের গরম বালিতে গর্ত করে তার মধ্যে

কোমর পর্যন্ত বালি চাপা দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখতে পার বেশ কিছুক্ষণের জন্য, তাহলে দেখবে মাস খানেকের মধ্যে সে হাঁটতে আরম্ভ করেছে।"

"সত্যি।"

"নিশ্চয়। চেষ্টা করে দেখ না। বাড়ি ফেরার তাড়া আছে কি? কি খোকা, সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাবে?" যদিও ছেলেকে প্রশ্নটা করল, কিন্তু তাকালো মায়ের দিকে।

জানকী না বলতে গিয়েও পারলনা। এই মানুষটার সাথে কথা বলে, তার হাসি দেখে জানকীর মনে এমন একটা উত্তেজনা ও আনন্দ হচ্ছে যে সেটার জন্যই সেও ছেলেকে শুধোলো "সমুদ্রের ধারে যাবে?" রামভদ্রন ও জানকী সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলল।

বিকেল হয়েছে। সূর্য তখনো অস্ত যায় নি। একটা নৌকার ছায়ায় বসে হাত দিয়ে গরম বালি সরিয়ে গর্ত করে তাতে ছেলেকে দাঁড় করিয়ে রামভদ্রন ও জানকী মুখোমুখি বসল কিন্তু মুখে কথা সরল না।

হঠাৎ জানকীর এমন কান্না পেল যে সে অনেক কষ্টে তাকে সামলে রাখতে হল। এমন একজন অচেনা অপরিচিতের সামনে চোখে জল, ভাবতেও যে লজ্জা। জানকী মুখ নীচু করে বসে আর রামভদ্রন আকাশের দিকে ভাব-লেশহীন চোখে তাকিয়ে রইল। একটু পর পর সে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে দেখে জানকী মুখ খুলল, "আজ শনিবার, অফিসের পর সোজা বাড়ি যাবার ইচ্ছা হয় নি?"

"আমার মনটা গেল কয়দিন খুব ভাল নেই। গত কয়দিন আমি অফিসেও যাই নি, বাড়িতেও না।"

"সে কি? এমন কাজ করবেন না। স্ত্রী বুঝি বাপের বাড়ি গেছে?"

"তা হলে তো খুবই ভাল হতো। সে বাড়িতে আছে বলেই আমার এই দুর্দশা। সারাক্ষণ জ্বালাতন করে মারে।"

"তার নামে এমন মন্দ কথা বলছেন কেন? একদিন আমাদের ওখানে ওকে নিয়ে আসুন না?"

"তা হলেই হয়েছে," রামভদ্রন যেন আঁতকে উঠল।

"আপনার স্ত্রীর সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে আপনার আপত্তি আছে দেখছি। আপনি কি ভাবছেন যে আপনার তাস খেলার কথা তাকে বলে দেবো? ভয় নেই, ও কিছু জানতে পারবে না।" আশ্বাস দিল জানকী।

"সত্যিই যদি তাকে দেখতে চাও তাহলে সে দেখতে কেমন বলছি। শিবস্বামীকে শাড়ি পরিয়ে দিলে যেমনটা হবে আমার স্ত্রী দেখতে প্রায় সেই রকম "কপাল কপাল." বলে রামভদ্রন হাত দিয়ে কপালটায় দুবার চাপড় মারল।

শোনামাত্র জানকী কেমন হয়ে যায়।

"ওকে বিয়ে করেছেন কেন তাহলে ?"

"ভাগ্য! ওর বাবা আমায় লেখাপড়া শিখিয়েছেন। বেশ ধনী ব্যক্তি তিনি। আর এই কন্যাই সব সম্পত্তির মালিক হবে একদিন।"

"তাহলে পুরোপুরি ক্ষতি হয়নি আপনার, কি বলেন? একদিক দিয়ে সান্ত্বনা পাবার কিছু কারণ আছে তাহলে," বলেই জানকী ঠোঁট চেপে ধরল যাতে আর কিছু না বলে ফেলে।

"যা বলতে চাইছিলে বলে ফেল না। কিছু মনে করবো না আমি।"

"ও কিছু না।"

"কিছু বলতে তো চাইছিলে। এখন সেটা লুকোচ্ছ। বলতে চাইছিলে বোধ হয় যে, আমাদের দুজনেরই ভাগ্য খারাপ তাই না? প্রথম যেদিন তোমায় দেখি সেদিন আমার ভিতরটাও তোমার অবস্থা কল্পনা করে কেঁদে উঠেছিল। ঠিক এই কথাই তুমিও আমায় বলতে চেয়েছিলে। তাই না?"

"হ্যাঁ…না দেখুন, আমার অবস্থা আপনার চেয়েও খারাপ। আপনি পুরুষ মানুষ। আর আমি মেয়েমানুষ বই ত নই। আপনি কৃতজ্ঞতা দেখাতে বিয়ে করেছেন। ভবিষ্যতে সম্পত্তির মালিক হতে পারবেন এই আশাও আপনার আছে। কিন্তু আমার কি আছে? কেন আমায় এমন ভাবে কষ্ট পেতে হচ্ছে?" দুঃখে গলা বুজে আসায় তার কথা আর শেষ হলো না।

কিছুক্ষণ কারো মুখে কোন কথা ফুটল না। বালিতে দাগ কেটে তারা। নিজের মধ্যে ডুবে রইল।

দু'জনেই তখন কল্পনার রাজ্যে। দু'জনেই তাদের স্ত্রী ও স্বামীর স্থানে বর্তমানে যে সামনে তাকে স্বপ্ন দেখতে চেষ্টা করছে। ফিল্মে যে নায়ক ও নায়িকাকে জানকী একটু আগে দেখে এসেছে, তারা জানকী ও রামভদ্রনের পাশেও দাঁড়াতে পারবে না।

"বয়স কত?" রামভদ্রন জানতে চাইল।

"চব্বিশ। আপনার?"

"সাতাশ।" বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস।

জানকীর ভিতরেও তোলপাড় আরম্ভ হয়েছে। দু'জনেই বালির উপর আঙুল দিয়ে আঁকিবুকি কাটছে। মনে যে চিন্তার ঝড় উঠেছে এ যেন তারই বাস্তবরূপ।

হঠাৎ জানকী শব্দ করে হেসে ওঠায় রামভদ্রন চমকে উঠল। জানকী মন্তব্য করল হেসে, "জীবনটা কেমন গোলমেলে। ঠিক আপনাদের তাস খেলার মত।

"কেমন সেটা?"

"আপনার হাতে যদি আপনার প্রয়োজনের সবগুলো তাস থাকে, আর আমার হাতে আমার প্রয়োজনেরগুলো, তাহলে তো কোন খেলাই সম্ভব নয়। নয় কি?

"জানকী, কি সুন্দর কথা তোমার!"

"জানকী ভাবল এই কথাগুলো যদি শিবস্বামী বলতে পারত তাহলে সে কী খুশিটাই না হতো!

রামভদ্রন একটু কাছে সরে এল। আবেগ ভরা গলা, চোখে জল ও হতাশা নিয়ে মন্তব্য করল, "জানকী, আমরা দু'জন কার্ড। শিবস্বামী আর লক্ষ্মী খেলোয়াড়। যে কার্ডের প্রয়োজন নেই তাকে সরিয়ে রেখে যার প্রয়োজন তাকে তুলে নেওয়ার নাম খেলা। জানকী তুমি বুদ্ধিমতী। বুঝতে পারছ আমি কি বলতে চাইছি?"

জানকী যখন এমন সুন্দর কথার মোহে চোখ বুজে তার স্বাদ নিতে ব্যস্ত তখন রবি রামভদ্রনের সার্টের হাতায় টান দিয়ে ডাকল, আপ্পা। চমকে জানকী চোখ খুলে বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে তাড়াতাড়ি ছেলেকে গর্ত থেকে বের করে কোলে তুলে নিল।

"ও তোমার আপ্পা নয় মাণিক, এ হল আঙ্কল। আপ্পা বাড়িতে আছে। চল যাই।"

"আপনার পরামর্শটা খুব ভাল বলে মনে হচ্ছে। কাজ হবে। এমনটা করলে আমার ছেলে নিশ্চয়ই মাসখানেকের মধ্যে হাঁটতে পারবে। আগামী কাল থেকে প্রত্যেকদিন আমি স্বামীকে সাথে নিয়ে এখানে আসব। তাতে সে এই তাসের নেশাটা ছাড়লে ছাড়তেও পারে।" হত বুদ্ধি রামভদ্রন তার পাশে হাঁটতে হাঁটতে জানতে চাইল, "তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ?"

"সে কি? কোন অধিকারের আপনার উপর রাগ করব? মনে পড়ে আমি তাসের খেলার কথা বলতে আরম্ভ করেছিলাম, সেটা কিন্তু শেষ হয় নি। আপনার বক্তব্য যে-আমার স্বামী ও আপনার স্ত্রী খেলোয়াড়, সেখানেই আপনার ভুল। তারাও তাস। ওই দুই কার্ডে কোন স্কোর হয়ত উঠবে না। বিধাতা হলেন খেলোয়াড়, মানুষ নয়। তাই তিনি একটা বাজে হাত খেলেছেন। এটা আমরা বলার কে?"

রামভদ্রন আশ্চর্য-"জানকী কি অদ্ভুত কথা তোমার।"

"কাল রবিবার। লক্ষ্মীকে নিয়ে অবশ্যই আমাদের বাড়ি আসবেন। অনেক কথা বলার আছে। বলছেন তো আমি খুব সুন্দর কথা বলতে পারি। লক্ষ্মীকে নিয়ে এলে তাকেও শিখিয়ে দেবো। রবি আঙ্কলকে "গুড্ বাই" বল। এবার আমরা ফিরবো," বলে বাড়ির দিকে পা চালাল।

গোধূলি এমন একটা আলো আঁধারের সংগম মুহূর্ত, যা দিনও নয়, রাত্রিও নয়। কিন্তু রাত্রি যে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে এই সত্যটাকে বোঝাতেই যেন রাস্তার সবগুলো আলো জ্বলে উঠল আর সমুদ্রের তীরের রাস্তাটা আলোকিত হয়ে গেল।

চারিদিক আলোকিত! একি শুধু বাইরের আলো মাত্র!

রাশিয়ায় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদঃ একটি ষড়যন্ত্রমূলক দলিল

তপন বসু

টনি ক্লিফ-এর লেখা "স্টেট ক্যাপিটালইজম ইন রাশিয়া" বই স্তালিনের যুগের সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার মূল্যায়নের নামে একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রাজনৈতিক দলিল বলে মনে হতে পারে।

মিঃ ক্লিফ তাঁর বইতে লিখেছেন, "বিপ্লবের অব্যবহিত পরে, এটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, প্রত্যেকটি কারখানার পরিচালনাভার থাকবে ট্রেড-ইউনিয়নগুলির হাতে। সেই অনুযায়ী রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম পার্টির কংগ্রেসে (১৮-২৩শে মার্চ ১৯১৯) গৃহীত কর্মসূচীতে ঘোষণা করা হয়ঃ

সামাজিক উৎপাদনের সংগঠিত হাতিয়ার প্রাথমিকভাবে নির্ভর করবে ট্রেড ইউনিয়নগুলির উপর…শ্রমিকদের অধিকাংশকে এবং যথাসময়ে উৎপাদনের সংশ্লিষ্ট শাখার সমস্ত শ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত করে বিশালসংখ্যক উৎপাদনের এককে তাদের অবশ্যই পরিবর্তিত করতে হবে।" এরপরেই লেখক অনাবশ্যক বৈরীতার দ্বারা পরিচালিত হয়ে স্তালিনের বিরুদ্ধে কল্পিত অভিযোগ দায়ের করে লিখছেন, "…১৯২৯-এর সেপ্টেম্বরে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত নেয় যে, শ্রমিক কমিটিগুলি কারখানা পরিচালনায় সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, অথবা কোনভাবেই কারখানা পরিচালন-সংস্থার বদল ঘটানোর চেষ্টা করতে পারবে না…।" ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিল থেকে এটা পরিস্কার জানা যায় যে, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত এই রকমই ছিল, "…পার্টির কমিটিগুলোর সঙ্গে আলোচনা ব্যাতিরেকে শ্রমিক কমিটিগুলোর তরফ থেকে এক-তরফাভাবে পরিচালন-সংস্থার রদবদল ঘটানো হবে নেহাৎ-ই হঠকারিতা।" পার্টির পক্ষে এই ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পেছনে যথেষ্ট সময়োপযোগী কারণ ছিল। কারণ তখন একদিকে চোদ্দটি ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের খল রাজনৈতিক নায়করা সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠেছে, অন্য-দিকে লিঁও ট্রটস্কির নেতৃত্বে রুশ পঞ্চম বাহিনী অতি তীব্র ঘৃণায়, অতি

কদর্য হিংসায় একের পর এক চালিয়ে যাচ্ছে মিথ্যা, কুৎসা, অন্তর্ঘাত ও গুপ্ত-হত্যার অতি বেপরোয়া অভিযান, আর একদিকে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রকাণ্ড কর্মযজ্ঞের মধ্যে নানান প্রতিকূলতার মোকাবিলা করতে গিয়ে জনসাধারণ হয়ে উঠেছেন চূড়ান্ত অধৈর্য—তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি প্রায়শই পরিচালনা ব্যাবস্থায় পরিবর্তনের নামে নানা অসুবিধা তৈরি করেছে এবং ফলত উৎপাদনে মন্দা দেখা দিচ্ছে। এই অবস্থায় শ্রমিক কমিটিগুলোর মধ্যে শৃংখলা ফিরিয়ে এনে সামগ্রিক সামাজিক উৎপাদনে মন্থর গতি রোধ করার উদ্দেশ্যে সোভিয়েত পার্টির পক্ষে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা মোটেই জনবিরোধী বা প্রতি-বিপ্লবী চক্রান্ত ছিল না। অথচ, গ্রন্থকার টনি ক্লিফ তাঁর পুস্তক মারফৎ শ্রমিক সাধারণকে বিশৃংখল ও হঠকারী হয়ে ওঠার পক্ষেই উস্কানি দিয়েছেন।

এই টনি ক্লিফ স্তালিনের আমলে সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রগতি সম্পর্কে লিখতে বাধ্য হয়েছেন, "আমলাতান্ত্রিক বিশৃংখলা ও অপচয় সত্ত্বেও জনগণের প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগ রাশিয়াকে শিল্পোৎপাদনের দিক থেকে ইয়োরোপে চতুর্থ এবং পৃথিবীতে পঞ্চম স্থান থেকে ইয়োরোপে প্রথম ও পৃথিবীতে দ্বিতীয় শিল্পোন্নত শক্তিতে পরিণত করেছে। সে তার পশ্চাৎপদতা থেকে একটা আধুনিক, শক্তিশালী, শিল্পোন্নতদেশে পরিণত হওয়ার দিকে পা বাড়িয়েছে।" স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে-দেশ ১৯২৭ সাল পর্যন্তও তার নড়বড়ে প্রযুক্তি নিয়ে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের চাপ ও আভ্যন্তরীণ অন্তর্ঘাতের ধাক্কায় জেরবার হয়ে যাচ্ছিল সেই দেশ ১৯২৮-২৯ সাল থেকে এত অগ্রগতি ঘটাল কি করে? ১৯৩৯ সালের ২৪শে আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে জার্মানির অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সময় থেকে ১৯৪১ সালের ২২শে জুন স্থানীয় সময় বেলা ৪টের সময় হিটলারের বিপুল বাহিনী বাল্টিক থেকে কৃষ্ণসাগর বরাবর সোভিয়েত ইউনিয়নের ২৫০০ মাইল এলাকায় ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে অবধি অর্থাৎ মাত্র ২২ মাসের সামরিক প্রস্তুতি নিয়ে তৎকালীন সর্বাধুনিক সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত দুর্ধর্ষ নাৎসী বাহিনীকে পর্যুদস্ত করা লালফৌজের পক্ষে সম্ভব হল কি করে? টনি ক্লিফ লিখেছেন, "জনগণের প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগ।" হ্যাঁ, অস্বীকার করার কোন উপায়ই নেই যে, একটি দেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে জনগণের প্রচেষ্টা ও ত্যাগ মস্ত ভূমিকা পালন করে, কিন্তু এটুকুই কি সব? তাহলে আবার প্রশ্ন জাগে, যে রুশি জনগণ জার সাম্রাজ্যবাদের মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে উৎখাত করে সমাজতন্ত্রের বৈজয়ন্তী উড়িয়েছিলেন ১৯২৭ সাল

অবধি সেই রুশি জনগণ কি ছিলেন কর্মবিমুখ? ১৯২৮-২৯ থেকে কি করেই বা তাঁরা আচমকা কর্মমুখর হয়ে উঠলেন? স্তালিনের নেতৃত্বে ও সোভিয়েত পার্টির পরিচালনাধীনে লেনিন রচিত 'নেপ' বা 'নিউ ইকনমিক পলিসি'র বাস্তব রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে সোভিয়েত জনগণ সে দিন যে বিস্ময়কর ইতিহাস রচনা করেছিলেন সেই ইতিহাস সৃষ্টির পেছনে আসল সত্যটাকেই চেপে গেছেন টনি ক্লিফ। ঠিক যেমন করে অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মিখাইল সের্গেইভিচ গরবাচভ 'পেরেস্ত্রৈকা ও নতুন ভাবনা' পুস্তকে ও ১৯৮৫ সাল থেকে শুরু করে তাঁর রাজত্বকাল অবধি অসংখ্য বক্তৃতা এবং প্রবন্ধে অনেক ঐতিহাসিক অবদানের কথা এড়িয়ে গেছেন—ভুল করেও অনেকের নামোচ্চারণ করেন নি।

মোদ্দাকথা লেখক টনি ক্লিফ এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে স্তালিনীয় আমলাতন্ত্রের কড়া চাবুক জনগণকে কর্মমুখর (!) ও আত্মত্যাগী (!) করেছিল এবং তার ফলেই রাশিয়ার অভূতপূর্ব শিল্পোন্নতি সম্ভব হয়। এটা কি সম্ভব?

টনি ক্লিফ স্তালিনের আমলে আপামর জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা-হীনতা ও শিল্পনীতিতে আমলাতান্ত্রিকতার উল্লেখ করে (?) লিখেছেন, "বিপ্লব পরবর্তী প্রথম কয়েক বছরে, আইনত ও বাস্তবত উভয়দিকে, ট্রেড-ইউনিয়নগুলিই ছিল মজুরীর হার নির্ধারণের একমাত্র অধিকারী। 'নেপ'-এর আমলে এগুলি নির্ধারিত হ'ত ট্রেড-ইউনিয়ন ও পরিচালনসংস্থার মধ্যে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে। তারপর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ার সাথে সাথে উত্তরোত্তর এগুলি নির্ধারিত হচ্ছিল অর্থনৈতিক প্রশাসনিক সংস্থাসমূহ, যেমন কমিশারিয়েট ও গ্লাভকি, এবং একজন কারখানা পরিচালকের মাধ্যমে।" (পৃঃ-৪)। গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এখানেও স্ববিরোধী বক্তব্য লক্ষণীয়। কারণ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ন ঘটাবার পরই 'নেপ'কে কার্যকরী করা সম্ভব হয়েছিল। অর্থাৎ, 'নেপ'-এর আমল মানেই হ'ল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়ার যুগ। অথচ লেখক তাঁর রচিত গ্রন্থে 'নেপ' ও পঞ্চবার্ষিকী 'পরিকল্পনা'র যুগকে পৃথক করে দেখাতে চেয়েছেন।

তাছাড়া, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী হবার পরই কেবল যথাযথ ভাবে প্রতিটি সক্ষম মানুষের কাজের গ্যারান্টি, কর্মজীবনে নিশ্চয়তা, কর্মজীবনে অবসর বিনোদের সুব্যবস্থা, অবসর জীবনে যাবতীয় নিরাপত্তার গ্যারান্টি,

গোপন ব্যালটে অবাধ ভোটাধিকার ব্যবস্থা ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পসংস্থা-গুলোতে ট্রেড-ইউনিয়ন ও পরিচালনসংস্থার মধ্যেকার সমন্বয় কমিটিগুলো আরো বেশি শক্তিশালী হয়েছিল। অথচ, লেখক টনি ক্লিফ বাস্তবসম্মত কোন দলিল হাজির না করেই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমল থেকেই শিল্পসংস্থাগুলো পরিচালিত হতে শুরু হয় আমলাতান্ত্রিক, কায়দায় অর্থাৎ মজুরীর হার নির্ধারণের দায়িত্ব হস্তান্তরিত হয় কমিশারিয়েট. গ্লাভকি প্রমুখদের আমলাতান্ত্রিক নীতির ফলেই, এই অভিযোগ ভিত্তিহীন।

পুরো বইটির মধ্যে প্রায় প্রতিটি পাতায় লেখক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন যে, স্তালিনের আমলে জাতীয় অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের মত শিল্পনীতির ক্ষেত্রেও আইন-কানুন ছিল জরুরী অবস্থার মত অসহনীয়—গণতান্ত্রিক অধিকারের কোন অস্তিত্ব ছিল না। অথচ তাঁরই হাজির করা তথ্য থেকে প্রমাণ হয়ে যায় যে, ১৯২৩ সালে অর্থাৎ লেনিনের আমলে যেখানে ১,৬৫,০০০ শ্রমিক ধর্মঘটে নেমেছিলেন সেখানে ১৯২৬ সালে অর্থাৎ লেনিনের মৃত্যুর দুবছর বাদে ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন ৩,২৯০০০ শ্রমিক, ১৯২৭ সালে ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করেছিলেন ২,০১০০০ শ্রমিক। এরপরেও কি স্তালিনের বিরুদ্ধে 'গণতন্ত্রের হত্যাকারী' বলে অভিযোগ দায়ের করা যায়?

টনি ক্লিফ আরো লিখেছেন, "আধুনিক পুঁজিবাদের বিশাল শিল্পকারখানা-গুলি শ্রেণী হিসাবে শ্রমিকদের সংহতির পক্ষে সন্দেহাতীতভাবে শক্তিশালী বাস্তব উপাদান হিসাবে কাজ করলেও, এই ঐক্যকে ভেঙে দেওয়ার জন্য নিয়োগকারীদের হাতে একগুচ্ছ কার্যকরী অস্ত্র মজুত রয়েছে। এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হ'ল ফুরনে-কাজের ব্যবস্থার মাধ্যমে শ্রমিকদের মধ্যে প্রতি-যোগিতা তীব্র করে তোলা।

লেখক একটা জিনিস বারবার ভুল করেছেন যে, এমন একটা সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে ফুরনে কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে সময়টা হচ্ছে মার্কসের ভাষায় 'ওয়ার কমিউনিজম' বা 'যুদ্ধকালীন সাম্যবাদ'-এর সময়। তখন একদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন, অন্যদিকে চৌদ্দটি ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র কর্তৃক সোভিয়েত ঘেরাও হওয়ার সম্ভাবনা। আর একদিকে নতুন একটি বিশ্বযুদ্ধের আগাম পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তার ওপর আবার গৃহযুদ্ধের দাপটে সোভিয়েত অর্থনীতির বেসামাল অবস্থা। স্বভাবতই, আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে বিশ্বপরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবেলা করার মত জায়গায় নিয়ে যাওয়ার

জন্য যুদ্ধক্লান্ত সোভিয়েত জনগণকে কর্মযজ্ঞে ব্রতী করতে ওটাই ছিল একমাত্র পথ—অন্তত সেই আমলে। তাছাড়া নাৎসী আমলে ক্রুপ, থাইসেন, হিউয়েন-বার্গ, কিপলারুস, কিরড রফ্স প্রমুখ শিল্পসম্রাটরা উত্তর ও দক্ষিণ ওয়েস্ট-ফালিয়া সহ সমগ্র রুঢ় ও রাইন শিল্পাঞ্চলে একাধিপত্য করার সঙ্গে সঙ্গে ফুরনে মজুরীপ্রথার পদ্ধতিতে অতি উৎপাদন ঘটিয়ে বিশ্ববাজার দখল করতে চেয়েছিল যার প্রধান লক্ষ্য ছিল সমরাস্ত্রের বাড়তি উৎপাদন আর সেইভাবেই তারা হের-ফ্যুয়েরার হিটলারের দিবাস্বপ্ন 'নিউ টিউটনিক অর্ডার' প্রতিষ্ঠা ও 'মহারাষ্ট্র-মণ্ডল' গঠনের উদ্যোগে সরাসরি সঙ্গী হয়েছিল। কিন্তু সেটার সঙ্গে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিধ্বস্ত জাতীয় অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করার স্বার্থে ফুরনে মজুরী-প্রথাকে এক করে ফেলাটা কি এক ধরনের বিকার না মূর্খামি? মনে হয় দুটোই!

উপরিউক্ত বিশ্লেষণের জের টেনে গ্রন্থকার আরো লিখেছেন, "স্তালিনপন্থীরা একই উদ্দেশ্যে ফুরনে-কাজের পদ্ধতি ব্যবহার করে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির সূচনার পরে ফুরন-হারে বেতনপ্রাপ্ত শিল্পশ্রমিকদের অনুপাত খুবই চড়াহারে বৃদ্ধি পেয়েছিল: ১৯৩০-এ এটা দাঁড়িয়েছিল সমগ্র শ্রমিকের ২৯ শতাংশ, ১৯৩১-এ এটা বৃদ্ধি পেয়েছিল ৬৫ শতাংশ পর্যন্ত; ১৯৩৪-এ সমস্ত শিল্প শ্রমিকের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছিল।" আদপেই সেটা তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা নয় প্রকৃত অর্থে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছিলেন সোভিয়েত ইউ-নিয়নের শিল্পশ্রমিকরা। তা যদি না হবে তবে ১৯৪৫ সালের আগেই, লেখক টনি ক্লিফ-এর ভাষাতেই "...জনগণের প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগ রাশিয়াকে শিল্পোৎপাদনের দিক থেকে ইউরোপে চতুর্থ ও পৃথিবীতে পঞ্চম স্থান থেকে ইউরোপে প্রথম এবং পৃথিবীতে দ্বিতীয় হিসেবে একটা বিরাট শিল্পোন্নত শক্তিতে উন্নীত করেছিল। সে তার পশ্চাৎপদতা থেকে একটা আধুনিক, শক্তিশালী, শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হওয়ার দিকে পা বাড়িয়েছিল।"

আলোচ্য বইটিতে বিভ্রান্তির আর একটা প্রমাণ হ'ল, তিনি লিখেছেন. "১৯৩৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের তৃতীয় সংবিধান রচিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর এক গোপন সভায় রাতারাতি গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।" কিন্তু, সত্যানুসন্ধানী ইতিহাসবিদ এই রায়ই দেয় যে, ১৯১৮ সালে ১৯২২-২৩ সালে গৃহীত পূর্বের দুটি সংবিধানের ওপর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী সহ

তৃতীয় সংবিধানটি' গৃহীত হয়। এর আগে ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যোসেফ স্তালিনের নেতৃত্বে একটি সংবিধান কমিশন গঠিত হয় এবং ১৯৩৬ সালের জুন মাসে উক্ত কমিশন সংবিধানের একটি খসড়া পেশ করে। কোটি কোটি সাধারণ মানুষের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনার জন্যে বলশেভিক পার্টির তরফে ওই খসড়ার ছ'কোটি অনুলিপি ছাপানো হয়। ৩ কোটি ৬০ লক্ষ দেশবাসী ঐ অনুলিপির ভিত্তিতে ৫ লক্ষ ২১ হাজার আলোচনা সভায় যোগদান করে এবং ১ লক্ষ ৫৪ হাজার সংশোধনী ও সংযোজনী বলশেভিক পার্টির সদর দপ্তরে এসে হাজির হয়। এত কিছু প্রক্রিয়া অবলম্বন করার পর তবেই ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর অধিবেশনে তৃতীয় সংবিধান গৃহীত হয়।

"রাশিয়ায় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ" বইটিতে লেখা হয়েছে, "বৃহৎ রুশী সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক শোষিত বা এর দ্বারা সরাসরি নিপীড়িত জাতিগুলি জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ক্রমবিকশিত তীব্রতা নিয়ে লড়াইয়ে সামিল হয়, যে সংগ্রামকে সাম্প্রতিককালে নাম দেওয়া হয়েছে 'টিটোবাদ'।

ইউ. এস. এস. আর-এ অ-রুশ জনগণের মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি উক্রেনীয়রা। তাদের জাতীয় আকাংখা ক্রমাগত একগুচ্ছ অপসারণের মধ্যে দমিত হয়েছে। ১৯৩০-এ উক্রেনীয় বিজ্ঞান একাদেমী উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং 'জাতীয় বিচ্যুতি'র অভিযোগে এর সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৩৩-এ উক্রেনীয় কমিউনিস্ট পার্টি ও পলিটব্যুরো ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, অত্যন্ত সুপরিচিত নেতা স্ক্রিপনিক্ গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য আত্মহত্যা করেন।" লেখক যেটাকে জাতীয় স্বাধীনতা বলে আখ্যা দিয়েছেন সেটা আক্ষরিক অর্থে ছিল একটি উগ্র বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রতিবিপ্লবী প্রতিক্রিয়া এবং অবশ্যই যার প্রবক্তা হলেন মার্শাল টিটো।

আঞ্চলিক স্বাধীনতা সম্পর্কে স্তালিন লিখেছেন, "ইউক্রেন বা ট্রান্স-ককেসাস অঞ্চলের জনগণ যদি আঞ্চলিক স্বাধীনতা সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত মতামত জানতে চান তাহলে আমি বলব যেহেতু মস্কোর সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে ঐ সমস্ত অঙ্গরাজ্যগুলোর অগ্রগতি ঘটছে সেহেতু এই মুহূর্তে ঐ সমস্ত রাজ্যগুলোর এক একটি পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়াটা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর হবে। কিন্তু, তারপরেও যদি ওঁরা সার্বভৌমত্বের জন্য পীড়াপীড়ি করেন আমি নির্দ্বিধায় তাঁদের ইচ্ছার পক্ষে রায় দেব।" এর পরেও কি এই ধরণের বিশ্লেষণ হাস্যকর নয় যে, যোসেফ স্তালিনের স্বৈরাচারী প্রবৃত্তি অনুযায়ী "...ইউক্রেনিয়-

দের জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ক্রমাগত একগুচ্ছ অপশাসনের মধ্যে দমিত হয়েছে ?"

১৯৩০ সালে ইউক্রেনিয় বিজ্ঞান একাডেমি প্রকৃত অর্থে একটি উগ্র জাতীয়তাবাদী প্রতিবিপ্লবী ঘাঁটিতে পরিণত হয়, এমতাবস্থায় নিখিল রুশ সর্বোচ্চ সোভিয়েতের অনুমোদন নিয়ে সোভিয়েত সরকার বাধ্য হয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির কার্যকলাপ বন্ধ করে দিতে।

এছাড়া ১৯৩৩ সালে নয়, ১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে ইউক্রেনিয় কমিউনিস্ট নেতা স্ক্রিপনিং বাধ্য হন আত্মহত্যা করতে, কারণ থানা-তল্লাশি করার পর তাঁর বাসস্থান থেকে প্রতিবিপ্লবী রণকৌশলের খসড়া-কর্মসূচীর অনুলিপি উদ্ধার করা হয় এবং তারই দায়-দায়িত্ব এড়াতে তিনি আত্মহননের পথ গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

বইয়ের ২১৪ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে, "ইউক্রেনে আমাদের নেতৃত্বকারী পার্টি সদস্যরা এবং কমরেড স্তালিন নিজে বিশেষভাবে ঘৃণিত। এই দেশে শ্রেণী-শত্রুরা একটা ভাল শিক্ষা পেয়েছে এবং সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়াই করতে হয় তা শিখেছে। উক্রাইনে প্রতিবিপ্লবী দল ও সংগঠনগুলির আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে। তারা সবাই এই কেন্দ্রের দিকে জড়ো হচ্ছে এবং আমাদের দলীয় ব্যবস্থাকে তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে সারা উক্রাইন জুড়ে তাদের জাল ছড়িয়ে দিয়েছে।" সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পোস্তিশেভ্-এর একটি বক্তৃতার উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন যে, একজন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যের বক্তব্যের মধ্যে থেকেই এটা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে, উক্রাইনে স্তালিন ছিলেন বিশেষভাবে ঘৃণিত। পোস্তিশেভ-এর কথা অনুযায়ী যখন, "উক্রাইনে প্রতিবিপ্লবী দল ও সংগঠনগুলির অবশিষ্টাংশ আস্তানা গেড়েছে, থারকভ ক্রমশই সমস্ত ধরনের জাতীয়তাবাদী ও প্রতিবিপ্লবী সংগঠনগুলির আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে", তখন সেখানে স্তালিন ঘৃণিত হবেন এটাই তো স্বাভাবিক।

টনি ক্লিফ বইয়ের ২২৫-২২৬ পৃষ্ঠায় সোভিয়েত প্রচারের দুর্বলতা দুটি ঘটনা দিয়ে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। একটি হল নাৎসী সেনাবাহিনীতে সোভিয়েত যুদ্ধবন্দীদের 'স্বেচ্ছায়' ব্যাপক যোগদান; অন্যটি হ'ল 'ফেরৎ না আসা' রুশীদের বিরাট সংখ্যা। টনি ক্লিফ বলেছেন, যুদ্ধের সময় ৫ লক্ষ বা তারও বেশী সোভিয়েত জাতীয়তাবাদীরা নাৎসী সেনাবাহিনীতে অস্ত্র সপেনে জার্মানীর

কমাণ্ডারের অধীনে কাজ করেছে। জার্মানীর হাতে ধৃত প্রায় পঞ্চাশজন সোভিয়েত জেনারেলের মধ্যে প্রায় দশজনই স্তালিনের বিরুদ্ধে হিটলারের সাথে হাত মিলিয়েছিল। যুদ্ধবন্দীদের আর কোন জাতীয় গোষ্ঠীই নাৎসীদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য তুলনামূলকভাবে এত তৎপরতা দেখায়নি।

যুদ্ধের পর, অনেক সোভিয়েত নাগরিকই আর দেশে ফিরে আসেনি। সামগ্রিকভাবে, ঐ সমস্ত 'ফিরে-না-আসা' লোক আর যারা নাৎসী বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল তারা যে এক নয় তা পরবর্তী নানা ঘটনা থেকেই স্পষ্ট। যে সোভিয়েত জনগণ শোষণের মূলোচ্ছেদ করে এক অভূতপূর্ব সমাজবাস্তবতা সৃষ্টি করেছিলেন, সেই সোভিয়েত জনগণকে অমর্যাদা করার কী অসহনীয় স্পর্ধাটাই না দেখিয়েছেন লেখক টনি ক্লিক !! "যুদ্ধের সময় ৫ লক্ষ বা তারও বেশী সোভিয়েত জাতীয়তাবাদীরা নাৎসী সেনাবাহিনীতে অষ্ট্রসপেনে জার্মানীর কমাণ্ডারের অধীনে কাজ করেছে।" সোভিয়েত ইউনিয়নের ৭০টি জাতির পক্ষে এর চেয়ে বড় অমর্যাদা আর কী থাকতে পারে! আর যে দশজন জেনারেলের স্তালিনের বিরুদ্ধে হিটলারের সঙ্গে হাত মেলাবার কথা তিনি লিখেছেন তাঁরা ছিলেন, স্তালিন-বিরোধী চক্রান্তের প্রধান নায়ক লিঁও ট্রটস্কির অনুচর ও জারের আমলের ফৌজি অফিসার জেনারেল তুখাচেভস্কির পরিচালনাধীন চক্রান্তকারী চক্রের অবশিষ্টাংশ। আর স্তালিনের বিরুদ্ধে হিটলারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সোভিয়েত-বিরোধী চক্রান্তের শরিক হওয়া এদের কাছে নতুন নয়। ১৯২৯ সাল থেকেই এঁরা ট্রট্স্কির সরাসরি নেতৃত্বাধীন নাৎসী পঞ্চম বাহিনীর সঙ্গে হাত মেলান। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ট্রট্স্কির-চক্রের অবশিষ্টাংশ ওই দশজন গোপনীয়তার পর্দা তুলে দিয়ে জার্মান জেনারেল দের কাছে খোলাখুলি আত্মসমর্পণ করেন। এর জন্যও কী যাবতীয় দায়-দায়িত্ব বর্তায় লেখকের ভাষায় 'স্তালিনবাদী বর্বরতা'র ঘাড়ে?

এছাড়া সোভিয়েত বন্দীদের এক বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে যে হত্যা করা হয়েছিল সেটা অন্য কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবকাশ না রেখে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়েই স্বচ্ছন্দে প্রমাণ করে দেওয়া যায়।

১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে উইসেলবার্গ-এ অনুষ্ঠিত জার্মান গেস্টাপো অফিসার ও এস. এস. অফিসারদের এক গোপন সভায় ইতিহাসের অপর এক কলঙ্কিত নায়ক হেনরিখ হিমলার তাঁর ভাষণে বলেন, "...রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হ'ল সে-দেশের অন্তত ৩০ মিলিয়ন

মানুষকে হত্যা করতেই হবে… ।" (সূত্র: দ্য অ্যান্টিম্যান : আর্নস্ট হেনরি : নোভস্তি প্রেস এজেন্সি পাবলিশিং হাউস : মস্কো : ১৯৮৯)

একই সময় হিমলার পোজনানে অনুষ্ঠিত 'বার্লিন মিলিটারি অ্যাকাডেমির' এক ছাত্রসমাবেশে বলেন, "জার্মানির জয়জয়কারের স্বার্থেই রাশিয়ার মানুষ ও সম্পদ ধ্বংস করা একান্ত অনিবার্য। ১৯১৮ সালে আমাদের সব থেকে নির্বোধের মত কাজ হয়েছিল বিদ্রোহী দেশগুলোর অসামরিক জনসাধারণকে ছেড়ে কথা বলা। কারণ, খেয়াল রাখতে হবে জার্মানির জনসংখ্যা সবসময় হওয়া উচিৎ প্রতিবেশি দেশগুলোর দ্বিগুণ। অতএব, সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ মানুষকে আমরা খতম করবই।" (সূত্র: দ্য অ্যান্টিম্যান: আর্নস্ট হেনরি)

এইভাবে দেখা যাচ্ছে লেখক টনি ক্লিফ তাঁর রচিত 'রাশিয়ায় রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ' বইয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতাকে বিশ্লেষণের নাম করে সেটিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বিরোধী কুৎসা রটনার একটি কালো দলিলে পরিণত করেছেন এবং স্তালিনের আমলের সোভিয়েত অর্থনীতিকে কোনভাবেই 'রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ' হিসেবে প্রমাণ করতে পারেন নি। এছাড়া এমন অনেক উদ্ধৃতির অবতারণা করেছেন যার যথাযথ তথ্য-প্রমাণ হাজির না করার ফলে লেখকের বক্তব্য ও মতামত সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

গ্রন্থপরিচয়

জন্ম জন্মদিন। বীরেন্দ্র দত্ত। বৈশাখী প্রকাশনী, হাওড়া ৫। দশ টাকা।

বীরেন্দ্র দত্তের গ্রন্থসংখ্যা—মূলত ছোটগল্প আর উপন্যাসেই তাঁর হাত খোলে—চমকপ্রদ, তিরিশের কাছাকাছি (প্রবন্ধসাহিত্যেও তাঁর কিছু প্রণিধানযোগ্য কাজ আছে)। সেদিক থেকে তাঁর সৃজনশীলতা যথেষ্ট সক্রিয় এবং প্রকাশকভাগ্যও বেশ ঈর্ষণীয় রকমের। সে যাই হোক, আমরা, যারা তাঁকে সেই 'উপনদী শাখানদী' থেকে 'শ্রেষ্ঠ গল্প' পর্যন্ত পড়েছি, মেনে নিতে বাধ্য যে শ্রীযুক্ত দত্তের গল্প-উপন্যাসে একটা কাব্যগত আলাদা চটক আছে। আখ্যানাংশ যখন স্মৃতি, প্রেম, বয়ঃসন্ধি কি মৃত্যুবোধকে ঘিরে জমে উঠছে, সেখানে লেখকের ন্যারেটিভ বাগভঙ্গি তাঁর অন্তর্গত কাব্যচৈতন্যে কেমন ছায়াচ্ছন্ন লাগে। এবং বলা বাহুল্য, ভালই লাগে। কিন্তু প্রায় কুড়িবছর পর, ১৯৭৪-এর দিকে শ্রীযুক্ত দত্ত ভেবেছিলেন কথাসাহিত্যের ঘটনাবিন্যাসে ইতস্তত যদিও অপরিহার্য কাব্যলগ্নতাকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা দেওয়া দরকার, পূর্ণাঙ্গ অবয়বের মর্যাদা দেওয়া দরকার। সেইসঙ্গে ভেবেছিলেন এই কাজে তাঁর যোগ্যতাও একটু পরীক্ষা করা দরকার।

সুতরাং আমাদের কাছে 'জন্ম জন্মদিন' তাঁর কথাশিল্পের সুপ্রশস্ত সক্রিয়তার পাশাপাশি আপাতদৃষ্টে কেমন অবিশ্বাস্য ও কৌতুকজনক কাণ্ড মনে হলেও পরক্ষণেই মনে না হয়ে পারে না, জিনিশটা তো বীরেন্দ্র দত্তের কাছে হঠাৎ কিছু নয়। তাছাড়া তাঁর সাহিত্যের প্রতিবেশটাও আমাদের মনে আছে। কৃত্তিবাসী কবিসমাজের সঙ্গে তিনি ছিলেন প্রত্যক্ষভাবে না হলেও ভাবসূত্রে সংশ্লিষ্ট। পঞ্চাশের সেই বসন্তবাতাস তাঁকেও ছুঁয়েছিল বই কি। শক্তি-সুনীল-আনন্দবাগচী-মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত ও কাব্যগত সন্নিধানের একটা ইতিবাচক বিধুরতা তো তাঁর মধ্যে চারিয়ে যেতেই পারে। সুতরাং ভেতর-ভেতরে সংগত কারণেই কবিতা কাজ করে যাচ্ছিল। 'জন্ম জন্মদিন'-এ সেই জায়মানতার বৃদ্ধি ও বিকাশই মলাটবদ্ধ।

স্মৃতি, অস্তিত্ব, প্রেম, মৃত্যু, যৌনতা, প্রকৃতি, সমকাল—এগুলো সাহিত্যের বনেদি কাঁচামাল যা বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন চেহারা পেয়ে থাকে। এইসব চিরকালীন উপকরণ যখন কবিতায় ব্যবহার করা হয় তখন আমরা প্রধানত

কবিতাকেই দেখব, উপকরণের ভূমিকা অনেকখানি পিছিয়ে যায় সেই দৃষ্টির সামনে। অর্থাৎ কবিতার ফরম অবয়ব কতটা ভাবকে হজম করেছে, অঙ্গীকৃত করেছে সেটাই আমাদের চোখে ও চেখে দেখবার বিষয়। বীরেন্দ্র দত্ত, বলতে ভাল লাগছে, সেই কাজে বেশ কিছুটা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এর জন্যে তাঁকে রপ্ত করে নিতে হয়েছে বাংলা ছন্দের ঘাঁতঘোঁত, যত্ন নিতে হয়েছে ভাষার, যেন বক্তব্য কোনোভাবেই গায়ে-পড়া হয়ে না দাঁড়ায়, শিখে নিতে হয়েছে বলা আর না-বলার অনুপাতের অঙ্ক। সোজা কথায়, কবিত্বের অন্তর্জাত টানের পাশাপাশি প্রযত্ন আর চর্চার ক্ষেত্রটাও কম জরুরি নয়। শ্রীযুক্ত দত্তের মধ্যে প্রায়শই এই যুগ্মতার সহাবস্থান ঘটেছে।

বইয়ের প্রথম কবিতা, এপ্রিল ১৯৭৪-এ লেখা 'চারদেয়ালের দরজা ঠেলেই' এমনিতর প্রযত্নলালিত রচনার সুখশ্রাব্য দৃষ্টান্ত। "চার দেয়ালের দরজা ঠেলেই হঠাৎ দেখি / শব্দবিহীন শূন্য ঘরের ধুসর মেঝেয় আঁকিবুকি / নানা কথার নানা স্মৃতির ছায়াছবি।" নিখুঁত স্বরবৃত্তে বীরেন ঢালাই করেছেন একটা পিছুটানের প্রাথমিক আবেগ। জানি, 'চারদেয়ালের দরজা', 'ধুসর মেঝে', 'ছায়াছবি'—শব্দগুলো বেশ ফ্যাকাশে লাগছে, কিন্তু এটা যাঁর একেবারে গোড়ার দিকের কাজ, সেদিক থেকে কিছুটা ছাড় দিতেই হয়; এবং দেবার পর একধরণের সহজতা কিন্তু থেকে যায়। তার আবেদন অস্বীকার করা যায় না। আবার, এর পাঁচমাস পরে লেখা (সেপ্টেম্বর ১৯৭৪) 'অসময়' কবিতাটির বাঁধুনি কোথাও-কোথাও একটু ঢিলে মনে হলেও যখন পড়ি: "অকস্মাৎ বর্ষা নামে, এমন অসহ্য শূন্যতায়। আর্দ্রতা যে বড় প্রিয়, আরাম বিলাস সুখকর।/কোথা বুঝি যতিচিহ্ন পড়ে আছে উপোসী ভিক্ষুক / হাতে তার ভিক্ষাপাত্র বুক জুড়ে আশার কঙ্কাল / হৃদয় বন্ধনে সঙ্গে অবিরল পাত্র মাজাঘষা।...মনে হয়, বীরেন তৈরি হচ্ছেন, চিনতে ও চেনাতে চাইছেন শব্দের ইশারাময় তির্যকতা। ১৯৭৮-এ পৌঁছে, চারবছর পর, তিনি লিখলেন: "আচমকা দমকা হাওয়া জানালার বুকে হাত রাখে,। রাতের পিওন এসে নীলখামে চিঠি রেখে যায় / খুলে দেখি শাদা চিঠি। শ্বেতপত্র! অস্পষ্ট অক্ষরে / বলে, 'কেমন আছেন?' বারবার একই কথা, 'কেমন আছেন?' / /চীৎকারে যেন কেউ হৃদয়ের শিরাগুচ্ছে টান দেয় দুরন্ত সাহসে। / সবল চুম্বক মুঠি, আমি হেথা অস্থির অনড়। / চমকে উঠে চেয়ে দেখি, মুখে রং সার্কাস ক্লাউন।" ('আমি এখন কেমন আছি,) আমরা খুশি না হয়ে পারি না এমনিতর

উচ্চারণের বিষণ্ণতায়। বিষণ্ণতায় কেউ অবশ্য খুশি হয় না, কিন্তু কবিতার ব্যাপার স্যাপারই অন্য। তাই এরকম বললুম। শেষের দিকে বেশ কিছু কবিতায় আমরা 'দেবলীনা' নামটি নানাভাবে দেখতে পাই। নামটি সুখশ্রাব্য সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি নিঃসন্দিগ্ধ হবার কারণ আছে এই নামের রেটরিক ব্যবহারে, শুদ্ধতার প্রতীকী যোজনায়। "আমি নির্নিমেষ থাকি / অন্ধকারে আলোর চুম্বনে / শিশির স্পর্শের মতো শিহরণে বুকে দেবলীনা।" ('অনিকেত এ জীবন') বুঝতে অসুবিধে হয় না, বীরেনও মনে মনে সুসময় ও সুচেতনার একটা প্রত্নপ্রতিমা তৈরি করার দিকে ঝুঁকেছেন। ভালই তো। কবিতাই যখন তিনি লিখছেন, তার বিভিন্ন কোণ, মাত্রা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিরীক্ষা—সবই তাঁকে চালিয়ে যেতে হবে, বাজিয়ে দেখতে হবে।'

স্বীকার করি, এই কাব্যগ্রন্থের মধ্যে কিছুকিছু অগোছালো শব্দ, অবিন্যাস, ঠেকনো দিয়ে খাড়া করার নবিশি চোখে পড়ে। অস্বাভাবিক কিছু নয়, কারণ বীরেন্দ্র দত্তের এটা প্রথমতম কবিতার বই। গল্প-উপন্যাসের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মনস্তাত্ত্বিক কারণেই তাঁর মধ্যে গদ্যবন্ধের প্রথাসিদ্ধ সরলতা, বক্তব্যপ্রবণতা বেশ জমিয়ে বসেছে। সেসব ছাঁটতে অনেক সময় নেবে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও যে লিরিকাল আমেজ, স্মৃতিচ্ছন্নতার আবহ কোথাও-কোথাও ফোটাতে পেরেছেন এবং যেকোনো পাকা কবির মতোই খেলাতে পেরেছেন তাঁর অস্মিতাকে সেটাই আনন্দের, এবং ভরসার। তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ যে অনেক বেশি পরিণত হবে, নিখুঁত হবে সেই প্রতিশ্রুতি তিনি এখানে জোরালোভাবেই রেখেছেন। ভাল কথা, বইয়ের ব্লার্ব এত বড় কেন? আর ভেতরে পূর্ণেন্দু পত্রীর ষ্টক ডেকরেশন লতাপাতার হাবিজাবির কোনো দরকার ছিল কি?

শিবশম্ভু পাল

জন্ম জন্মদিন। বীরেন্দ্র দত্ত। বৈশাখী প্রকাশনী। দশ টাকা

দায়বদ্ধতার সংজ্ঞান্তর

মহাশয়,

'মার্চ-এপ্রিল,' ৯২-সংখ্যায় শুভ বসু-কৃত নাট্য-সমালোচনা "দায়বদ্ধতার সংজ্ঞান্তর" পড়লাম। চন্দন সেন রচিত, মেঘনাদ ভট্টাচার্য-নির্দেশিত, 'সায়ক'-প্রযোজিত অসাধারণ নাটকটির অনন্য সমালোচনাটির একমাত্রত্রুটি যে, এ-টি চরিত্রগুলির ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েনের মধ্যেই আটকে গেছে ; সমাজ প্রাসঙ্গিকতার আলোচনাকে স্থান করে দেওয়া হয়নি এখানে, তেমন করে। ফলে সমালোচককেই খেদ প্রকাশ করতে হয়েছে উপসংহার-মূলক অনুচ্ছেদে : "কাল-নির্দেশক কোনো ব্যঞ্জনা'' নেই বলে ! কিন্তু কাল মানে কি একটি বিশেষ সাল ? বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের নাটক 'দায়বদ্ধ'।

নাট্য কাহিনীতে আমরা স্বাধীনতা-উত্তর কালে বিগত প্রায় দেড় যুগের ঘটনা পাই : ডাক্তারের স্ত্রী-কন্যাকে এখানে রেল-লাইনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হয়, কিন্তু মৃত্যুর বদলে বেঁচে থাকার সংবাদ আসে এক সঙ্গীত-প্রিয় লরি-ড্রাইভারের মাধ্যমে। নতুন সংসারে সতীর আভিজাত্যের দর্প এবং বিবাহহীন সম্পর্কে অনাস্থা দুর্মর বাধা হয়ে দাঁড়ায় আত্মভোলা গগন মিস্ত্রিের তৃপ্তির পথে। তাই তার পেশাগত 'ভাইস' তাকে গ্রাস করে বসে। পারিবারিক সংকট যখন তুঙ্গে, তখন বাড়ীর কাজের মেয়েটির মতো উপকৃত প্রতিবেশীরাও তাদের পাশে দাঁড়ায় না। গগনের লরি রাখার জায়গাটিই কেবল লোপ পেতে বসে না, তাকে বাস্তুচ্যুত করারও ষড়যন্ত্র পাকিয়ে ওঠে। নিরঞ্জন মাষ্টার, যাঁর স্ত্রী মূল্যবোধ মাড়িয়ে রংমশালী জীবনে বিসর্জিত, তাঁরই উপর নাগরিক সমিতি ভার দিয়েছে পাড়া ছাড়ার নির্মম ফতোয়াটি জানিয়ে দেবার। মাস্টার মশাই এদের নিষ্পাপ অবস্থানে বিশ্বাস রেখেও অসহায়ভাবে অন্যায় ফতোয়াটি জারি করে যান। এই বুদ্ধিজীবীর বসা মোড়াটিকে পদাঘাত করে গগন একই সঙ্গে তার ঘৃণা প্রকাশ করে সত্য-উচ্চারণে অপারগ বুদ্ধিজীবীর উপর, এবং অনাধিকার-চর্চার ফতোয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। সতীও প্রতিবাদের

মধ্যে দিয়ে গগনকে স্পর্শ করার উপযুক্ত সহমর্মিনী হয়ে ওঠে, অহঙ্কার-আভিজাত্যে জলাঞ্জলি দিয়ে। পুলিশ কিন্তু গগনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে চায়, ঝিনুকের আত্মহত্যা-প্রয়াসের সূত্রে, পৌষ মাসের আশায়।

জামাইবাবু ইউনিয়ন-কর্তা, তাই কম ঘুষ দিয়ে দেবু প্যানেলে নাম তোলার সুযোগ পায়, বেকারত্ব ঘোচাতে। মূল্যবোধ ভেঙে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেবার এ-যুগটা যে আজকের বামফ্রন্ট শাসনের অন্তর্ভুক্ত, তা শুভ বসুর বিশ্বাস করতে হয়তো বাজে, বাজে লাগে। তাই 'কাল-নির্দেশ' তাঁর কাছে স্পষ্ট হয় না। কিন্তু স্পষ্টতর ব্যঞ্জনা যে নাট্যকার নির্দেশক দিতে পারেননি, সে-ও এ-কালের আতঙ্কময় পরিবেশের কারণে। গগন তবু একবার সাহস করে বলে বসেছে যে, সে ভোটের পার্টিকেও দেখেছে! এমন একজন সৎ-উদার শ্রমজীবী মানুষ কেন গণসংগঠনের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে, তার সাকরেদ-আদিকে নিয়ে? কেন সে রীতিমতো ঘেন্না করে এ-সব সংগঠন ও ভদ্রলোক সম্প্রদায়কে? সে-ই কিন্তু দেবু-ঝিনুক-সতীর মূল্যবোধেরও প্রেরণা!

স্বভাবতই নাট্যকারের উপর কটাক্ষ বর্ষিত হয় এই কোণে, ঐ কাগজে। কিন্তু নাট্য-গগনের অপার বিস্তার ও জনপ্রিয়তায় সরকারী পুরস্কার দাতারা শেষ অবধি মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়!!

নির্মল সাহা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

শতবর্ষ তাঁকে ছুঁয়ে গেল। তিনি স্পর্শ করলেন দুটি শতাব্দীরই শেষ দুই প্রান্ত—জনমে মরণে। এই জন্ম-মৃত্যুর সীমানা পেরিয়ে তাঁর ঐতিহ্যবাহী মনন উত্তর পর্বের মানুষের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জীবনে স্থায়ী চিহ্ন এঁকে দিল।

১৮৯৩ সালের ২৬ জানুয়ারি সংস্কৃত বিদ্যাচর্চা ও সনাতন হিন্দু আচারের পীঠস্থান ভাটপাড়ার এক নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে মহামহোপাধ্যায় শ্রীজীব ভট্টাচার্য ন্যায়তীর্থের জন্ম। তাঁর বাবা পঞ্চানন তর্করত্ন ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত। তাঁর টোলে নিকট-দূর অঞ্চল থেকে বহু ছাত্র পড়তে আসতেন। খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল বাঙলার সীমানা পার হয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। শ্রীজীব তাঁর বাবার টোলেই পড়াশুনো শুরু করেছিলেন। পরে ন্যায়শাস্ত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত রাখাল দাস ন্যায়রত্নের কাছে পাঠ গ্রহণ করেন। তাছাড়া বীরেশনাথ বিদ্যাসাগর, গুরুচরণ তর্ক দর্শনতীর্থ, হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী, রাজেশ্বর শাস্ত্রীর কাছেও তিনি ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। জ্ঞানচর্চার টানেই তিনি মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, পণ্ডিচেরীর দিলীপকুমার রায়, সীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ প্রমুখ বিদ্বজ্জনের সংস্পর্শে আসেন।

টোল-চতুষ্পাঠীর সনাতন ঐতিহ্যবাহী শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও সেই অঙ্গনে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে শ্রীজীব পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণের আবশ্যকতা অনুভব করেছিলেন। তিনি পড়েছেন ভাটপাড়া মাইনর স্কুল, চুঁড়া অ্যাকাডেমি, নৈহাটি মহেন্দ্র স্কুল এবং হিন্দু স্কুলে। সেখানেও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় দুটি বিষয়ে লেটারসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. এবং এম. এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী পান। এম. এ.-তে পেয়েছিলেন সোনার মেডেল। তাঁর আধুনিক শিক্ষার বহর যে মোটেই খাটো ছিল না তা বলা-ই বাহুল্য। সেই সঙ্গে এ কথাও বলতে হয় শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের মধ্যে দুটি শিক্ষা ধারার সম্মিলন ঘটেছিল।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অধীনে শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ নব্য ন্যায় (The Evolution of Modern Logic) বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন। এই কাজের জন্য ১৯২১ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত ডি. পি. আই থেকে বৃত্তি পেয়েছিলেন। কাজ শেষও করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গবেষণাপত্রটি

ডিগ্রির জন্য জমা দেওয়া হয়নি। কারণ,শাস্ত্রী মশাইয়ের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য। গৌতমের ন্যায় সূত্রের অধিকাংশই বৌদ্ধ দর্শন থেকে নেওয়া—হরপ্রসাদের এই অভিমতের তিনি বিরোধী ছিলেন। কিন্তু হরপ্রসাদের প্রতি শ্রদ্ধা হারাননি।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত। ভাটপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতানুশীলনের কেন্দ্র সংস্কৃত কলেজের তিনি ছিলেন অধ্যাপক ও সম্পাদক। আমৃত্যু তিনি এই পদে বহাল ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৩৬—১৯৫৮), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৬৩—১৯৭১) এবং নৈহাটি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজে (১৯৫০—১৯৬৪) অধ্যাপনা করেছেন। অধ্যয়ন-অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি লিখেছেন বহু গ্রন্থ, নিবন্ধ এবং সৃজনশীল রচনা। লিখেছেন সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজিতে। তাঁর কয়েকটি রচনা—
১. Antiquity of Nyaya Sutra, ২. Sankaracharya the Great and his connection with the Kanchi Kamakathi, ৩. The other World, ৪. Genetics of Nyaya-Vaiseshika thought ৫. চণ্ডতাণ্ডবম্ (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে নাটক), ৬. বিবেকানন্দ চরিতম্, ৭. মহাকবি কালিদাসম্, ৮. স্তবকুসুমমালিকা, ৯. গোপীনাথ কবিরাজ স্মারক বক্তৃতা সংকলন, ১০. বর্তমান ভারতে বেদান্তস্যোপযোগিত, ১১. শ্রীমদ্ভাগবত বাংলা অনুবাদ, ১২. মহাভারত (আদি পর্ব)—মূল ও ও নীলকণ্ঠের টীকার হিন্দি অনুবাদ ও সম্পাদনা। লিখেছেন বাংলাতেও। সংস্কৃত পত্রিকা 'প্রণব পরিজাত' সম্পাদনা করেছেন। আনন্দ বাজার পত্রিকা, মাসিক বসুমতী, গল্পভারতী, হিমাদ্রী প্রভৃতি পত্রিকায় লিখেছেন অনেক। তিনি সুঅভিনেতা ছিলেন। ছিলেন সুরসিক।

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তিনি আমন্ত্রিত হন। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়, অল ইণ্ডিয়া লিটেরারি কনফারেন্স (মাদ্রাজ), লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ইনস্টিটিউট (নতুন দিল্লি), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭৯, গোপীনাথ স্মারক বক্তৃতা) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেন।

দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শ্রীজীব ন্যায়তীর্থকে সম্মানিত করেছে। ১৯৬৮-সালে তিনি রাষ্ট্রপতির সম্মানসূচক পুরস্কার পান। এলাহাবাদের প্রয়াগ বিদ্বদ্‌সমাজ তাঁকে মহামহিমোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করেন। হাওড়া পণ্ডিত সমাজ "মহাকবি", নবদ্বীপ সারস্বত সমাজ "ব্যাকরণ শিরোমনি" সম্মানে

সম্মানিত করেন। ১৯৭২ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডি. লিট, ১৯৮৯ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো নির্বাচন, ঐ বছরেই বেনারসের সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় মহামহোপাধ্যায় ১৯৯০ সালে বিশ্বভারতী দেশিকোত্তম, ঐ বছরেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্মান সূচক ডি. লিট, এবং উত্তর প্রদেশ সরকারের সংস্কৃত অ্যাকাডেমি বিশ্বসংস্কৃত ভারতী, ১৯৯১ সালে কলকাতা সংস্কৃত কলেজ জ্ঞান-ভাস্কর উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আজীবন সদস্য।

শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের বাবা রাজনীতি-সচেতন ছিলেন। অনুশীলন সমিতির স্থানীয় শাখার সভাপতি হিশেবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তিনি পালন করেন। শ্রীজীবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ রাজনীতির যোগ না থাকলেও অনুশীলন সমিতির প্রেরণায় লাঠি খেলা ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ করে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এক সময় তিনি নিয়মিত শরীর চর্চা করতেন।

একশো বছরের দীর্ঘ জীবনে শিক্ষাই তাঁর মূল আভরণ। আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গভীর হলেও সনাতন টোল শিক্ষা পদ্ধতিকে কখনোই এড়িয়ে যান নি। প্রতীচ্যের অনেক পণ্ডিত নিজ দেশের প্রত্নমহিমা উদ্ধারের জন্য সংস্কৃতের চর্চা করেছেন। এই চর্চার ক্ষেত্রে আধুনিক গবেষণা প্রণালীর প্রয়োগে অনেকেই সচেষ্ট হয়েছিলেন। আধুনিক ধারার পাশাপাশি টোল-কেন্দ্রিক সনাতন পদ্ধতিতে সংস্কৃত চর্চার ধারাও এদেশে বজায় ছিল। এই দুটি ধারাকে মিলিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা কখনো কখনো দেখা গেছে। সাহেব পণ্ডিতরা টুলো পণ্ডিতদের সাহায্য নিয়ে কাজ করেছেন। ১৯২৮ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত পঞ্চম ভারতীয় ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সে সভাপতির অভিভাষণে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছিলেন, দেশীয় পণ্ডিতদের আধুনিক গবেষণা প্রণালী শিখিয়ে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চায় নিয়োগ করা উচিত। তা হলেই প্রাচ্যবিদ্যা চর্চা যথার্থ হবে। সেদিক থেকে শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ যথার্থ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্।

তাঁর মনে দুঃখ ছিল মাধ্যমিক স্তর থেকে সংস্কৃত পঠন-পাঠন তুলে দেওয়ায়। এর পুনর্বহালের জন্য অনেকের কাছে আর্জি জানিয়েছেন, কিন্তু কোনো ফল হয়নি।

এই মহামহিমোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের জীবনাবসান হয় ২৮ অক্টোবর ১৯৯২ তারিখে।

নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত

অশোক রুদ্র

ডঃ অশোক রুদ্রের জীবনপঞ্জী নতুন করে আর লিখবার প্রয়োজন আছে মনে হয় না। গত ২৮শে অক্টোবর রাতে শান্তিনিকেতনে নিউমোনিয়ার আক্রমণ ও হৃদযন্ত্রের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁর মৃত্যু হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এরপর তাঁর জীবন ও কাজ সম্পর্কে অনেক তথ্য বেড়িয়েছে। আমি তাই এই ছোট্ট অবসরে কেবলমাত্র আমাদের অতি পরিচিত অশোকদার কথা কিছু লিখবো।

অশোকদাকে আমি চিনি ব্যক্তিগতভাবে ১৯৭৪-৭৫ সাল থেকে। প্রথমে ছাত্রী হিসাবে ছিলাম অত্যন্ত প্রিয়, পরে গবেষণা করার সময় ছিলাম অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, যদিও আমি ওঁর কাছে গবেষণা করি নি। তারও পরে বেশ কিছুদিন ওঁর কাছে research associate হিসাবে কাজ করেছি I L O-র একটি project-এ। কাজের ব্যাপারে ওঁর হিসেব ছিল অত্যন্ত কড়া। কত সময় এত বকাবকি করেছেন যে প্রায় মনস্থির করে ফেলেছি 'কাল থেকে আর আসবো না।' কিন্তু অশোকদার জ্ঞানের পরিধি ও কাজের প্রতি গভীর আগ্রহ মত পরিবর্তনে বেশী সময় নিত না। ছাত্রী হিসাবে যেটুকু বুঝেছি পাঠক্রম বোঝানোর ক্ষেত্রে অশোকদা খুব সফল শিক্ষক ছিলেন না, তবে গবেষক হিসাবে ওঁর সাফল্য সন্দেহাতীত।

অশোকদার একটা স্বভাব ছিল প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। এই কারণেই আমাদের সঙ্গে অশোকদার প্রায়ই মতবিরোধ হোত। যেমন একটা ঘটনার কথা বলি, যতদূর মনে পড়ে ১৯৮২ / ৮৩ সালের কথা। সেবার ভারতবর্ষ থেকে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা যাবার কথা। পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন বিজ্ঞানী মতামত দিয়েছিলেন যে খালি চোখে এই গ্রহণ দেখলে চোখের ক্ষতি হতে পারে। ওই সময় বাড়ির বাইরে না থাকাই ভাল। আমার যতদূর মনে পড়ে বিশ্বভারতী সেদিন বেলা ১-টার পরে ছুটি হয়ে গিয়েছিল। অশোকদা নিজে তো বিভাগে কাজ করতে এসেছিলেনই, ওনাকে গবেষণার কাজে যারা সাহায্য করতো তাদের-ও আসতে বাধ্য করেছেন। অথচ তার বেশ কিছুদিন আগেই অশোকদার একটি চোখ অকেজো হয়ে গিয়েছিল।

আরো একটি ঘটনার কথা বলি। ১৯৭৯ সালের December মাসে বিশ্বভারতীর Agro-Economic Research Centre-এর Silver Jubilee অনুষ্ঠানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বিদগ্ধ অর্থনীতিবিদদের সমাবেশ হয়েছিল। তিনদিনের সেই আলোচনাচক্রে অশোকদাও আমন্ত্রিত ছিলেন। অশোকদা প্রতিবাদ স্বরূপ যোগদান করেন নি। তাঁর প্রতিবাদের কারণ ছিল এই যে—যেখানে ভারতের কৃষি অর্থনীতি উপযুক্ত সেচব্যবস্থার অভাবে ধুঁকছে, সেখানে বেশ কিছু টাকা খরচ করে আলোচনা চক্র করার কোন দরকার নেই। ওই টাকায় যেটুকু সেচ ব্যবস্থা করা যায় তাতে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কিছু দীর্ঘ-মেয়াদী পদক্ষেপ নেওয়া যায়। অশোকদা ঠাট্টা করে বলতেন 'তোমরা দারিদ্র নিয়ে আলোচনা কর আর তাতে বেশ ভাল টাকা খাওয়া-দাওয়ায় খরচ কর।'

ছাত্র-ছাত্রীদের নানা সমস্যার প্রতি অশোকদা ছিলেন অত্যন্ত সহানু-ভূতিশীল। আমরা নানা ধরণের ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হতাম। সেসব কথা ধৈর্য্য ধরে শুনতেন, সমাধান করতেন। সহকর্মীদের নানা বিষয়ে তাঁর মত বিরোধ হোত, কিন্তু নিজের ভুল বুঝতে পারলে ক্ষমা চাইতে-ও তাঁকে দ্বিধা করতে দেখিনি। অশোকদা নিজেকে কখনও সর্বজ্ঞ মনে করতেন না। বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের মতামত নিতেন, গবেষণার কাজে পরিসংখ্যান সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমার সাহায্য নিজেই চাইতেন।

অশোকদার আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার। ওঁর একাকীত্ব আমাকে ভীষণ টানতো। বড় নিসঙ্গ ছিল ওঁর শেষ জীবন। ফরাসী স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর তেমন কোন যোগাযোগ ছিল না। অথচ অনেক প্রসঙ্গেই ওঁর স্ত্রীর গল্প শুনেছি। ছেলে অলোক ছিল ওঁর অসম্ভব প্রিয়। অলোক প্রায়ই আসতো অশোকদার কাছে। সেই সময় অশোকদাকে অন্য মানুষ মনে হোত। অলোক এলে নিয়মিত দুপুরে বাড়িতে খেতে যেতেন।

অশোকদার প্রতিভা ছিল অসাধারণ। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে সংখ্যাতত্ত্বে বি-এস-সি করে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ-ডি করেন। দিল্লি ও বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। Indian Statistical Institute-এর সাথে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন। মৃত্যুর আগেও বিশ্বভারতী থেকে অবসর নিয়ে Institute-এ ডঃ প্রশান্ত চন্দ্র মহালনবীশের উপর একটি গবেষণামূলক কাজ করছিলেন। বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করেছেন দীর্ঘদিন। ভারতীয়

অর্থনীতির সকলক্ষেত্রে ছিল ওঁর অনায়াস বিচরণ। ভারতীয় কৃষি অর্থনীতি সংক্রান্ত সমস্যায় তাঁর ছিল গভীর অনুসন্ধিৎসা বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করা কালীন অশোকদার বিশেষ অবদান আনন্দ পাবলিশার্স-এর 'অর্থনীতি গ্রন্থমালা'র সহকারী সম্পাদনা করা। এই গ্রন্থমালায় তাঁর রচনা ভারতবর্ষের কৃষি অর্থনীতি'। এছাড়াও আরো অনেক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের রচয়িতা তিনি, যেমন 'Indian Agricultural Economics : Myths and Realities. Allied Publishers, 1982. পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেতমজুর : কথাশিল্প, ১৯৮১।

বাড়ি করেছিলেন 'প্রান্তিকের' কোলঘেঁষে, প্রকৃতিকে ভালবাসতেন, তাই চারিদিকে লালমাটির খোয়াই আর একপায়ে দাঁড়ান তালগাছ ছিল তাঁর সঙ্গী। প্রতিবেশী ছিল সাহেবগঞ্জ লুপ লাইন। অবসর ছিল না তাঁর এতটুকু। সারাদিন গবেষণার কাজ, পঠন-পাঠন, বিকেলে বাড়িতে ছাত্র-ছাত্রী, বন্ধু ও অনুরাগীদের ভীড়। শান্তিনিকেতনকে ভালবাসতেন, আর ভালবাসতেন রবীন্দ্রসংগীত। 'দীপ নিভে গেছে মম' গানটি ছিল তাঁর অতি প্রিয়। জীবনের শেষদিনটি পর্যন্ত ছিলেন শান্তিনিকেতনে এবং শেষ যাত্রায় রবীন্দ্রসংগীত ছিল তাঁর সাথী।*

—নীপা বিশি

* অশোক রুদ্রে'র সঙ্গে 'পরিচয়'র ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘদিনের। ৫০'এর দশক থেকেই পরিচয়ে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে সুরু করে। তাঁর মৃত্যুতে আমরা সুহৃৎ হারিয়েছি। প্রথা সম্মত বিয়োগপঞ্জী অশোক রুদ্রের ক্ষেত্রে আমরা প্রকাশ করতে চাইনি। তাঁর ছাত্রীর স্মৃতিচারণ আমাদের গ্রহণ যোগ্য বিকল্প মনে হয়েছে।

—সম্পাদক মণ্ডলী

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত পুস্তকাবলি

বিবিধ বিদ্যা সংগ্রহ

o বাঙ্গালীর সংস্কৃতি (২য় সংস্করণ)	: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৫ টাকা
o বাঙ্গালীর ভাষা	: সুকুমার সেন ও সুভদ্রকুমার সেন	১৫ টাকা
o বাংলা গদ্যের ইতিবৃত্ত	: হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	৮ টাকা
o কলকাতা তিন শতক (২য় মুদ্রণ)	: কৃষ্ণ ধর	১২ টাকা
o ভারতের কৃষিপ্রগতি ও গ্রামীণ সমাজ	: গৌতম সরকার	৮ টাকা

জীবনী গ্রন্থমালা

o সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	: সুকুমারী ভট্টাচার্য	৫ টাকা
o বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	: বিজিতকুমার দত্ত	২ টাকা
o রাজেন্দ্রলাল মিত্র	: বিজিতকুমার দত্ত	৮ টাকা
o সুশীলকুমার দে	: ভবতোষ দত্ত	৩ টাকা
o সুকুমার	: লীলা মজুমদার	১৪ টাকা
o বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	: সরোজ দত্ত	১০ টাকা

সংকলন গ্রন্থ

o সুকুমার পরিক্রমা	: পবিত্র সরকার সম্পাদিত	৩০ টাকা
o প্রেমচন্দ্র গল্প সংগ্রহ	:	৪৫ টাকা
o সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা সংগ্রহ	:	৫০ টাকা

মুখপত্র

o আকাদেমি পত্রিকা ১	: অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত	১০ টাকা
o আকাদেমি পত্রিকা ২	: অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত	১০ টাকা
o আকাদেমি পত্রিকা ৩	: অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত	১০ টাকা
o আকাদেমি পত্রিকা ৪	: অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত	১০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

- আকাদেমি দপ্তর, কলকাতা তথ্য কেন্দ্র ১।১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড কলিকাতা-৭০০০২০
- ইউনিভারসিটি ইন্সটিট্যুট হল কাউন্টার, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০০৭৩
- ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা-৭০০০৭৩
- দে বুক স্টোর, কলকাতা-৭০০০৭৩
- আকাদেমি গ্রন্থাগার, ১১৮ হেমচন্দ্র নস্কর রোড, বেলেঘাটা, কলকাতা-৭০০০১০

আই. সি. এ.…………

শারদীয় ১৩৯৯
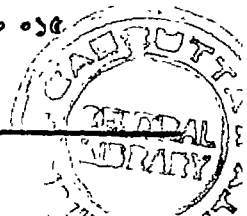
* কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ তদারকিতে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কয়লা তুলে আমাদের সমগ্র এলাকাকে ভয়াবহ ধ্বসের কবলে ঠেলে দেবার জন্য দায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যথাযথ ধ্বস-প্রতিরোধক ব্যবস্থা, ক্ষতিপূরণ ও জমি পুনরুদ্ধারের দাবিতে—আন্দোলন গড়ে তুলুন।

* আমাদের এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা অধিগৃহীত শিল্প সংস্থা—"ইস্টার্ন কোল ফিল্ডস্ লিমিটেড"-এর কাছে বকেয়া কর আদায়ের দাবিতে—আন্দোলন গড়ে তুলুন।

* সর্বক্ষেত্রে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে আমরা ব্রতী। আমাদের প্রেরণার উৎস জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন—আরো ভালোভাবে উন্নয়নের শরিক হোন।

ডিসেরগড় নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী

বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরী হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করেছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে। অতিব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলশ্রুতি হিসাবে এই গ্রহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন, কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল স্রোতকে রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ সমস্তই ঘটবে আমাদের অপরিণামদর্শিতা, লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই, প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ. ৩৫১১/৯২

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত পুস্তকাবলি

বিবিধবিদ্যা সংগ্রহ

* বাঙ্গালীর সংস্কৃতি (২য় সংস্করণ) : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৫ টাকা
* বাঙ্গালীর ভাষা : সুকুমার সেন ও সুভদ্রকুমার সেন ১৫ টাকা
* বাংলা গদ্যের ইতিবৃত্ত : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৮ টাকা
* কলকাতা তিনশতক (২য় মুদ্রণ) : কৃষ্ণ ধর ১২ টাকা
* ভারতের কৃষিপ্রগতি ও গ্রামীণ সমাজ : গৌতম সরকার ৮ টাকা

জীবনী গ্রন্থমালা

* সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : সুকুমারী ভট্টাচার্য ৫ টাকা
* বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বিজিতকুমার দত্ত ২ টাকা
* রাজেন্দ্রলাল মিত্র : বিজিতকুমার দত্ত ৮ টাকা
* সুশীলকুমার দে : ভবতোষ দত্ত ৩ টাকা
* সুকুমার : লীলা মজুমদার ১৪ টাকা
* বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : সরোজ দত্ত ১০ টাকা

সংকলন গ্রন্থ

* সুকুমার পরিক্রমা : পবিত্র সরকার সম্পাদিত ৩০ টাকা
* প্রেমচন্দ গল্প সংগ্রহ ৪৫ টাকা
* সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা সংগ্রহ ৫০ টাকা

মুখপত্র

* আকাদেমি পত্রিকা ১ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০ টাকা
* আকাদেমি পত্রিকা ২ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০ টাকা
* আকাদেমি পত্রিকা ৩ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০ টাকা
* আকাদেমি পত্রিকা ৪ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

* আকাদেমি দপ্তর, কলকাতা তথ্যকেন্দ্র ১/১ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০
* ইউনিভারসিটি ইন্সটিট্যুট হল কাউন্টার, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
* দে বুক স্টোর, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
* আকাদেমি গ্রন্থাগার, ১১৮ হেমচন্দ্র নস্কর রোড, বেলেঘাটা, কল-৭০০ ০১০

আই. সি. এ ৩৫১১/৯২.

থেমে নেই কোনো কিছুই—
এই পৃথিবী, নদী কিংবা বাতাসের মত;
মানুষ আর মানুষের সভ্যতার মত;

আমরাও থেমে নেই······
মানুষের অবিরাম চলায়
সহযাত্রী আমরাও
গড়ে তোলার গভীর বাসনায়—

শারদীয়া উৎসবের দিনগুলির জন্য রইল শুভেচ্ছা—

শ্রীবিপিন চট্টরাজ

নিয়ামতপুর নোটিফায়েড অথরিটির পক্ষে প্রচারিত।

কুলটি-বরাকর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি

হনুমানচড়াই, বরাকর, বর্ধমান।

— ❀ —

পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকারের স্বপ্ন সার্থক করতে, এলাকার অগণিত জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখতে এবং সরকারের বিভিন্ন জনহিতকর প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ করতে কুলটি-বরাকর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

শ্রীসুধীর ভৌমিক
ভাইস-চেয়ারম্যান
কুলটি-বরাকর নোটিফায়েড
এরিয়া অথরিটি

পরিচয়-এর গ্রাহক হোন

নবপর্যায়ে পরিচয় মুক্তবুদ্ধি যুক্তিবাদী পাঠকের প্রত্যাশা পূরণে অঙ্গীকারবদ্ধ

গ্রাহক সংক্রান্ত—

যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা চল্লিশ টাকা। ডাকযোগে নিলে অতিরিক্ত দশ টাকা।

আপাততঃ পরিচয় প্রতি দুই মাসে যুক্ত সংখ্যা হিসেবে বেরবে। দাম দশ টাকা। বিশেষ সংখ্যা বা শারদীয় সংখ্যার দাম পনের থেকে ত্রিশ টাকার মধ্যে থাকে; কিন্তু গ্রাহকগণ নির্দ্ধারিত চাঁদার মধ্যে সব সংখ্যা পাবেন।

এজেন্সী সংক্রান্ত—

কমপক্ষে আট কপি নিতে হবে।

কমিশন শতকরা পঁচিশ টাকা।

পত্রিকা ভি-পি-তে পাঠানো হয়।

এজেন্ট নিজে সংগ্রহ করলে ছাড় ৩৩·৩৩ শতাংশ।

লেখকদের প্রতি—

ছোট লেখা কাম্য। স্বাভাবিক হস্তাক্ষরে গল্প বা প্রবন্ধ ফুলস্ক্যাপ কাগজের দশ পৃষ্ঠার অনধিক হওয়া চাই। সম্ভব হলে নিজের কাছে কপি রেখে লেখা পাঠাবেন।

লেখা মনোনীত হলে তিন মাসের মধ্যে জানানো হবে।

অমনোনীত লেখা, ফেরৎ পাঠাবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ডাকটিকিট না পাঠালে, ছয় মাসের মধ্যে নষ্ট করে ফেলা হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— গ্রাহক কিম্বা এজেন্সী সংক্রান্ত চিঠিপত্র / রেজিষ্টার্ড চিঠি / মনি অর্ডার / ড্রাফট / চেক ইত্যাদি অবশ্যই নিম্ন ঠিকানায় পাঠাতে হবে :

পরিচয়

৩০ / ৬, ঝাউতলা রোড

কলকাতা-৭০০০১৭

"সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি
এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শুনে এক মিলনের বাঁশী"

—নজরুল

*　　*　　*

আমাদের সংগ্রাম পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে,
আমাদের লক্ষ্য—সুস্বাস্থ্য, শিশু-কল্যাণ
এবং মাতৃমঙ্গল।

আসুন মন মেলাই সুস্থ সামাজিক জীবনের
সংকল্পে, নিবেদিত হই কুষ্ঠ-রোগীর সেবায়

আর

দেশ ও জাতির স্বার্থে মানবাত্মার জয়গানে
মুখরিত হই,
সংগ্রাম করি যাবতীয় বিভেদ ও অনৈক্যের বিপক্ষে।

৬২ বর্ষ ১-৩ সংখ্যা, আগস্ট-অক্টোবর ১৯৯২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৯৯

প্রবন্ধ :

উপন্যাস :

গল্প :

সংলাপ কবিতা :

একাঙ্ক নাটক :

কবিতাগুচ্ছ—১

কবিতাগুচ্ছ—২

মণিভূষণ ভট্টাচার্য। পবিত্র মুখোপাধ্যায়। কমলেশ সেন। ভাস্কর চক্রবর্তী। নবারুণ ভট্টাচার্য। শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়। শুভ বসু। অমিতাভ গুপ্ত। বিজয়া মুখোপাধ্যায়। প্রণব চট্টোপাধ্যায়। কালীকৃষ্ণ গুহ। নন্দদুলাল আচার্য। বাসুদেব দেব। আনন্দ ঘোষহাজরা। প্রভাত চৌধুরী। নীরদ রায়। গোবিন্দ ভট্টাচার্য। সত্য গুহ। তুলসী মুখোপাধ্যায়। শিশির গুহ। কৃষ্ণা বসু। সুরজিৎ ঘোষ। জয়া মিত্র। নন্দিতা চৌধুরী। চৈতালী চট্টোপাধ্যায়। অনুরাধা মহাপাত্র। জয়দেব বসু। বিশ্বজিৎ পাণ্ডা। ঋজুরেখ চক্রবর্তী। জিয়াদ আলী। রূপা দাশগুপ্ত। ব্রত চক্রবর্তী। প্রবীর ভৌমিক। অনীক রুদ্র। অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়। সুমন গুণ। অভীক ভট্টাচার্য। প্রবালকুমার বসু। রাহুল পুরকায়স্থ। অলোককুমার ঘোষ। অমরেশ বিশ্বাস। প্রদীপ পাল ২৮০-৩১৪

প্রচ্ছদশিল্পী
পূর্ণেন্দু পত্রী

সম্পাদক
অমিতাভ দাশগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী
ধনঞ্জয় দাশ কার্তিক লাহিড়ী বাসব সরকার বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য
শুভ বসু

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ
রঞ্জন ধর

উপদেশকমণ্ডলী
গোপাল হালদার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

'নাই নাই ভয়' ঃ কিউবার অমৃত মন্ত্র

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

"Within the Revolution, every thing, against the Revolution, nothing!" [Fidel Castro, 1961]

"I would spend my last days in Gulag rather than in California." [Graham Greene, interview with 'Granma' (Havana) around Nov. 1983]

বেশ কিছুকাল আগে 'পরিচয়' পত্রিকাতেই ভিয়েতনাম-এর অসমসাহসী সংগ্রাম বিষয়ে লিখতে গিয়ে উদ্ধৃত করেছিলাম রবীন্দ্রনাথের কথা—"যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা / দাসত্বের ধূলি আঁকে নাই কলঙ্কতিলক"। অধুনা পূর্ব ইয়োরোপে প্রতিবিপ্লবের চতুর ছদ্মবেশী স্থিরসংকল্প ও ক্রমান্বিত আঘাতে এবং সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েটের অভ্যন্তরেই দীর্ঘদিনের প্রায়-অবোধ্য জাড্য ও তারই অনুষঙ্গে বিপ্লবী চরিত্রে ব্যাপক স্খলনের ফলে প্রায় যেন আত্মহননের মতো ঘটনায় জগৎ জুড়ে সমাজবাদ-সাম্যবাদের বিপর্যয় ঘটেছে। সমাজবাদের অগ্রগমনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিশ্বব্যাপী শ্রেণীবৈরিতাও যে কঠোরতর হয়ে ওঠে, স্টালিনের এই পুরনো সতর্কবাণীকে গ্রহণ না করে, যথাযথ সাবধানতা অবলম্বন ব্যাপারে শুধু সোভিয়েট নয় সারা দুনিয়ার কম্যুনিস্ট আন্দোলন অবহেলা দেখিয়ে এসেছে।° বেশ কিছু দেরিতে বুঝলেও এটা বোঝার চেষ্টা খুবই প্রয়োজন। ইতিহাসেরই সাক্ষ্য তো রয়েছে যে, বিপ্লব ঘটলে প্রতিবিপ্লবেরও আশঙ্কা থেকে যায়, বিলম্বিত হলেও সে-আশঙ্কার প্রচণ্ড গুরুত্ব কমে না। অতর্কিতে প্রতিবিপ্লবীর হাতে মার খেলাম বলে অজুহাত যে চলে না তা ফ্রান্সে ১৮৪৮-৫১ সালের ঘটনা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে স্বয়ং মার্ক্স্-এর বহু বহ্নিমান বক্তব্যে ঘোষিত হয়েছে। ব্যক্তি বা সমষ্টির কাছে ইতিহাসের তো কোনো বাধ্যবাধকতা নেই; বিপ্লব অনিবার্য বলে চড়ে বসলাম ইতিহাসের শকটে আর বিনা বাধাবিঘ্নে পৌছোলাম লক্ষ্যস্থলে, এমন কাণ্ড তো ঘটে না। সেখানে সর্বদাই যে থাকে মানুষের (ব্যক্তি ও সমষ্টি) সক্রিয় ভূমিকা। স্বখাত সলিলে

ডুবে মরার ঘটনাও তো একেবারে বিরল নয়। আর কিছু পরিমাণে তাই যে ঘটেছে পূর্ব ইয়োরোপে তা নিঃসংশয়। থাক্ সে-কথা, যার প্রকৃত সমীক্ষা কোনো একসময় ঘটবে আশা করি, আর বর্তমানের বিকট বিড়ম্বনা আর বিপদের অবসানকল্পে আবার জগৎ জুড়ে লড়াই চলতে থাকবে।

ইতিমধ্যে চলুক সর্বত্র যথোচিত কালোপযোগী বিপ্লবী চিন্তা ও কর্মের আয়োজন। কেমন করে মানবে দুনিয়ার মানুষ যে বঞ্চিত জনতা আবার জাগবে না? জগতের বর্তমান 'প্রভু' হয়ে যারা বসেছে, আমেরিকা-ব্রিটেন-জার্মানী-ইতালি ফ্রান্স, কানাডা-জাপান নিয়ে—জি-৭' বলে পরিচিত যে শক্তি, আমাদের মতো দেশকে অবলীলাক্রমে অবদমিত যারা করতে লেগেছে, "পবিত্রগণতন্ত্র'-র নামে যারা ইরাকের সঙ্গে লড়াইয়ে মরুযুদ্ধে ছ'হাজার আরব সৈন্যকে জীবন্ত অবস্থায় বালুকাসমাধি দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না, তাদের দুর্বৃত্তি আর দৌরাত্ম্যকে পরাস্ত করার প্রয়াসে সব দেশের জনতা লিপ্ত না হলে আমাদের মনুষ্যত্বই যে লুপ্ত হবে। এজন্যই ভাবি বিশেষ করে ছোট্ট কিউবার কথা, অকুতোভয় যে-দেশ গর্বভরে তুলে ধরেছে সমাজবাদ-সাম্যবাদের ধ্বজা—ধ্বনি তুলেছে: "Socialism or Death!" এবম্বিধ বাক্য, বাতুলতা মাত্র ভাববেন অবশ্য বহু বিজ্ঞজন। ভাবুন, তবু কিউবার দিকে তাকিয়ে মনে কেবলই ঘুরছে রবীন্দ্রনাথেরই বাণী:

যদি মাতে মহাকাল, উদ্দাম জটাজাল
ঝড়ে হয় লুন্ঠিত, ঢেউ হয় উত্তাল
হোয়ো নাকো কুন্ঠিত, তালে তার দিয়ো তাল—
জয় জয় জয় গান গাইও।
হাঁই মারো, মারো টান, হাঁইও॥

* * *

কিউবার বিপ্লব বিষয়ে সামান্য মাত্র সন্ধান থাকলে জানা যায় তার মোহনীয়তা—তারুণ্যের নানাগুণ, আদর্শনিষ্ঠা, চরিত্রবত্তা, অকুতোভয় কর্মব্যাপৃতি ইত্যাদির সমাবেশ মনকে মুগ্ধ না করে পারে না। ছোট্ট দ্বীপ, মার্কিন উপকূলের অদূরে। ইয়াঙ্কি প্রভুত্ববাদীদের চক্ষুশূল, পাশ্চাত্য গোলার্ধে সমাজবাদ-সাম্যবাদের এক প্রজ্বলন্ত প্রদীপ—একে নিভিয়ে দিতে, নিংড়ে ফেলতে, নিঃশেষ করতে আমেরিকান দৌরাত্ম্যের অন্ত নেই তেত্রিশ বৎসর ধরে। আন্তর্জাতিক বিধিব্যবস্থাকে অবজ্ঞা জানিয়ে আজও সেখানে গুয়ান্টা-

নামোতে মার্কিন ঘাঁটি রয়েছে। সর্বশক্তি দিয়ে তাকে অবরোধের জোরে টুঁটি টিপে মারার চেষ্টা কখনও স্তব্ধ হয় নি। জগৎ জুড়ে 'ঠাণ্ডা লড়াই' নাকি বন্ধ হয়েছে, কিন্তু কিউবাকে পিষে মারার মার্কিন দুর্বৃত্তির শেষ নেই। সোভিয়েট আর পূর্ব ইয়োরোপের প্রাক্তন সোসালিস্ট দেশ থেকে কিউবা পেতো খাদ্য, তেল, সিমেণ্ট, কলকব্জা প্রভৃতি জিনিস যা বিশেষভাবে কমানো দামে আমদানি হতো, আর কিউবা রপ্তানি করত তার প্রধান উৎপাদন চিনি আর নিকেল যা এখন তার পক্ষে সম্ভব আর নয়, কারণ প্রতিবিপ্লব জয়ী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোসালিস্ট বাণিজ্যনীতি পরিত্যক্ত হয়েছে। আমেরিকা আইন করতে চলেছে যাতে ক্যানাডা, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশ কিউবার সঙ্গে বাণিজ্য একেবারে বন্ধ করে দেয় আর সবাই মিলে ক্ষুধাকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে দুঃসাহসী কিউবাকে শায়েস্তা করা যায়, পদানত করা যায়। বিপ্লবী কিউবার সংকল্পকে চূর্ণ করা অবশ্য সহজ কর্ম নয়। কিন্তু ইতিমধ্যে সেখানকার বীর জনতাকে প্রচণ্ড অভাব ও কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। বাণিজ্য-সংকোচনের ফলে বিষম দুর্দশা তাকে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। মোটর গাড়ির সংখ্যা দারুণভাবে কমাতে হয়েছে; পেট্রোল আর যন্ত্রপাতি সবই প্রায় অপ্রাপ্য। চীন থেকে কয়েক লক্ষ বাইসাইকেল তাই কেনা হয়েছে; ঘোড়ায় টানা এবং গরুর গাড়ির ব্যবহার শুরু হয়েছে; ভোগ্যবস্তুর সরবরাহের একান্ত অভাব ঘটায় দেশের সবাইকে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। সহজ নয় এসব কাজ একেবারে। ত্রিশবর্ষাধিক সময় জুড়ে আমেরিকা টাকার জোরে, গোয়েন্দা লাগিয়ে, নেশাভাঙের অজস্র সুযোগ জুগিয়ে, চকমকে বিলাসিতার জীবনের লোভ দেখিয়ে আর অবশ্যই সমাজবাদ-সাম্যবাদবিরোধীদের কিনে নিয়ে মার্কিন প্রভুরা অবিরাম লেগে রয়েছে কিউবার শিরদাঁড়া বাঁকিয়ে দিতে, তার মাথা নুইয়ে দিতে। বহুকাল ধরে চলছে এই যে প্রক্রিয়া তাকে আরও জোরদার, আরও সোল্লাস করে তুলেছে সোভিয়েতসহ পূর্ব ইয়োরোপে প্রতিবিপ্লবের জয়। কেমন করে এই দুরবস্থার মধ্যে মনের জোর বজায় রেখে কিউবা লড়ছে তা বাস্তবিকই এক আশ্চর্য ঘটনা। তবু দেখি, শত্রুপক্ষের বিবরণেই দেখি যে, কিউবার রাজধানী হাভানায় ঢুকলেই চোখে পড়বে বিরাট প্রচারপত্র : "Mr. Imperialism, we are not afraid of you!" ["হে শ্রী সাম্রাজ্যবাদ, আমরা তোমাকে ভয় করি না।"]

"অভয় মন্ত্র, অশোক মন্ত্র" কেবল যে ফিদেল কাস্ত্রোর মতো তেজস্বী

কর্মবীরের বজ্রঘোষণায় প্রকাশ হচ্ছে তা নয়। এরই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দেখা দিল স্পেনের বার্সিলোনায় সম্প্রতি-সমাপ্ত 'অলিম্পিক' ক্রীড়াঙ্গনে। যেখানে বিশ্বের কঠোরতম ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় ছোট্ট কিউবা [যার লোকসংখ্যা বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে হারিয়ে যাবে!] হয়েছে পঞ্চম [উপরে যে চার দেশ আছে তার মধ্যে মার্কিনদের বাদ দিলে থাকে প্রাক্তন-সোভিয়েট, চীন আর জার্মানী, যাদের কৃতিত্বের দাবি মূলত ও প্রধানত থাকবে অধুনা-বিলুপ্ত সমাজবাদী ব্যবস্থার]। এটা আকস্মিক ঘটনা নয়, অলিম্পিকের ইতিহাসে সমাজবাদী দেশগুলির অতুলন সাফল্য বহুদিনই দেখা গিয়েছে। '৯১ সালেই Pan-American Games হয়েছিল হাভানাতে। কিউবার গৌরবগরিমা ছিল অম্লান। কাস্ত্রোর পিতৃভূমি হলো স্পেন; সেদেশ থেকেই বহু পরিবার আমেরিকায় বসবাস করছে; স্পেনের কবিতা অনবদ্য; সেদেশের স্ত্রী-পুরুষ স্বভাবত প্রাণোচ্ছল, আমুদে, নাচগানের ভক্ত। সুখী জীবনই তাদের কাম্য। আমাদের মতো "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" আউড়ে গোমড়া মুখে বসে থাকার পাত্র তারা নয়। তাদেরই ডাক দিয়েছেন কাস্ত্রো কৃচ্ছ্রসাধনে, এবং সন্দেহ নেই যে দারুণ উৎসাহী সাড়া পাচ্ছেন। এর মূল হেতু হলো সমাজবাদের বিপ্লবী আবেদন যা কাস্ত্রোও তার সহচরদের আত্মস্থ। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে আছে ক্রীতদাসরূপে আনা আফ্রিকানদের বংশধরেরা। প্রায় নিঃশেষ [শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারে] হলেও আদিম অধিবাসীও রয়েছেন। সবার রঙে রং মিশিয়ে কাস্ত্রো বলে থাকেন যে, তিনি 'লাতিন আমেরিকান' নন; তিনি বরঞ্চ হলেন 'লাতিন আফ্রিকান'। এজন্যই সোভিয়েট, জি-ডি-আর প্রভৃতির মতো দেশ যখন সোশ্যালিস্ট ছিল, তখন কিউবার মানুষ জাতিবর্ণ নির্বিশেষে তাদের সহযোগিতায় আঙ্গোলা, মোজাম্বিক প্রভৃতি আফ্রিকান দেশের মুক্তি-সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল, সদ্য-লব্ধ স্বাধীনতার বিকাশকল্পে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রশিক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারে পরম সহায় হয়েছিল। পূর্ব ইয়োরোপে বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে এ-কাজ বন্ধ হয়ে গেছে, নয়া-সাম্রাজ্যতন্ত্র সর্বত্র নবোদ্যমে অভ্যস্ত দৌরাত্ম্যে এখন প্রবৃত্ত। যাই হোক, 'লাতিন আফ্রিকান' হলেও কাস্ত্রো এবং তাঁর স্বদেশবাসীরা 'লাতিন' চরিত্র হারায় নি। জীবন যে সম্ভোগের বস্তু তা ভোলে নি। তবু তাদেরই আহ্বান জানানো হয়েছে বিপ্লবের জন্য কৃচ্ছ্রসাধনে। আর তারা সাড়া দিয়ে চলেছে। কিউবা-তে তাই আজ এক রণধ্বনি হলো: 'Socialism

means suffering !'—হ্যাঁ, সুখী জীবনের জন্যই দুঃখ আজ সইতে হবে। "আসুক সহস্র বাধা বাধুক প্রলয় / আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয় !" কী অপূর্ব মনুষ্যমহিমা এই অসম সময়ে সূচিত হচ্ছে ! বিশ্বে বিবেক বলে যদি কোনো বস্তু থাকে তো তার অকুতোভয় জয় ঘোষণা আজ করছে কিউবা। এমন মনোহারী দেশ এবং তার মানুষের সঙ্গে আমাদের মৈত্রীবন্ধন অটুট হোক।

* * * *

কাস্ত্রোর নেতৃত্বে আর অবিস্মরণীয় বিপ্লবী চে গুয়েভারা-র মতো বিশ্ববিমোহন মানুষের সাহচর্যে কিউবাতে যে বিপ্লব হয় তার স্বকীয়তা ভাস্বর হয়ে রয়েছে। সেদেশের তখনকার প্রায়-পোশাকী কম্যুনিস্ট পার্টি প্রথমে কাস্ত্রো সম্পর্কে কতকটা বিমুখ ছিল। তবে অনতিবিলম্বে একত্র কাজ চলতে থাকে, প্রশ্নাতীত কম্যুনিস্ট প্রত্যয় নিয়ে কাস্ত্রো সদলে পার্টির অন্তর্ভূক্ত হন। একটা নতুন হাওয়ার ঝলক তখন যেন বয়ে গিয়েছিল. আর কিউবার সমাজ-বাদী বিপ্লব একটা বিশিষ্ট মনোরম চেহারা নিয়েছিল [অবশ্য বিপ্লববিরোধী-দের চোখে নয়। মার্কিন কর্তৃপক্ষের রোষনয়ন কখনও একটুও নরম হয় নি !] এক ধরনের স্বচ্ছন্দ এবং স্বাতন্ত্র্যও কিউবার ক্ষেত্রে বারবার দেখা গিয়েছে যদিও ব্যতিক্রম ছিল। কিউবার বিরোধীরা নিশ্চিত হয় নি। বিপ্লব-পরবর্তী প্রথম দশকে বাণিজ্যমন্ত্রী-রূপে চে গুয়েভারা সোভিয়েট বাণিজ্যনীতির গলদ প্রকাশ্যে আলোচনা করেন আলজিয়র্সে। চে-র অশান্ত-বিপ্লব পরিক্রমা যা গোটা দক্ষিণ আমেরিকাকে কিছুকাল মাতিয়ে তুলেছিল নিত্যস্মরণীয় তার কথা এখানে তুলে ধরার দরকার নেই। শুধু না লিখে পারছি না যে চে-র পিছু ধাওয়া করে Regis Debray নামধেয় 'বিপ্লবী' লিখলেন, 'Revolution in a Revolution' গ্রন্থ, মস্ত বিপ্লববিশারদ নাম কিনে অনতিবিলম্বে রণে ভঙ্গ দিলেন এবং বর্তমানে বেশ কিছুকাল ফরাসী রাষ্ট্রপতি মিত্তের-মহোদয়ের পরামর্শদাতা পদে খোস-মেজাজে বহাল তবিয়তে বিরাজ করছেন, নিজেই লিখছেন যে প্যারিস ছাড়া কোথাও মন বসে না। তবে তারপরই হলো নিউইয়র্ক ! থাকুন এরা বেঁচেবর্তে, কিন্তু কিউবাতে কাস্ত্রো-সহ বিপ্লবীদের হাজার মুশকিলের মোকাবিলা করতে হয়েছে। কেউ কেউ হাল ছেড়ে দিলেও কম্যুনিস্ট পার্টির শ্রীবৃদ্ধি রুদ্ধ হয় নি। বরঞ্চ ক্রমান্বিত অগ্নিপরীক্ষায় সাফল্যই ঘটেছে।

'৬২ সালে কিউবা থেকে সোভিয়েটের পারমাণবিক অস্ত্র সরিয়ে নেওয়ার মার্কিন দাবি একটা বিশ্বসংকটের সৃষ্টি করে। যুদ্ধের সম্ভাবনায় জগৎ আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। সে সময়ে মাঝে মাঝে সোভিয়েটের সঙ্গেও অল্প মনান্তর ঘটলেও পরিণামে 'শেষ বেশ' দেখা যায়। ক্রুশ্চভ আর কেনেডির শুভবুদ্ধির ফলে সংকট কেটে যায়, আর কাস্ত্রো দুনিয়াকে সানন্দে ও সগর্বে সোভিয়েটের সঙ্গে কিউবার অটল মৈত্রী ঘোষণা করতে পারেন। এখানে বিশদ বিবরণ সম্ভব নয়। কিন্তু উল্লেখ করতেই হয় যে, একটা সময় ছিল যখন মহাচীনের গতিগতি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে আর কাস্ত্রো স্বভাবসিদ্ধ স্পষ্ট। এমনকি কঠোর ভাষাতে বলতে কসুর করেন নি যে, আন্তর্জাতিক স্তরে কম্যুনিস্ট সুসম্পর্ক লংঘিত হওয়ার যে সংকট তার জন্য চীনা নেতাদের দায়িত্ব কম নয়। এমনকি 'প্রতিবিপ্লবী' স্তরেও যেন তারা নেমে যেতে তৈরি ['নাটো'-সংস্থায় ষোড়শ সদস্য বলে বুর্জোয়া টীকাকারের দলের তখন মহা আমোদ।] কিন্তু স্পষ্টবাদী হয়েও বিশ্ববিপ্লবী প্রয়াসে আত্মনিবেদিত কিউবা কখনও আন্দোলনের লেশমাত্র ক্ষতিসাধনে সহায় হয় নি। এজন্যই মার্কিন সাম্রাজ্যতন্ত্রীদের নিরন্তর অপবাদ ও বৈরিতা সত্ত্বেও কিউবার সুখ্যাতি বিড়ম্বিত হতে পারে নি। বুর্জোয়া পর্যবেক্ষকরা না বলে প্রায়ই পারে নি যে কাস্ত্রোর 'কাস্ত্রোইকা' [গর্বাচভ-সাহেবের 'পেরেস্ত্রৈকা'-র জবাব!] দেশবাসীর খাদ্যাভাব দূর করেছে। শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদির সুব্যবস্থা করেছে, "Poor but pure" হলো এই ব্যবস্থা। কিছু দুর্বৃত্ত সর্বদা থাকলেও মোটের উপর তরুণ সমাজকে নীতি ও আদর্শে নিষ্ঠ হতে সহায়তা দিয়েছে, দক্ষিণ আমেরিকার সব দেশের মধ্যে কিউবাতেই সাধারণ মানুষের জীবনের মান ছিল শ্রেষ্ঠ। আজ অবশ্য সেই মান বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব হতে চলেছে আর সেজন্যই কাস্ত্রো কৃচ্ছ্রসাধনের বাণী প্রচার করে চলেছেন।

কাস্ত্রোর মুখ থেকেই তাই শুনি : "আমাদের মরা হাড়ে আবার কিউবার জমি উর্বর হয়ে উঠুক, তবু কিছুতেই সমাজবাদ-সাম্যবাদকে পরিহার করব না!" আমাদের দেশ-সমেত সকল দেশের শ্রেষ্ঠ-শিক্ষা যা বলে, পাশ্চাত্যে রুসো থেকে মার্কস্ যার পুনরাবৃত্তি করেছেন ধনতন্ত্রে নিছক সম্ভোগপ্রবৃত্তির অবিবেকী চরিত্রধ্বংসী আতিশয্যের অভিশাপ বিষয়ে। তাই শুনছি কাস্ত্রোর কণ্ঠে কিউবার কঠোর কর্মযজ্ঞের ডাক। কিউবার রাষ্ট্রদূত যখনই আসছেন

আমাদের মধ্যে, তখনই তাঁর কথায়, কাজে, মানসিকতায়, ভবিষ্যৎ চিন্তায় তারই প্রতিচ্ছবি পাচ্ছি।

* * * *

১৯৯১ সালে "The August Coup" রচনায় যিনি লেখেন : "I made my choice long ago", সেই গর্বাচভ-প্রমুখের উদ্যোগিতায়, সোভিয়েটেরই নিজস্ব অধঃপতনের ফলে, প্রায় দুনিয়া জুড়েই কম্যুনিস্ট কার্যক্রম, তৃতীয় বিশ্বে বিশেষ করে ক্রমশ সমাজ রূপান্তরের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে মামুলি রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ায় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বহু কারণে ১৯৮৫-৮৭ থেকে শুরু করে সমাজবাদ-সাম্যবাদের বিপর্যয় ঘটল, তখন প্রথম থেকেই যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব সতর্কবাণী কিউবার দিক থেকে এসেছে। সংকট ঘনিয়ে আসছে দেখেও যথেষ্ট সংযমের সঙ্গে কিউবা বলেছে : 'বিপ্লবের ব্যাপক মানহানি আর শিকড় ধরে তাকে উপড়ে ফেলার মতো অপপ্রচার বন্ধ হোক্; সোভিয়েট বিপ্লবের গতিপথে বহু গ্লানি অন্যায় আর অপরাধ ঘটে থাকলেও তার মৌলিক মহিমাকে কলঙ্কলিপ্ত করা চলবে না; ঐতিহাসিক বিচারে কম্যুনিস্ট পার্টির সৃজনশীল ভূমিকাকে অবলুপ্ত কিছুতেই যেন করা না হয়' ইত্যাদি বহু মূল্যবান পরামর্শ এসেছে কিউবা থেকে। ফিদেল কাস্ত্রোকে কয়েকবার আমি দেখেছি। কথা বলেছি, তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। দিল্লীতে দেখা হয়েছে। বার্লিনে (১৯৭২) বক্তৃতা শুনেছি, নভেম্বর ১৯৮৭-তে মস্কোতে দেখেছি। বিপ্লবের ৭০-তম বার্ষিকীর প্রথম দিনে তিনি আসেন নি। দ্বিতীয় দিনে এলেন, বেশ কিছুটা গম্ভীর, যেন বিষণ্ণ, কথা বললেন প্রধানত নিকারাগুয়া প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশের কমরেডদের সঙ্গে, সোভিয়েট হোতারা খুব একটা আগ্রহ দেখালেন না [১৯৮৭ সালের সম্মেলনে 'তৃতীয় দুনিয়া' যে খানিকটা অবহেলিত তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমি নিজেকেই বলতে পারি]। কাস্ত্রো বললেন কিছু কথা, কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিতা ছিল না, নৈরাশ্য না হলেও অপ্রসন্নতা ছিল যেন তার মনে। তাই অমন এক অনুষ্ঠানে প্রত্যাশিত মর্মস্পর্শী ভাষণ কেউ শুনল না। তখনও কারও কল্পনাতেই নেই যে ধীরে, অথচ স্থির পদক্ষেপে গর্বাচভ-নেতৃত্ব এগোতে থাকবে সোসালিস্ট সৌধের প্রস্তরগুলিকে সুকৌশলে ভেঙে ফেলতে। তখনও চিন্তার বাইরে ছিল যে, বার্লিনে '৮৯-এর ৭ই অক্টোবর জি-ডি-আর প্রতিষ্ঠার চল্লিশতম বার্ষিকীতে হনেকার-কে কমরেড সম্বোধনে ভাষণ দেবার অব্যবহিত পরেই গর্বাচভ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে এগোবেন, জি-ডি-আরকে বিধ্বস্ত করার

পরিকল্পনা কার্যকর হবে। লিখছি যখন, তখন সামনে রয়েছে "Gorbachov in Cuba: Documents and Materials" ২—৫ এপ্রিল '৮৯-এ গর্বাচভের ভাষণ ইত্যাদি যাতে রয়েছে। বক্তৃতায় বন্ধুতার উত্তাপ নেই কিন্তু-বৈরিতা সুকৌশলে লুক্কায়িত—যে বৈরিতা ফেটে পড়ল অনতিবিলম্বে। আশ্চর্য নয়, কারণ গর্বাচভ তখন মশগুল "Our common dear European home" নিয়ে [যার বিস্তৃতি ব্যাখ্যা করলেন তিনি প্যারিসে—"from the Atlantic to the Urals"]। Alexander Yakovlev-এর মতো ব্যক্তি, একদা "পেরেস্ত্রৈকার জনক" বলে খ্যাত এবং কয়েক বছর গর্বাচভের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ, সম্প্রতি নিজমূর্তিতে দেখা দিয়েছেন, বহুকাল ধরে লুক্কায়িত সমাজবাদ বিরোধিতা একান্ত নির্লজ্জভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ইয়োরোপের "সভ্যতা"-য় প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন দেখেছেন তাঁরা—দেখুন, ক্ষতি নেই, ইতিহাস চলবে নিজস্ব গতিতে. কিন্তু একটা 'দশকের শ্রেষ্ঠ পুরুষ' বলে' বন্দিত, 'নোবেল' শান্তি পুরস্কারে ভূষিত, মার্কিনদেশে 'Gorbie' নামে সবাইকে আহ্লাদে আটখানা করার নায়ক মহাশয়ের আজকের অবস্থা সবাই দেখছি। চিবিয়ে-ফেলা ছিবড়ের মতো দেখাচ্ছে প্রাক্তন প্রিয়পাত্রকে। নির্মম ধনশক্তি এভাবেই চলে। কই, যে-বিজ্ঞানী শাখারভকে ভারতের কোনো কোনো কম্যুনিস্ট নেতা তো রুশ দেশের গান্ধী ভেবে মাথায় তুললেন কিন্তু পাশ্চাত্যে তার স্থান আজ কোথায়? অমন যে Solzhenitsyn, যার তুলনা নাকি নেই রুশ সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে, তারও মার্কিন দেশেই প্রায়-বিস্মৃত অবস্থান কি দেখছি না? অতিরিক্ত মদ্যপ বলে একদা চিহ্নিত ইয়েল্‌ৎসিন আপাতত কিছু মার্কিন হাততালি পাচ্ছে। কিন্তু তাই বা কতদিন চলবে? এমন সব গুণধর সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির একদা কর্ণধার হতে পারাটাই হলো সে দেশের অধঃপাতের একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ। দুঃখ আরও এই যে আমরাও তৃতীয় বিশ্বে এমনই কর্তব্যপালনে অপারগ হয়েছি যে, নির্জোট আন্দোলন উঠে গেছে। শান্তি আন্দোলনের সাড়াশব্দ নেই ['Order of Lenin'-ধারী যে রমেশচন্দ্রকে নিয়ে আমাদের অহঙ্কার ছিল তিনি কোথায় জানি না], 'New InternationalEconomic Order'-এর প্রবক্তারা এখন মনোমোহন সিংহদের ভিড়ে হারিয়ে গেছেন, New International Information Order-এর একদা উচ্চভাষী দাবিদার সাংবাদিকদের মধ্যে কম্যুনিস্ট নামধারীরা International Television-এর অর্থপুষ্ট হয়ে সোল্লাসে বুখারেস্ট আর

অন্যত্র কম্যুনিজম্-এর পতন-সংবাদ বিতরণে ব্যস্ত হয়েছেন, আফগান বিপ্লবকে সুবিপুল সম্বর্ধনা জানাবার পর 'গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেবার' কাজে উদ্যোগী হয়েছেন—কত আর বলি, লিখে চলছি তীব্রবেগে, হয়তো একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছি, কিন্তু বড় দুঃখেই এটা ঘটছে। কোনো সান্ত্বনাই নেই ভেবে যে ১৯৮৭ নভেম্বরে ক্রেমলিনে প্রত্যক্ষদর্শী হয়েই আমার মনে সংশয় ভিড় করতে শুরু করেছিল। তখনই একদিন আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতা Oliver Tambo-কে জড়িয়ে ধরে বলি: 'কমরেড, এই পশ্চিমীগুলোকে যে-আর সইতে পারছি না'। আর পোড়-খাওয়া বিপ্লবী আমাকে বলেন, 'ধৈর্য-যে আমাদের ধরতেই হবে, we have to live with it'।

* * * *

লিখে যেতে কষ্ট হচ্ছে, তবে আরও কষ্ট হচ্ছে দেখে কতকগুলো 'Moscow News' আর 'New Times' যা ছড়িয়ে রয়েছে টেবিলেই। এই Moscow News (৪৪নং, ১৯৯০) প্রকাণ্ড হেডিং ছাপিয়েছে: "Castro is the Caribbean's Saddam Hussein!" কিউবা থেকে প্রকাশিত পুস্তিকা "Being True to Principles"-কে বিদ্রূপ করে মস্ত লেখার শিরোনাম দিল মস্কো নিউজ (১০নং, ১৯৯০): "Being true to Principles or Principles being True?" ঠাট্টা দেখলাম যে হাভানা ভাণ করছে যে সকল সত্যের অধিকারী হলো কিউবা ["a sage who alone knows the right way]। মস্কো নিউজ (৩৮নং, ১৯৯০) উত্তর কোরিয়ার মুণ্ডপাত করার সঙ্গে সঙ্গে মস্ত হরফে ছাপালো "The Other Cuba"। মিয়ামি-তে ভিড়-জমানো কিউবান্ দুর্বৃত্তদের বর্ণনা আর ভবিষ্যদ্বাণী যে শীঘ্রই কিউবার সোসালিস্ট ব্যবস্থা 'পটল তুলতে বাধ্য হবে'! কী অপরাধ কিউবার যে মস্কোওয়ালাদের এমন আক্রোশ! অপরাধ হলো কিউবার দৃপ্ত ঘোষণা যে সমাজকে কলঙ্কমুক্ত করা সম্ভব নয় যদি "সমাজবাদের কুৎসা ক্রমাগত রটানো হয়। যদি কম্যুনিস্ট পার্টির মর্যাদাকে ধ্বংস করা হয়, যদি সমাজবাদের মূল্যবোধকে নষ্ট করা হয়, যদি সমাজে অগ্রগামী শক্তির উদ্দীপনাকে ভেঙে দেওয়া হয়, যদি সামাজিক শৃংখলাকে বিকল হতে দেওয়া হয়। যদি কেবলই পার্টি আর প্রশাসনের ভার-ভ্রান্ত নেতৃত্বের নিন্দাই চলতে থাকে।" পুনর্বিন্যাসের নামে সমাজবাদ-সাম্যবাদের সর্বনাশ-সাধনে

যাদের কুণ্ঠা জাগেনি, তারা সইবে কেমন করে ছোট্ট কিউবার এই 'আস্ফালন' ?

কিছুকাল আগে ইরাক-ইরান যুদ্ধ নিয়ে বোলচাল ছাড়তে গিয়ে লণ্ডন 'ইকনমিস্ট'-এর মতো সুসভ্য পত্রিকা লেখে যে তারা হলো 'চার অক্ষর'-এর দেশ ("four-letter countries")। ইংরিজী কয়েকটা চার অক্ষরের শব্দ আছে যা ভদ্রসমাজে উচ্চারণ নিষেধ। আমাদের মতো অ-শ্বেতাঙ্গ দেশ হলো দুনিয়ার অহঙ্কারী মালিকদের কাছ নোংরা, অনুচ্চার্য। তাই তো দেখি এ যাবৎ পারমাণবিক বোমা পড়েছে জাপানে, জীবাণু-যুদ্ধ হয়েছে কোরিয়ার বিরুদ্ধে, রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার হয়েছে ভিয়েতনামে। ইলেকট্রনিক যুদ্ধ হয়েছে ইরাকের সঙ্গে—সবই অ-শ্বেতাঙ্গদের পোড়া বুকে চাপানো হয়েছে! কিউবা হলো আর এক 'four-letter' দেশ, যাকে শুধু অবজ্ঞা করে নিয়ে, দানবীয় ক্রূরতার অস্ত্র দিয়ে যাকে মাথা নীচু করানো হবে। অবশ্য "The best-laid plans of mice and men" ভেস্তে যায়। মনুষ্যত্বের এমন নির্লজ্জ অপমান যে সহ্য করবে না মানুষ, তার দৃপ্ত পূর্বাভাস আসছে কিউবা থেকে। ১৯৪৫ থেকে ১৯৮০-এর মধ্যে ইউনাইটেড নেশন্‌সে মার্কিন দৌরাত্ম্য রোধে যে সোভিয়েট 'ভিটো' ব্যবহার করেছিল ১১২ বার, সেই সোভিয়েট আর সে নেই। দুনিয়া আজ সাম্রাজ্যবাদের কব্জায়, কিন্তু তবুও মানুষ জাগবেই, অন্যায়কে সইবে না।

অলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গনে গোটা জগতের সোসালিস্ট সংগ্রামের প্রতীক ছিল অপরাজিত, অপরাজেয় কিউবা। Rio de Janeiro-তে বিশ্বপরিবেশ রক্ষা সম্মেলনে মার্কিন রাষ্ট্রপতির অপদস্থতা আর সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট কিউবার নেতা কাস্ত্রোর সমাদর সম্প্রতিকালের স্মরণীয় ঘটনা। গোটা দক্ষিণ আমেরিকা অন্তর দিয়ে জানে এবং বোঝে যে কিউবার বিপ্লব নিরন্তর-বিপদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে আজও সমুজ্জ্বল চেহারায় দেখা দিয়েছে। বিলাসী জীবনের লোভ দেখিয়ে, প্রায় যেন টেলিভিশন প্রচারের চাপে, সোসালিস্ট ধ্যানধারণাকে উল্টে দেওয়ার চেষ্টায় অবশ্য বিরাম নেই। আমাদের সাংবাদিকদেরও অনেকে চীনে গিয়ে সাংহাই শহরে ও সন্নিকটস্থ অঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকায় ভোগ্যদ্রব্য আর বিলাসবস্তুর প্রাচুর্য দেখে ভেবেছেন [যেমন, ইন্দর মালহোত্রা, 'Sunday', 14—20 June 1992-তে] যে সাম্যবাদের পীঠস্থানেই "replacement of Marx by Mammon" ["মার্কসের জায়গায় ম্যামন'-

এর অবস্থান") ঘটেছে! চীনের একান্ত বাস্তববাদী অথচ মূলগতভাবে সমাজবাদ-সাম্যবাদ বিষয়ে পূর্ণ প্রত্যয়ী নেতৃত্বই যথাসময়ে জগৎকে জানাবে যে লক্ষ্মীর কল্যাণী মূর্তির বদলে কুবেরকে না বসিয়ে তার দেশে নবযুগ সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে কি না। উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকার সংযোগস্থলে ক্যারিবিয়ান্ দ্বীপাঞ্চলে (যার অংশীভূত হলো কিউবা) মার্কিন প্রভুত্বলালসা গোটা এলাকাকে 'পিছনের উঠোন' বানাতে গিয়ে এখনও তো সফল হতে পারে নি। নিকারাগুয়াতে বদমায়েসি করে জনপ্রিয় শাসনকে হঠিয়েছে বটে কিন্তু ফিরিয়ে আনতে পারেনি আগেকার তাঁবেদার Somoza-পন্থীদের [যে Somoza সম্বন্ধে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার স্বয়ং বলেছিলেন, সে হলো কুম্ভীর বাচ্চা কিন্তু আমাদেরই নিজস্ব কুম্ভীর বাচ্চা—he is a son of a bitch but our own son of a bitch!] কিউবাকে চূর্ণ করতে পারলে মার্কিন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে বটে, কিন্তু এ হলো শিবের অসাধ্য কর্ম, যে "যৌবনজলতরঙ্গ" আজও কিউবায় বহমান, কে তাকে রোধ করতে পারে?

এদেশে আমরা বিশ্বপরিবেশের চাপে আর নিজেদেরই অকর্মণ্যতার ফলে পাশ্চাত্যের (জাপান-সহ) ধনশক্তির কাছে প্রায় দাসখৎ লিখে ফেলতে চলেছি। খবর পড়ি যে, বিশাখাপত্তনে মার্কিন নৌঘাঁটি বুঝি হবে—আশ্চর্য নয়। মার্কিন নৌবাহিনীর সঙ্গে একত্র মহড়াও তো আমরা সম্প্রতি দিয়েছি! ভারত-মহাসাগর অঞ্চলে প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য প্রধান কেন্দ্রীয় মার্কিন ঘাঁটি (পারমাণবিক অস্ত্রসজ্জিত) রয়েছে মরিশাস-এর কাছ থেকে চুরি করে আনা Diego Garcia-দ্বীপে। যার কোচিন থেকে দূরত্ব, দিল্লী থেকে কোচিনের দূরত্বের চেয়ে কম। এবার বুঝি খাস্ বিশাখাপত্তনে "The lords of human kind"-দের আমরা অভ্যর্থনা করি! কিন্তু এটাই তো শেষ কথা হতে পারে না।

কিউবার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে এগোবার চেষ্টা তাই আজ চলছে আমাদের মধ্যে। বাধা-বিঘ্নের শেষ নেই। কিউবাতে কোনোকিছু পাঠানোই যে মার্কিন প্রভুদের প্রকুপ্ত করবে। আমাদের কাছ থেকে পশ্চিমী সহায়তা সরিয়ে নেবে তারা, আরও কত রকমের বাধা। দেশের ভিতরে পশ্চিমী প্রভুত্বের পক্ষে বাজনদারেরও তো অভাব নেই। মুষ্টিভিক্ষা মারফৎ চাল গম ইত্যাদি সংগ্রহের চেষ্টাকে তাই উপহসিত হতে হচ্ছে। দেশের গরীবদের প্রতি দরদ যাদের আছে বলে জানা ছিল না তারা গম্ভীর গলায় বলছে যে

এদেশের গরীব খেতে পায় না আর কম্যুনিস্টরা "দেশের লোক খেতে পায় না —খাওয়াবার জন্য 'শঙ্করা'-কে ডাকছে। যত বিদ্রূপই হোক্ না কেন, দুনিয়া জানে বলেই তো প্রবাদ বাক্য আছে গরীবই গরীবের সহায় ["It is the poor who helps the poor"]। মুষ্টিভিক্ষা তো এদেশে কখনও নিন্দার্হ ছিল না। আর মনে পড়ছে St. Francis of Assissi-র মতো মহাপ্রাণ মানুষের এক কাহিনী। গির্জার বিশপ-এর ঘরে ভোজনের নিমন্ত্রণে গিয়ে তিনি নিজের ভিক্ষার ঝুলি থেকে প্রতিটি অতিথির পাত্রের পাশে এক খণ্ড রুটি রাখছেন দেখে বিশপ ভৎর্সনা করেন : 'ফ্রান্সিসকা। আমি তো রুটির ব্যবস্থা ভালোভাবেই করেছি'। অবিস্মরণীয় জবাব আসে : "মহামহিম বিশপ মহোদয়। আমি যে গরীবের ঘর থেকে ভিক্ষা করে এনেছি এই রুটি। এ যে পবিত্র বস্তু!' এটা মনে পড়ে আর ভাবি কেমন যেন পবিত্রতা মিশিয়ে থাকবে গরীব ভারতবর্ষ থেকে কিউবাতে পাঠানো এই ভালোবাসার দিনে, জগৎ জোড়া মুক্তি-প্রয়াসের পূত পুণ্য প্রতীকরূপে।

আন্তর্জাতিক সোসালিস্ট মৈত্রীর যুগ কিছুকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে সন্দেহ নেই। মনে পড়ছে, ১৯৬৬ সালে ভিয়েতনাম-এর কম্যুনিস্ট নেতা Le Duan বলছেন : 'সোভিয়েত আর চীনের কাছ থেকে অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েই আমরা লড়ছি' আর যোগ করেন অবিস্মরণীয় বাক্য : "সোভিয়েট আর আমরা যেন, পান্তাভাত ভাগ করে খেয়েছি ["Sharing their rice and water"]। ছিল একদিন যখন সোভিয়েটের বিপ্লবী গর্ব ছিল যে ভিয়েতনাম, কিউবা, আঙ্গোলা, মোজাম্বিক প্রভৃতি নানা দেশে বিপ্লবশক্তি-বিকাশের জন্য নিজেকে বঞ্চিত করেও সহায়তা সোভিয়েট দিচ্ছে—এমনকি পূর্ব-জার্মানী কিম্বা চেকোশ্লোভাকিয়ার মতো জীবনযাত্রার মানের বিচারে অগ্রসর দেশকেও সোভিয়েট সহায়তা দিয়ে চলেছে। পরে, গর্বাচভ-দের কাছ থেকে জেনেছি এ নিয়ে-সোভিয়েটের মানুষ নাকি ক্ষুব্ধ বোধ করেছে, নিজেদের দিকে তাকাতে গিয়েই আজ তারা পশ্চিমের বৈভব আর বিলাসিতার মোহে পড়েছে। ধনতন্ত্রের চাকচিক্যের মায়ায় বাঁধা পড়েছে। কিছু বাস্তব সত্য এতে রয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু এই গোড়ায়-গলদ ব্যাপারটি আগে ধরা যায় নি। মূল নীতি, কম্যুনিজ্‌ম্‌-এর বিশ্ববীক্ষা ও জীবনদর্শন প্রায় ভুলে যাওয়া হয়েছিল বলে। কিউবা এ ভুল করে নি। আজও জোর গলায় তাই কিউবা বলছে : যত বিপদ আসুক না কেন, মৃত্যু বরণ করতে হয় হোক্, কিন্তু জগৎ

জুড়ে দুঃখীর দুঃখকে সমূলে নিঃশেষ করার যে লড়াই, সমাজবাদ সাম্যবাদের যে লড়াই তা থেকে বিরত হবো না।

কিউবার মানুষের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমরা কবে বলার অধিকারী হবো : "ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।" এ-আগুন সর্বভুক্ সর্বনাশা কাণ্ড নয়। এ হলো মানুষের জীবন। মানুষের সভ্যতাকে যথাসম্ভব নিষ্কলুষ করে তোলার সংগ্রাম। এ হলো অযুতবর্ষব্যাপী মানবনিগ্রহের অবসানসূচনা, এ হলো জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'নবজীবনের গান'। কবে যে "সমিতির সাম্যে ও ঐক্যে / জনতার মুখরিত সখ্যে" জাগ্রত হয়ে আমরা মানুষ হয়ে ওঠার লড়াইয়ে কায়মনোবাক্যে নামতে পারব, কে জানে? ইতিমধ্যে সমাজবাদ-সাম্যবাদে পূর্ণ প্রত্যয়ের যে ধ্বজা উড্ডীন রেখেছে কিউবা, সেই ধ্বজাকে আমরা যেন অভিনন্দিত করতে পারি, সেই প্রত্যয়ের প্রতি সম্মান দেখাতে পারি, আমাদের এই "দুঃখী অথচ অন্নপূর্ণা" মাতৃভূমিতে নব-যুগের জন্ম ঘটাতে সহায় হতে পারি।

মনে মনে গড়া

অরুণ মিত্র

বর্ষার ভেতর দিয়ে এলাম
কোথাও কোনো ছাত ছিলো না মাথার ওপর,
রোদের হল্‌কার ভেতর দিয়ে এলাম
কোথাও কোনো দেয়ালের আড়াল ছিলো না,
কাঁটার জমিতে হাঁটতে হাঁটতে এলাম
কোথাও মেঝে ছিলো না পায়ের নিচে।

আমি এই শূন্যতায় অগ্রসর হচ্ছি
অথচ মনে মনে গড়ছি
আলোর ঘর
খুশির হাওয়ায় বুকজুড়োনো কথা
আর ঠাণ্ডা মাটির এক পৃথিবী।

বলো তোমরা আমি কি করুণার পাত্র ?

পুনরুত্থান

মণীন্দ্র রায়

॥ ১ ॥

অন্ধকার, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ?
মহাদেবের জটা হইতে।

আমাদের চেতনার গম্বুজে কচ্ছপখোলের অর্ধবৃত্তে
ধূম্রনীল মেঘশিল্পের চলমান ভাস্কর্য—
পাহাড় মন্দির সমুদ্রসিংহের দ্রুতসঞ্চারী মন্তাজ এবং মিক্সিং।

আমাদের কল্পনার সিলিংচিত্রে
প্রভাতপল্লবের স্বর্গনিটোল শিশিরবিন্দু—
মুঠিতে ধরতে গেলেই প্যালেটশুদ্ধু লাফিয়ে
মুখে সাঁটা চ্যাপলিনের হাফবয়েল ডিম।

কার্যকারণহীন এই আকস্মিকতা।
এঁটেল মাটির মত নাছোড়বান্দা।

॥ ২ ॥

অন্ধকার, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?
মস্তিস্কের ঝুলকালি হইতে।

গ্রীক পুরাণের জিউস যখন ধ্বংস করেন কাউকে
তার মাথাটাই দেন বিগড়ে।

ভ্রান্তির ঘরগোনা-বৃত্তে ছুটন্ত আমরা উরুর পেশিকে ক্লান্ত করি,
অপেক্ষমান কেন্দ্রের শৃগালদন্তের সদ্‌গতির জন্যে।
তারপর রুটি মাখন মাংস
ডলার এবং মার্ক, পাউণ্ড, ফ্রাঙ্ক, ইয়েন,
আর মদ, মেয়েমানুষ, এইড্‌স,
খোলাবাজার আর ক্যাবারে।
ওদিকে নিত্য দুর্ভিক্ষের করাঘাত।
পরম শান্তির বুঝি দেরি নেই আর।

॥ ৩ ॥

অন্ধকার, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ?
আলোকমণ্ডলের বিপ্রতীপ বিবর হইতে।
পিঙ্গলচক্ষু রোমশ মাকড়শা রয়েছে প্রাণপতঙ্গের পথে জাল পেতে।
কাদায় পদক্ষেপের ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ,
অদৃশ্য আবহে প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় পাখির
ক্যানেস্তাটিনে বাজি ফাটানোর ধাতব হিংস্রতা।

এই ভৌতিক ছাউনি থেকে বেরোলেই বিশ্বাস হয় না
গীর্জামথিত উষা কয়ারস্তোত্রের ইন্দ্রজাল—
অবলোহিত থেকে অতিবেগনির সিম্ফনি।

মানুষের ধমনী কি উত্তাল হবে না সেই
সজ্জিত যুদ্ধাশ্বের হ্রেষাধ্বনিতে ?
মানুষের হৃদয় কি অভীপ্সাব্যাকুল হবে না
চিরযৌবনা মৃত্তিকার ঋতুস্নানের পরেও ?
ওহে কুযুক্তির পুরুৎঠাকুর !
মানুষকে ন্যাংটো করলে
মুখে ছিট্‌কে পড়ে প্রস্রাব আর বিষ্ঠা।
স্পার্টাকাস থেকে বাস্তিল, বাস্তিল থেকে শীতপ্রাসাদ,
এবং এখন—।

ইতিহাস তো চলে না প্রজন্মের মাপে।
তাপ তো জমছেই—জমছে না ?
মাটির ওপর কান পেতে শোনো,
অঙ্কটি বরং শিখে নাও
প্রথম ব্রহ্ম-অণ্ড ফাটার সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে।
মানুষ কি মেনে নেবে এই
নপুংসক অস্তিত্বের ঢোলক-বাজানো অশ্লীলতা ?
হা মানুষ !

॥ ৪ ॥

অন্ধকার, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ—
দুঃস্বপ্ন-গিরগিটির কালো চক্ষু হইতে।
ভয়, ভয় থেকে অসাড়তা।
হাত, হাত নয়, পা, পা নয়, ইচ্ছে, ইচ্ছে নয়।
তলিয়ে যাচ্ছি যেন আমরা
শ্মশানচণ্ডালের ধেনো মদের দুর্গন্ধে,
বমি আর প্রলাপের ঘূর্ণিপাকে।

কে ? কে এসে বলবে—না !
ছোঁ মেরে কার ঈগলচঞ্চু তুলে নেবে দেওদারের শূন্যে,
আছড়ে ফেলবে গণ্ডোয়ানার টাঁড় মাটিতে ?
টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে আমাদের
করোটি আর কশেরুকা, যকৃৎ অন্ত্র নাভিকুণ্ডলী আর জিহ্বা।
ডুকরে উঠব আমরা চারদিক থেকে—
ফিরিয়ে দাও আমাদের গোটা শরীর।

ওগো আদি জননী,
ভূমিষ্ঠ করো আবার আমাদের
রক্ত জল কান্না আর ক্লেদের মধ্যে।
আবার আমরা হই—হতে থাকি,
শত অন্তর্ঘাতের আর ডাইনীর উচাটন ডিঙিয়ে
আমরা হই, আর হতে থাকি।

অন্ধকারের কফিন খুলে
কী মহান আমাদের সেই পুনরুত্থান !

কে-যে আমার

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

কে-যে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে-ফিরছে
খাচ্ছেদাচ্ছে উঠছে-বসছে সঙ্গে সঙ্গে
দেখতে চাইছে তেরছা-চোখে ভেতরে কে !
পঙ্গু আমার চলনবলন ধরনধারণ
বদ-অভ্যেস পক্ষাঘাতের : কোন কথাটা
বলব-বলব করে বিলকুল তাঙড়ে রাখা
ভাবনাগুলো তালগুলিয়ে ফেলা গিলে
আর যে-কথা একেবারে হজম, কখন
সেটাই জিভে লুফে-লুফে তারিফ করা—
এমনি বিতিকিচ্ছি আমার স্বভাবটাকে

ফাঁক করে কে মাথা গলায় ভেতর আমার
কোথায় আমি রই পালিয়ে আমার ভেতর।
কোথায় আমার ফটোগ্রাফের নেগেটিভ্-এ
অন্য মুখের আদল আছে মুখ লুকিয়ে
ধুলো-পড়া কুলুঙ্গিতে পাণ্ডুলিপি
হিজিবিজি নক্‌শা মনের রাখে লিখে
ভুলে যাওয়া আদ্যিকালের মনের খবর
অনেক চিত্রবিচিত্র শখ আবছা রঙিন
ধূসর ধুলোর সে-ই বকবক কে শুনতে চায়
ছবির সে-সব নেগেটিভ্-কে জ্যান্ত করতে
কার এত শখ?

আজ-দিনকাল বড্ড খারাপ
আকাঙ্ক্ষারই আগুনে জল নিত্যি ঢেলে
আশা আমার মাড়ায় না পথ, আনাচকানাচ
ভালোবাসা জাপটে শরীর ধরতে চাইলে
মুখ মটকে হাসে সুদখোর লাভ-লোকসান
খুন ছিনতাই চলছে স্বপ্ন জলজ্যান্ত-র
হেসে-হেসে ছুরি মারছে আস্থা-ভরসা
বড্ড খাশা ঝাড়া-হাতপা আজ-দিনকাল—
কার এত শখ? সেদিনের মন সে-গুপ্তধন
সন্ধানে কে ছায়ার মতন কে-যে আমার
সঙ্গে সঙ্গে উঠছে-বসছে ঘুরছে-ফিরছে
কে-যে আমার!

হে মাতঃ বঙ্গ

গোলাম কুদ্দুস

হে মাতঃ বঙ্গ, হে বঙ্গ জননী,
বিস্মৃত স্বপ্নের মত মনে পড়ে
একদা কত না কবি রচিত তোমার স্তোত্র।
এখন নিঃঝুম পুরী।
এলো হতদর, অনাদর, ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপের কাল।

এই উপহাস সত্য হ'লে মিথ্যা হত মাতৃত্বের অহঙ্কার।
সন্তানের দারুণ দুর্দিনে মা কি কভু ছেড়ে চলে যায়?
পাশে দিলে মাতা যথাসাধ্য পূর্বস্মৃতি পূর্বপ্রীতি
স্মরণ করিয়ে দিতে অবুঝ সন্তানদের,
মার কাজে যোগ দিতে এসেছিল অলক্ষ্যে কখন
সুমহান পুত্রগণ কপোতাক্ষ তীর থেকে,
বীরসিংহ গ্রাম থেকে, জোড়াসাঁকো-কাঁঠালপাড়ার
প্রান্ত থেকে, সঙ্গে নিয়ে এসেছিল
আপন সৃষ্টির ডালি মায়ের গৌরব উদ্ধারিতে,
মায়ের বেদনা মুছে নিতে।
হায় মাতা! এত ব্যথা সইতে হত না যদি
নিন্দুকের কথা মত প্রবেশিতে আপন সাগরে।
শান্তিতে কাটাতে কাল, কারো সাধ্য হ'ত না কখনো
বিস্তীর্ণ সাগরজল ছুরি দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে
রক্তে লাল ক'রে দেয় নীলাম্বুরাশিকে।
সচক্ষে দেখতে হ'ত না মা গো
সন্তানে সন্তানে হানাহানি।

একদিন ধূলিতে শুকাল রক্ত।
মনে হয়েছিল এইবার নিশ্বাসে প্রশ্বাসে
বিশ্বাসের প্রবাহিত বায়ু শীতল করিবে হিয়া।

কিন্তু দেখা গেল, নামমাত্র নাড়া খেলে
বিচ্ছেদের বৃশ্চিক-দংশন-জ্বালা
সমাজের নানা অঙ্গে রি-রি ক'রে জ্বলে ওঠে।

এসে গেল নবজাতকের দল।
তারা মাতা তোমাকে পেল না খুঁজে,
তখন তুমি যে ছিলে ছায়াবৃতা,
যদিও তখনো তুমি বিশ্ব-মাতা, ভারত-মাতার পাশাপাশি
বঙ্গমাতা রূপে আমাদের মর্মমূলে করেছ বিরাজ।
ক্রমে ছায়া গেল স'রে।
শোনা গেল অভিনব কলরব,
কোটি কণ্ঠ সমুদ্রের তরঙ্গ উচ্ছাস
উচ্চারিল ওগো মাতা ভাষার মহিমা তব!
রক্ত দিয়ে বলিল তোমাকে।
মধু-কবিসম যারা কিছুকাল ভুলে ছিল, তারা ফিরে গেল
হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।
তুমি গিয়ে আত্মপ্রকাশিলে।

আরো গেল দিন। পূবের আকাশ হ'ল লাল,
দিনান্তের আঁধারেও দেখা দিল জয়ের মশাল
উড়ে এসে জুড়ে বসা শাসকেরা উন্মত্ত আক্রোশে
নখরে চৌচির করে সদ্যোজাত ইতিহাস।
হেন কালে এপারের ভ্রাতৃবৃন্দ প্রসারিত বীরবাহু।
উভয়ের পদভরে চূর্ণ হল, হল ধূলিসাৎ
দানবের সব দম্ভ, সীমানার সব বেড়াজাল।
তুমি দেখা দিলে অপরূপ বেশে,
কিন্তু সবে প্রমাদ গণিল। তোমাকে আসন দেবে কোথা?
পূবে, না পশ্চিমে? ভেবে তারা সারা।
তোমার আননে দেখা দিল সকৌতুক স্নেহমাখা হাসি,
ইঙ্গিতে জানালে মাতা—তোমরা সবাই বাছা

যেখানে যেমন খুশি থাকো,
শুধু থাকো নিবিড় শান্তিতে !
তুমি শুধু চাও সন্তানের বিরোধের বিচ্ছেদের মাঝখানে
বিছাতে আঁচল আপনার—মায়ের আঁচল !

আমার দরকার : অগ্নি চেতনা সিরিজ

রাম বসু

অন্ধ জলরাশি গলা টিপে ধরছিল। তামস তিমির থেকে ছিটকে পড়া পাথরখণ্ড এফোঁড় ওফোঁড় বিদ্ধ করছিল। কর্কশ রোমশ হাত আমার চোখের মণিদুটো এক হ্যাচ্‌কা টানে উপড়ে নেবার পর

সূর্য মুছে গেল।

রিক্ত রূপকথার শিকড় বাকড় কোন প্রতিশ্রুতি দেয়নি আমাকে। শোনায়নি বিরল আবির্ভাবের দুর্লভ কাহিনী। অন্ধকারের শাখা প্রশাখার ভৌতিক অস্তিত্ব ক্ষণে ক্ষণে বহুরূপী। আর এমনি কপাল, তাল তাল মেঘ নিয়ে বাতাস হরেক রকম পুতুল তৈরি করে আমাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছিল—

যে-আমি একদিন সূর্যকে ভালবেসেছিলাম, আদিত্যচেতনা নক্ষত্রে উদ্ভাসিত করেছিলাম কুহেলি আকাশ, উচ্ছসিত করেছিলাম পল্লবকে প্রেমের মুখরতায়,—সে এখন কনিণীকাহীন তিক্ত স্তব্ধতা।

কি হবে এই ঠুন্‌কো সান্ত্বনায়? চুষিকাঠি, কালিঘাটের কাঠের পুতুল, কচ্ছপের পচা খোলে বসে মাখা ফরাসি আতর? অথবা কৌশলের জাল ফেলে যশের বেলুন?

বাঁচার জন্যে কিছু নমনীয়তা দরকার
জীবন প্রয়োজনের অনুশাসন নয় তবু
নিয়তির দুর্মর নিয়মের বাধ্যবাধকতাও নয়
আকস্মিকতার অনুবন্ধে সংহিতার পরম দেবতা, তার নাম জীবন
সৌরবর্তে বিস্ফোরণে সংজ্ঞাবহ ভালবাসা, তার নাম জীবন
তার আবরণ উন্মোচনের নাম—আত্মনির্মাণ

লোভের দরজা পার হয়ে এসেছি। শূন্যতার রশ্মির বৈপুল্যে অপাবৃত প্রাণ, উষার ধ্যানের বর্ণাঢ্য বিবৃতি। তার মধ্যে স্বয়ংজ্যোতি অতন্দ্র আগুন। সেই উত্তাপের আদলে গড়তে হবে নিজেকে আবার।

না। বীরত্বের কোন উপকথা শোনাবো না। প্রমেথিয়ুস, কর্ণ কিংবা সিসিফাস। চোখের গহ্বর দুটি সুপ্ত অগ্নিগিরির দুটি জ্বালা মুখ। দুঃখের পবিত্র অনুশাসনে চেতনার ক্রমিক উন্মেষ। আত্মদানের বিধাতা চাষের আয়োজন করেই চলেছেন।

কবিতা লিখতে চাই বলে লাঙ্গল দেওয়াই আমার আনন্দ
সমাসবদ্ধ আনন্দে শ্রী ও প্রজ্ঞা
নগদ বিদায়ের কোন দরকার নেই
আমার দরকার আদিত্যের দ্যোতক—আহুতি।

শাখাপ্রশাখা

কৃষ্ণ ধর

এই শাখাপ্রশাখাগুলো বড় ছড়িয়েছে
উথালপাথাল করে ঝড়ো বাতাসে
কোটরে জমে থাকা ষড়ঋতুর গোপন নির্যাস
ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে
ঝড়কে বলি, তোমার উদ্দাম মুঠি
এবার আলগা করবার সময়

আমার শাখাপ্রশাখাগুলো একটু হাফ ছেড়ে বাঁচুক
রৌদ্রের ঝালর গায়ে দিয়ে
ভেসে বেড়াক বিবাগী মেঘ
আমার শেকড়ের মাটি চনবনিয়ে উঠুক
ভিজে বর্ষার বারমাস্যা গা থেকে ঝেড়ে ফেলে

গ্যালন-করা ঘোড়ার পায়ের শব্দের মতো
দাপিয়ে আসছে দলছুট আমাদের দিনগুলি
ওদের ঝলমলে আঙরাখায় ওই দিগন্তটা
অনেক দিন পর হেসে উঠছে খুশিতে

ঘূর্ণি ঝড়ো দামাল হাওয়া
আমার শাখাপ্রশাখাগুলোকে খেলতে দাও
আমার বাজে-খাবলানো শরীরটা
তোমার দস্যিপনাকে তুড়ি দিয়ে
এখন দিনের রুচি রৌদ্রকে
একটু আলতো করে চুমু দিতে চাইছে

ও হাওয়া, তুমি এখন যাও।

আপেক্ষিকের শর্তে

সিদ্ধেশ্বর সেন

কুয়াশার ভোর,
সিঞ্চিত ক্ষিতি,
অঘোর বর্ষা,

গ্রীষ্মের দাহ, তা-ও,
সয়েছি—
কখন প্রবীণ বটের ছায়ায়,

সে-সব এখন স্মরণকালের
বন্দী!

নেই কোনোখানে পা-ফেলারও
গতি-সন্ধি

হয়তো ত্বরণ,
আলোর চলার-নেভারও গতিতে,
গতির ভেদে

বেঁকে-চুরে যাই !
এই-কী ত্বরণ—
আপেক্ষিকের শর্তে !!

স্বাদ

তরুণ সান্যাল

সেতো শুধু প্রেম নয়, প্রেমেরও অধিক করে পাওয়া
অলোকসামান্য রূপ অন্তরে-বাহিরে যার ছিল
সে আমাকে ছুঁয়ে গিয়েছে, সঙ্গে নেয়নি, হাওয়ার চৈত্রও
ফুলে শুধু আঙুল ছোঁয়াল বলে যন্ত্রণাই কাঁটা
সমস্ত শরীর ভরে উঠেছিল, যাকে বলে মরণেরও স্বাদ,
অর্থাৎ মরলাম, আর সমস্ত জন্মই সেই মৃত্যু বয়ে চলি।
রবীন্দ্রনাথের গান, কোনো কবিতার পঙ্‌ক্তি, মধ্যরাতে চাঁদ,
তারও অবয়ব হয়ে কাক জ্যোৎস্না, প্রথম বৃষ্টিতে ধোয়া ভেজা.
বিদ্যুতে বেগুনি মুখ স্মৃতি জাগানিয়া নারী নদীকে ঢেউয়ের মাথা ছোঁয়ায়,
একাই আপ্লুত এক ঘনপাতা ছাওয়াগাছে দোয়েলের শিস
বা শতাব্দী জুড়ে সেই ইতিহাস হয়ে ওঠা মানুষ মানুষী—
সব সব···আরো কিছু···নাৎনীর দুধের দাঁতে হাসি এই অপরাহ্ণ বেলা
এরা মাথায় স্নায়ু ছিঁড়ে নিয়েছে, ভাবছি যেখানে অতল
অনাদি কালের এক জৈবধাতু টান রাখে শিকড়ে,
ঈশ্বর ঈশ্বর, আমি জানি না ঈশ্বর আছে কি না
কিন্তু না রইলে কাকে ধন্যবাদ জানাবো-বা, সে গূঢ় একাকী,
কেননা যা-কিছু পেয়েছি কেউ তা দেয়, তা হোক না মাঠ
গাছলতা বাবা মা সতীর্থ সখা সখী পত্নী এবং আমিও
হৈ হৈ হাওয়ায় গাছপালায় দৈত্যটা দেখছি ঝাঁপিয়ে পড়েছে
আমাকে সে নেবে, নিক, ঈশ্বরতো সবই দিয়েছিলেন।

ভালোবাসা সব জানে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

যাবার সময় হলো, তাই এ-উচ্চণ্ড ভালোবাসা—
ভালোবাসা ঘরে-বাইরে, ভালোবাসা দ্বিধাহীন জ্বর।
ভালোবাসা থেকে আসে রমণী-কিশোরী পরস্পর,
চুম্বনে কী মর্মতল তৃপ্ত করে আশা—
ভালোবাসা সব জানে, গোপনে আকণ্ঠ ভালোবাসা!
শুয়ে-বসে ভালোবাসা, ভালোবাসা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে,
পুরাতন হাসি সেকি নূতন নূতনতর হয়?
স্পর্শময় ভালোবাসা দেহে লেগে থাকে সর্বক্ষণ,
নিষ্পাপ কিশোরী কীসে তীরবিদ্ধ—
ভালোবাসা সব জানে, ভালোবাসা অক্ষত মোহন।

বধিরের কাছে জন্মান্ধের কাছে

অমিতাভ দাশগুপ্ত

যখন তুমি একটু একটু করে ভেঙে যাচ্ছিলে, বাইরে থেকে বোঝা যায় নি।

না বুঝে কেবল ঘ্যানর ঘ্যানর করছিলাম—এসো এলাটিং বেলাটিং গল্প করি, চলো গড়চুমুক যাই, সান্দিনিস্তা নিয়ে দুচারটে বিদিশি ট্যাব্‌লয়েড্ পড়ে ফেলা যাক; রাগ ফলিয়ে বলি—তোমার হালের লেখাপত্তর কিস্যু হচ্ছে না,

আর এ-সবেরই ছুতোয় তোমাকে গোখ্‌রো হয়ে কাটি, ওঝা হয়ে ঝাড়ফুঁক করি···সারাবেলা তোমাকে গিলতে গিলতে ছেঁড়া শার্টের বুক আর্সেনিকের রসে তেতো হয়ে যায়।

পরম যত্নে তখন তুমি আমার নখগুলি ছেঁটে দাও, জিভ হীরাকষ আর নিশাদলে ঝাঁঝালো করে তোলো, ব্রেনের ভিতরে ঘনিয়ে আনো কানামাছি, আমাকে জাপটে-ধরা সাবেক সোয়েটার ফুটো ফুটো হয়ে যায় তোমার ঘেন্নাভেজা থুথুতে, ল্যাব্রাডর প্রণালী থেকে নিয়ে আসো ঝরা পাখির ডেক্‌-ভরা আর্তনাদ, আর রাতের তলপেট চিরে ঘন ঘন চলাফেরা করতে থাকে তোমার সহর্ষ করাত।

দুঃখের পিরিচে ধরতে চাই তোমার থুৎনির শিশির অথচ কাছে এলেই পচে গলে নষ্ট হয়ে যাই, জিভ দিয়ে চেটে নিতে যাই তোমার পুরন্ত গোড়ালির হালকা রোম-ছোঁয়া নূপুর।

ঠিক যেমনটি বাজাতে চাই সেভাবে আর বাজে না কিছুই।

না ভালোবাসা-টালোবাসা নয়—তুমি আমাকে ভাঙন, মার, মারীবীজের সেঁকো বিষ দাও। আমার জানোয়ারটাকে ধুত্‌রোর বিচি, ভাঙ্, আর বাদামি চিনিতে মেশানো শতভরির বড়ি গিলিয়ে মারো।

তোমার পাল্‌টানোর শব্দ শুনতে পাই না এত আমি বিটোফেন
তোমার ভাঙনের কীর্তিনাশা দেখি না এত ধৃতরাষ্ট্র আমি

রামপ্রসাদদাকে

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

না চাও চুম্বন যদি পাবে নদী, আসঙ্গের বদলে আকাশ
মাংস মুছে মুছে নিসর্গের চেনা অংশে উপমা অভ্যাস
সবইতো যথেষ্ট হলো রামপ্রসাদদা!
যখন সবাই বললো খা খা কার্যকারণ খা
আমি আকণ্ঠ খেলুম, পক্ষী হয়ে উড়াল দিলুম মেঘে
তারা আর ভাষা নয়, যাকে দেখে
বোঝা যাবে একদিন এদের দোলাতো
নিতান্ত কাঙাল এক চেনা হরিনাথ!
এখন কোথাও নেই স্পষ্ট বিনিময়, সবকিছু দিয়েও অনাথ
এই আয়ুরেখাপালানো কর্কশ করতলে
দেখা যায় নিতান্ত নীরব এক ব্যত্যয়ী রেখা!
হ্যাঁ, কেউ কেউ হাত দেখে বলে
একদিন নদী এর কথা শুনতো, ভোরে গানের গমকে
এই রূপসনাতনই টান মেরে ওঠাতো সূর্য, গাছে স্তবকে স্তবকে
অলীক ফোটানো সব একলা বকুল, শিশিরের অশেষ বাসনা
সৌন্দর্যের প্রকৃত গোপন কথা
ভূমধ্যসংসারে এ-মানুষই করেছিল তৃণআয়নায় রটনা!

এখন ঘটেনা কিছু, ভালবাসা শুধু এক ছন্দ-দুর্ঘটনা
আজো মাঝে মাঝে ঘটে এই হাতে,
তাছাড়া তো সব সাদা পাতাই ক্যানভাসের নিরেখ শূন্যতা।
আমি তাই লিখি না কিছুই, সুযোগ এলেই চোখ জড়ো করি ঘুমে;
হে ফুল উৎফুল্ল। আমি যাবার নিয়মে
তোমার নিকটে না গেলে
তুমিতো আমার অন্তিম ঘ্রাণে মালা হয়ে গড়ে উঠবে না।
মানুষ ফুলকে চায়, ফুলের মানব প্রস্তাবনা
একমাত্র শুনেছে আকাশ, তাই তার নক্ষত্রউন্নত ঘুণাক্ষর
কিছুই পড়ছি না আজকাল, চোখ এখন স্থায়ী ঘুম চায়
রামপ্রসাদদা! বড় বেশীদিন থাকা হলো শব্দের হল্লায়।

জাল ছেঁড়ো

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

এখন কী লিখবো, কিভাবে লিখবো, কেন লিখবো
ভাবতে গিয়ে দেখি
নিজেকে টপকিয়ে গিয়ে অন্ধকার লুতাতন্তুজাল
যদি ছিঁড়ে যেতে পারি, তাহলে আবার হয়তো
কিছুটা আলোয় ঘেরা গাছপালা মানুষজনের পাশে গিয়ে
আবার দাঁড়াতে পারি, শ্বাস নিতে পারি।
একেকটা পাথর কারা রাস্তার সামনে ফেলে গেছে,
নাকি স্বভাববশত তারা গড়িয়ে গড়িয়ে আসে রীতিমতো মানববিরোধী!
কে জানে এ প্রপঞ্চ না মায়া, না বাস্তবনিষ্ঠ কোনো বাধা,
যেভাবেই হোক, ব্যথা লাগলে ঠিক টের পাওয়া যায়,
কেন ব্যথা আসে তা তো আগেই বলেছি,
কিন্তু তার চেয়ে অন্য কোনো কর্কশতা নেই?
দেখি যদি নিজেকে ডিঙোতে পারি, যদি পারি, চেষ্টা ক'রে যাই,
হয়তো বা জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবো একদিন,

বেরিয়ে এলেই কিন্তু টের পেয়ে যাবো।

পুরাণকথা

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

বালির ওপরে শুধু দাগ ফেলে চলে যায় জল
জলের ভিতরে থাকে বালি আর সমুদ্রের নাম,
তোমার শরীরে স্নানে খেলা করে নগ্ন কোলাহল…

এত দূর দুপুরের মধ্যে আজ আমরা এলাম।

কিছু আগেপরে ছিল আবছা ভিজে ছায়া আমাদের
কাছাকাছি বাতাসেও ছিল পাখিডাকের উড়াল
তুমি ছিলে স্বল্পতম নিজস্ব বসনে একা, ফের—

যেন, ফের, ক্ষিপ্রজন্মে তুমি খোলো মুক্ত কালাকাল।

বৃষ্টি হলে ঠাণ্ডা হয় কে না জানে এমত জগতে…
যেমন খরার পিঠে পোড়ে তপ্ত ধুলো আর খড়,
বর্ষায় মেঘের কালো চুল ওড়ে পরতে পরতে
গোধূলি বিদ্যুতে ওই চমকে ওঠে বোশেখের ঝড়।

তুমি কি তেমনি কিছু ফেরিঘাটে শেষ পারাপার…
মাঝিও তোমাকে চেনে—তোমার নৌকার দেহখানি,
আমি কি শুধুই ঢেউয়ে হাঙরের ধারালো আহার!
সাগরে কেমন প্রেম ডুব দেয়, আমি কি তা জানি?

গীতিকাব্য

শিবশম্ভু পাল

তমসাতীরের শোকে গড়ে ওঠে নিঃশুল্ক বন্দরের কাল
কত যে বিষাদ জয় বিপণন, রক্তদাতা কত যে জটায়ু
তমসাতীরের জলবায়ু
বঙ্গজ কুলীন সৌম্য শারদ সকাল।

আমি সে প্রত্যুষ থেকে অল্পদামে পরিমিত খুচরো মুদ্রায়
কিনেছি নীলিমাখণ্ড, বকের ডানার শাদা আর
কিছুটা সমুদ্রতীর, কিছু পারাপার
আমার কমলগঞ্জে কাটাকাপড়ের ব্যবসায়।

তা বলে আমারও কিছু কম নেই বিমর্ষ ফাটল
টাইকুন যে আছে থাক, সুখে থাক সোনার কলমে
চেয়েছি আর-একটুখানি বিনিয়োগ চমকে বিভ্রমে
আমারই মাপের, ছোটখাটো।

ভিডিও পার্লার্

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

ঠিক আসনটিতে বসলে বেজে উঠবে বেল্
অন্ধকারে স্বপ্ন অঢেল
ছড়িয়ে দেয় ভিডিও পার্লার্—
স্বরভঙ্গে বিচলিত নয় লাউড্ স্পীকার
কেড়ে নেয় কলোনীর মন
'আমাদের আজকের ছবি ডন্-ডন্-ডন্-ডন্'

বেড়ে গেলে শীতের প্রকোপ
পার্কের ক্ষণস্থায়ী ঝোপ
ছেড়ে দিয়ে ছেলেমেয়ে জোড়ায় জোড়ায়
ভীড় করে দোরগোড়ায়—

দু'একজন ঘোর একা
ঠেক্ খুঁজে দোসরের পায়নি তো স্থাখা
পার্লারে ঢুকে আসে সামলাতে শীত

রূপালি বাক্‌সটি স্নিগ্ধ করে শঙ্কর-সঙ্গীত
সুরু হচ্ছে স্বপ্ন বণ্টন—
আমাদের আজকের ছবি ডন্‌-ডন্

ফুৎকারে ঐতিহ্য উড়ে যায় ?

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

মল্লিকবাজার থেকে আসছি, কাল গুশকরায় কেটেছে বৈকাল
পরশু তো ছিলাম ব্রহ্মপুরে এক বন্ধুর জিম্মায় ;
প্রবল হই চই হলো এই ক'দিন—চুম্বক কী জানো ?
একটাই মানুষজন্ম—এই খবর রাষ্ট্র হয়ে গেছে ।
ট্রেনের হকার বলছে, দুর্গাপুর স্টেশনের কুলি,
অ্যাম্বারে বেয়ারা, যার বক্‌শিসেই কেন্দ্রীভূত মন,
সকলে শুনেছে. কিন্তু কোথা থেকে, সে-কথা ভাঙছে না :
"একটাই মানুষজন্ম. আগেপরে কিচ্ছু জানা নেই।"
এ-যে কী ভীষণ কাণ্ড ! বজ্রগর্ভ, অশুভ ইঙ্গিত
এখনি বুঝবে না তোমরা, ভাবছো এ-তো বালবৃদ্ধে জানে,
ভুল ! আগে বিশ্বাস করেনি । জানতো মনে-মনে বুদ্ধির ব্যাপারী
দার্শনিক. ত্রাতা, আর পুরোহিত, যাজক, মন্ত্রীরা ।
ক্ষমা, দয়া, পরজন্ম, মীমাংসার আশ্বাস যা কিছু
কুড়িটা শতাব্দ ধরে শেখালাম ভিন্ন ভিন্ন দেবস্থান গড়ে :
"সহ্য করো, ফুল ফুটছে, ভাগ্যে থাকে মেওয়া তো ফলবেই"—
উড়ে যায় ? ফুৎকারে ঐতিহ্য উড়ে যায় ?
একটাই মানুষজন্ম ! কে ওদের সামলাবে এখন ?

এবার যা-ইচ্ছে করবে, কিছু আর মুলতুবি রাখবে না,
গোষ্ঠী ভেঙে যাবে, লোকে বশ্যতা মানবে না সামর্থ্যের ।
ঠোঁটে ক্ষত নিয়ে ফিরবে স্কুলের ছাত্রীরা প্রতিদিন ।
সাংঘাতিক কথা ! বলবে, আত্মার পান্‌জাবি নয়, যন্ত্র এ-শরীর,
যন্ত্র মন, ব্যাটারী-নির্ভর । চার্জ করে যাও যে-যেমন পারো ।
এতখানি উপেক্ষার উশ্‌কানি কে দেয় ? ধরো তাকে
চিরুণি-তল্লাশ করে, ছ ইঞ্চি উচ্চতা ছেঁটে দাও ।

* বিহার রাজ্য-রাজনীতি ক্ষেত্রে এটি খুন করার ডাকনাম ॥

নারাশংসী

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিরিচ আর ঘোড়া সুদ্ধ্ বীরের দু লাইন স্তব বাঁধছেন কবি ।
পেস্‌মেকার প্রোটোকল সামলে বীর এখন
কমাণ্ডো ঘেরাও হয়ে ছুটি বনমুখো ।
বিরল হয়ে হয়ে আসছে ইঁট আর অবলং ।
মাথায় ডাল গলে পড়ছে অঙ্গার ফোঁটার মতো পাতা ।

ভাবতে ভাবতে যান—হুইস্কিমেদল কৃতী সব
আমলা-পার্ষদ, সব চেকবই লোফালুফি মন্ত্রক নিগম,
ভাবতে ভাবতে যান—আন্তর্জাতিক সেক্রেটারি জেনারেল
ক্যুবা-র সরেজমিনে দেখে আসতে বলেছেন···তিনি
শাসক ? শাসিত ? পরক্রিয় যন্ত্র ? সোনার বিস্কুটে

গুপ্ত জেব ভ'রে বনে ডুব দিতে বন
চিট হুণ্ডি শেয়ারের পাতায় ঝুরিতে সোর করে উঠল, যেন
ঠুনকো জালপাতা জোড়া ভাঁশের তাণ্ডব । কবি তাঁর
সাত স্কন্ধ চম্পূ গেঁথে তুলবেন ক্লাব আর কাফের
ভাষণে-আশ্বাসে ? ফের লকারে, অসুখে মরে আছে যারা তাদের বোবায় ?

হীরো হণ্ডা চেপে ফুলঝলকা নায়িকাকে পিঠে তুলে
সে কি উড়ে গেল ? সিদো-কানোর পাথর হয়ে দাঁড়িয়েছে ? পূর্ণ সূর্যের
গোল খড়ি-দাগা নীচে বর্ম আর সাঁজোয়ার জঙ, দীর্ঘশ্বাস !
ট্যুরিস্ট সঙ্গমে কবি দেখছেন মঞ্চে উঠে হেসে নেবে যায়
পাপ্পু, দৌড়রাজ, রিমি যৌনদেবী, সুখ সিং কূটবিৎ—একে একে।

রেখে যায়

শ্যামসুন্দর দে

কোন এক ফুলের সুবাস বসেছিল
গাছে গাছে অরণ্যে নিভৃত কোণে
আমার চলার পথে
সুদূর যাত্রায়।
পরিচয় মেলেনি যে তার
অজানার রূপের আড়ালে
শুধু তার সুবাস ছড়িয়ে যায়
মনের সরণি জুড়ে ।
হয়ত কোন নির্জন অবকাশে
কোন গন্ধ ভেসে আসে
উদাম বাতাসে ভাসে
মননের ভেলা,
অচেনা অজানার আড়ালে
গভীর সুর-মূর্ছনা।

গোধূলি আকাশ জুড়ে উড়েছিল
এক ঝাঁক নীড়ে ফেরা পাখি
তারা সব ফিরে গেল
রেখে গেল রাতের স্তব্ধ আকাশ।

নাট্যশিল্পী শম্ভু মিত্র

জগন্নাথ ঘোষ

শম্ভু মিত্র একালের এক অবিসংবাদিত নাট্যব্যক্তিত্ব। অনায়াসেই বলা যায়, তিনি নাটকের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। তাঁর নিজের জবানীতেই[১] জানা যায়, ছোটবেলা থেকেই তিনি নাট্যাভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। তিনি বলেছেন, "কেন যে আমি অভিনয় করতে শুরু করলুম সে বলা আমার পক্ষে খুব শক্ত। কিন্তু হয়েছিল একটা ইচ্ছে ছোটবেলা থেকেই অভিনয় করার। কেমন করে জানি না অভিনয় খুব ভালো লাগতো।" ছোটবেলায় শম্ভু মিত্রের মনে অভিনয় করার যে ইচ্ছে অঙ্কুরিত হয় তার প্রকাশ ঘটতে থাকে তাঁর স্কুলজীবন থেকে। তখন তিনি বালিগঞ্জ গভর্নমেণ্ট স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে পড়তেন। সেসময় সপ্তম শ্রেণীকে বলা হতো ফোর্থ ক্লাশ। ঐ ক্লাশের ছাত্রাবস্থায় তিনি বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভায় 'I am a little soldier' নামক একটি ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করেন। এর পরের পুরস্কার বিতরণী সভায় শম্ভু মিত্র একটি ইংরেজি গল্প পড়েন, যার আরম্ভ অংশ নিম্নরূপ : My name is Solomon Snowham. I eat, drink and sleep." বলা বাহুল্য, এইসব আবৃত্তির মাধ্যমে শম্ভু মিত্রের প্রশংসা ছড়িয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শম্ভু মিত্রকে গদ্যপাঠে শিক্ষা দিয়েছিলেন তৎকালীন ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক কে. ডি. ঘোষ।

সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় শম্ভু মিত্র তাঁর সহপাঠীদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে স্থির করেন তাঁরা নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করবেন। তাঁরা দ্বিজেন্দ্রলাল

রায়ের নাটক অভিনয়ের জন্য নির্বাচন করেন। তার মহলাও শুরু করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের হেডমাস্টার মহাশয়ের নিষেধে সে অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়নি। এই ঘটনায় খুবই ক্ষুব্ধ হন শম্ভু মিত্র।

অতঃপর ম্যাট্রিক পাশ করার পর শম্ভু মিত্র ভর্তি হন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে। কিন্তু কলেজের পড়া তাঁর ভালো লাগেনি। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ছেড়ে দিলেন কলেজের পড়া। আর, কলেজে পড়াকালীনই তিনি শুরু করেন নাটক পড়া। তখন তাঁর পঠিত নাটকের তালিকায় ছিল দেশি ও বিলেতি নাটক।

কলেজের পড়ায় ছেদ ঘটিয়ে শম্ভু মিত্র খুব শীঘ্রই কলকাতা ত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে তাঁর পিতৃদেব চাকরী থেকে অবসর নিয়ে কলকাতা ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি চলে যান এলাহাবাদে। শম্ভু মিত্রও তাঁর পিতার সঙ্গে এলাহাবাদ যান। এদিকে তাঁর বয়স কুড়ি পেরিয়ে একুশে পড়েছে। আর কতদিন উপার্জনহীন অবস্থায় থাকা যায়! তাই তিনি সিদ্ধান্ত নেন উপার্জনের আশায় তিনি কলকাতায় যাবেন। এখানে ফিরে এসেই তিনি জড়িয়ে পড়েন নাটকের সঙ্গে। অভিনয়ের প্রতি তিনি ঝুঁকে পড়েন। কিন্তু অভিনয়ে জড়িয়ে পড়ার আগে তিনি শুরু করেন অভিনয় দেখা। তখন তিনি থাকতেন 'জনৈক' উদার ভদ্রলোকের বাড়িতে। তাঁর বাড়িতে শ্রীমিত্র থাকেন আট কি নয় বছর।

উক্ত উদার ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় ছিল তৎকালীন প্রখ্যাত নট ভূমেন রায়ের। তিনি একদিন শম্ভু মিত্রকে বলেন, যদি তাঁর (শম্ভু মিত্রের) অভিনয়ের প্রতি আগ্রহ থাকে তাহলে তিনি একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। তখন ভূমেন রায় রঙমহলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শম্ভু মিত্রকে সেই ভদ্রলোক ভূমেন রায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। সেই পরিচয়ের সূত্রে শম্ভু মিত্র রঙমহলে ঢুকলেন। সেখানে কয়েকটি পুরানো নাটকে অভিনয়ের পর শম্ভু মিত্র সুযোগ পেলেন বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মালা রায়' নাটকে অভিনয় করার। তারপর গৌর শীর নাটক ঘূর্ণি, বিধায়ক ভট্টাচার্যের দেওয়া নাট্যরূপ রত্নদীপ (মূল কাহিনী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়) নাটকের অভিনয়ে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। এই পর্যন্ত কাটল শম্ভু মিত্রের জীবনের রঙমহল-পর্ব। এই পর্বের পর তিনি যোগ দিলেন মিনার্ভা থিয়েটারে। এখানে এসেই তিনি অংশ নিলেন 'জয়ন্তী' নাটকের একটি প্রধান ভূমিকায়। উক্ত ভূমিকায় যে

অভিনেতা অভিনয় করছিলেন তিনি অকস্মাৎ অভিনয়ে অংশ নেওয়া বন্ধ করেন। মিনার্ভায় শম্ভু মিত্রের নায়িকা ছিলেন অপর্ণা দেবী।

মিনার্ভায় নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগে শম্ভু মিত্র প্রশংসিত হলেন। তখন মিনার্ভায় অভিনয় করতেন মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি কারোর দ্বারা অপমানিত হলে শম্ভু মিত্র তার প্রতিবাদে মিনার্ভা ত্যাগ করেন। এরপর ভূমেন রায়ের সহযোগিতায় শম্ভু মিত্র যোগ দেন নাট্যনিকেতনে। এখানে এসে তিনি তারাশংকরের 'কালিন্দী' নাটকে মিঃ মুখার্জীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। কিন্তু নাট্যনিকেতন কিছুদিনের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেলে সেখানে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী শ্রীরঙ্গম খুললেন। শ্রীরঙ্গমে মঞ্চস্থ হয় শিশিরকুমার প্রযোজিত প্রথম নাটক তারাকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'জীবনরঙ্গ'। এই নাটকে শম্ভু মিত্র গ্রহণ করেন 'নাট্যকারের' ভূমিকা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য শম্ভু মিত্রকে শিশিরকুমারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। কিন্তু শ্রীরঙ্গমে বেশি দিন থাকেননি শম্ভু মিত্র। এই রকম থিয়েটার-হারা জীবনেই পুনরায় ভূমেন রায়ের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। ভূমেন রায় তখন কালীপ্রসাদ ঘোষের ভ্রাম্যমান নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেই দলে ছিলেন বিশিষ্ট নট নরেশ মিত্র, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, রবি রায়, জীবন গাঙ্গুলী প্রভৃতি। সেই দলের সঙ্গে দু-একটি অভিনয়ের পর শম্ভু মিত্র দল ছাড়েন। এইভাবে যখন তিনি চুপচাপ বাড়িতে বসে আছেন তখন একদিন বিনয় ঘোষ ও বিজন ভট্টাচার্য তাঁর কাছে এসে হাজির। তাঁরা এসে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের কথা শম্ভু মিত্রকে বললেন। এই সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে নাট্যাভিনয় হবে, তাতে তাঁকে অংশগ্রহণ করতে হবে—এই ছিল তাঁদের অনুরোধ। তারপর স্থাপিত হলো ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ। গণনাট্য সঙ্ঘের প্রযোজনায় বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' অভিনীত হলো শ্রীরঙ্গম মঞ্চে। 'নবান্ন'-র অভিনয়ে শম্ভু মিত্রের ছিল দয়াল মণ্ডলের ভূমিকা এবং যুগ্ম-পরিচালনার দায়িত্ব।

শম্ভু মিত্রের পূর্বোক্ত জবানী থেকে আমরা এসব কথা জেনে এসেছি। এও জেনেছি, যখন বিনয় ঘোষ ও বিজন ভট্টাচার্য শম্ভু মিত্রকে তাঁর বাড়িতে এসে তাঁকে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘে যোগ দিতে অনুরোধ করেন, তার আগেই তিনি এই সঙ্ঘ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি যখন শ্রীরঙ্গম মঞ্চে অভিনয়সূত্রে জড়িত তখন ১৯৪২ সালের ২৮ মার্চ গঠিত হয় ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘ। এই ঘটনার ২০ দিন আগে, অর্থাৎ ৮ মার্চ,

১৯৪২-এ ঢাকার রাজপথের উপর ফ্যাসিবিরোধী এক মিছিল পরিচালনার সময় বিশিষ্ট তরুণ কমিউনিস্ট লেখক সোমেন চন্দ ফ্যাসিবাদী গুণ্ডার হাতে নিহত হন। এই প্রসঙ্গে ধনঞ্জয় দাশের বক্তব্য[২] জেনে নিলে তৎকালীন পরিস্থিতির পরিচয় স্পষ্ট হবে—"সোমেন চন্দের হত্যাকাণ্ডে বিচলিত হয়ে ওঠেন বাঙলার সকল দলের সর্বমতের শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা। এমন কি বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তীর মতো দলনিরপেক্ষ লেখকও এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করে সেদিন বিবৃতি প্রকাশ করেন। এই ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামে মানবিকতার বিবেক শিল্পীসাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক অংশ যেন একটা ঐক্য সূত্র খুঁজে পেলেন। এই সূত্র ধরেই ১৯৪২ সালের ২৮ মার্চ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হলো ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক সম্মেলন এবং এই সম্মেলনমঞ্চেই গঠিত হয় ফ্যাসিস্ত-বিরোধী লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘ।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই সঙ্ঘ ছিল ভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘেরই বাংলা শাখা।

শম্ভু মিত্র অভিনয় সূত্রে সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও অন্তরের সমর্থন পাচ্ছিলেন না। এমনি মুহূর্তে বিনয় ঘোষ ও বিজন ভট্টাচার্যের আহ্বান তাঁকে নাট্যশিল্পের অদেখা জগতের ইশারায় রোমাঞ্চিত করে।

১৯৪৩ সালের গোড়াতেই যে তিনি প্রগতি লেখক সঙ্ঘের একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি, সে খবর আমাদের জানা আছে। ১৯৪৩ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত হয় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস। এই কংগ্রেসের পাশাপাশি একটা ভিন্ন সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ। এই সময়ই অনুষ্ঠিত হয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের তৃতীয় সম্মেলন। বাংলার প্রগতি লেখক সঙ্ঘের অন্যতম প্রতিনিধি হয়ে উপস্থিত ছিলেন শম্ভু মিত্র।[৩] তিনি নির্বাচিত হন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের বাংলা শাখার নাট্য-সম্পাদক। এই সময় থেকেই শুরু হলো শম্ভু মিত্রের নাট্যজীবনের নতুন পর্ব।

॥ ২ ॥

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘে শম্ভু মিত্র যোগ দিয়েছিলেন অভিনয়ের তাগিদে। যদিও ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ স্থাপিত হয় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রত্যক্ষ মদতে, তবু এ-কথা বলতে দ্বিধা নেই, শম্ভু মিত্র কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি

কোনো আকর্ষণ বা আনুগত্যের জন্য ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘে যোগ দেননি। সে কথা তিনি তাঁর পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারে স্বীকার করেছেন—"আমি এই Association-এ এসেছিলুম বিনয় ঘোষ বিজন ভট্টাচার্য এরা বলেছিল তাই। আর নির্দেশক হবো-টবো এ আকাঙ্ক্ষা আমার একদমই ছিলো না। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিলো অভিনয় করবো।"

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের প্রযোজনায় ১৯৪৩ সালের মে মাসে নাট্য-ভারতী মঞ্চে (বর্তমান গ্রেস সিনেমা) অভিনীত হয় বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন' ও বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরী'। এই দুটি প্রযোজনায় শম্ভু মিত্রের কি ভূমিকা ছিল তা জানা যাবে সুধী প্রধানের একটি উক্তি[৪] থেকে—"এই ১৯৪৩ সালের প্রথম দিকেই বিনয় ঘোষ 'ল্যাবরেটরী' এবং বিজন ভট্টাচার্য 'আগুন' নামে দুটি একাঙ্কিকা রচনা করেন। বিনয় ও বিজনের সঙ্গে শম্ভু মিত্রের আলাপ ছিল আগে থেকেই। শম্ভুবাবু পেশাদার মঞ্চে চেষ্টা করেও কোন সুযোগ না পেয়ে মনমরা অবস্থায় ছিলেন। ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘে তাঁকে বিনয় ঘোষ আনেন এবং 'ল্যাবরেটরী' নাটকের পরিচালনার ভার দেন। শম্ভুবাবু এই নাটকে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন এবং পরিচালনা করে নিজের দক্ষতার পরিচয় দেন।...আর বিজনের 'আগুন' ছিল চালের কন্ট্রোল দোকানের সামনে ক্রেতাদের লাইন শান্তিপূর্ণ রাখার সমস্যা নিয়ে লেখা। এই রাত্রিতে শম্ভু মিত্রের সঙ্গে বিজন ভট্টাচার্য, তৃপ্তি ভাদুড়ি (বর্তমানে মিত্র) ও আমি গণনাট্যের অভিনেতা অভিনেত্রী হিসাবে পরিচিত হই।"

শ্রীপ্রধানের মন্তব্য থেকে দেখা যাচ্ছে শম্ভু মিত্র 'ল্যাবরেটরী'র প্রযোজনা ও প্রধান চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয়ের দায়িত্ব পান। কিন্তু 'আগুনে'র প্রযোজনা ও অভিনয়ে শম্ভু মিত্র অংশ নিয়েছিলেন কিনা সে সম্পর্কে শ্রীপ্রধান কোনও মন্তব্য করেন নি। বলাবাহুল্য, 'আগুনে'র প্রযোজনা করেন স্বয়ং নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য। গন্ধর্ব পত্রিকার আশ্বিন ১৩৮৪ সংখ্যায় মুদ্রিত 'নির্ঘণ্ট : বিজন ভট্টাচার্যের নাট্য প্রযোজনা : প্রথম রজনী' অধ্যায়ে 'আগুন'-এর ভূমিকালিপির পরিচয়দানকালে লেখা হয়েছে : "এই নাটকের ভূমিকালিপি সংগ্রহ করা যায়নি 'তবে বিজন বাবু (কৃষাণ) এবং সুধী প্রধান (অন্য একটি কৃষক) অভিনয় করেন। তৃপ্তি মিত্রের অভিনয় এই আগুনেই।'

১৯৪৪ সালের ৩ জানুয়ারি স্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয় বিজন

ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী'। এরপরও 'জবানবন্দী'-র দুবার অভিনয়ের খবর পাওয়া যায়। এই দুটি অভিনয় হয় শ্রীরঙ্গমে ও মিনার্ভায়। শ্রীরঙ্গমের অভিনয়ের তারিখ ১০ জুলাই ১৯৪৪। আর মিনার্ভায় অভিনয়ের তারিখ ১৭ জানুয়ারি ১৯৪৪। এই তথ্যটি জানা গেছে ধনঞ্জয় দাশের 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক' গ্রন্থে 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক প্রসঙ্গে' অধ্যায় থেকে। সেখানে শ্রীদাশ লিখেছেন[৫], "সঙ্ঘের (ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘ) 'দ্বিতীয়' সম্মেলনে মূল সভাপতিরূপে নির্বাচিত হলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র আর সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যরূপে ১৫ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি (১৯৪৪) পর্যন্ত সম্মেলনের কার্যসূচী পরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুল বসু, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, আবুল মনসুর আহমদ, গোপাল হালদার ও শচীনদেব বর্মন-এর মতো বাঙলার সাংস্কৃতিক জগতের অগ্রগণ্য প্রতিনিধিবৃন্দ।...১৭ জানুয়ারি মিনার্ভা থিয়েটারে বিজন ভট্টাচার্য-র 'জবানবন্দী' নাটক অভিনয়ের মধ্যদিয়ে শেষ হয় ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘর দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন।"

'জবানবন্দী'-র অভিনয়-লিপি থেকে জানা যায়, রমজানের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন শম্ভু মিত্র। কিন্তু 'বহুরূপী' পত্রিকার ৩৪ সংখ্যায় তিনি এই তথ্যের প্রতিবাদে লিখেছিলেন "না রমজান আমি করিনি। জবানবন্দীতে কোন রোলেই আমি নামিনি। তবে কোন শিল্পী অনুপস্থিত থাকলে তাতে আমায় নামতে হোতো। গঙ্গাপদ বসু জামসেদপুর যেতে পারেননি। তখন ওঁর ভূমিকাটি (পরাণ মণ্ডল) আমায় করতে হয়। তবে রমজান কোনদিনই করেছি বলে মনে পড়ে না। ওটা ভুল খবর।...যতো দূর মনে পড়ে মনোরঞ্জন বড়াল।"

জবানবন্দী 'অন্তিম অভিলাষ' নামে হিন্দী ও গুজরাতি ভাষায় অনূদিত হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 'অন্তিম অভিলাষ' অভিনীতও হয়। সুধী প্রধান এই অভিনয় সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, সেটি নিম্নরূপ[৬]:

"বাংলার বাইরে 'অন্তিম অভিলাষ' নামে এই নাটক অভিনয় করিয়ে এবং গঙ্গাপদ বাবু (বসু) যে ভূমিকায় অভিনয় করতেন সেই ভূমিকায় শম্ভু মিত্র অভিনয় করে সর্বত্র বিশেষ করে বোম্বাই শহরে বহু শিল্পী ও রাজনৈতিক নেতা প্রভৃতির কাছ থেকে নিজের এবং সমগ্র দলটির জন্য অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেন।"

শম্ভু মিত্র 'জবানবন্দী'-র অভিনয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে অংশ গ্রহণ না করলেও তিনি কি এর পরিচালনা করেছিলেন? 'গন্ধর্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্বোক্ত 'নির্ঘণ্ট' থেকে জানা যায় 'জবানবন্দী'-র পরিচালনা করেন বিজন ভট্টাচার্য। কিন্তু সুধী প্রধান তাঁর 'নবনাট্য আন্দোলন প্রসঙ্গে' শীর্ষক প্রবন্ধে 'জবানবন্দী'র অভিনয় সম্পর্কে আলোচনায় লিখেছেন[৭] —

"গঙ্গাপদ বাবু (বসু), বিজন (ভট্টাচার্য), তৃপ্তি মিত্র, রবীন মজুমদার অমল ভট্টাচার্য ও আমি এই নাটকে (জবানবন্দী) অভিনয় করে নানাধরনের দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছি। আবার নাট্যকার হিসাবে বিজন ভট্টাচার্য এবং পরিচালক হিসাবে শম্ভু মিত্রের ভবিষ্যৎও নির্দিষ্ট হয়ে যায়।"

এমনকি শ্রদ্ধেয় হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর একটি প্রতিবেদনে[৮] জানিয়েছেন। "we all thought of the director of the play. Comrade Sambhu Mitra who was kept away by an attack of malaria contracted at the Mymensingh Kisan School."

শ্রীমুখোপাধ্যায় এই প্রতিবেদনটি লিখেছিলেন ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের দ্বিতীয় সম্মেলন উপলক্ষে মিনার্ভাথিয়েটারে অনুষ্ঠিত 'জবানবন্দী'র অভিনয়ের শেষে।

'জবানবন্দী'র পরে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা হলো বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'। নাটকটি শ্রীরঙ্গম মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয় ২৪ অকটোবর, ১৯৪৪। এই প্রযোজনায় শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্য ছিলেন যুগ্মভাবে পরিচালনার দায়িত্বে। পরিচালনায় বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্র— কার কি দায়িত্ব ছিল, সে সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য থেকে যা জানা যায় তা হলো— বিজন ভট্টাচার্য অভিনয় শিক্ষার ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতেন; আর শম্ভু মিত্র দেখতেন সম্পাদনা, প্রযোগ-ভাবনা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো। পরিচালনার দায়িত্ব ছাড়াও শম্ভু মিত্র দয়াল মণ্ডলের ভূমিকায় অভিনয় করতেন।

'নবান্ন' নাটকের রাধিকার ভূমিকাভিনেত্রী শ্রীমতী শোভা সেন তাঁর 'শিল্পী তিনি কিন্তু অভাব শৃঙ্খলার' প্রবন্ধে 'নবান্ন'র প্রযোজনার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন[৯], "আমাদের বলা হলো ইনিই (বিজন ভট্টাচার্য) তোমাদের নাট্যগুরু বা শিক্ষক। পার্টি (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি) বলে দিয়েছেন গুরু তাই নির্দ্বিধায় গুরু বলে নিয়েছিলাম। পরে আরেক ভদ্রলোকের সঙ্গে

আলাপ হলো তিনি থাকেন চারতলায়, নাম শম্ভু মিত্র। গুরুগম্ভীর রাশভারী মানুষ। ইনিও শিক্ষক। বিজনবাবু অভিনয় সংলাপ শেখাবেন, শম্ভুবাবু মঞ্চ, সংগীত ইত্যাদি।”

‘নবান্ন’র প্রয়োগনৈপুণ্যের উৎকর্ষ সম্পর্কে সুশীল জানার মন্তব্য[১০] প্রনিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, ‘নবান্ন’র মঞ্চ ব্যবস্থাপনায় শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্র ও শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্য যে সাফল্য ও কলানৈপুণ্য দেখিয়েছেন—তা বিশেষ ভাবে প্রশংসনীয়।”

‘নবান্ন’ অভিনয়কালে নাটকটিকে নানাভাবে সম্পাদিত করা হয়। শ্রদ্ধেয় সুধী প্রধানের ‘নবান্ন নাটকের প্রযোজনা এবং বাংলা নাটক ও নাট্য-আন্দোলনে তার প্রভাব’ নামের প্রবন্ধে[১১] বর্ণিত হয়েছে কেমন শিল্পসম্মত ভাবে ‘নবান্ন’র দৃশ্য পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে। শ্রীপ্রধান তাঁর উক্ত প্রবন্ধে লিখেছেন—“সম্পাদনার পদ্ধতিগুলি বিচার করলে দেখা যাবে প্রধান সমাদ্দারের পরিবার নিয়ে একটি গল্প আছে এবং সেই পরিবারের পরিণতি আগষ্ট বিপ্লব, বন্যা, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর সঙ্গে যেমন হতে পারে বা হয়েছিল তা দেখানো হয়েছে।”

শ্রীপ্রধান তাঁর সদ্যোক্ত প্রবন্ধে ‘নবান্ন’র দৃশ্য পরিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে শম্ভু মিত্রের নাট্যদীক্ষার প্রশংসা করেছেন। তিনি প্রাসঙ্গিক মন্তব্যে[১২] লিখেছেন—“দৃশ্যগুলির পরিবর্তনে শম্ভুবাবুর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং মঞ্চসজ্জা যতদূর সম্ভব কল্পনার সাহায্যে সরল করার ব্যাপারেও তিনি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য কর্তৃক চট ব্যবহারের সুপারিশ পেয়েই বাস্তবায়িত করেন। চট দিয়ে তিনটি চেম্বার করা এবং চটের ফালি করে বাঁশের সাহায্যে কখনো কৃষকের বাড়ী, কখনো গণেশের ছবি দিয়ে চালের আড়ত করা চটের ফালির দরজার দুইপাশে মঙ্গলঘট কলাগাছ এবং ফুলের সাজ দিয়ে বিয়েবাড়ী এবং তার পাশে কার্ডবোর্ডের ডাষ্টবিন, বাঁশের রেলিং তৈরী করে তার পাশে বেঞ্চি দিয়ে পার্কের আভাস সৃষ্টি করা প্রভৃতি খুঁটিনাটি কাজ তিনিই করেছেন। নাটকের সংলাপ প্রধানতঃ বিজনও শেখাতেন—কিন্তু অভিনয়ের কোনো সূক্ষ্ম কাজ করতে হলে মনোরঞ্জনবাবু (ভট্টাচার্য), শম্ভুবাবু, বিজন (ভট্টাচার্য) সকলেই অভিনেতা অভিনেত্রীদের মনে ধারণা জন্মিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিতেন নিজেদের চেষ্টার উপর। ‘নবান্ন’ অভিনয়ে সফলতার জন্য প্রধানত নিয়মিত রিহার্সালই দায়ী এবং এব্যাপারে শম্ভুবাবু কখনো

পরিশ্রান্ত হতেন না। কয়েক কাপ চা পেলে তিনি রাত্রি ১২টা পর্যন্ত রিহার্সাল দিতে রাজী হতেন।"

'নবান্ন' নাটকে শম্ভু মিত্রের অভিনীত ভূমিকা ছিল দয়াল মণ্ডলের। ২৭ অক্টোবর, ১৯৪৪ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় 'নবান্ন' অভিনয়ের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সেই সমালোচনায় শম্ভু মিত্রের অভিনয় সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে নিম্নোক্ত রূপে—

"...গ্রামের এক বয়োজ্যেষ্ঠ কৃষকরূপে শম্ভু মিত্র অতি চমৎকার অভিনয় করিয়াছেন। ...শম্ভু মিত্রের অভিনয়ের স্বাভাবিকতা অনবদ্য।"

প্রশ্ন জাগে 'নবান্ন' প্রযোজনার প্রয়োগকলার মৌলিকতা কতখানি শম্ভু মিত্রের ছিল। 'নবান্ন'র প্রযোজনা নিয়ে আজ পর্যন্ত অনেক লেখাই আমাদের গোচরীভূত হয়েছে। কিন্তু শম্ভু মিত্র তাঁর একটি প্রবন্ধে[১৩] এ সম্পর্কে বিনীত স্বীকারোক্তিতে জানিয়েছেন—"দিগ্বিজয়ীর তৃতীয় অঙ্কে নাদিরশাহ যখন দিল্লী ধ্বংসের আদেশ দেন তখন নেপথ্যে বিউগল ড্রাম ইত্যাদি বেজে উঠতো, বিস্ফোরণের শব্দ হতো মুহুর্মুহু, আর তার মধ্যে সৈনিকদের চীৎকার ও আক্রান্তদের আর্তনাদ শোনা যেতো। পিছনের পট লাল আলোয় রক্তিম হয়ে যেতো, আর পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া উঠত সেই লালের মধ্যে।...এই নাট্যাভিনয় যদি না দেখতুম তাহলে 'নবান্ন'-র প্রথম দৃশ্যের কল্পনা করা যে সম্ভব হতো না একথা অনস্বীকার্য।"

শম্ভু মিত্র এই মন্তব্য করেছিলেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রযোজিত 'দিগ্বিজয়ী'-র অভিনয় দেখে। 'নবান্ন' প্রযোজনায় তিনি যে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের কাছে অনেকখানি ঋণী, একথা তিনি স্বীকার করলেও, আর কেউ স্বীকার করেননি। শিল্প-সাহিত্যে মোড় ফেরার অপূর্ব সূচনা থাকে। শ্রীমিত্র সবিনয়ে তা স্বীকার করেছেন।

নবান্ন নাটকের অভিনয়ের জন্য শম্ভু মিত্র প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর নাট্যপ্রযোজনাকর্মের উৎকর্ষ প্রদর্শন করেছেন। আশ্চর্যের বিষয়, শ্রীরঙ্গমে 'নবান্ন' অভিনয়ের পর আর তিনি 'নবান্ন' অভিনয়ের জন্য বিশেষ কৌতূহলী ছিলেন না। ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ছাড়া 'নবান্ন' অভিনয় করা সম্ভব নয়—এই ছিল তাঁর অভিমত। অবশ্য ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ছাড়াই 'নবান্ন' তার পরেও অভিনীত হয়েছে। তাতে শম্ভু মিত্রের ভূমিকা ছিল কিনা জানা

যায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তিনি ধীরে ধীরে গণনাট্য সঙ্ঘের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলতে থাকেন। অবশ্য ১৯৪৮ সালে কম্যুনিস্টপার্টি বেআইনী ঘোষিত হবার আগে পর্যন্ত শম্ভু মিত্র গণনাট্য সঙ্ঘ ত্যাগ করেননি। তিনি খুব সম্ভব গণনাট্য সঙ্ঘের যে-প্রযোজনায় শেষ অংশ নেন, তা হলো রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা'। ১৯৪৬ সালের মে মাসে রবীন্দ্র সপ্তাহে কলকাতার টেগোর সোসাইটি কর্তৃক নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকের যুগ্ম-পরিচালক ছিলেন শম্ভু মিত্র ও গঙ্গাপদ বসু। মুক্তধারায় 'নবান্ন' নাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অংশগ্রহণ করেছেন। এরপর গণনাট্য সঙ্ঘের অভিনয় ও প্রযোজনায় শম্ভু মিত্র অংশ নেননি। অবশেষে তিনি ছেড়ে দিলেন গণনাট্য সঙ্ঘ।

যখন গণনাট্য সঙ্ঘের মধ্যে কাজ করা সম্ভব হয়ে উঠল না, তখন তাঁরই চেষ্টায় বহুরূপীর সৃষ্টি হলো। শম্ভু মিত্রের গণনাট্যসঙ্ঘ ত্যাগের প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন করে শ্রীস্বপন মজুমদার লিখেছেন,[১৪] "কিন্তু এত প্রতিভাধরের পক্ষে ক্রমেই যেন অপ্রশস্ত হয়ে উঠছিল গণনাট্যের আশ্রয়। শিল্প আদর্শ ও সঙ্ঘনীতির ব্যবধান যখন বৃদ্ধি পাচ্ছে সেখানে তারই মধ্যে ৪৮-এর ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে সঙ্ঘের এক সভায় একজন মহর্ষিকে তুচ্ছ করে কিছু বলায় শম্ভু মিত্রের মনে হয় গণনাট্য সঙ্ঘে সক্রিয়ভাবে কিছু করা যাবে না।"

শম্ভু মিত্র তাঁর একটি লেখায় তাঁর গণনাট্য সঙ্ঘ ত্যাগের কাহিনী লিখেছেন যা পড়লে আমরা জানতে পারব 'শিল্পআদর্শ ও সঙ্ঘনীতির ব্যবধান' অপেক্ষা রাজনীতির অস্থিরতাকেই তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন,[১৫] "নবান্ন অভিনয়ে একটি কাব্যসৃষ্টি হতো। আবেগের কাব্য। মানুষের নিঃসহায়তার কাব্য, তার ভালবাসার কাব্য।

"কিন্তু সেটা সফলতার পথে আর এগুতে পারলো না। নানান্ কারণে নানান দিক থেকে বাধা দেওয়া হতে লাগলো। তার মধ্যে অস্থির রাজনীতি ও রাজনীতির নামে ব্যক্তিগত আক্রোশ ও অসূয়া যেন ভীমাকৃতি হয়ে উঠলো। ফলে হলো না। ধুলো উড়লো, কাদা ছুটলো, কিন্তু ঠাকুর ঘরটিকে কেউ নিকিয়ে সাফ করতে এলো না।"

অবশ্য শম্ভু মিত্রের গণনাট্য সঙ্ঘ ত্যাগ নিয়ে নানা বিতর্ক প্রচলিত আছে। এই মুহূর্তে সেই বিতর্কে প্রবেশ করতে চাই না। কেননা আমি গণনাট্য-

সঙ্ঘের ইতিহাস লিখতে বসিনি। জানবার চেষ্টা করছি শম্ভু মিত্রের নাট্য-দীক্ষার স্বরূপকে। কিন্তু তবুও জেনে নেওয়া প্রয়োজন আছে গণনাট্য সঙ্ঘ ত্যাগ শম্ভু মিত্র কি কারণে করেছিলেন। সেটা কি নাট্যশিল্পের তাগিদ, না অস্থির রাজনীতি-র ঘূর্ণাবর্ত থেকে সরে আসা?

সুধী প্রধান ও নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন। গণনাট্য সঙ্ঘে 'নবান্ন'র স্মরণীয় প্রযোজনার পর উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা হল 'শ্যাডো প্লে', 'শহীদের ডাক' ও দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক 'বাস্তুভিটা'। এই সময় গণনাট্য সঙ্ঘে 'নীলদর্পণ' নাটক অভিনয়ের কথা ওঠে। এতে সায় ছিল না শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্যের। এই প্রসঙ্গে সুধী প্রধান তাঁর 'গণনাট্য আন্দোলনের উপর নবান্নের প্রতিক্রিয়া' প্রবন্ধে লিখেছেন[১৬] "...দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'নীলদর্পণ' শম্ভুবাবু পছন্দ করেননি। তিনি নাট্যবিভাগে যে সংশোধনী খসড়া উপস্থাপিত করেন তাতে ক্ষেত্রমণির অত্যাচারের সংবাদ দিয়ে ছোট বৌ-এর ওপর অত্যাচার দেখানর প্রস্তাব ছিল—যা, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অনেকেই সমর্থন করতে পারেননি। দিগিনবাবু অবশ্য বলেছিলেন যে গোটা নাট্যবিভাগ যদি রাজী থাকে তবে যেন তাঁর বিরোধিতা মিনিট বুকে উল্লেখ থাকে। এর পরেই শম্ভুবাবু এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় বিরক্ত হয়ে সভাস্থল পরিত্যাগ করেন। গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে শম্ভু মিত্রের বিরোধের এই একটিমাত্র ঘটনাই আছে।"

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে[১৭] এই বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন তার সঙ্গে সুধী প্রধানের পূর্বোক্ত মতের সমর্থন মেলে। দিগিন্দ্র লিখেছেন—"এমন কি, যে 'নীলদর্পণ' করাবার উদ্দেশ্যে লেখককে গণনাট্য সঙ্ঘে নিয়ে যাওয়া হল, সেই 'নীলদর্পণ' প্রথমে গণনাট্যকে দিয়ে করানো যায়নি। সেখানে প্রবল অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন শম্ভু মিত্র। পিস কেটারের মতো তিনি চাইলেন 'নীলদর্পণ'কে এ কালের রাজনৈতিক পটভূমিতে এনে ঢেলে সাজাতে। লেখক তাতে তীব্র আপত্তি করে। তাতেই ক্ষুণ্ণ হয়ে শম্ভু মিত্র গণনাট্য সঙ্ঘ ছেড়ে 'বহুরূপী' নামে আলাদা সংস্থা করেন।"

তৎকালীন গণনাট্য সঙ্ঘের পার্টি সেল সম্পাদক চারুপ্রকাশ ঘোষ তাঁর ১৮ আগষ্ট ১৯৪৬ তারিখে লেখা প্রতিবেদনে স্বীকার করেছেন, উল্লিখিত

সময়ে গণনাট্য সঙ্ঘে দুটি ধারা সৃষ্টি হয়েছে। একটির প্রধান শম্ভু মিত্র এবং অন্যটির সুধী প্রধান। চারুপ্রকাশ প্রথমোক্ত ধারার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন[১৮]—They seem to ignore that is their zeal for setting new standards, traditions and principles in the culture and development of Art, they are trading to drift away from the party and to develop lamentable lack of elementary loyalty to Party. They have proved to be neither good Party Members nor successful builders of art movement."

সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে শম্ভু মিত্র গণনাট্য সঙ্ঘে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুর আহ্বানে যোগ দিলেও নাট্যশিল্পের উৎকর্ষ সৃষ্টির দিকেই তিনি ছিলেন সদাসতর্ক। গণনাট্য সঙ্ঘে তিনি পরিচালনাকর্মের সঙ্গেও অধিক পরিমাণে যুক্ত ছিলেন। পরিচালনাকর্মটি তিনি যে পরম আন্তরিকতায় ও শিল্পসার্থকতায় সম্পন্ন করেছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। নাট্য-নির্দেশনার যাবতীয় অনুপুঙ্খ বিষয় তিনি সুচারুভাবে অনুধাবন করেছিলেন এবং প্রয়োগ করেছিলেন। গণনাট্য সঙ্ঘ ত্যাগ করে আসার পর তিনি যখন তাঁর নিজস্ব নাট্যসংগঠন গড়ে তুললেন তাতে তাঁর নাট্যদীক্ষার সদ্ব্যবহার করার দুর্লভ সুযোগ ঘটল।

॥ ৩ ॥

গণনাট্য সঙ্ঘ থেকে বেরিয়ে-আসা দল নিয়ে গড়ে উঠল বহুরূপী। শম্ভু মিত্র প্রধান যে কারণে গণনাট্য সঙ্ঘ ত্যাগ করেন, এমনকি যে কারণে সাধারণ রঙ্গালয় ত্যাগ করেন, সে কারণটি হলো নিজের অভিরুচি ও শিল্পাদর্শ নিয়ে তিনি নাটক নির্বাচন করবেন এবং প্রযোজনা-কর্ম নিষ্পন্ন করবেন। এ ব্যাপারে তাঁর বাঞ্ছিত কর্মশালা হলো বহুরূপী, যেখানে সার্থক হবে শম্ভু মিত্রের নাট্যচর্চা। প্রথমে মনে রাখতে হবে, দলটির 'বহুরূপী' নামকরণ প্রথম থেকে হয়নি। প্রথম নাম ছিল 'অশোক মজুমদার ও সম্প্রদায়'। এই নাট্যসম্প্রদায় গঠন করার প্রেরণা এসেছিল মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের কাছ থেকে। সম্প্রদায়ের পরিচালক হলেন শম্ভু মিত্র এবং কলিম শরাফি থাকলেন শম্ভু মিত্রের দক্ষিণহস্ত। তিনি নিয়ে এলেন তাঁর তিনজন সহকর্মী। তাঁদের নাম অশোক

মজুমদার, অমর গঙ্গোপাধ্যায় ও মহম্মদ জ্যাকেরিয়া। সম্প্রদায়টি গড়ে উঠল পেশাদারী রূপে। আর যাঁরা দলে যোগ দিলেন তাঁরা হলেন সত্যজীবন চট্টোপাধ্যায়, জলদ চট্টোপাধ্যায়, শোভেন মজুমদার, অরীন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়, মুক্তি গোস্বামী, ঋত্বিক ঘটক, ললিতা বিশ্বাস, রবীন মজুমদার, কালী সরকার প্রমুখ। 'বহুরূপী' নামকরণের পূর্বে 'অশোক মজুমদার ও সম্প্রদায়' ১৯৪৮ সালের ১৩,১৪,১৬ সেপ্টেম্বর রঙমহল মঞ্চে প্রথম অভিনয় করে 'নবান্ন'। আমন্ত্রণপত্রে প্রযোজক হিসেবে মুদ্রিত হতো অশোক মজুমদারের নাম। কিন্তু পরিচালনা, মঞ্চ-সজ্জা আলোকসম্পাত প্রভৃতি বিচিত্র ব্যাপার দেখাশোনা করেছিলেন শম্ভু মিত্র। তাছাড়া তিনি দয়াল ও টাউটের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

'নবান্ন' আর্থিক দিক থেকে 'অশোক মজুমদার ও সম্প্রদায়কে' লাভবান করতে পারেনি। কিন্তু নাট্যদল হিসেবে বেঁচে থাকার একটি প্রেরণা জুগিয়েছিল। অনেকে দলত্যাগ করলেও মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, কলিম শরাফি, অশোক মজুমদার, অমর গাঙ্গুলী, মহম্মদ জ্যাকেরিয়া ও শোভেন মজুমদার দল ছাড়েননি। দলে এলেন আরও নতুন মুখ: স্মৃতি ও গীতা ভাদুড়ী, সবিতাব্রত দত্ত, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, কুমার রায়। 'নবান্ন'র পর এই নাট্যসম্প্রদায় মঞ্চস্থ করেন তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক'। নির্দেশনা ও অসীম চরিত্রের ভূমিকাভিনয়ে ছিলেন শম্ভু মিত্র। 'পথিক'-এর প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় ই. বি. আর ম্যানসন ইনসটিটিউট (অধুনা নেতাজী মঞ্চ)। অভিনয় তারিখ ছিল ১৬ অক্টোবর, ১৯৪৯। পথিক-এর আলোক সম্পাতের দায়িত্বে ছিলেন তাপস সেন।

তৎকালীন পত্রপত্রিকায় 'পথিক'-এর অভিনয় কৌশলের প্রশংসা প্রকাশিত হয়। ২৮ অক্টোবর, ১৯৪৯ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় 'পথিক'-এর প্রযোজনা সম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে লেখা হয়—

"সম্প্রতি শিয়ালদহ রেলওয়ে ম্যানসন হলে শ্রীযুক্ত তুলসী লাহিড়ীর নব-রচিত 'পথিক' নাটকের অভিনয় দেখিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। মানভূম জেলার একটি কয়লাখনি অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া মাত্র তিনটি দৃশ্যে পূর্ণাঙ্গ নাটকখানি গড়িয়া উঠিয়াছে। আঙ্গিকের দিক দিয়া ইহা আধুনিক।

'পথিক' প্রযোজনার পরই, অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের শেষদিকে শম্ভু মিত্র ও

তৃপ্তি মিত্র চলে যান বোম্বাই সিনেমায় অভিনয়ের জন্য। মাত্র তিন মাসের জন্য তাঁরা গেলেন বোম্বাই। কিন্তু নাট্যসম্প্রদায়টি তখনও অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছিল।

শম্ভু মিত্র বোম্বাই থেকে ফিরে আসার পর নাট্যসম্প্রদায়টির একটি নামকরণের ব্যাপারে সবাই তৎপর হয়ে ওঠেন। ১৯৫০ সালের ১মে দলটির নাম হলো 'বহুরূপী'। অশোক মজুমদার তাঁর 'পথিক থেকে রক্তকরবী' শীর্ষক প্রবন্ধে এই নামকরণ প্রসঙ্গে লিখেছেন—[১৯]

"আমরা সবাই মিলে জটলা করছি, মিটিং করছি, দলের নামকরণ নিয়ে কিছুতেই আর কোন নাম ঠিক হয় না। অনেক রকম-বেরকম নাম সবার মাথায় এসেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব নাকচ করে মহর্ষির (মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য) স্মরণ নিতে হোল। কোনরকম ভাবনা চিন্তা না করেই তিনি বললেন, 'আরে আমরা তো বহুরূপীর দল।' সেই থেকে 'দল' কথাটাকে বাদ দিয়ে দলের নাম হোল 'বহুরূপী'। সারাভারতের রসিক সমাজ, যাঁরা থিয়েটারকে ভালবাসেন তাঁদের মুখে মুখে আমাদের পরিচয় 'বহুরূপীর দল'। মহর্ষিকে সভাপতি করে আমাদের যাত্রা শুরু হোল। সংকল্প—ভালো করে ভালো নাটক অভিনয় করা। তারিখটা ছিল ১লা মে, ১৯৫০।"

'বহুরূপী'র নাট্য পরিচালকের পদে থাকলেন শম্ভু মিত্র। আজ যে 'বহুরূপী' বাংলা নাট্য-দিগন্তে অভাবনীয় নাট্যঐতিহ্য উপহার দিয়েছে, সেই শম্ভু মিত্র সমার্থক হয়ে গেছেন। 'বহুরূপী'-তে নাট্য প্রযোজক ও প্রধান অভিনেতা ছাড়া শম্ভু মিত্রের আর একটা পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। তিনি নাট্যকারও।

বহুরূপীর বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু 'বহুরূপী'র বয়স যখন কুড়ি সেই সময়, অর্থাৎ ১৯৬৮ সালের গোড়াতে শম্ভু মিত্রের সঙ্গে শুরু হলো সাংগঠনিক বিরোধ। তিনি চেয়েছিলেন সংগঠনের দায়-দায়িত্ব বুঝে নিতে। অবশ্য অন্যান্যদের এ ব্যাপারে মত থাকলেও শম্ভু মিত্র শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসেন। এই সময় থেকে তিনি স্বপ্ন দেখতেন জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার। তাঁর উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি। কিন্তু দুঃখের বিষয় নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠার জন্য আশানুরূপ চাঁদা ওঠাতে না পারলেও, যে চাঁদা উঠেছিল, তাই দিয়ে হয়তো নাটমঞ্চ স্থাপন করা সম্ভব হতো। কিন্তু জমি না পাওয়ার দরুন অবশেষে নাটমঞ্চ স্থাপনের ইচ্ছা পরিত্যক্ত হয়। এই সময় বহুরূপীর সঙ্গেও শম্ভু মিত্রের সম্পর্কে দেখা দিতে থাকে ভাঁটার টান। অবশেষে

১৯৭৮ সালের আগষ্টে যখন 'বহুরূপী'র বয়স হল তিরিশ, তখন বহুরূপী ত্যাগ করলেন শম্ভু মিত্র। 'বহুরূপী' ও শম্ভু মিত্রের মধ্যে ব্যবধান যোজন পরিমাণ হলেও, শম্ভু মিত্র কখনই নিজেকে 'বহুরূপী'র বাইরের লোক বলে ভাবতে পারতেন না। তাঁর যাবতীয় নাট্য-প্রতিষ্ঠার মূলে 'বহুরূপী'। 'বহুরূপী তে তিনি অভিনয় করেছেন, নাট্য পরিচালনা করেছেন। 'বহুরূপী'র জন্য তিনি নাটক লিখেছেন, অভিনেয় নাটকের সম্পাদনা করেছেন। সব থেকে বড় কথা, যে রবীন্দ্র-নাটকের অভিনয় করে 'বহুরূপী' বাংলা মঞ্চের গৌরব বাড়িয়েছে সেই অভিনয়ের ও প্রযোজনার মন্ত্রগুপ্তি শম্ভু মিত্রের শিল্প-জিজ্ঞাসাসঞ্জাত। সেই শিল্পজিজ্ঞাসা মার খাচ্ছিল তার গণনাট্য পর্বে। তাই শম্ভু মিত্র গণনাট্য ত্যাগে দ্বিধা করেননি। গণনাট্যের ইতিহাস লেখকগণ এ ব্যাপারে শম্ভু মিত্রকে যতই নিন্দা করুন না কেন, তাঁর নিজস্ব চিন্তার জগতের কাছে তিনি ছিলেন দায়বদ্ধ। হতে পারে তিনি শিল্প-উৎকর্ষের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে ছিলেন উন্মুখ। এই উন্মুখতার বিকাশে বাধা আসছিল বলে শম্ভু মিত্র গণনাট্য সঙ্ঘ ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু একথা ঠিক গণনাট্য সঙ্ঘ ত্যাগ করলেও গণনাট্যের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অনাবিল উৎকাঙ্ক্ষা শম্ভু মিত্রের নাট্যজিজ্ঞাসার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল। তাই যে-বিন্দুতে দাঁড়িয়ে তিনি গণনাট্য সঙ্ঘ ত্যাগ করেছিলেন ঠিক সেই বিন্দু থেকেই তাঁর নাট্যশিল্প বিকাশের পথ-পরিক্রমা শুরু হয়। এই পথ-পরিক্রমার নতুন মাত্রা সংযোজিত হয় রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনায়।

সদ্য-স্বাধীন ভারতে যখন সমাজ গঠনের দরকার ছিল জরুরী, তখন এমন নাটক বাছতে হবে যার অভিনয় জনগণের মধ্যে জাগাবে সাড়া। তাই নবান্ন, পথিক, উলুখাগড়া, ছেঁড়াতার ইত্যাদি প্রযোজনার পর শম্ভু মিত্র স্পর্শ করতে চাইলেন রবীন্দ্রনাটক।

'বহুরূপী'তে প্রথম প্রযোজিত রবীন্দ্রনাটক 'চার অধ্যায়'। নাটকটির প্রথম অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় শ্রীরঙ্গম মঞ্চে ২১ আগষ্ট, ১৯৫১। তারপর একে একে 'রক্তকরবী' (প্রথম অভিনয়: ১০ মে, ১৯৫৪), 'স্বর্গীয় প্রহসন' (প্রথম অভিনয়: ২২ মে, ১৯৫৫), 'ডাকঘর' (প্রথম অভিনয়: ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭), 'মুক্তধারা' (প্রথম অভিনয়: ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৫৯), 'বিসর্জন' (প্রথম অভিনয়: ১১ নভেম্বর, ১৯৬১), 'রাজা' (প্রথম অভিনয়: ১৩ জুন, ১৯৬৪), 'দুরাশা' (প্রথম অভিনয়: ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৩), ঘরে বাইরে (প্রথম

অভিনয়ঃ ৯ জুন, ১৯৭৪) মঞ্চস্থ করেছে 'বহুরূপী'। রবীন্দ্রনাথের যে-কটি নাটক 'বহুরূপী' কর্তৃক প্রযোজিতহয়েছে, তার মধ্যে 'চার অধ্যায়', 'রক্ত করবী', 'মুক্তধারা', বিসর্জন' ও 'রাজা' নাটকগুলি মঞ্চস্থ হয়েছে শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায়। রবীন্দ্র নাটক ছাড়া অন্য যে-সব নাটক 'বহুরূপী'তে শ্রীমিত্রের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয়েছে সেগুলির তালিকা নিম্নরূপঃ 'নবান্ন' (প্রথম অভিনয় ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮) পথিক (প্রথম অভিনয়ঃ ১৬ অক্টোবর, ১৯৪৯), উলু খাগড়া (প্রথম অভিনয় ১২ আগষ্ট, ১৯৫০), ছেঁড়াতার (প্রথম অভিনয় ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৫০), বিভাব (প্রথম অভিনয়ঃ ২০ এপ্রিল, ১৯৫১), দশচক্র (প্রথম অভিনয়ঃ ১ জুন, ১৯৫২), স্বপ্ন (প্রথম অভিনয় ১৮ এপ্রিল, ১৯৫৩), এইতো দুনিয়া (প্রথম অভিনয়ঃ ১৮ এপ্রিল, ১৯৫৩), ধর্মঘট (প্রথম অভিনয় ৯ ডিসেম্বর, ১৯৫৬), সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাংকে (প্রথম অভিনয়ঃ ৮ নভেম্বর, ১৯৫৪), পুতুলখেলা (প্রথম অভিনয়ঃ ১০ জানুয়ারী, ১৯৫৮), কাঞ্চনরঙ্গ (প্রথম অভিনয়ঃ ২৪ জানুয়ারী, ১৯৬১) রাজা অয়দিপাউস (প্রথম অভিনয়ঃ ১২ জুন, ১৯৬৪), বাকি ইতিহাস (প্রথম অভিনয়; ৭ মে, ১৯৬৭), বর্বরবাঁশী (প্রথম অভিনয়ঃ ৭ মে, ১৯৬৯) পাগলাঘোড়া (প্রথম অভিনয়ঃ ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১), চোপ, আদালত চলছে (প্রথম অভিনয়ঃ ৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'নবান্ন' ও 'পথিক' প্রযোজিত হয় 'অশোক মজুমদার ও নাট্য সম্প্রদায়' কর্তৃক। ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত উল্লিখিত প্রযোজনাগুলিতে শম্ভু মিত্র অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন প্রায় সবকটিতেই। শুধু মাত্র তিনি তৃপ্তি মিত্রের নির্দেশনায় অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন 'ডাকঘর' ও 'টোরাডাকটিল' নাটকে। পক্ষান্তরে, তাঁর নির্দেশিত নাটকেও তিনি অভিনয় করেননি। যেমন 'বাকি ইতিহাস', 'বর্বর বাঁশী' ও 'পাগলা ঘোড়া'।

উপরের তালিকা থেকে জানা গেল শম্ভু মিত্র রবীন্দ্র-নাটকের সঙ্গে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন সফোক্লিস, হেনরিক ইবসেনের নাটকও। তবে একথা স্বীকার করতে হবে, শ্রীমিত্রের নাট্য-পরিচালনার সিংহভাগ জুড়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। সেই জন্যই প্রশ্ন জাগে কেন রবীন্দ্রনাথ? অবশ্য বহুরূপীতে রবীন্দ্রনাটকের প্রযোজনার পূর্বেই শম্ভু মিত্র গণনাট্য সঙ্ঘে থাকাকালীন 'মুক্তধারা' মঞ্চস্থ করেছেন। এই নাটকের পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর উপরেই ছিল। অতএব রবীন্দ্র-নাট্য পরিচালনায় অভিজ্ঞতা তাঁর ইতিপূর্বেই ঘটেছিল। কিন্তু শম্ভু মিত্র গণনাট্য সঙ্ঘের প্রযোজনায় 'মুক্তধারার' অভিনয়কে খুব বেশি

গুরুত্ব দেননি। তখন ১৯৪৬ সাল সবে শুরু। শম্ভু মিত্র সন্ত বোম্বাই থেকে ফিরে এসেছেন 'ধরতি কি লাল' ছবির কাজ শেষ করে। বলাবাহুল্য, 'ধরতি কি লাল'[২০] বিজন ভট্টাচার্য রচিত 'নবান্ন'-বই হিন্দী চিত্ররূপ। সেখান থেকে ফিরে এসেই তিনি দায়িত্ব পান 'মুক্তধারা' পরিচালনার। তাঁর কণ্ঠেই শোনা যাক 'মুক্তধারা' সম্পর্কিত তাঁর মতামত[২১]—

"ফিরে এলে (বলাবাহুল্য বোম্বাই থেকে) 'মুক্তধারা'র ভার পড়ে। ব্যর্থ হই। সাম্রাজ্যবাদীদের আচরণ জানা সত্ত্বেও মনে হোল এ নাটক যেন কোনো পুরাকাহিনীর মতো, আমাদের জীবনের সঙ্গে যেন কোনো সংলগ্নতা নেই। তখন তাই স্পষ্ট মনে হোল যে রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়েই আমরা গভীর নাট্যের সৃষ্টিতে পৌঁছে যাব।"

এই ঘটনার ৫ বছর বাদে সেই রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করেই ঘটল শম্ভু মিত্রের নাট্যমুক্তি। 'কীভাবে রবীন্দ্রনাথে পৌঁছান গেল' নিবন্ধে শম্ভু মিত্র ব্যক্ত করেছেন—কখন কোন্ পরিস্থিতিতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন। উক্ত নিবন্ধে তিনি স্পষ্ট করেই লিখেছেন—"সামাজিক কারণেই 'চার অধ্যায়' অভিনয় করার কথা মনে হোল।"

এখন প্রশ্ন, কোন 'সামাজিক কারণে'? শোষণমুক্ত এক আদর্শ মানবসমাজের স্বপ্ন শম্ভু মিত্রের হৃদয়ের নিভৃতে আঁকা ছিল। এটাও তিনি জানতেন যে, সমাজকে পাল্টাবার পথ খুবই দুর্গম। এই পথে চলতে গেলে চাই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা। এই দুয়ের অভাব হলেই ঘটে বিপত্তি। 'চার অধ্যায়' পাঠ করে শম্ভু মিত্রের এই সিদ্ধান্তে আসতে দেরি হয়নি। 'চার অধ্যায়'-এর প্রযোজনায় তিনি শিল্পসিদ্ধির যে চরমে যেতে পেরেছিলেন, যাকে অশোক সেন বলেছেন,[২২] 'অসাধ্য সাধন', সেই শিল্পসিদ্ধি এতখানি অনায়াসলব্ধ হওয়ার কারণ রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সাঙ্গীকরণ। সেই দিক থেকে 'চার অধ্যায়ে'র অর্জিত সাফল্য শম্ভু মিত্রকে আরও বেশি দুঃসাহসী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী করে তোলে। তিনি হাতে তুলে নেন রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'। 'রক্তকরবী'তে রয়েছে শোষণমুক্ত এক আদর্শ মানবসমাজের নাট্যরূপ। 'রক্তকরবী'র মঞ্চ-সাফল্যের স্বরূপ জানার আগেই আমাদের জেনে নিতে হবে 'চার অধ্যায়ে'র প্রয়োগ কর্মের বৈশিষ্ট্য কি ছিল।

'চার অধ্যায়ে'র যে নাট্যলিপি বহুরূপী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে বলা হয়—"যা লেখায় প্রকাশ হয় না, আঁকায় প্রকাশ হয় না, গানে প্রকাশ হয়

না, কেবলমাত্র নাট্যাভিনয়েই প্রকাশ হয়। 'চার অধ্যায়'কে আশ্রয় করে সেই চেষ্টা করতে পেরেছি বলে আমরা 'চার অধ্যায়'কে ভালবাসি।"

মূলত এই 'ভালবাসাই' 'চার অধ্যায়ে'র প্রযোজনাকে সাফল্য মণ্ডিত করেছিল। ২৪ আগস্ট, ১৯৫১ তারিখের 'সত্যযুগ' পত্রিকায় 'চার অধ্যায়ে'র প্রযোজনা সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল, তা স্মরণ করলে পাঠকের পক্ষে কিঞ্চিৎ সুবিধে হবে—

"'চার অধ্যায়' মূলত নাটক নয়, উপন্যাস। উপন্যাসের মধ্য থেকে যথার্থ নাটকীয় উপাদনকে ছেঁকে তোলা শিল্পীর কৃতকর্ম। এ পরীক্ষায় বহুরূপী জলপানি না পেলেও ফার্স্ট ডিভিশনের নম্বর নিয়ে পাশ করেছেন। যে জিনিষটা প্রথমেই চোখে পড়েছে, তাহল নাটকের প্রয়োগ কৌশলের বিশিষ্টতা। সূত্রধার গল্প শুরু করল। সেই গল্প মোড় নিয়ে নাটকের মোহনায় প্রবেশ করল। নাটক শুরুর সংস্কৃত ঘেঁষা এই পদ্ধতিটি নূতনত্বের স্বাদ এনেছে নিঃসন্দেহেই তবে সূত্রধরের বাচনভঙ্গী যদি শম্ভু মিত্রের হতো তবে শেষ পর্যন্ত আলুনি হয়ে পড়তো না বোধ হয়। গল্প এলা ও ইন্দ্রনাথের পরিচয়ের মোড়ে পৌছুলে সূত্রধারের কণ্ঠ আশ্রয় ত্যাগ করে এলা ও ইন্দ্রনাথের নেপথ্য অভিনয়ের মধ্যদিয়ে যেভাবে দর্শকের সামনে উপস্থিত হয়েছে তার জন্ম পরিচালকের উদ্ভাবনী শক্তির প্রশংসাই করতে হয়।"

'চার অধ্যায়ে'র মঞ্চ-ও প্রয়োগ-সাফল্য শম্ভু মিত্রকে উচ্চাকাঙ্ক্ষী করে তুলেছিল। তারই প্রকাশ ঘটে 'রক্তকরবী' প্রযোজনায়। এই প্রযোজনা আজ প্রবাদে পরিণত হয়েছে। শ্রীমিত্র তাঁর নাট্যজীবনের বিভিন্ন পর্বে 'রক্তকরবী' সম্পর্কে যত কথা বলেছেন এবং লিখেছেন এমন আর কোনও নাটক নিয়ে নয়। তাঁর 'রক্তকরবী প্রসঙ্গে' নিবন্ধে শম্ভু মিত্র ব্যাখ্যা করেছেন, কেমন করে কোন পরিস্থিতিতে তিনি 'রক্তকরবী'র মঞ্চসজ্জা সংলাপ সংগীত আবহ সৃষ্টির অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রধান মন্ত্রণাদাতা ছিলেন খালেদ চৌধুরী। তাঁর সম্পর্কে শম্ভু মিত্র লিখেছেন[২৩]— "তারপর একদিন খালেদ চৌধুরী বহুরূপীতে এলেন। এবং রয়ে গেলেন। লোকটির অস্বাভাবিক ক্ষমতা। আঁকতে পারেন, যেকোনও বাজনা বাজাতে পারেন, গান শোনাতে পারেন। আর যতো নতুন নতুন জিনিষ উদ্ভাবন করতে পারেন। তাঁকে পেয়ে আবার আমাদের মাথায় 'রক্তকরবী'র চিন্তা পেয়ে বসল।"

গোপাল হালদার 'রক্তকরবী' দেখে তার প্রয়োগকর্ম সম্পর্কে প্রণিধান—

যোগ্য মন্তব্য করেছিলেন,[২৪] "শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্র যা করতে চেয়েছেন তা অনুকরণ নয়, রবীন্দ্রনাথের নকল নয়, রবীন্দ্রানুপ্রেরণায় নতুন সৃষ্টি।…'রক্ত করবী'কে কবি প্রাণদান করেছেন, কিন্তু 'রক্তকরবী' জীবন্ত হয়ে উঠেছে শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্রের প্রযোজনায়।"

গোপাল হালদারের এই উক্তিতে ধরা পড়ে শম্ভু মিত্রের রবীন্দ্র-অনুধ্যানের স্বরূপ। তিনি তাঁর "রক্তকরবীতে সঙ্গীতপ্রয়োগ" প্রবন্ধে[২৫] এ-সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করে লিখেছেন, "চার অধ্যায়' অভিনয় ও শেষ অধ্যায়ের শেষে একটু সুরের দরকার ছিলো, যার শীর্ষ বিন্দুতে 'বন্দেমাতরম্' কথাটি জিগির দেওয়ার মতো আসবে। – কিন্তু 'রক্তকরবী' প্রযোজনার সময়ে মনে হলো এখানে সুরের প্রয়োজন অনেক বেশী অথচ চিরাচরিত যে-পথে আবহ-সঙ্গীতের সুরারোপ করা হয়ে থাকে সে-পদ্ধতি এ-নাট্যে খাপ খাবে না। অর্থাৎ কেবল কারখানা বা খনির বাস্তব আওয়াজে যেমন এর কাব্যকে ধরা যাবে না তেমনি সাধারণ নিয়মের 'আবহ-সঙ্গীতে এর বাস্তব রূপটি হারিয়ে যাবে। তাই দরকার ছিলো এক মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর, এক অনন্য বোধশক্তির যার মধ্যে সঙ্গীত ও নাট্যাভিনয় গভীরভাবে অনুভূত।"

শম্ভু মিত্রের নাট্যবোধ যে কত গভীর তা এই উক্তি থেকে বোঝা যাবে। 'রক্তকরবী'র প্রযোজনা এই নাট্যবোধ থেকে উৎসারিত হয়েছিল বলে, তা এক উল্লেখযোগ্য প্রযোজনার দিকচিহ্ন হয়ে আছে।

অন্যান্য শিল্পের মতো নাট্যশিল্পও সামাজিক দায়িত্বকে এড়াতে পারে না। একথা সব নাট্য-প্রযোজনা ও অভিনেতা সর্বদাই মনে রাখেন। যাঁরা শুধু মনে রাখেন না, প্রয়োগের মাধ্যমেও দেখাতে পারেন তাঁরাই পান শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান। শম্ভু মিত্র একের পর এক নাট্য-প্রযোজনার মাধ্যমে তাঁর সমাজ-মনস্কতার ব্যাপক ও গভীর পরিচয় রেখেছেন।

রবীন্দ্রনাথের যেকটি নাটক শ্রীমিত্র বেছেছিলেন প্রযোজনার জন্য সেগুলি তিনি বারবার পড়েছেন এবং দলের সবাইকে পড়ে শুনিয়েছেন। ধরতে চেয়েছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথের নাট্যমানসের প্রকৃত স্বরূপ। তার সঙ্গে তিনি যোগ করেছিলেন তাঁর মৌলিক নাট্যবোধ। সেই কারণে তাঁকে প্রবন্ধ লিখে বোঝাতে হয়েছিল 'কীভাবে রবীন্দ্রনাথে পৌছানো গেল'।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া শম্ভু মিত্র অবলম্বন করেছিলেন ইবসেনের নাটক ও সফোক্লিসের নাটক। ইবসেনের 'এনিমি অব দি পিপ্‌ল্'কে এবং 'এ ডলস্

হাউসকে' তিনি বিশেষ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীতে গ্রহণ করেছেন। 'এনিমি অব দি পিপ্‌ল্' বহুরূপীর বাংলা রূপান্তরে হয়েছে 'দশচক্র'। স্বাধীনতালাভের ৫ বছর বাদে 'দশচক্র' মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে বলা হয়েছে এক ডাক্তারের কাহিনী, যিনি জনগণের স্বার্থে আত্মস্বার্থ বলি দিতে চেয়েছিলেন। এ এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত যা স্বাধীন ভারতবর্ষের সমাজ গঠনের প্রধান দিশারী। ইবসেন যে-নাটক বহুদিন আগে লিখেছিলেন তাঁর দেশের তৎকালীন সমাজ-বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে, শম্ভু মিত্র তাকেই নিয়ে এলেন তাঁর দেশের প্রেক্ষিতে আদর্শ সমাজগঠনের মৌলিক ভাবনায়। বহুরূপীর নাট্যলিপিতে তাই ডাক্তারকে বলা হয়েছিল 'ধর্মযোদ্ধা', যে "সোজা হয়ে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়ায় অনেক প্রচলিত ক্ষয়ে-যাওয়া সত্যকে ফেলে, অনেক ঘুনে,-ধরা তত্ত্বকে ভেঙে নিজের সার্থকতার পথ বেছে নেয়।"

'এ ডলস্ হাউসকে বাংলায় রূপান্তরিত করেন শম্ভু মিত্র নিজেই। এ ছাড়া অভিনয় ও নির্দেশনায় তো তিনি ছিলেনই। এই নাটকের ভূমিকা বর্ণিত হয়েছে বহুরূপীর নাট্যলিপিতে—"এ নাটকে যদি কেবলমাত্র নারী-জাগরণের বা নারীর ভোটাধিকারের প্রশ্ন আছে বলে মনে হোত তাহলে আজকের যুগে এ নাটক করার উৎসাহ বহুরূপীর হোত না। বহুরূপীর মনে হয়েছে যে এই পুতুলের সংসারের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী-উভয়েই যেন পুতুল খেলার-পুতুল। অতীত থেকে যে-চিন্তা বংশপরম্পরায় আমাদের মনের মধ্যে শিকড় মেলে বসে গেছে আমরা তারই হাতের অসহায় পুতুল মাত্র।"

কিন্তু এইটুকু বলেই বহুরূপী থেমে যায়নি। বহুরূপী প্রশ্ন তুলেছিল—"নরনারীর মিলন সমাজ-বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। তার মধ্যে আছে ভবিষ্যতের বীজ। সেই বীজ যেখানে লালিত হবে সেই সংসারের ভিত্তি যদি সৎ না হয় তাহলে সে ভবিষ্যতের ভিত্তি কোথায়?"

স্বাধীনতা প্রাপ্তির এগারো বছর বাদে বহুরূপী প্রযোজনা করে 'পুতুল খেলা'। তখন ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সংবিধান প্রস্তুত। নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত। কিন্তু সমাজে নারীর অবস্থান কোথায়, কোথায় তাদের মুক্তি ও স্বাধিকার তা নিয়ে ভারতীয় জনগণের মাথাব্যথা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ কত আগে লিখেছিলেন 'স্ত্রীর পত্র' গল্প, যেখানে আমরা দেখেছি ভালোবাসাহীন শ্রদ্ধাহীন সমাজ-সংসার ও দাম্পত্যজীবনকে পরিত্যাগ করে মৃণাল চলে যায় পুরীর শ্রীক্ষেত্রে। পুতুলখেলার বুলুও অনুরূপভাবে দাম্পত্য-

জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ত্যাগ করেছিল স্বামী ও সংসার। পুতুলখেলার প্রযোজনায় শম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাথের মৃণালের ভাবনাকেই শিরোধার্য করে নাট্যকর্ম সাধন করতে উদ্যোগী হন। তাই বলছিলাম, শম্ভু মিত্র বারংবার তাঁর নাট্য প্রযোজনায় ছুঁতে চেয়েছিলেন সমকালীন সমাজ-বাস্তবকে। আর এর ফলে তিনি হয়েছেন তাঁর কালের নাট্য-আন্দোলনে এক অগ্রপথিক।

॥ ৪ ॥

১৯৬৪ সাল থেকে বহুরূপীতে শম্ভু মিত্রের প্রযোজনায় ঘটেছে অন্ধকারের নাট্যরূপের বিস্তার। এই বছরই তিনি উপহার দিলেন দুখানি নাটক—'রাজা অয়দিপাউস' ও 'রাজা'। প্রথমটি গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিসের, দ্বিতীয়টি রবীন্দ্রনাথের।

'রাজা অয়দিপাউস' বাংলায় নাট্যরূপায়িত করেন স্বয়ং শম্ভু মিত্র! এই দুখানি নাটককেই বহুরূপী 'অন্ধকারের নাটক' রূপে চিহ্নিত করেছে। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগে, কেন অন্ধকারের নাটক?

বলাবাহুল্য, বহুরূপীর নাট্যনির্দেশক শম্ভু মিত্র এই প্রশ্ন এবং এর উত্তর সম্পর্কে আগে থেকেই সচেতন ছিলেন। রাজা অয়দিপাউস-এর নাট্যলিপিতে লেখা হয়েছিল—"আলো-আঁধারীর দুনিয়ায় হিসেবের বাইরেও হিসেব আছে, একজনের দেনা অন্যজনে বর্তায়। এক অজেয় অন্ধকার নিষ্কলঙ্ককে শাস্তি দেয়। যাকে চেনা যায় না, বোঝা যায় না। তার বাড়ানো হাতে মানুষকে মাশুল তুলে দিতে হয়।

"যে ভয়ংকরের মুখোমুখি দাঁড়ানো ভবিতব্য। সে চুরমার করে দেয়, আর ভাঙনের মুখে দাঁড়িয়েই মানুষ আবিষ্কার করে তার নিজের বংশগরিমা,—সে বিরাট, সে মহৎ, সে অন্ধকারেরই সন্তান।" অনুরূপভাবে 'রাজা' সম্পর্কেও মন্তব্য করা হয়েছিল—

"অন্ধকারের 'রাজা' কঠিন বজ্র আর কোমল ধ্বজা উড়িয়ে আসে। সে কালো, সে ভীষণ; সে মধুর। তার উত্তরীয়ের সুগন্ধ মুগ্ধ আবিষ্টতায় ভরে দেয়। গর্বিত বুদ্ধি তাকে খুঁজে পেয়েছে ভেবে প্রবঞ্চিত হয়, অহমিকার আক্রোশে আগুন জ্বলে, অভিমানের অশ্রু অনর্থ সৃষ্টি করে। সমস্ত আত্মম্ভরিতার অবসানে যখন আত্মনিবেদন সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, তখনই কি হৃদয়ের অন্ধকার ঘরের দুয়ার খুলে যায় মুখোমুখি সুদর্শনা খুঁজে পায় তার রাজাকে?"

'অন্ধকারের নাটক' নিয়ে ১৯৬৪ সালে বহুরূপীতে যে নাট্যোৎসব হলো, তাকে বহুরূপীর তৎকালীন নাট্যলিপিতে বলা হয়েছিল—"এই আলোর মতো অন্ধকার আর অন্ধকারের মতো আলোকে নিয়েই তো উৎসব।" অর্থাৎ অন্ধকারের নাটক আলোরই উৎসারণ ঘটিয়েছে।

বহুরূপীর 'অন্ধকারের নাটক' অভিনয়ের কৃতিত্ব কেউ অস্বীকার করেননি। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীমহল থেকে শুরু করে অতি সাধারণ দর্শকও বহুরূপীর নাট্য প্রয়োগ কৌশলে সেদিন অভিভূত হয়েছেন। এসবই কিন্তু নির্দেশক শম্ভু মিত্রের অসাধারণ নাট্যবোধের ফলশ্রুতি। অধ্যাপক অমলেন্দু বসু 'রাজা অয়দিপাউসে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে[২৬] সেকথা স্বীকার করে বলেছেন, "শম্ভু মিত্রের মঞ্চানুযায়ী অনুবাদে নাটকটির এই বারুদঠাসা ঘটনা-পরম্পরা ফুটে উঠেছে সুন্দররূপে তাঁর নিজ অভিনয়ে ও নির্দেশনায় যেমনটি হয়েছিল বলে আমি জানি। এবং আমার নিশ্চিত ধারণা আগের কালে অন্য বঙ্গীয় অভিনয়ে ও নির্দেশনায় এই পরম্পরার দুর্বারগতি অব্যাহত থাকবে।"

বহুরূপীতে অন্ধকারের নাটক প্রযোজনার পর মঞ্চস্থ হয় অপ্রচলিত প্রথাবিরোধী নাটক, যাকে আমরা অনায়াসে বলতে পারি অ্যাবসার্ড নাটক। এই নাটকের নাট্যকার বাদল সরকার। এগুলি হলো—'বাকি ইতিহাস', 'প্রলাপ', 'ত্রিংশ শতাব্দী' ও 'পাগলা ঘোড়া'। এছাড়া নীতীশ সেনের 'বর্বর বাঁশি' ও ইয়োনেস্কোর 'গণ্ডার'। 'গণ্ডারের' নির্দেশক শম্ভু মিত্র নন। এই ধরনের নাট্যাভিনয়ের পশ্চাতেও সক্রিয় ছিল শম্ভু মিত্রের সমাজবোধ। তিনি তাঁর 'ফিরে তাকাই' প্রবন্ধে[২৭] লিখিতভাবে জানিয়েছেন তাঁর অভিপ্রেত উপলব্ধিকে—"যখন আমাদের মনে হচ্ছে আমাদের দেশ একটা বিপর্যয়ের মধ্যে চলেছে, যখন আমাদের প্রচণ্ড চিন্তা হয়েছে যে একটা ব্যক্তিগত মানুষ কি করে নিজের সার্থকতা খুঁজে পাবার চেষ্টা করবে, এই দিশাহারা সমাজের মধ্যে এখন আমরা আবার দশচক্র করছি। নতুন স্বাদে, নতুন অনুভবে। এবং এই চিন্তাটাকে আরো স্পষ্টরূপ করেছি আমরা রবীন্দ্রনাথের 'রাজা'-তে আর সোফোক্লেসের 'রাজা অয়দিপাউস'-এ।

"তেমনই চারিদিকে নির্বুদ্ধি কথার মস্তানী পুনরাবৃত্তি শুনতে শুনতে মনে হয়েছে ইয়োনেস্কোর 'গণ্ডার' অভিনয় করা আমাদের দেশের পক্ষে দরকার।"

প্রকৃতপ্রস্তাবে অন্ধকার, নৈরাজ্য, বিশৃংখলা, ধর্ষকামিতা শম্ভু মিত্রের কাম্য নয়। তিনি উত্তরণে বিশ্বাসী। যেখানে একঘেয়েমি, অন্ধকার আর

প্রথাসর্বস্বতা বিরাজমান, সেখানে তিনি জ্বালতে চান আলো, ফোটাতে চান রূপ, আনতে চান ব্যঞ্জনা। এই হলো নাট্যনির্দেশক ও নট শম্ভু মিত্রের মর্মবাণী। নাট্যনির্দেশনা ও অভিনয় শিল্পকে এক উৎকর্ষ বিন্দুতে তিনি মিলিয়েছেন। এই পটভূমিতে উদ্ভাসিত হয়েছে তাঁর বিরল নাট্যব্যক্তিত্ব।

নাট্যনির্দেশক ও নট ছাড়াও শম্ভু মিত্রের আরো বহুতর পরিচয় আমাদের জানা। তিনি নাট্যপত্রিকার সম্পাদক, নাট্যকার এবং নাট্যবিশ্লেষক প্রবন্ধকারও। ১৯৫৫ সালের মে মাস থেকে বহুরূপী নাট্যসম্প্রদায় কর্তৃক প্রকাশিত হয় নাট্যপত্রিকা 'বহুরূপী'। এই নাট্যপত্রের সম্পাদনার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে দিয়েছিলেন শম্ভু মিত্র ১৯৭১ সালে। বহুরূপীতে থাকাকালীন তিনি এই দায়িত্ব আন্তরিকতার সঙ্গেই পালন করেছিলেন।

নাট্যরচনা ও নাট্যরূপদানেও শ্রীমিত্র ছিলেন উৎসাহী। তিনি নাট্যরূপ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়', ইউজিন ও' নিল-এর 'হয়্যার দ্য ক্রস ইজ মেড' ('স্বপ্ন' নামে), হেনরিক ইবসেন-এর 'এ ডলস হাউস' ('পুতুল খেলা' নামে) ও সোফোক্লেসের 'রাজা অয়দিপাউস'। তাঁর রচিত নাটক হলো 'উলুখাগড়া' (শ্রীসঞ্জীব ছদ্মনামে) ও 'চাঁদবণিকের পালা'। অমিত মৈত্র-র সঙ্গে যুগ্মভাবে শম্ভু মিত্র লেখেন 'কাঞ্চনরঙ্গ'।

শম্ভু মিত্র অভিনয় ও নির্দেশনার সঙ্গে জড়িত থেকেও নাট্যজগৎ ও নাট্য-ব্যক্তিত্ব নিয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'প্রসঙ্গ : নাট্য', 'সন্মার্গ ও সপর্যা', 'কাকে বলে নাট্যকলা' এবং 'নাটক রক্তকরবী'। শেষোক্ত গ্রন্থের বিষয় সেই 'রক্তকরবী' যা তাঁর নাট্যব্যক্তিত্ব প্রকাশের এক দুর্লভ মাধ্যম। 'কাকে বলে নাট্যকলা' গ্রন্থে শম্ভু মিত্র রম্যভঙ্গীতে ব্যক্ত করেছেন নাট্যকলার দুরূহ তত্ত্ব। 'প্রসঙ্গ : নাট্য' ও 'সম্মার্গ-সপর্যা' গ্রন্থে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন নাট্যইতিহাস, নাট্যব্যক্তিত্ব, অভিনয়কলা, প্রয়োগকৌশল প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে। তাঁর প্রতিটি মন্তব্যই নাট্যইতিহাসে এক নবসংযোজন। শিশিরকুমার যে টোটাল থিয়েটারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছিলেন তা শম্ভু মিত্র স্বীকার করে লিখেছেন,[২৮] "নাটককে, দৃশ্যপটকে, অভিনয়কে, শব্দকে সব কী করে এক সঙ্গে নাট্যের মধ্যে ব্যবহার করতে হয় তার শিক্ষা আমরা শিশিরকুমারের কাছ থেকেই পেয়েছি। তিনিই আমাদের প্রথম নির্দেশক, যিনি মঞ্চের ছবি কল্পনা করেছেন। যিনি আলো, দৃশ্যপট, অভিনয় দিয়ে থিয়েটারের একটা সামগ্রিক রূপ প্রথম এই দেশে এনেছিলেন।"

একালের সবথেকে জনপ্রিয় নাট্যব্যক্তিত্ব ব্রেখট-এর নাম শম্ভু মিত্র প্রথম শোনেন শিশিরকুমারের মুখে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে। ব্রেখট-এর অভিনয়পদ্ধতিতে একটি স্বাতন্ত্র্য আছে ঠিকই, কিন্তু শ্রীমিত্র স্বীকার করেছেন, ভালো অভিনয়ের ব্যাপারে ব্রেখট ও স্তানিস্লাভস্কির অভিনয়শৈলিতে কোনোও মৌলিক পার্থক্য নেই।[২৯]

শম্ভু মিত্র যখন রবীন্দ্রনাটক প্রযোজনার জন্য নির্দিষ্ট করেন তখন সেই নাটক বারবার পড়ার সঙ্গে জেনে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের অভিনয় ও প্রয়োগ-কলার বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ একাধারে ছিলেন নাট্যকার, অভিনেতা, অভিনয় শিক্ষক ও প্রযোজক। ১৮৮১ সাল থেকে 'বাল্মীকিপ্রতিভা' রচনা ও অভিনয়ের পর ১৯০২ সাল পর্যন্ত তাঁর নাট্যভাবনায় একটি পর্ব শেষ হয়েছে। এই পর্বে তিনি প্রচলিত মঞ্চরীতি ও মঞ্চমায়াকে আশ্রয় করেছিলেন। কিন্তু ১৯০২ সালে তিনি রচনা করলেন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'রঙ্গমঞ্চ'। এই প্রবন্ধেই তিনি বললেন, প্রচলিত মঞ্চরীতি অমান্য না করলে অভিনয়ে ও প্রযোজনায় মুক্তি আসবে না। তিনি পরিত্যাগ করতে চাইলেন মঞ্চমায়ার কৌশল। ১৯১৫ সালে তিনি 'ফাল্গুনী' নাটক প্রযোজনা করে তাঁর নাট্য-উপলব্ধির নববিকাশ ঘটিয়েছিলেন। শম্ভু মিত্র যখন রবীন্দ্রনাটক প্রযোজনায় অভিলাষী হন তখন রবীন্দ্রশৈলীর স্বরূপ ও ইতিহাস তিনি নিশ্চয়ই জেনেছিলেন। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে, শম্ভু মিত্র রবীন্দ্র-নাট্যপ্রযুক্তিকে অনুসরণ করেননি। তাঁর 'মঞ্চসজ্জার ভূমিকা' প্রবন্ধটি এব্যাপারে আমাদের কাছে দিগদর্শনের কাজ করে। এই প্রবন্ধটি পাঠ করলে দেখা যাবে শম্ভু মিত্র নাট্যপ্রযোজনাকালে দুটি মঞ্চসজ্জা সম্পর্কেই কেবলমাত্র উৎসাহ প্রকাশ করেছেন—শিশিরকুমারের মঞ্চসজ্জা ও রবীন্দ্রনাথের মঞ্চসজ্জা। দুঃখের বিষয় শিশিরকুমারের মঞ্চসজ্জার কোনোও স্কেচের নিদর্শন শম্ভু মিত্রের গোচরে আসেনি। রবীন্দ্রনাথের মঞ্চসজ্জা সম্পর্কে সংক্ষেপে মন্তব্য করা হয়েছে[৩০] —"নাটক অনুযায়ী প্রেক্ষাগার ও মঞ্চকে এক ছন্দে সাজানো হয়েছে।" শম্ভু মিত্র যখন 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ করার কথা ভাবেন, তখন মঞ্চসজ্জার স্কেচ আগেই তৈরি করান শিল্পী খালেদ চৌধুরীকে দিয়ে। বলাবাহুল্য, পাঠক তার সন্ধান পাবেন শ্রীমিত্রের 'সন্মার্গ-সপর্যা' গ্রন্থে। সেই স্কেচে শিল্পী ধরে দিতে চেয়েছেন নাট্যাভিনয়ের 'সমগ্র রূপ'।[৩১]

সবশেষে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকেন যিনি, তিনিই অভিনেতা

শম্ভু মিত্র। ১৯৪৪ সালে 'নবান্ন' নাটকে অভিনয়ের পর থেকে শম্ভু মিত্রের যাবতীয় অভিনয় বহুবার নাট্য-সমালোচক কর্তৃক নানাভাবে উল্লেখিত ও প্রশংসিত হয়েছে। গিরিশচন্দ্র দুঃখ করে লিখেছিলেন—'দেহপটসনে নট সকলি হারায়।' এযুগে জন্মালে গিরিশচন্দ্র এই দুঃখ করতেন কিনা, জানি না। কারণ, এখন ক্যামেরা, টেপরেকর্ডারে ধরা থাকে অভিনেতার অভিনয়-কৌশল। শম্ভু মিত্রের দৈহিক সৌন্দর্য না থাকলেও তিনি অসাধারণ কণ্ঠের অধিকারী। অনুশীলন ও পরিশীলনে সেই কণ্ঠ হয়েছিল ক্ষুরধার ব্যঞ্জনাধর্মী এবং সূক্ষ্ম ভাব-প্রকাশের সহায়ক। তিনি 'রাজা', 'রক্তকরবী' ও 'রাজা অয়দিপাউস' নাটকে রাজার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। রাজকীয় মহিমা প্রকাশে তিনি সাহায্য নিয়েছিলেন দৈহিক পরিকাঠামোর আর তার সঙ্গে মিশেছিল রাজকীয় কণ্ঠের শিঞ্জিত নির্ঘোষ। আবেগে, উচ্ছ্বাসে সেই কণ্ঠ যেমন ছিল ইঙ্গিতময় তেমনি অপূর্ব স্বর-নির্ঝরিণী।

আবার, শম্ভু মিত্র যখন চাষী, মধ্যবিত্ত, কেরাণী, ডাক্তার, দেশব্রতী প্রভৃতি চরিত্রে অভিনয় করেন তখন সেই কণ্ঠকেই তিনি আয়ত্তগত করে চরিত্রের অন্তর্নিহিত ভাবনাকে প্রোজ্জ্বল করে তোলেন। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ শম্ভু মিত্রের অভিনয় বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ করেছেন নিম্নোক্ত উপায়ে.[৩২] "শম্ভুবাবুর স্বাভাবিক অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেছে সংলাপ-নির্ভর নাটকে। উচ্চারিত সংলাপের আপাত-অর্থের গভীরে দর্শকের মনকে নিয়ে যাওয়া, ছোটোখাটো ক্রিয়া ও অভিব্যক্তি অশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলা—এটাই হল শম্ভু মিত্রের অভিনয়ের বৈশিষ্ট্য।"

সংলাপ-নির্ভর নাটকের অভিনয়ে কণ্ঠই একমাত্র সম্পদ। এই সম্পদের ব্যবহারে তাই 'অতিরঞ্জন'[৩৩] পরিলক্ষিত হয়েছে। শম্ভু মিত্র যেমন অতিরঞ্জনকে এড়াতে পারেননি, তেমনি কণ্ঠস্বরের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন এক অনপনেয় মুদ্রাদোষের। বাংলা থিয়েটারে এ এক চরম দুর্ভাগ্য। বৈচিত্র্যহীনতা সজীবতার লক্ষণ নয়। শম্ভু মিত্রর পক্ষে যা স্বাভাবিক, অন্যের পক্ষে তাই গলার ফাঁস। বহুরূপীর অভিনেতৃ-সম্প্রদায় এই ফাঁস আলগা করলেই মঙ্গল। অভিনয়, নাট্য প্রযোজনা, নাট্যরচনা নাট্যসম্প্রদায় গঠন ও পরিচর্যা সব নিয়ে শম্ভু মিত্র আজ এক বিরাট প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের কাছে আজ সমগ্র নাট্যজগৎ দায়বদ্ধ। একথা নাট্যকর্মীদের সতত স্মরণে রাখাই সমীচীন।

নির্দেশিকা

১. শম্ভু মিত্রের সঙ্গে কিছুক্ষণ / সুবীর রায়চৌধুরী, যুগান্তর, ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০

২. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক প্রসঙ্গে / মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক প্রথম-খণ্ড, ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত (১৯৭৪) পৃ. বত্রিশ-তেত্রিশ

৩. এই সম্পর্কে সুধী প্রধান তাঁর 'গণনাট্য সঙ্ঘের কয়েকটি অতীত প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে লিখেছেন—"১৯৪৩ সালের ২৫মে বোম্বাই শহরে ভারতীয় গণ-নাট্য সঙ্ঘের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে আমি যেতে পারিনি, কলকাতায় আমার বিশেষ কাজ ছিল। এই সম্মেলনে বিনয় ঘোষের ল্যাবরেটরী অভিনয় হয়েছিল এবং ওখানে যে সর্বভারতীয় কমিটি গঠিত হয় তাতে বাংলার নামের তালিকায় বিনয় রায় সর্বভারতীয় সংগঠনের যুগ্ম-সম্পাদক ; বাংলার প্রতিনিধি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং স্নেহাংশু আচার্য এবং বাংলা কমিটির জন্য সর্বশ্রী সুনীল চট্টোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, সুজাতা মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিষ্ণু দে ও বিনয় রায়ের নাম ছিল। এই সম্মেলনের দুই মাসের মধ্যে সাধারণ সম্পাদিকা অনিল ডি সিলভা কলকাতায় এসে উক্ত কমিটির দুটি বৈঠক করে আমাকে সংগঠন সম্পাদক, শম্ভুবাবুকে নাট্য-সম্পাদক, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে সংগীত-সম্পাদক ও চিন্মোহন সেহানবীশকে কোষাধ্যক্ষ করেছেন।" —সংস্কৃতির প্রগতি (১৩৮৯) পৃ. ২২২

৪. নবনাট্য আন্দোলন প্রসঙ্গে—ঐ, পৃ. ১৮০

৫. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, প্রথম খণ্ড, ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত পৃ. একচল্লিশ-বিয়াল্লিশ

৬. সংস্কৃতির প্রগতি, পৃ. ১৮১

৭. ঐ, পৃ. ১৮১

৮. People's war, February 13, 1944। প্রতিবেদনটি সংকলিত হয়েছে ধনঞ্জয় দাশ ও সতীন্দ্রনাথ মৈত্র সম্পাদিত নতুন পরিবেশ, শারদীয়া ১৩৮৪ সংখ্যায়।

৯. দ্রষ্টব্য : নৃপেন্দ্র সাহা সম্পাদিত গন্ধর্ব পত্রিকা, আশ্বিন ১৩৮৪ সংখ্যা

১০. নবান্ন, অরণি পত্রিকা, ২১ অক্টোবর ১৯৪৪। নিবন্ধটি সংকলিত হয়েছে

ধনঞ্জয় দাশ ও সতীন্দ্রনাথ মৈত্র সম্পাদিত নতুন পরিবেশ, শারদীয়া ১৩৮৪ সংখ্যায়।

১১. নবান্ন : প্রযোজনা ও প্রভাব (১৯৮৯) পৃ. ৩০

১২. ঐ, পৃ. ৩৬-৩৭

১৩. শিশির কুমারের প্রয়োগ কলা সম্পর্কে / সম্মার্গ-সপর্যা (১৩৯৬) পৃ, ১০৫

১৪. বহুরূপী, ১৯৪৮—১৯৮৮ (১৯৮৮) পৃ. ১২

১৫. 'রাজার' কথায় / সম্মার্গ-সপর্যা পৃ. ৮৩

১৬. দ্রষ্টব্য : নবান্ন : প্রযোজনা ও প্রভাব, পৃ. ৪৩-৪৪

১৭. গণনাট্য সঙ্ঘের ঐতিহাসিক ভূমিকা—ইতিহাসের বিচারে বাংলা নাটক। নাট্যচিন্তা : শিল্পজিজ্ঞাসা (১৯৭৮), পৃ. ৩৫৪

১৮. Crisis in Bengal / Marxist Cultural Movement in India Chronicles and Documents (1936—47) Compiled and Edited by Sudhi Pradhan, p. 302

১৯, বহুরূপী পত্রিকা, ৬৯ সংখ্যা (১মে ১৯৮৮), কুমার রায় সম্পাদিত

২০. ধরতি কি লাল-এর চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে বিজন ভট্টাচার্যের জবানবন্দী ও নবান্ন এবং কৃষণচন্দরের হিন্দী উপন্যাস অন্নদাতা—এই তিনটি গ্রন্থের কাহিনীকে আশ্রয় করে। দ্রষ্টব্য : গণনাট্য থেকে বাংলা ছবি : বাস্তববাদ ও উত্তরণ / বাঙলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা, ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত (১৯৯১)।

২১. কীভাবে রবীন্দ্রনাথে পৌছান গেল / সম্মার্গ ও সপর্যা, পৃ. ১৮৫

২২. বহুরূপীর নাটক ও সমাজের কথা / বরূহপী পত্রিকা ৭০ (১০ অক্টোবর ১৯৮৮), কুমার রায় সম্পাদিত

২৩. রক্তকরবী প্রসঙ্গে / সম্মার্গ—সপর্যা পৃ. ১৯

২৪. 'রক্তকরবীর' রূপায়ণ / বহুরূপী পত্রিকা ৬৯ (১মে ১৯৮৮), কুমার রায় সম্পাদিত

২৫. দ্র. সম্মার্গ-সপর্যা, পৃ. ১১২

২৬. দ্র. বহুরূপী পত্রিকা ৬৯ (১মে ১৯৮৮), কুমার রায় সম্পাদিত

২৭. দ্র. বহুরূপী ৭০ (১০ অক্টোবর ১৯৮৮), কুমার রায় সম্পাদিত

২৮. শিশিরকুমারের প্রয়োগ কলা সম্পর্কে / সম্মার্গ—সপর্যা, পৃ. ১০৬

২৯. শম্ভু মিত্র 'ব্রেখ্‌ট-এর থিয়েটার' প্রবন্ধে লিখেছেন, "অনেক সময়ে আমা-

দের দেশে খুব জোরের সঙ্গে লিখতে দেখেছি যে ব্রেখটের রীতি নাকি স্তানিস্লাভস্কির রীতি থেকে একেবারে ভিন্ন, বিপরীত। আমি তাঁদের দু'জনেরই সৃষ্ট থিয়েটারে অভিনয় দেখেছি, তাঁদের অনুরাগীদের সঙ্গে আলাপ করেছি এবং তাঁদের লেখাও কিছু কিছু পড়েছি—তাতে আমার তো দুটো পদ্ধতিতে এতো কিছু বিপরীত বলে মনে হয়নি।" —সম্মার্গ-সপর্যা, পৃ. ১০৯

৩০. মঞ্চসজ্জায় ভূমিকা, ঐ, পৃ. ৪৮

৩১. ঐ / ঐ, পৃ. ৫০

৩২. বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস, (১৯৮৫) পৃ. ৪০৯

৩৩. ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ঝিলিমিলি' গ্রন্থে শম্ভু মিত্রের 'পুতুল-খেলা'র তপনের চরিত্রাভিনয়ের বর্ণনায় লিখেছেন—" 'পুতুলখেলা'র তপন, বুলু উভয়েই অতিরঞ্জন করেছেন। অভিনয়ের দোষে নয়, নাটকের দোষে। বুলুর সরলতা, তপনের সামাজিকতা একটু যেন অত্যধিক। তপনের সাধারণত্বটা একটু বেশী। অবশ্য সাধারণ লোকের সাধারণত্ব কাটানো কঠিন।

সওদাগর

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়

সিন্ধুপদ খেজুর গাছের গোড়ের এ প্রান্তে পা দিয়ে ডান হাতে লম্বা বাঁশের রেলিংটা ধরে। বাঁ হাত দিয়ে মটর কড়াই, ভাজা বাদামের চ্যাঙারিটা মাথার উপর ঠিকঠাক রাখে। দু-এক পা এগোতেই খেজুর গোড়ের প্রায় মাঝামাঝি। ঘাড়টা ঘুরিয়ে আন্দাজ নেয়, ট্রেনটা কত দূর?

রেল লাইন লম্বা শুয়ে আছে। ডিসট্যান্ট সিগন্যালের পোস্ট ছাড়িয়ে চোখ যায় না। সুতরাং কান সতর্ক। লাইনে অতবড় যন্ত্রবাহনের আওয়াজ খোঁজে।

খেজুর গোড়েটা এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ছুঁয়েছে রেলের মাটি, পাথর লোহালক্কড়। গোড়ের তলা দিয়ে চলে গেছে সন্থ কাটা মাইনর ইরিগেশনের সরু খাল।

হুটপাট পা ফেলতে কোনা উঁচু পাথরে হাওয়াই চটি মুচড়ে যায়। মাথার উপর ভাজা বাদাম ছোলা মটর সামলায় সমস্ত যত্ন ঢেলে। সিন্ধুপদ টপকায় রেললাইন। প্ল্যাটফরমের মস্ত শরীরটা ফুলে ফেঁপে ক্রমশ ঢালু হয়ে মাটির সমতলে।

খাকি ফুল প্যান্ট লটপট দোলে হাঁটু থেকে পায়ের পাতা অব্দি। কদম ছাঁট চুল খোঁচা খোঁচা। কামানো গোঁফ দাড়িতে বেঁটে-খাটো ফরসা মুখ। এটুকুতে ঘেমে লাল ছোকরা সিন্ধুপদ। বেকায়দায় পা পড়ে আঙুলে চোট। খানিক যন্ত্রণা। পাথরটা যে কোন জায়গায় ছিল! সেটা এখান থেকেই

নজর করে। চোখে পড়ে খাল-লাগোয়া বাস্তু সীমানায় খিরিস গাছটা। ভাঙা টিনের ছোট্ট বোর্ড লাগানো—

বেতার শিল্পী
তরজা গায়ক যুগল কিশোর।
যোগাযোগ করুন।

এত বোর্ড-মোড লাগিয়েও তো কাকার তেমন ডাক নেই। আসর নেই। এর চেয়ে নামগানে থাকলে কাকার তবু পেট চলতো।

স্টেশনে ঢোকার আগেই ট্রেনটা ভোঁ দেয়। সিন্ধুপদ খাকি প্যান্ট ঝপট ঝাপট দুলিয়ে আর একটু এগোয়। ভেণ্ডার কামরায় তোলার জন্যে শাক, পটল, কাঁচা লঙ্কার বস্তা সাজিয়ে ব্যাপারির ভিড়। কাঁচা লঙ্কার বস্তাটা টানা-হ্যাঁচড়া করতে গিয়ে সিন্ধুপদর গায়ে লাগে। লঙ্কা-ব্যাপারি মেয়েটা লজ্জায় কুণ্ঠিত হয়ে বলে, আহা গো-মুখ তুলে তাকায়, ও কীত্তনদা—তুমি! ভিজে গেছো!

—যাক, বলে পাশ কাটায়।

ট্রেনটা থামে প্ল্যাটফরমে। সিন্ধু দরজা মুখে ওঁত পেতে দাঁড়ায়। ভেতরের ভিড় নিচে নামে। ট্রেনটা গোটা শরীর ঝাঁকিয়ে নড়ে ওঠে। ছোলা মটরের চ্যাঙারি সামনে এক লাফে উঠে পড়ে। একটু একটু করে প্ল্যাটফরম পিছনে ফেলে ট্রেনটা এগোয়।

বাইরে ভীষণ রোদ। মোটা খাকি কাপড়ের হাওয়াই শার্টটার বড় ঝুল। দু-বুকে দুটো পকেটে পকেট শার্টের নিচের দিকটায়। পঁচিশ পঞ্চাশ গ্রাম ছোলা বাদাম ধরে যায় এমন পরিমাপে ঠোঙা ভজন কয়েক।

কামরার দরজা গোড়ায় প্রচুর হাওয়া। ঘামে ভিজে গলা বুক হাওয়ায় ক্রমশ জুড়োয়। জুড়োয় গলায় জড়ানো তুলসির মালা। খাড়া খাড়া ছাঁটা চুলের গোড়ায় হাওয়া। ছোলা মটরের চ্যাঙারিটা পেটের কাছে ঠেকিয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা করে সিন্ধুপদ যেন বালিগঞ্জের শ্রাদ্ধবাড়ির নামগানের দলে গিয়ে বাবুদের বাথরুমের শাওয়ার চালিয়ে জলে মাথা ভিজোনোর প্রথম সুখ।

ট্রেনটা দূরত্ব কেটে···হাওয়া বাতাসে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে এগোয়। মাঠের মানুষ ঘাড় তুলে একবার তাকায়। পাশের গাছপালায় কাকপাখি অবস্থান ছেড়ে এক চক্কর উড়ে আবার ডালে পাতায় বসে।

কামরার সিটে যাত্রী মানুষজন। জানালা ঘেঁষে বাচ্চাদের বসার

হুড়োহুড়ি। হৈ চৈ। বাচ্চাদের গলার স্বরে সিন্ধুপদর বুকে আশ্বাসের ঝিলিক। আর দরজার কাছে দাঁড়ায় না। হাঁক দেয়, এ্যাই বাদাম—ছোলা—আ—মটর—

প্রলম্বিত স্বরে নিজেকে দীর্ঘস্থায়ী করে তোলে সিন্ধু। কামরার ডাইনে বাঁয়ে সিট ভর্তি প্যাসেঞ্জার। ভাজা বাদাম ছোলা—আ—আ—, এই উচ্চারণগুলো পাক মারে। বাচ্চা দুটো ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়, এমন আওয়াজের কৌশলটা যে কোথায়···! কার গলায়! মানুষটা কেমন দেখতে···! শৈশব কৌতূহল।

বাচ্চা দুটোর পাশে মাধ্যমিক পাশ করা-কিশোরী। তার পাশেই মধ্যবয়সী মা সাজগোছে দৃশ্যত যুবতী। পাশে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে স্বামী। বাচ্চারা এমন পুলিশ পোষাকে সিন্ধু দেখে থ। কিশোরী মেয়েটা দু-চোখ ফেলে মুহূর্তে কত কী যে হাতড়ায়! বিব্রত স্মৃতিতে চোখ মুখ লাল মধ্যবয়সিনী মা একবার দেখে, আর একবার নিজেকে যাচাই করতে পাশে স্বামীটিকে মৃদু ঠেলা দিয়ে বলে, বাদাম-ওলা লোকটা যেন খুব চেনা মুখ!

খবরের কাগজ থেকে এক পলক চোখ সরিয়ে আবার মন দেয় খবরের কাগজে। কলকাতাতেই আলফা ধৃত! কোথায় আসাম···কোথায় কলকাতার টালিগঞ্জ!

কামরার মধ্যে বাচ্চারা, কিশোরী মেয়েটা···মেয়েটার মায়ের এমন আত্ম-জিজ্ঞাসু চোখের দৃষ্টিতে বিদ্ধ হয়ে গলার স্বরে সেই কৃৎকৌশলটা হারিয়ে ফেলে সিন্ধুপদ। ক্রমশ মা-মেয়ের নজর থেকে এক-পা দু-পা করে কামরাটার শেষ দেওয়ালের কাছে প্যাসেঞ্জারদের মনোযোগ টানতে বলে, গরম বালি ভাজা বাদাম ছোলা—আ—

মধ্যবয়সিনীর স্বামী বলে, হ্যাঁ তো। চেনা মুখই।

—আমাদের বাড়ি গিয়েছিল মনে হচ্ছে···

—যাবে না কেন? ডেকে নিয়ে গেলেই তো যাবে।

—আচ্ছা···বাবা মার মচ্ছবে এও কি বাবাজী সেজেছিল?

স্বামী বেচারা হেসে ফেলে। —সেজেছিল কি গো? ওরা নদীয়ার এক-গনের শিষ্য টিষ্য।

—হ্যাঁ। সাদা কাপড় সাদা ফতুয়া তিলক মাটিতে রসকলি, কণ্ঠায় বুকে কপালে ভর্তি করে প্রভুপদ চিহ্ন···

কথাটা কিংবা স্বামীর স্মৃতি জাগরণে প্রক্রিয়াটা হঠাৎ থেমে যায়। সিন্ধু কাছাকাছি এসে বলে, রমেনবাবু—দাদা ভালো তো?

—হ্যাঁ ভাই। তুমি?

—চলে যাচ্ছে নিতাইয়ের কৃপায়। এ ট্রেনে? অফিস যান নি?

—না। যাবো একটু এক আত্মীয় বাড়ি।

স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তায় যে সিন্ধু এসে পড়েছে সেটা টের পায়। সুতরাং কামরাটা যেন তাকে বিপন্ন করে তুলেছে। চলতি ট্রেন—এক্ষুনি নামার সুযোগও নেই। তাই গেটের কাছে দাঁড়িয়ে বাবাজী সিন্ধু।

কিশোরি মেয়েটা মায়ের কানে মুখ এনে আস্তে আস্তে বলে, হ্যাঁ গো মা তোমরা সব বাবাজী দাদুদের প্রণাম করতে বললে? আমি তো ওকেও সাষ্টাঙ্গ হয়ে গড়…। কিশোরি মেয়েটা যেন ভুল কাউকে প্রণিপাত করেছে সে রকম একটা আফশোস তার চোখে মুখে। ফলত মেয়েটা লজ্জায় ছোট হয়ে যায়। অনুযোগ করে মায়ের কাছে, আমি চাইনি গড় করতে। তোমরা জোর করলে দাদু ঠাকমা যে কী ধমক দিলো সেদিন…!

কাগজের খবর ছেড়ে দিয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকায় বাবা রমেনবাবু।

—তাতে কি হয়েছে রে কনা? তুই তো একটা মানুষকে প্রণাম করেছিস।

করলেই বা—।

কিশোরি কণিকার মনে ধরে না কথাটা। সে ভাবে, অমন কীর্তন গাওয়া লোকটা ছোলা বাদাম বেচবে কেন? হকার লোকই বা কেন বাবাজী হয়ে অমন ফোঁটা তিলক কেটে নিতাই গৌর বলে ভাবরসে নাচানাচি করবে? আর যত মাসি পিসিরা নামের দলের সঙ্গে ওই ছোকরা হকারের পায়ের ধুলো নিয়ে জিভে মাথায় ঠেকাবে?

নিজের সাজানো যুক্তি অকাট্য এই বিশ্বাসে বাবার এমন নরম পরামর্শ মনে মনে খণ্ডন করে। একটা বিজয়িনী গাম্ভীর্যে কিশোরী মুখটায় বেশ আস্থা ফুটে ওঠে।

মধ্যবয়সিনী স্বামীকে বলে, দেখো—ওই ছেলেটা তখন পিতলের বড় করতাল নিয়ে দোহারকি ধরতো, জয় নিতাই গৌর-রাধেশ্যাম—বড় বাবাজীরা অন্নগ্রহণ করতো। ওই ছোকরাটা কোমরের কাপড় বুকবেড় দিয়ে যেন কোন দেবস্থানের পাচক। আমি আলু ডাল সজনা ডাঁটা সব গুছিয়ে সিধে

ধরে দিয়েছিলুম। দামী গাওয়া ঘিয়ের জার বের করে দিলুম। সেই ঘিয়ে বেগুন ভাজলো তো এই ছোকরা বাবাজী—

স্বামী রমেন মাথা নেড়ে সমর্থন জানায়। —করেছো তো।

সামান্য এটুকু কথায় স্ত্রী যেন সন্তুষ্ট নয়। তার ভাবনার···বিস্ময়ের অংশীদার নয় নিজের মানুষটা। চারখানা কলাগাছ চার কোণে বেঁধে লাল কাপড় মুড়ে মূল তুলসি মঞ্চ। পটের মধ্যে ঊর্ধবাহু গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। ধূপ ধুনো প্রদীপ জেলে ন্যুব্জ শ্বশুর, লাঠি ঠুকে ঠুকে শাশুড়ী, প্রায় বুড়ি ননদ নাতি নাতনিরা প্রতিবেশী ক'জন মানুষ এক সঙ্গে মঞ্চ পরিক্রমা অধিবাসের রাত্রে। বড় করতালের বুক কাঁপানো আওয়াজ মৃদঙ্গের বোল্—সব মিলিয়ে সুর··· সেই সুর মানুষগুলোকে বাচ্চাগুলোকে পরিক্রমণ করিয়ে নিলো। ওই ছোকরা হুকারটা তো করতালের ধাতব আওয়াজে পৃথিবীর সুরকে নামিয়ে নিজের বাজনায় ভরিয়ে দিয়েছিল আশপাশ।

সকাল আটটা পনেরর ডেইলি প্যাসেঞ্জার রমেনবাবু। সিন্ধুপদ পরিচিত প্রিয় মুখ। কিন্তু তার পরিবারের কাছে যেন সিন্ধুপদ একটা বিষয় হয়ে রমেনবাবু মেয়ের দিকে, তারপর স্ত্রীর দিকে তাকায়। খবরের কাগজটা আর না পড়ে পাটে পাটে ভাঁজ করে।

কাগজটা এগিয়ে দিয়ে রমেনবাবু বলে, কে পড়বে? স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে। পরক্ষণেই মেয়ে কণিকার হাতে ধরিয়ে বলে, নে। তুইই পড়—

ট্রেনটা স্টেশনে দাঁড়ায়। সিন্ধুপদ ছোলাবাদামের চ্যাঙারির দু-ধারে বাঁধা দড়ি গলায় ঝুলিয়ে। পেটের ঠেকনোয় ফেরি করা সুবিধে। কামরা ঘেঁষে প্ল্যাটফরম দিয়ে দ্রুত হেঁটে পরের কামরায় যায়। নিজেদের জানালায় দেখতে পায় সিন্ধুপদর মুখ কালি। মা মেয়ে তাকিয়ে থাকে ছোকরা বাবাজীর দিকে।

ট্রেনটা ছাড়তেই স্ত্রী জিজ্ঞেস করে, হ্যাঁ গো—বাবার মোচ্ছবের আর বাবাজীরা সব কি করে?

—আশ্রম মঠে যেমন করে থাকে, নিতান্ত দায়সারা উত্তর রমেনবাবুর।

—অতো লোকজন. সকলে! মনের গোপন কোণে সঞ্চিত সমীহ ধরে নাড়াচাড়া করে স্ত্রী। ঘর সংসার ছেড়ে, লোভ সুযোগ অবহেলা করে নিয়ম নিষ্ঠায় মানুষগুলো কেমনভাবে কাটায়···! বিস্ময় আর অনুসন্ধান উৎকীর্ণ হয়, ফরসা মুখে। সিঁদুর টিপ, আলমারি থেকে বের করা দামি শাড়ি জামায় মানানসই সঙ্গিনী এখন প্রশ্নকণ্টিত।

মেয়ে কণিকা যেন মায়ের মুখে কথা বলছে। মুখ চোখে মায়ের মতই কৌতূহল।

চলতি ট্রেণের জানালায় হাওয়া। গাছপালা দেখা যায়, দূরের টালি খড়ের ঘরের মধ্যেও দু-একখানা ইটের দেওয়ালে সাদা কলিটানা বসবাসের ঘর। তাল সুপুরির মাথায় উড়ুক্কু কাক পাখি। মাঠের রাস্তায় গামছা বাঁধা ডিশে ভাত পানতা বয়ে আনে দুটো বাচ্চা ভাইবোন। চলতি ট্রেন স্বাখে, দেখেও হাঁটে। থমকে দাঁড়ায় না পথে। বরং কোমর উঁচু হেঁটমুণ্ড চাষা মজুরদের মধ্যে বাছতে থাকে, হঠাৎ আঙুল তুলে বোনটা বলে, হাই—

—তো রে বাপ্।

ছেলেটা চমকে দাঁড়িয়ে দ্বিধা!—কইতো… !

মেয়ে আর মা তখনও সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিরুত্তর রমেনবাবুর দিকে। রমেন যেন বিদ্ধ। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, যাঁদের আমরা প্রণাম করি তাঁরা তাঁদের মধ্যে ক'জন আর বরাবর প্রণম্য থাকে বল?

উত্তর শোনার আগ্রহের উপর পালটা প্রশ্নের কড়া ঝাঁঝ। তারা আবার আশা করে মানুষটার নতুন উত্তরের যোজনায়। রমেন বাবু আবার বলে, যে হেডমাষ্টার মশায়কে এত সমীহ করিস হয়তো খোঁজ নিলে জানিবি তিনি ইস্কুলের টাকা নয় ছয় করেন…, যে মেসোমশাই তোদের এত প্রিয় একদিন জানতে পারলি; লোকটা যৌবনে কি মাঝ বয়েসেও ভীষণ পাজি নোংরা ছিল!

মায়ের মুখ চুপসে যায়। কণিকার মুখ নিভে গেল চকিতে!

ভেণ্ডার কামরায় সিন্ধু আবার হাঁকে, বালিতে ভাজা বাদাম-ছোলা মটর—

আনাজ সব্জির ঝাঁকা, পটল ঝিঙে বস্তায় ভরে মুখ বাঁধা।

আনাজ-ব্যাপারি লোকগুলো, মেয়েগুলো কাঠের লম্বা সিটে গায়ে গায়ে বসে। কথা বলছিল লঙ্কার বস্তায় ঠেস দিয়ে মেয়েটা পাশের পটল ব্যাপারির সঙ্গে, নিয়ে যাচ্ছি দশ পাল্লা কাঁচা লঙ্কা। দর পড়ে গেল কুড়িটাকা থেকে দশে। তবু বটি যা আর পুলিশের পয়সা একই রয়ে গেল। কমবে নি কেন?

ঝাঁকা বস্তার পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে সিন্ধুপদ চলে আসে ব্যাপারিদের কাছে,—কই গো দাদারা দিদিরা টুকটাক মুখ চালাও ফুটফাট কথা কও—

লঙ্কা ব্যাপারি মেয়েটা সবুজ কাপড়ে গা জড়িয়ে যেন টিয়া পাখি। পান চিবিয়ে ঠোঁট লাল। লাল সিঁদুরের টিপ। ঘাড় ফিরিয়ে বলে, কে গো কীত্তনদা?

—হ্যাঁ, তা কী দোবো বলো? বাদাম—ছোলা—?

ওপাশের লম্বা সিট থেকে ব্যাপারিদের মধ্যে এক ছোকরা বলে, হ্যাঁ, বাদাম কিনবো। আগে একছত্র নাম গান গাও—

—দেখো দিকি কাণ্ড? হাতে খোল নেই করতাল নেই, পদ গাও—, যেন শ্রোতাদের অভিমতের জন্যে ফেলে দিল কথাটা।

—নাই-ই থাকলো কিছু। মুখ—মুখটা আছে তো? সবুজ শাড়ির টিয়া পাখি মারলো কথার ঠোক্কর।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। বড় বড় চোখে সিঁদুরটিপ বেশ জ্বলজ্বলে। ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, বাপুরে—আমরা বলে কি শুনতে নেই?

সিন্ধুপদর চোখে চোখ লাগে বউটার। চাপা স্বরে শুধোয়, গাইতে হবে?

—গাওনা, শুনি—

মুখ তুলে সিন্ধুপদ তাকায় সকলের দিকে। দেখায় চ্যাঙারি ভর্তি ছোলা মটর গুলো। বলে, এগুলো—?

আশ্বাস দেয় গোটা ভেণ্ডার কামরা,—আমরা তো সকলে কিছু কিনবো—

সিন্ধুপদর ছোকরা মুখ খুসিতে ভরে যায়। মনে মনে পদ কল্পনা করে। দু-এক মুহূর্ত গম্ভীর হয়ে বলে, এখন সময়টা কখন হল? প্রশ্ন রাখে কীর্তনের ঢঙে।

দু-চারজন বলে ওঠে, দুপুর বেলা!

চলতি গাড়ির চাকার আওয়াজ। তার মধ্যে গলায় জোর এনে সিন্ধুপদ বলে কীর্তনীয়া ভঙ্গিতে, দুপুর মানে? মধ্যহ্নকাল। তাহলে মধ্যাহ্ন কীর্তন একপদ গাই?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ তাই হোক, লম্বা কাঠের বেঞ্চ থেকে আওয়াজ আসে। লোকগুলোকে কেমন নিজের বলে মনে হয়। গড় জানায় শূন্যে। সুর করে গায়—

জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ।
নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ॥

আবার হাত জোড় করে শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রণাম জানায়। সুর ধরে—

সংসার সাগরে কাম—আদি ফণিগণ গো,
তারা নিরন্তর দংশিতেছে আমারি অন্তর গো॥

সিঁদুরটিপ বউটার দিকে তাকিয়ে পরের পদ শোনায় গলা কাঁপিয়ে—

তাহাতে ব্যাকুল বড় হইয়াছি আমি গো।
নিরন্তর মধুর স্বভাবা হও তুমি গো ॥

বউটা মুখ ঘুরিয়ে ঠোঁট বাঁকায়, ঢং—

পরের স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ায়। সব্জি আনাজের ঝাঁকা ঢোকে। নতুন প্যাসেঞ্জার। তাল কেটে যায়। ছন্দ ছত্র সব লণ্ডভণ্ড।

সিন্ধু বলে, নাও—পঞ্চাশ করে বাদাম মাপি?

—না। না—। পঁচিশ—বড্ড দাম বাদামের।

ব্যাপারিরা ছোট ছোট ঠোঙা ধরে নেয়। পয়সা দেয়। ঠোঙাটায় বাদাম মেপে আর গোটা কতক বাদাম ধরে দেয়। ঠোঙাটা বাড়িয়ে বউটাকে বলে, নাও তোমাকে একটু ঝুল দিলুম—

—কেন গো? বউটা মুখ করে,—ঝুলে পড়বে? তাহলে লঙ্কা বেচতে হবে কিন্তু?

সিন্ধু রসিয়ে বলে, না। ওতে যে বড্ড ঝাল—

—তবুও তো লোক খায়।

উত্তর না দিয়ে সিন্ধুপদ হাসে। আর এক ঠোঙা বাদাম মাপে। তার কাছে এ কামরাটা ক্রমশ প্রিয় হয়ে ওঠে। কোন জ্বালা নেই। নেই বিপন্নতার দাহ।

সারাদিনের সঙ্গে যার যতটুকু বিনিয়োগ করার ছিল, করেছে। এখন ঘরে ফেরা। কিংবা রাতের কর্মস্থলে অংশীদার হতে যাত্রা। সব মিলিয়ে মানুষের ভিড়। নারীপুরুষের কলকল কথাবার্তা। বিষন্ন মুখে দু-চারজন প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া। উত্তাল ঢেউয়ে হাল-নোঙরহীন একদল যুবক-যুবতী। সকলেই ফেরে। ক্রমশ রাত্রি ঘিরে ধরে ছ'সাততলা বাড়ির ছাদ বারান্দা, বৃক্ষলতার শাখা প্রশাখা, পাখ পাখালির আবাস, আবাস গ্রাম গাঁয়ের।

স্টেশনে মানুষের ভিড়। ট্রেনটা প্ল্যাটফরমে থামতেই কামরায় গুহা থেকে আবদ্ধ মানুষগুলো বেরিয়ে আসে। শ্বাস নেয় পৃথিবীর বাতাসে। সারাদিন ধরে তো একটা যুদ্ধে আটকে ছিল!

সিন্ধুপদ ঠেলে ঠুলে ঢুকে যায় কামরার মধ্যে। ভিড় থিক থিক করে নারী পুরুষ যুবকযুবতী বাচ্চাকাচ্চাদের। একটু দাঁড়িয়ে ছোলা মটরের চ্যাঙারিটা টেনে নিয়ে হাঁকতে যাবে, আর একজন চেঁচায়—, এ্যাই ভাজা ছোলাবাদাম—

থমকে যায় গলার স্বর। একই কামরায় একই বস্তুর দুই হকার? সুতরাং

চুপচাপ থাকে। অপেক্ষা করে পরের স্টেশনের জন্যে। পাশের কামরায় যাওয়ার উদ্যোগে।

একটু একটু করে এগিয়ে যায় দরজার কাছে। চলতি গাড়িতে বাইরের হাওয়া। ভেতরে তো মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসে এক বায়ুমণ্ডল। ট্রেনটা প্ল্যাটফরমে থামতেই সিন্ধুপদ ঠেলেঠুলে ছোলা বাদামের চ্যাঙারিটা বাঁচিয়ে এগিয়ে যায়। কামরায় উঠে হাঁক দেয়,—ছোলা মটর—। এ্যাই তাজা বাদাম—

পাশে চিনির রসে জমানো বাদাম ছাপা বিক্রি করে হকারটা। আর একজন বাদাম ছাপার ডালাটা নিয়ে হাঁক দেয়, এ্যাই বাদাম ছাপা—

একজন যাত্রী জিজ্ঞেস করে প্রথম হকারকে, ও ভাই? বাদাম ছাপা পঞ্চাশ কত?

—একটাকা কুড়ি।

—দাও তো।

দ্বিতীয়জন ডালা ভর্তি বাদাম ছাপা এনে রাগে ফুঁসে ওঠে। খদ্দেরকে মালটা দেওয়া হলে কড়া গলায় বলে, এই ছোকরা তুই এ কামরায় কেন রে?

প্রথম হকার কথা ছোঁড়ে,—তাহলে বেচবো কোথায়?

—কেন? সামনের দিকে—

—অঁ। উনি আমার বাজার ঠিক করে দেবে, তাই আমাকে বেচতে হবে। বেশ তাচ্ছিল্য ফুটে ওঠে প্রথম হকারের গলায়।

—মারবো এক থাপ্পড়, দ্বিতীয় হকার ধমকে হাত তোলে। রোগা রোগা ওলটানো চুলে প্রথম হকার হকচকিয়ে তাকায়। পরক্ষণে দ্বিতীয় হকারটা রোগা ছেলেটার বাদাম ছাপার উপর বসানো পঞ্চাশ গ্রাম পরিমাপের বাটখারাটা তুলে নিয়ে বলে, নে। এবার হকারি কর? বড্ড বেড়েছে?

প্যাসেঞ্জার দু-একজন ঘটনাটা দেখে। বলে, কেন একটা দেশ দাদাগিরি করবে না আর একটা দেশের উপর?

তখন হাঁক দেয় সিন্ধু,—ভাজা ছোলা—বাদাম—

শহর থেকে মফস্বলমুখি ট্রেনটা। ক্রমে প্যাসেঞ্জার ফাঁকা। প্রচুর হাওয়া কামরার মধ্যে। চেনা মুখগুলো ফুটে ওঠে। ঝিমোনো চোখ মুখ,

নয়তো এক-ঠে বসে বসেই ভীষণ ব্যস্ত নিজের সঙ্গে নিজে। ওপাশে তাস খেলে মশগুল হয়ে চারজন।

পরের কামরায় উঠে সিন্ধুপদ চমকে যায়। গলার মধ্যে, এ্যাই ভাজা ছোলা বাদাম—, হাঁকটা দলা পাকায়। সারাদিনের ধকল ধাক্কায় সেই টাটকা সকাল আর মুখে নেই। ধুলো ঘাম, মানুষের গন্ধ নিজের গায়ে আর এক পরত। সিন্ধু মানুষের কাছ থেকে উপার্জন করতে করতে মানুষের গন্ধে ঢেকে যায়। হঠাৎ সেইসব পলেস্তারা খসে গিয়ে সিন্ধুপদ সকালের সিন্ধুপদ হয়ে যায়।

রমেনবাবু বলে, কি সকালেও দেখা, ফেরার সময়েও দেখা—

স্ত্রী মেয়ে কণিকা মাত্র একবার দেখে সিন্ধুকে। হঠাৎ মা বলে, বাদাম খাবি?

—হুঁ। কিনে দাও—, কণিকা আগ্রহে ছোকরা বাবাজীকে দেখে। মচ্ছবের সেদিন এই ছোকরাকে অতো সুন্দর মানালো কেমন করে!

স্ত্রীর মনে হয়, মানুষ···আত্মীয়জন প্রণম্য কি তাহলে একটা স্তর, একটা পর্যায় অব্দি! কিন্তু ওইটুকু পর্যায় নিয়ে যে গোটা মানুষটা কাছাকাছি চলে আসে! সিন্ধুপদ রমেনবাবুদের ভক্ত শিষ্যবর্গীয়তে শুধু শুধু আটকে না রেখে খদ্দেরও ভেবে ফেলে। সুতরাং স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলে, কি বউদি বাদাম দোবো?

কণিকা, মা সবাই হেসে বলে, হ্যাঁ সকলের জন্যে দাও—

—এক'শ দিই? বলে ঘনিষ্ঠ আগ্রহে মাপতে থাকে ভাজা বাদাম। যত্ন করে ঝালনুনের পুরিয়া দু-তিন খানা ঠোঙার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। সিন্ধুপদ দ্রব্যটি কার হাতে দেবে মুহূর্তে ঠিক করতে পারে না। ছোলা মটরের চ্যাঙারিটা সুদ্ধ এগিয়ে যায় চেনা মানুষগুলোর কাছে। ঠোঙাটা ধরেই দেয় কণিকার হাতে। কণিকা কিশোরী মুখে ছোট্ট করে হাসে।

সিন্ধুপদ একই সঙ্গে হেসে বলে, ভালো বালিতে ভাজা—

—কে ভাজে? এতক্ষণে কণিকার মা প্রিয়ভাজন রমণী হয়ে ওঠে।

নিম্নমুখি হয়ে সিন্ধুপদ বলে, মা—

পাশের প্যাসেঞ্জার বলে, দেখি—আমাকে পঞ্চাশ গ্রাম।

ছোট্ট ঠোঙায় মাপতে থাকে বাদাম। রাতের কামরাটা বাজার হয়ে ওঠে সিন্ধুর কাছে। বাজারের পরিসর বৃদ্ধি পায়।

রমেনবাবু দামটা মিটিয়ে দিতে পয়সা বের করে। তখন ভাবে, এটাই সিন্ধুপদর জীবিকা, না কীর্তনটা উপজীবিকা···! নিজের মনেই প্রশ্ন। নিজেই উত্তর খোঁজে, কেউ তো শুরু করে কাপড়ের কারখানায়, এগিয়ে যায় সার কিংবা অন্য কিছুতে।

পয়সাটা দিতে গিয়ে সিন্ধুপদর হাতে হাত ছুঁয়ে যায়। হঠাৎ মনে হয়, কোন দ্রব্যটা যে কখন কাটতি!

বাদামের খোসা ছাড়িয়ে কণিকা বলল, আসছে বারের মোচ্ছবে আবার যাবেন তো?

গলার স্বরে যেন অনুনয় করে।

সিন্ধুপদ বিস্ময়ে হাসে। মা তাকায় মেয়ের স্বরে।

রমেনবাবু দেখতে পায়, দ্রব্যটির সঙ্গে সিন্ধুপদও নিজে খানিক বাজার হয়ে উঠেছে।

অবসর নেওয়ার আগে বিনয়

কার্তিক লাহিড়ী

রিটায়ারমেন্টের কথা ভাবলে বুক কেঁপে ওঠে। অযথা, না, এই ভাবার মধ্যে নিরাপত্তাবোধের অভাব থাকে বলে একটা অজানা ভয় জেঁকে বসে। অথচ অদ্রীশের সেই আশঙ্কা থাকা উচিত নয়। সংসার তার খুব বড় নয়—দুই ছেলে এবং স্ত্রী। বড়ছেলে অর্জুন এন্‌জিনিয়ার, থারমাল প্রোজেক্টে ঢুকেছে, থাকে এখান থেকে বেশ দূরে প্রোজেক্ট-সাইটে। ছোট অজয়-ও বসে নেই, এম-এ পাশ করে সিনিয়ার বেসিক স্কুলে পড়াচ্ছে ফিক্‌স্ট-পে টিচার হিসেবে। অতএব আর্থিক দিক থেকে সে একেবারে বেহাল হয়ে পড়বে এমন নয়। তবে মাস মাস যে টাকা ঘরে আনতো মাইনে হিসেবে, তা প্রায় অর্ধেকে গিয়ে দাঁড়াবে হয়ত। কিন্তু গ্রাচ্যুটি বা পেনশন ক্যমিউট করে যা পাবে সেটা ব্যাঙ্কে রেখে দিলে তার সুদ প্রাপ্য পেনশনের সঙ্গে যোগ করলে মাইনের চেয়ে বরং বেশি-ই হবে। শুধু ব্যাঙ্কেই বা রাখবে কেন, ইউনিট ট্রাস্ট, লাইফ-ইনসিওরেন্স এবং কিছু কিছু কোম্পানি যে লোভনীয় প্রস্তাব রাখছে, তাতে তার আয় বাড়বে বই কমবে না, উপরন্তু তাদের দেওয়া বোনাস হাতে এলে টাকার অঙ্কটা মন্দ হবে না।

তাহলে অদ্রীশের বুক কেঁপে ওঠে কেন রিটায়ারমেন্টের কথা ভাবলে? কাঁপুক আর যাই করুক, চাকরি থেকে অবসর নিতেই হবে সে আজই হোক কিংবা কাল। এর আগে অনেকে নিয়েছে, সে এবং আরো কেউ কেউ অন্য কোথাও সেইদিন রিটায়ার করবে, তারপরেও করবে। এর থেকে নিস্তার

নেই কারোর। একদিন যেমন চাকরিতে ঢুকেছিল, তেমনি অনিবার্যভাবে অবসর নিতে হবে যদি না তার আগে মৃত্যু হয়। অদ্রীশ এইসব ভেবে ভেবে নিরাসক্ত হতে চেষ্টা করে খুব, শান্ত মনে জাগতিক নিয়ম মেনে নিতে চায়— উন্নতির পর পতন, মিলনের শেষে বিচ্ছেদ, জন্মালে মরতে হবে-র মত একদিন অবসর নিতে হবে চাকরি থেকে নিশ্চয়।

এবং সে ঐ কথা ভুলতে থাকে অর্থাৎ রিটায়ারমেণ্ট হলে কি হবে সেই কথা। কিন্তু ভোলার জো নেই কোনোমতে। অফ-পিরিয়ডে বসেছিল ষ্টাফ-রুমে। বেয়ারা রামধীন এসে জানায়, হাতে সময় থাকলে বড়বাবুর সঙ্গে যেন দেখা করেন একবার।

অদ্রীশের সঙ্গে অফিসের সম্পর্ক খুবই কম। ক-বার সে অফিসে গিয়েছে তা হাতে গুণে বলতে পারে। কিন্তু প্রত্যেকবারই সে গিয়েছে নিজে থেকে, অফিসের কেউ-ই তাকে দেখা করতে বলেনি কখনো। আজ কি এমন হলো যে শ্রীধরবাবু তাকে দেখা করতে বললেন। টাকা-পয়সা নিয়ে ডিল্ করে না সে, হেড অফ দি ডিপার্টমেণ্টও নয়,তাছাড়া তাদের ডিপার্টমেণ্টে কেনাকাটাও কিছু হয় না, যা হয় সেটা-র দায়িত্ব বিভাগীয় প্রধানের। আর এর মধ্যে সে উইদাউট পারমিশনে স্টেশন লিভ-ও করেনি। তবে কি ই. এলের ব্যাপার (ই. এল—আরন্‌ড লিভ)? কিন্তু সে ই. এল নেয় নি এরমধ্যে, তাহলে? যেতেই শ্রীধরবাবু 'আসুন আসুন' বলে তার সামনের চেয়ারে বসতে বললেন। খাতিরটা একটু বেশি বলেই মনে হয় অদ্রীশের, কেন না এর আগে কেউ এমন উষ্ণভাবে বসতে বলেনি কখনো। এসে দাঁড়িয়েই থেকেছে, বসতে বলার ভদ্রতাটুকু কারোর কাছে পায় নি। তাই শ্রীধরের বসতে বলায় একটু খুশি হয় বই কি—

—আপনার কাগজ-পত্তর তো রেডি করতে হয় স্যার।

শ্রীধরের কথা ধরতে না পেরে সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে তার দিকে।

আর ছ-মাস-ও নেই, নিয়ম হচ্ছে ছ-মাস থাকতে সব রেডি করতে হয়। আমি আপনার কাছে দু-দিন লোক পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু সে দুদিনই সুধীর গিয়ে আপনাকে পায় নি। তাই আজ, শ্রীধর হেসে তার অসমাপ্ত বাক্যটি শেষ করে। আর ঐ হাসি অদ্রীশের বুকে তীর হয়ে বেঁধে যেন, আর ছ-মাসও নেই! বুকের ভিতরটা কেমন হা-হা করে ওঠে। সে করুণ ভাবে তাকায় শ্রীধরের দিকে।

অনেক ফরম আছে, ভর্তি করতে বেশ সময় লাগবে, এখনই জমা দিতে হবে—

অনেক ফরম? মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় অদ্রীশের, বুকের দোলন তখনও স্বাভাবিক হয়নি, তাড়াতাড়ি জমা দিতে হবে, নইলে—অদ্রীশ ভাবতে পারে না যেন। আমাদের অফিসেও সব ফরম নেই, বলে শ্রীধরবাবু বেল বাজালেন। তাতে কোন লাভ হয় না, একটাকেও যদি কাজের সময় পাওয়া যায়, খালি গল্প আর গল্প আর টাকার ধান্ধা, বিরক্তিতে গজগজ করতে করতে এবার হাঁকেন, ছকু—

একডাকেই অবশ্য ছকুর দেখা পাওয়া গেল। সে আসতে শ্রীধরবাবু তাকে বৈষ্ণববাবুর কাছে নিয়ে যেতে বললেন, বৈষ্ণববাবু পেনশনের ব্যাপার দেখাশোনা করেন এখন।

বৈষ্ণববাবু তাকে দেখে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন, আইয়্যা পড়সেন ছার (স্যার,) আপনারে বিছরাইতে ছিলাম (খুঁজছিলাম)

তার উৎসাহের মাত্রা দেখে অদ্রীশ অবাক হওয়ার তলে তলে কৌতূহলও বোধ করে, আমাকে খুঁজছিলেন?

হ, ছার, আপনের তো রিটয়ারের সময় আইয়্যা পড়সে

কথাটা শুনে এবার বুক ধক করে ওঠে না, তবু কেমন একটা অস্বস্তি, সে সেই অস্বস্তি স্বাভাবিক করার জন্য হাসে খামকা, তা তো হলো বোধহয় ফরম তো ভরবার লাগে, অনেক ক-ডি ফরম

আচ্ছা, অদ্রীশ ঢোক গেলে

বৈষ্ণববাবু ড্রয়ার টেনে একটা কাগজ বের করে আনেন, আময়ার কাছে একডাই ফরম আছে, আর নাই, জুগাড় করন লাগবো

অদ্রীশ ফরম-টা নেয়—ফরম—। ফরম অভ অ্যাপলিকেশন ফর কমিউটেশন অভ এ ফ্রাকশন অভ পেনশন উইথআউট মেডিক্যাল একজামিনেশন। সে দেখে—ফরমটা তিনপাতার এবং তার তিনটে ভাগ

সে পড়তে চেষ্টা করে, দু-এক লাইন পড়ে তারপর মাথা মুণ্ডু বুঝতে পারে না। তাই তাকায় বৈষ্ণববাবুর দিকে, আপনি হেলফ্ করবেন তো? আমি তো কিছুই বুঝছি না, এত বড় ফরম, তাও আবার তার তিনটে পার্ট

লইয়্যা যান, কেউরে জিগাইয়া (জিজ্ঞাসা) লইবেন

অদ্রীশ ফরমটা নিয়ে উঠতে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, এটা ভরে জমা দিলেই তো হয়ে যাবে, নাকি—

কিতা কন্ ছার, আরো ফরম আসে (আছে), অনেক ক-ডি কইলাম জে

অদ্রীশ হাসে, তো দিন সেগুলো

আময়ার অফিসো নাই, আপনেরে জুগাড় কইর‍্যা লইতে হইব

আমাকে, আঁতকে ওঠে যেন সে, আমি কোথা থেকে জোগাড় করবো

হ ছার, আময়ার তো নাই, আপনারেই করতো হইব

সে উঠে পড়তে বৈষ্ণবাবু বলেন ফিসফিসিয়ে, ইনস্পেকটরেট অফিসে হকলতান (সব) আছে, পাইবেন

একথা কেন তিনি ফিসফিসিয়ে বলেন বোধগম্য হয় না তার। এর মধ্যে কি গোপন ব্যাপার আছে? কি থাকতে পারে? পেনশন পাওয়ার জন্য কয়েকটা ফরম ভর্তি করে জমা দিতে হবে, কলেজ অফিসে নেই, অন্য অফিস থেকে জোগাড় করে নিতে হবে—এই তো? তাহলে এর মধ্যে গূঢ় রহস্য কি থাকতে পারে ভেবে পায় না অদ্রীশ।

দরজার মুখে এলে বৈষ্ণববাবু একটু জোরেই বলেন, ছার ড্যুপ্লিকেটে জমা দিবেন, দুই কপি কইর‍্যা

সে ঘুরে দাঁড়ায়, দু-কপি ক'রে?

হ, ছার, দুই কপি

কিন্তু আপনি যে ফরমটা দিলেন—

আর নাই আময়ার, আপনে বড়বাবুরে জিগান ছার···

বড়বাবু, মনে মনে হেসে ওঠে অদ্রীশ, যে বড়বাবু তোমার কাছে পাঠাচ্ছে সে জানবে ফরমের কথা, ভেবেও অবশ্য একবার শ্রীধরবাবুর কাছে যাওয়ার গুরুত্ব টের পায়। শ্রীধরবাবু জানুন না জানুন ফাইল শেষ অব্দি তার মাধ্যমেই যাবে প্রিন্সিপ্যালের কাছে, সেখান থেকে হায়ার এডুকেশন ডাইরেক্টর হয়ে সেক্রেটারির কাছে। তাই অদ্রীশ আবার গিয়ে দাঁড়ায় বড়বাবুর সামনে

ফরম পেয়েছেন তো? তার উত্তরের অপেক্ষা না করেই শ্রীধরবাবু বলে চলেন, কালকের মধ্যে জমা করে দেবেন, তাহলে ফাইল মুভ করতে সুরু করবে শ্রীধর আরো কি সব বলেন মামুলি কথা-ই, তবে অদ্রীশ বুঝতে পারে, ফরম

যত তাড়াতাড়ি জমা দেবে, কাজ তত এগিয়ে যাবে, আর সেই খুশি খুশি ভাব বজায় রেখে বলে, আজ আসি তবে

তখন শ্রীধরবাবু বলেন, দু কপি করে জমা দেবেন। একটা আমাদের অফিসে থাকবে, আরেকটা আমরা পাঠিয়ে দেবো, ব'লে গলা নামান প্রায় ফিসফিসের স্বরে, বলি কি তিন কপি ক'রে করে রাখবেন। নিজের কাছে এক কপি রেখে দেবেন, বলা তো যায় না, একদিন দেখলেন যে অফিস আপনার কাগজ-পত্র খুঁজে পাচ্ছে না, তাই—তিনি হেসে বাক্য শেষ করেন।

আর ঐ হাসি অদ্রীশের মনে একটা ভয়ের চোরা স্রোত বইয়ে দিতে থাকে নিঃশব্দে। তাহলে কি এর মধ্যে অনেক কাগজপত্র হারিয়ে গেছে? অদ্রীশ চমকে চমকে ওঠে। তারপর হঠাৎ-ই গেলে যাবে কি আর করা—এরকম একটা নিরাসক্ত আবহাওয়া তৈরী করে স্টাফ-রুমে ফিরে আসে আবার।

রিটায়ারমেণ্টের কাগজ-পত্র ঠিক করতে হবে, বুক কেঁপে উঠতে চায় অজান্তে, কত লোক তো কত কতদিন পরে পেনশন পায়, তাদের চলে কি করে? কেউ কেউ তো জীবদ্দশায় পায়ই না পেনশন, অদ্রীশ এবার ঢুঁড়তে থাকে কাকে জিজ্ঞেস করা যায় এ-ব্যাপারে। শ্রীধর বৈষ্ণবরা—খালি কি করা উচিত বলে খালাশ, বিষয়টা তার নিশ্চয়ই, কিন্তু এ-ব্যাপারে করণীয় কি কিছু নেই অফিসের? হঠাৎ মনে হয় একবার প্রিন্সিপ্যালকে জানালে হয় ব্যাপারটা, তাঁকে বলতে হবে—সে অফিস থেকে একটি মাত্র ছেঁড়া-খোঁড়া ফরম পেয়েছে, এবং অফিস বলতে পারে না কি-কি ফরম দরকার। তাতে প্রিন্সিপ্যাল তৎপর হয়ে সংশ্লিষ্ট করণিক বৈষ্ণব-কে ডাকবেন, বেশ ধাতিয়ে বলবেন—ইমিডিয়েটলি সব ফরম জোগাড় করে আনতে, তখন ওরা নড়ে চড়ে উঠবে খুব।

খুশিতে চোখ চকচক করে উঠেই আবার মিইয়ে যায় সব উৎসাহ। অদ্রীশ জানে—প্রিন্সিপ্যালের সামনে তারা কেঁচো হয়ে থাকবে, কিন্তু তারপরই শুরু হয়ে যাবে তাদের আসল খেল। কেরাণীদের চটিয়ে আজ অব্দি কেউ পার পায় নি, সে তো কোন ছার—এটা ওটা কত আপাত্তি তুলে ফাইল চলতেই দেবে না, অতএব প্রিন্সিপ্যালের কাছে নালিশ করার পরিকল্পনাটা শিকেয় উঠে যায়।

অদ্রীশ ভাবতে থাকে, এবং ক্লাশে যাওয়ার বেল বেজে গেলেও সে মনে

মনে ঢুঁড়েই চলে—কাকে সে জিজ্ঞেস করতে পারে এ বিষয়ে। ছেলে-ছোকরা সহকর্মীরা বলতে পারবে না, তাছাড়া বলেও লাভ হবে না তাদের, কারণ তারা টিউশনি, এরিয়ার, ইনকামট্যাক্স, শিফট—অ্যালাউন্স নিয়ে মেতে থাকে সর্বদা। একমাত্র বেচু-কে জিজ্ঞেস করা যেত, কিন্তু সে বাড়ি করায় এত ব্যস্ত যে কলেজে আসার ফুরসত টুকুও পায় না এখন।

এসময় গগনবাবুকে আসতে দেখে তার কেন জানি মনে হয়, ওঁকে জিজ্ঞেস করলে হয়ত কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে। সে তাই গগনবাবুকে কাছে ডেকে নেয়। গগন পাশের চেয়ারে বসলে অদ্রীশ ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করে, পেনশনের ব্যাপারে আপনার কিছু জানা আছে ?

পেনশন ? গগনবাবু একটু চমকে ওঠেন যেন, কেন, কেন ?

অদ্রীশ তাতে একটু কুঁকড়ে যায় মনে মনে, সে বলতে পারছে না আসল কথাটা, মানে, পেনশনের ফরম

ততক্ষণে গগন বেশ সহজ হয়ে গেছেন, অফিসে পাবেন ফরম, অফিস দিতে পারল না, খুব কুণ্ঠায় বলে অদ্রীশ, এবং বলে সে অবাক হচ্ছে এই কুণ্ঠা দেখে নিজের, পেনশনের কথা বলতে এত কুণ্ঠা আমার !

কার জন্য চাইছেন ফরম ?

অদ্রীশ একটু সময় নিচ্ছে উত্তর দেবার, তারপর নিজের আবেগ সহজ করতে করতে লজ্জা এসে আবার কেমন অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছে। বলতে গিয়েও বলতে পারছে না, শেষে খুব জোর দিয়ে নিজের জড়তা ঝেড়ে ফেলে, নিজের জন্য

মানে ? গগনের অবাক হওয়া যেন সীমা মানতে চাইছে না, আপনি ?

হাঁ হাঁ, অদ্রীশ হাসতে থাকে, আমি, আপনি কি ভাবছেন চিরজীবন বয়েস আটকে থাকবে এক জায়গায় এসে, রিটায়ার করবো না ?

গগন তবু একবার অদ্রীশকে দেখে, বিশ্বাস হতে চায় না, আপনি এখনই তেমন আছেন—হেলদি স্মার্ট এ্যাণ্ড ইয়ং

অদ্রীশ হা-হা করে হেসে ওঠে খুব। এই হাসি তার সংকোচ আশঙ্কা সব ছুঁড়ে ফেলে দেয় কোথায়, তা থাকলে কি হবে ? সার্টিফিকেট এজ্...গগনের দীর্ঘশ্বাস পড়ে, আপনারা চলে গেলে কলেজের কি হাল হবে তাই ভাবছি, দিন দিন যা হচ্ছে।

কি আর হবে, এবার অদ্রীশই সান্ত্বনা দিতে থাকে গগনকে, অনেকদিন তো হলো, নিউ ব্লাড আসুক—

নিউ ব্লাড? ম্লান হাসেন গগন, একটু থেমে বলেন, সত্যি করে বলুন দেখি এই ছেলে ছোকরাদের মধ্যে কে সিন্‌সিআর, কেবল ধান্ধায় ঘুরছে —আমরাও তো ঘুরেছি গগন বাবু, ওরকম মনে হয় সিনিয়ারদের জুনিয়ার সম্বন্ধে। গগন সে-কথার দিকে গেলেন না, হঠাৎ বলে ওঠেন, আপনি রিটায়ার করবেন, ভাবতেও পারছি না, থেমে বলেন, আপনি পেনশনের বিষয় বললেন না?

অদ্রীশ তাকিয়ে সম্মতি জানায়

আমার খুড়শ্বশুর রিটায়ার করেছেন কিছুদিন আগে, দেখি উনি যদি কিছু বলতে পারেন, তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন, অফিস কিছু বলতে পারল না? অদ্রীশ নার্থক মাথা নাড়ায়। গগনকে তখন চিন্তিত দেখায়, তাই তো, কলেজ থেকে অনেকদিন কেউ রিটায়ার হয়নি, আর এরাও বেশিদিন বদলি হয়ে আসেনি এখানে, কিন্তু শ্রীধরের তো জানা উচিত ছিল, সে হেড-ক্লার্ক, আরো কয়েকটা অফিস চরিয়ে এসেছে। সে-ও হয়তো পেনশন কেস ডিল করেনি কখনো, অদ্রীশ গগনবাবুর দিকে তাকায়, ।

আমাদের মধ্যে আর কেউ জানতে পারে কি?

কে আর জানবে? এক, গগনবাবু একটু ভাবেন যেন, চিন্তাহরণ জানতে পারে, দেখুন তো রুটিনটা, আজ কি ওর ক্লাশ আছে?

দু-জনে তন্ন তন্ন করে রুটিন দেখে, চিন্তাহরণের ক্লাশ ছিল এবং আছে।

আমি কিন্তু দেখিনি চিন্তাবাবুকে, অদ্রীশ বলে

আমিও দেখিনি, তাহলে কি ও আসে নি? গগনবাবু হাঁকেন, রামধীন। সে এলে গগনবাবু জিজ্ঞেস করেন চিন্তাবাবু সম্পর্কে। রামধীন জানায়, চিন্তাবাবু এসেছেন, এখন তিনি প্রিন্সিপ্যালের ঘরে আছেন

অদ্রীশ স্বস্তি পায় যেন। সে ঘড়ির দিকে তাকায়, এহ্, মা, আমার যে একটা ক্লাশ ছিল, উঠে পড়ে সে, রেজিস্ট্রী খাতা নিতে এগোয়

— এখন আর যাবেন কোথায়? পিরিয়ড শেষ হতে দশ মিনিট বাকি আছে, ছেলেদের কি পাবেন এখন?

বড্ড অন্যায় হয়ে গেল, অদ্রীশ বসে পড়ে কিন্তু ক্লাশে না যাওয়ার অস্ব—

শোচনা তাকে বেশিক্ষণ কাবু করতে পারে না, কারণ জোগাড়ের চিন্তা পেয়ে বসে আবার, এবং সে চিন্তাহরণের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে তখন।

চিন্তাহরণের পরামর্শ মত সে ফুড অ্যাণ্ড সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে হাজির হয় যথাসময়ে। করিডর দিয়ে যেতে কোন ঘরে ঢুকবে অদ্রীশ ঠাহর করতে না পেরে একজন পিয়নকে টুলে বসতে দেখে তার দিকে এগিয়ে যায়।

আচ্ছা ভবতোষবাবু কোথায় বসেন ?

ভবতুষবাবু ? সে একটু মনে করতে চেষ্টা করে, ইয়ানে তো ভবতুষ নামে কেউ নাই

নাই ? অদ্রীশ যেন আকাশ থেকে পড়ে, আমাকে যে বলে দিলেন ফুড ডিপার্টমেন্টে গেলে নাম বললেই দেখিয়ে দেবে

কুন ডিপার্ট-এর কতা কইতাসেন ?

ফুড অ্যাণ্ড—

তার কথার মধ্যে সে বলে ওঠে, ইডা তো উয়েটিং ডিপার্টমেণ্ট, ফুড ঐতাসে

ঐ জুড়া বিল্ডিংডা

অতএব অদ্রীশকে পিছিয়ে আসতে হয় বেশ কয়েক পা।

স্যার, আপনি এখানে ?

চমকে অদ্রীশ সঙ্গে সঙ্গে ভরসা পায়, এই এসেছিলাম

কার্ড করাতে ?

না, ভবতোষবাবুর সঙ্গে দেখা করতে, তা—

আসুন আসুন, ভবতোষবাবু আমাদের অফিস সুপারইনটেন্‌ডেণ্ট, আসুন আমার সঙ্গে, বলে ছেলেটি তাকে জুম ক'রে প্রশ্ন করে, আমাকে চিনতে পারলেন স্যার ? তার চেনা না-চেনার উপর ভরসা না রেখে সে বলে, আমি আটাত্তরের ব্যাচ

আটাত্তর ? অদ্রীশ যেন খোলা চোখে দেখতে চাইছে, পিছিয়ে যাচ্ছে কয়েকটা বছর, সে জানে—ছেলেটিকে মনে রাখার কারণ হয় নি কোনো, এক অনার্স-এর ছাত্র হলে তবু মনে পড়ে কিছুটা, ও কি অনার্স পড়তো ? জিজ্ঞেস করতে সংকোচ হয়

এখন আপনি ডে-কলেজেই আছেন? খুব মনে পড়ে কলেজের কথা, কি ভাল ছিল…

অদ্রীশ ফিরে আসে বাস্তবে তখন, হাঁ, ডে-তেই আছি

ভবতোষবাবু খুব ভালো মানুষ, আমাকে খুব ভালোবাসেন

আচ্ছা আচ্ছা. অদ্রীশ কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না, তবে ছেলেটির আন্তরিকতা তাকে অভিভূত করে বেশ। সে তাকে নিয়ে যাচ্ছে ঠিক মানুষটির কাছে তবে

আমাদের স্যার, খুব ভালোবাসতেন আমাকে, ছেলেটি পরিচয় করিয়ে দেয় ভবতোষবাবুর সঙ্গে, আর আপনি তো…

ভবতোষবাবু সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারে একটু নড়ে চড়ে বসেন, নমস্কার, বসুন

সামনের চেয়ারে বসে অদ্রীশ

আপনি কথা বলুন স্যার, আমি আসছি, বলে ছেলেটি চলে যায়

চিন্তাহরণবাবু আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার কাছে

চিন্তাহরণ, তিনি দু-বার উচ্চারণ ক'রে ওহো তাই বলুন ব'লে স্পষ্ট চিনতে পারেন এবার, কেমন আছেন চিন্তাবাবু?

ভালো, অদ্রীশ বলে কেমন সংকোচ বোধ করে কথাটা পাড়তে, তাই চুপ করে যায়, আর তাকিয়ে থাকে তার দিকে। বোধহয় ভবতোষবাবুও কি বলবেন খুঁজে পান. তাই গেলাস তুলে নিয়ে জল খান

চা খাবেন?

চা পেলে মন্দ হতো না এখন, তবু অদ্রীশ না-না করে। তারপর একটু চুপ থেকে বলে, আমি রিটায়ার করছি সামনের নভেম্বরে, তাই. থেমে পড়ে, একটা লজ্জা এসে ছেঁকে ধরে যেন

ভবতোষবাবু তাকিয়ে থাকেন তার দিকে

আমাদের কলেজ অফিসে ফরম নেই, তাই চিন্তাবাবু বললেন আপনি যদি দয়া করে দেন আপনার অফিস থেকে

পেনশনের ফরম তো? এবং উত্তরের অপেক্ষা না করে ভবতোষ ডাকলেন, সুভাষ

যাই স্যার

একটু হেঁকেই বললেন, দেখো তো পেনশনের ফরম আছে কিনা. আমাদের থাকলে নিয়ে এসো স্যারের জন্য, ক-টা পাও, সবগুলো

অদ্রীশ কুণ্ঠায় ধুলোয় মিশে যেতে যেতে বলে, দু-কপি করে দিলে ভালো হয়, তাতে কোনো অসুবিধে হবে কি আপনাদের? আমাদের অফিস বলল—দু কপি করে দিতে

ভবতোষ বাবু হেসে ওঠেন, দেখুন—এখন আছে কিনা

সুভাষ ততক্ষণে কয়েকটা ফরম এনে হাজির করেছে। ভবতোষ বাবু কাগজগুলো ঠিক করে নিতে নিতে বলেন, আর কোথায়? ফরম জি, ফরম থ্রি, ফরম—

আর নেই স্যার, যা ছিল তাই—

ভবতোষ ফরমগুলো এগিয়ে দেন অদ্রীশের দিকে, বলেছিলাম না, সবগুলো পাবেন না। এক কাজ করুন, আপনি একবার হেলথে যান। হেডক্লার্ক চিন্ময়বাবুকে বলবেন আমি পাঠিয়েছি, তাহলে, ভবতোষবাবু কথা শেষ না করে তাকালেন অদ্রীশ বাবুর দিকে। তারপর একটা স্লিপে কিছু লিখতে থাকলেন, যতদূর মনে পড়ছে এই ফরমগুলো লাগে। তবু চিন্ময়বাবুকে দেখাবেন একবার।

অদ্রীশ ফরম আর স্লিপ ব্যাগে ঢুকিয়ে নেয়, আপনাকে অযথা কষ্ট দিলাম অসময়ে জ্বালাতন করে, আবার হয়ত আসতে হবে

তাতে কি হয়েছে, ভবতোষ চেয়ারে নড়ে চড়ে বললেন আবার, নিশ্চয় আসবেন।

আসি তাহলে, নমস্কার

অদ্রীশ ভবতোষের কাছ থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে একবার ভাবে আজই সে যাবে কিনা হেলথের চিন্ময়ের কাছে। কিন্তু ঘামে গেঞ্জি পাঞ্জাবি ভিজে জবজবে, একেবারে শরীরের সঙ্গে বুকে পিঠে বগলে সেঁটে আছে খুব, এখন বাড়ি গিয়ে এসব ছেড়ে পাখার নিচে থাকা দরকার, তাই সে চিন্ময়ের কাছে কাল যাবে ঠিক করে একটা রিকশা ডাকে, ভবতোষ বাবু যে স্লিপটা দিলেন তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে কোন্ কোন্ ফরম পাওয়া গেল, আর কোনটা বাকি আছে

তারপর চিন্ময়কে বলতে হবে এই এই ফরম আমার দরকার।

চিন্ময়-ও অদ্রীশকে বেশ খাতির করলেন, প্রায় জোর করেই তিনি চা খাওয়ালেন। তারপর নিজে উঠে গিয়ে কয়েকটা ড্রয়ার টেনে কাগজপত্র
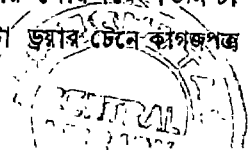
উলটে দেখলেন। কিন্তু একটি ফরম না পেয়ে শেষে পাশের চেয়ারে বসা সহকর্মীকে অনুরোধ করলেন আলমারী খুলে দেখতে। আলমারীতে কয়েকটা ফরম পাওয়া গেল, কিন্তু সে-পাওয়ার কোনো মানেই হয় না, কারণ ঐ ফরম সে পেয়েই গেছে ভবতোষবাবুর কাছ থেকে

সরি, আপনাকে সাহায্য করতে পারলাম না, বলেই তিনি ডাকলেন বিশু-কে, শোনো, স্যারকে একটু নিয়ে যাও তো পাবলিক হেলথের বিশ্বজিৎবাবুর কাছে। বলো, আমি পাঠিয়েছি। অদ্রীশ বিশুর সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে চিন্ময়বাবু বলে উঠলেন, যদি এখানে না পান, তবে স্টেট অ্যাগ্রিকালচার চলে যাবেন, ওখানে আমার বন্ধু বাদল বিশ্বাস আছে, তাকে আমার নাম করে বলবেন, বাদল নিশ্চয় আপনাকে সব ফরম জোগাড় করে দেবে, ওদের অফিসে না থাকলে বলে দেবে কোথায় পাওয়া যাবে সবগুলো। বিশুর সঙ্গে অদ্রীশ আসে পাবলিক হেলথের বিশ্বজিতের কাছে। কিন্তু বিশ্বজিৎ সিট-এ ছিলেন না। কোথায় গেছেন ঘরে উপস্থিত ও আসীন কেউ বলতে পারে না। বিশু আসি বলে বেরিয়ে গিয়ে ফিরে এসে জানায় সায়েবের ঘরেও বিশ্বজিৎ যায় নি। কিন্তু এসেই না পেয়ে চলে যাওয়ার মানে হয় না। সে দাঁড়িয়ে থাকে বিশ্বজিতের টেবিলের সামনে, আর অপেক্ষা করতে থাকে। বিশু অবশ্য তার অনুমতি নিয়ে চলে যায়।

বিশ্বজিত-কে পেতেই হবে, এসেই যখন পড়েছি তখন অপেক্ষা করা উচিত, অতএব সে অপেক্ষা করতে থাকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে যায়, একজন তাকে বসতে বললে ভারি ভালো লাগে তার। অদ্রীশ কৃতজ্ঞ হয়ে তাকায় তার দিকে, তারপর বসে পড়ে।

বসেও সময় কাটে না যেন আর। পাখা ঘুরছে ফুল স্পীডে, বেশির ভাগ টেবিল খালি। ডানদিকে একটা টেবিলে মুখোমুখি বসে দু-জন কাগজের ছকের উপর আলপিন আর জেমস্ ক্লিপ সাজিয়ে কি একটা খেলা খেলছে মগ্ন হয়ে খুব। তারও ওপাশে একজন খবরের কাগজ পড়ছে, আর একদম বাঁ দিকের দেয়ালে একজন বাবু ও বেয়ারা ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছে।

ঘর তবু শান্ত নিথর। মধ্যে মধ্যে পাখার বাতাসে ফাইলের দু-একটা কাগজ পতপত শব্দ করছে, তাতে নিস্তব্ধতায় চিড় ধরছে না কোনো, বরং আরো নিঃশব্দ চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে চারধার।

আর সময় আস্তে আস্তে বয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বজিতের দেখা নেই তবু। অদ্রীশ অপেক্ষা করতে করতে শেষে ধৈর্য হারায় এবং উঠে পড়ে। কিন্তু বেরিয়ে পড়ে না ঘর ছেড়ে, ক্ষীণ আশা জেগে থাকে, বিশ্বজিৎ হয়ত এখুনি এসে পড়বে, বিশ্বজিৎ আসবে, কিন্তু বিশ্বজিৎ আসে না। অদ্রীশ ফিরে আসে শূন্যহাতে। পরের দিন অবশ্য অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টে বাদল বিশ্বাস বাকি ফরম জোগাড় করে দিলেন। তাঁকে কিছুটা দৌড়-ঝাঁপ করতে হয়। ডিপার্টমেন্টে যে পেনশন কেস দেখে সে মেডিক্যাল লিভে আছে দিন পনেরো, ফলে আলমারির চাবি কাকে দিয়ে গেছে জেনে বাদলবাবু নিজেই আলমারি খুলে বের করতে থাকেন, আপনি বোধ হয় লাকি, সবগুলো আছে বলে মনে হচ্ছে—

অদ্রীশ কৃতজ্ঞতায় গলে যায়, তাই সে বলতে পারে না—দু-কপি করে পেলে ভালো হয়। একথা বলা শোভন হবে না ভেবে এবং লজ্জায় বলে না। বাদলবাবুর কাছ থেকে ফরমগুলো নিয়ে সে কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়তে থাকে বারবার, বারবার ধন্যবাদ জানাতে থাকে বাদলবাবুকে।

অদ্রীশের মনে হয়, এ ধরণের লোক আছে বলেই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাঠামোটা এখনও টিকে আছে, নইলে কবে ধসে পড়ত সব।

বাদলবাবুকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে সে বেরিয়ে আসে। বেরিয়েই প্রথমে মনে হয়—ফরমগুলোর জেরক্স কপি করাতে হবে, যেগুলোর দু-কপি পেয়েছে সেগুলোরও, কারণ নিজের কাছে এককপি রাখতে হবে, শ্রীধরবাবু ঠিকই বলেছেন, যদি কোনক্রমে কাগজ পত্র হারিয়ে যায় তখন…

অতএব সে জেরক্স করার জন্য এগিয়ে আসতে থাকে।

ফরম ভর্তি করাও এক এলাহি ব্যাপার। প্রথম কথা: সাইক্লোস্টাইলড্ ফরমের সব লেখা পড়া যায় না, দ্বিতীয়তঃ কোনো কোনো ক্রমিক সংখ্যার এমন কিছু লেখা আছে তার মাথামুণ্ডু উদ্ধার করা মুস্কিল। তবু সে প্রথমে নিজের কপি ভর্তি ক'রে পরে অন্য দুটি ফরম ভর্তি করে।

আর তা নিয়ে পরের দিন হাজির হয় কলেজে। আজ তার ফার্স্ট হাফে মাত্র দুটো ক্লাশ, ঐ দুটো সেরে নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে বৈষ্ণববাবুর কাছে। তাকে বলবে একটু দেখে দিন। সে জানে, বৈষ্ণবাবু কিছুই জানেন না এ-বিষয়ের, তবু একটু খাতির করা এইমাত্র, যাতে ফাইলটা মুভ করে তাড়াতাড়ি।

তাকে দেখে বৈষ্ণববাবু উল্লাসে ফেটে পড়েন, আইছেন ছার, আপনের হুকল ফরম পাইছি, এই যে

ফর্ম পেয়েছেন? অদ্রীশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে

হ, ছার। গোদরেজের ভিতরে আছিল, লয়্যা যান ছার, বৈষ্ণববাবু ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ড্রয়ার টানাটানি শুরু করেন, আহা-রে, কুনো কাম যদি ঠিকঠাক হয়, খাড়ান ছার, বলে তিনি উঠে প্যান্টের পকেট থেকে চাবি বের করেন। তারপর চেয়ারে বসে ড্রয়ারের তালা খোলেন, আপনে গেলে পর গোদরেজ খুইল্যা দেখি হকলডি আসে, সাথে সাথে আপনেরে খবর দিবার চাইতে আছিলাম, একডারেও পাইলাম না যে পাঠাই আপনেরে কইতে

অদ্রীশ শুধু তাকায় বৈষ্ণববাবুর দিকে, এর মধ্যেও আমাকে খবর দিতে পারলেন না? কিন্তু বলে না কিছুই, সে পাশে হেলা বৈষ্ণববাবুকে আস্তে করে বলে, আমি কিন্তু পেয়েছি!

কই পাইলেন? ইনস্পেকট-রেটোয়?

অদ্রীশ হেসে তার সাইড-ব্যাগ থেকে ভর্তি করা ফরম বের করে টেবিলের উপর রাখে, দেখুন

খুব পরিশানি হইছে আপনার, কেডা জানতো যে—

অদ্রীশ কি বলবে বৈষ্ণববাবুকে? বলবে কি যে আপনি একটু তৎপর হলে এত হয়রানি হতো না আমার? শুধু আমার নয় অনেককে বিরক্ত করতে হয়েছে, আর আমিও নানা অবলিগেশনে পড়ে গেলাম?

কিন্তু বলতে পারে না, বলে না। সে জানে—বিরাট মেশিন চলছে, তার একটা তুচ্ছ স্ক্রুরও দারুণ ভূমিকা আছে। তাকে অনেকবার বৈষ্ণববাবুর কাছে আসতে হবে পেনশনের ব্যাপারে, তিনি সামান্য ক্ষুব্ধ হলে গা ছেড়ে দিলে তার ফাইল নড়বে না একচুলও

অদ্রীশ তার সমস্ত হয়রানি বিরক্তি নিঃশব্দে গিলে ফেলে হেসে ওঠে, তাতে কি হয়েছে, আমি তো পেয়েই গেছি ফরম, এখন আপনি দয়া করে—

কিতা যে কন ছার, বৈষ্ণববাবু বিনয়ে এঁকে বেঁকে শেষে ফরমগুলো টেনে নেন নিজের সামনে…

আত্মজীবনীর ক্ষত

কিন্নর রায়

এ পাড়ায় ঢোকার মুখে, ডান দিকে কর্পোরেশনের যে বিশাল গোটা দুই হলুদ ভ্যাট, তার ভেতর ময়লা না থাকলে সেখানে অনেকগুলো কাক সারি বেঁধে বসে থাকে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে বুঝি বা কাকের খাঁচা। হলুদের ভেতর বেশ কয়েকটি কালো কালো পাখি। তার একটু আগে কপালে লাল বোর্ড আঁটা পোস্ট অফিস। আরও একটু এগোলে, বলতে গেলে ভ্যাটের পেছনেই, পাঁচিলের ধার ঘেঁষে নকল পাহাড়, তেমন উঁচু নয়। তার আশেপাশে লোহার পাইপ ঘেরা কয়েকটা গাছ। সেই গাছদের অনেকেই শহরের ধুলো, দূষণে হলদে, মরকুটে। তাদের ফাঁকে সিমেন্ট ঢালাই করে, তার ওপর বালি-সিমেন্টের প্লাস্টার দেয়া গম্ভীর পেঁচা। বর্ষার জল যার গায়ে সবুজ শ্যাওলা-ছোপ লাগিয়ে দিতে পেরেছে।

আগে, আগে বলতে পনের / কুড়ি বছর, কলকাতার অনেকটাই দক্ষিণ ছিল এ অঞ্চল। এখন তো কলকাতা নামের বলটি গড়িয়ে গেছে আরও, আরও দক্ষিণে। অমিয় ইদানীং যে পিনকোডে থাকে, তাও কলকাতার দক্ষিণাঞ্চল। কলকাতার এই যে দক্ষিণ, তার ভেতর নিজের চারপাশকে খুঁজে পায় না অমিয়। অমিয়র চারপাশে এখনও ধানক্ষেত, পুকুর, বর্ষায় ব্যাঙের ডাক। এস. ই. বি-র বিদ্যুৎ চলে গেলে কখনও কখনও চব্বিশ, এমন কি ছত্রিশ ঘণ্টাও আলোহীন পাখাহীন।

অমিয় হাতঘড়িতে, যার দাম পঁয়ত্রিশ টাকা, চলে ব্যাটারিতে, সময়

দেখে নিতে পারে। নটা চল্লিশ। দশটার ভেতর হরিসাধন সেনের সঙ্গে দেখা করার কথা। আসলে হরিসাধনবাবু আত্মজীবনীর একটা অংশ বলবেন, তাঁর দেখা, মা-বাবা, বাবার ঠাকুমা, ঠাকুমা, ঠাকুরদা, জ্যাঠামশাই, সেই সময়ের কিছু টুকরো কথা।

অমিয় যে দৈনিকটি আর একই হাউস থেকে বেরনো পাক্ষিকে নানা ধরনের খেপ খেটে দেয়, তবুও তার চাকরি হয় না, প্রতিবারই—যখন যখন সুযোগ আসে, অমিয় ভেবেছে এবার তার চাকরি হবেই, পাকা না হোক, অন্তত কন্‌ট্রাক্ট বেসিস বা ট্রেনি—এরকম একটা চিঠি পাওয়া যাবে মালিকের কাছ থেকে, তা হয়নি। সব ডিপার্টমেন্টেই নতুন নতুন লোক ঢুকেছে; তারা থিতিয়ে পার্মানেন্ট হয়ে গেছে। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, স্যালারি শিট, নাম সইয়ের খাতা, ক্যাজুয়াল লিভ, আর্নলিভ—সবই তাদের সঙ্গে জুড়ে গেছে। আর অমিয়, এ অফিসের ছাই ফেলার অনেক ভাঙা কুলোর একটি রয়ে গেছে। তার মাস গেলে একটি রিটেনারশিপ আছে, ভাউচারে। আর আছে নানান খেপের খুচরো, ছোট, মাঝারি টাকা। তাতে অমিয়র চলে যায়।

অমিয় নিয়ম করে কাগজের অফিসে আসে। ঝাপসা কাচ ঘেরা নানা ঘরে, বিনয়ে নুয়ে যেতে যেতে অ্যাসাইনমেণ্টটি নিজের কাঁধে চাপিয়ে নেয়। তারপর বেরিয়ে পড়ে। এভাবেই অমিয়র বেঁচে থাকা।

হরিসাধনের বাড়িটি তিন তলা। সিঁড়িতে মোজাইক। এতটা রাস্তা হেঁটে এসে, সিঁড়ি ভেঙে অমিয়র কমজোরি বাঁ পা একটু যেন বিশ্রাম চাইছিল। লোহার গেট পেরিয়ে ভেতরে চলে এলে এই বর্ষায় এখনও রাধাচূড়ার হলুদ, তার দু একটি সিমেণ্ট বাঁধানো উঠোনে পায়ের চাপে থেঁতলে গিয়েছে। একতলায় রক্তে চিনি-চর্বি, হিমোগ্লোবিন, ই. এস. আর, থুথু, পেচ্ছাপ, পায়খানা পরীক্ষার ল্যাবরেটরি। এপাড়ায় এরকম আরও আছে। রাস্তার বাঁপাশে ডান পাশেও হয়ত। অমিয় আসতে আসতে দেখতে পেয়েছে। দোতলায় ভাড়াটে থাকে। তিনতলাটি হরিসাধনের এখনও নিজস্ব। রান্নাঘর, বড় চওড়া বারান্দা, সেখান থেকে একটি কামিনী ফুলের গাছ চোখে পড়ে। তার ছোট, গভীর সবুজ পাতায় এখনও কাল রাতের বৃষ্টি। এখানে দাঁড়ালে বেশ লম্বা, চওড়াও, সবুজ পাতাঅলা কাঠগোলাপ গাছ চোখে পড়বে। এই সবুজ কামিনী পাতার শেড নেই, অনেকটা বুঝি কচি-কলাপাতা, চোখে স্নিগ্ধতা আনে। আর সেই

চোখ জুড়িয়ে দেয় সবুজের ফাঁকে এক জোড়া কালো কাক, এসবই অমিয় তার গত দুদিনের অভিজ্ঞতায় দেখে নিতে পেরেছে। সে এলেই হরিসাধন বলবেন, ও ঘরে কালি আছে। কলমও। ভরে নিও। দোয়াতের পাশে— ঐ কাগজের বাক্সের ভেতরই একটা ন্যাকড়া আছে, হাতে কালি লাগলে মুছে নেবে। বলতে বলতে হরিসাধন তাঁর শোয়ার ঘরটিতে চলে যেতে পারেন।

অমিয় পড়ার ঘরে ধুলো, ঝুলমাখা অজস্র বই, দেশি-বিদেশি জার্নাল দেখতে দেখতে পুরনো চাইনিজ কলমে কালি তোলায় মন দেয়। তার গোল্ডেন ক্যাপটি খুলে রাখে টেবিলে। আবার তুলে নিয়ে—কালি ভর্তি কলমের মুখে লাগিয়ে ন্যাকড়া, দোয়াত, সব ঠিকঠিক রেখে টেবিলের ধুলোটে শাদা কাচে নিজের মুখটি ফুটে উঠতে দেখতে পায়। খুব ছোট করে ছাঁটা চুল, সামনে সামান্য টাকের আভাস, থুতনিতে ফ্রেঞ্চকাট—তার বন্ধুরা অনেকেই বলে থাকে ইনটেলেকচুয়াল কেয়া খোপ, আসলে এটা স্তুতি না প্যাক—ঠিক মতো বুঝে উঠতে পারে না অমিয়, তবুও নিজের মুখ এখন, এই ধুলোময় কাচে, বাইরে থেকে আসা মেঘলাগা আলোয় কেমন যেন খুনী খুনী মনে হয়।

আসলে অমিয় যে দৈনিকটিতে ও পাক্ষিকে নিয়মিত শ্রম দিয়ে ভাউচারে মাস গেলে কিছু পেমেণ্ট পেয়ে থাকে, তার শারদ সংখ্যায় হরিসাধন সেনের আত্মজীবনীর একটি অংশ—'আমাদের পরিবার'—সম্পাদক প্রায় লাফ দিয়ে উঠেছিলেন, সেই লাফ অমিয় দেখতে পায় নি, কিন্তু তার প্রস্তাবটি— অনুলেখক হিসেবে হরিসাধনের আত্মজীবনীর সঙ্গে নিজেকে জুড়ে দিতে পেরেছে অমিয়—এতে তার ভাউচার অঙ্কটি কিছু বাড়বে, শারদ সংকলনের দায়িত্ব পাওয়া বিভাগীয় সম্পাদক যখন অনুমোদন করেন এবং তাঁর মুখেই শুনতে পাওয়া যায়—বড়সাহেব তো দু হাত তুলে নেচে উঠলেন প্রায়, যদি পাওয়া যায় তো দারুণ হবে।

লেগে থাক। লেগে থাক তুমি। উনি তো এখন আর নিজের হাতে লিখতে পারেন না। বাংলা, ইংরেজি—সবটাই ডিকটেশন দেন। কখনও একটু আধটু হাতে—সেই ব্লাইণ্ড ফোল্ড, যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখতেন, শেষের দিকে। এখন ভবতোষ দত্ত। তুমি লিখে ওঁকে শুনিয়ে, সই করিয়ে নেবে। টেপ করে, তা থেকে শুনে লিখে, কপি তৈরি করার ঝামেলা অনেক। শারদীয় সংখ্যা, অত সময় তুমি পাচ্ছ কোথায়? তার থেকে গোটা আট/

দশ সিটিং। ওঁর একটা তে-ভাগা ব্যাকগ্রাউণ্ড আছে, সেটা খুব একটা বলতে চান না। খোঁচা দেবে। অতবড় স্ট্যাটিসটিক্স-এর পণ্ডিত। ভি. সি ছিলেন দুটো ইউনিভার্সিটির। ওঁর বই বিদেশে পড়ান হয়। লেগে থাক। ক্যারি অন।

আপনি একটা টেলিফোন করে—অমিয় হরিসাধনের সঙ্গে কথা বলার জন্যে অ্যাপয়েন্টমেন্টের সুতো খুঁজছিল।

নিশ্চয়ই। আমি ডেট করে রাখব। তুমি পরশু একবার

এভাবেই অমিয় হালদার হরিসাধন সেনের কাছাকাছি চলে আসতে পারে। আর তার এই সাড়ে নটার পর পরই এসে যাব, এমন কথা দিয়ে সে সপ্তাহে একদিন এই পাড়ায় ঢুকে পড়ে, যেখানে অনেকগুলো প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট ক্লিনিক, গ্যাসের দোকান, তরকারির বাজার।

তিন তলার এই বিশাল স্পেসে গোটা তিনেক বড় বড় ঘর, দুটো বাথরুম, একটা রান্নার জায়গা, মাঝে ডায়েনিং। সবটাই কেমন আগোছালো, বিশেষ করে গত পাঁচ বছর আরও, স্ত্রী চন্দ্রপ্রভা মারা যাওয়ার পর। অবশ্য মৃত্যুর সাত/আট বছর আগে থেকেই ম্যাসিভ সেরিব্রাল হেমারেজে তিনি অনেকটাই অবিন্যস্ত ছিলেন, বিছানায়। চন্দ্রপ্রভা শুয়েই থাকতেন। পাশে রাতদিনের আয়া। একমাত্র সন্তান চাকরি করে কানাডায়। তার চিঠি আসে নিয়মিত। কখনও দূরভাষে, অন্য মহাদেশ থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর।

অমিয় এখন নিজের রুটিন বুঝে নিয়েছে। সে আসবে। বেল বাজাবে। রাত দিনের কাজের পুরুষ মানুষটি দরজা খুলে দেবে। তারপর জুতো বাইরে খুলে ডায়েনিং পেরিয়ে সে বসার ঘরে যাবে। সেখানে যদি হরিসাধন থাকেন, হয়ত তিনি তখন পায়জামা আর হাফশার্ট পরে চামচে থেকে কোনো ভিটামিন টনিক চেটে খাচ্ছেন, নয়তো রান্নার মহিলাটির খুব জ্বর হয়েছে, তিনি এই অসুস্থায় কী খাবেন, সেপট্রান না ক্রোসিন, তা নিয়ে বিতণ্ডায় থেকে যাবেন ওঁর রাতদিনের পুরুষ কাজের লোকটির সঙ্গে। পরনে রেডিমেড পাজামা, একটু উঁচু করে তুলে পরা। তার দড়িটি অবধারিত ভাবে ঝুলে আছে বাইরে। সুতির হাফ হাতা-মদনের গেঞ্জির ওপর টেরিকটের বুক কাটা হাফশার্ট। একটু যেন ময়লা মতো। পরিষ্কার কামানো গাল। মাথা বোঝাই পাকা চুল খাজিয়ে, আঁচড়ানো। তেমন লম্বা নন। ডিকটেশন দেয়ার সময় উচ্চারণ যাতে স্পষ্ট থাকে, তার জন্যে বাঁধানো দাঁতে পাটি দুটি পরে নিয়ে তিনি আধশোয়া হয়ে যেতে পারেন বিছানায়।

অমিয়র মনে আছে সেদিন জ্বরের ট্যাবলেটটির বানান ব্যাপারে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। ফুলপ্যান্ট গেঞ্জি পরা ছেলেটি পাশে দাঁড়িয়ে। তার হাতের মুঠোয় হরিসাধনের রিস্টওয়াচ। হরিসাধন নিজের হাতে দম দিয়েছেন একটু আগে। পুরনো অ্যাংলো সুইস ক্যাভালরি। ঠিক সাত মিনিট পাম্প চালাবে মদন। হরিসাধন তখনও ওষুধের মোড়কে ছাপা বানান বিতর্কে ছিলেন। মদন গাল চুলকোচ্ছিল। শেষ অব্দি অমিয়কে ওষুধের বানান বিষয়ক জটিলতাটি সমাধান করে দিতে হয়।

শোবার ঘরে একটি বিশাল খাট। মাথার ওপর ধীরে চলা ফ্যানটি. ঠিক খাটের ওপরে নয়, একটু দূরে। ঘরের কোণে আলনায় এলোমেলো জামাকাপড়, ময়লা। একটি পুরনো ড্রেসিং গাউন, ওয়াটার প্রুফ, পাকিয়ে রাখা অপরিচ্ছন্ন ধুতি।

খাটের ওপর ইংরেজি বাংলা মিলিয়ে গোটা তিনেক ডিকশিনারি। খুব ভারি, পুরু আতশ কাচ। অনেকগুলো পুরনো ডায়েরি, রেফারেন্স বুক। ঘরের মেঝের মোজাইকে কালচে ছোপ পড়েছে।

লম্বা কোলবালিশটি মাথায় দিয়ে তিনি শুয়ে পড়তে পারেন। কখনও পিঠের নিচে দিয়ে আধশোয়া হন। আবারও উঠে এসে ক্যুরিয়ার সার্ভিসে আসা চেক বা চিঠিটির স্লিপ সই করে নিয়ে খাটে ফিরে আসেন। আবার ফিরে আসেন পুরনো প্রসঙ্গে।

অমিয় সেই ভারতবিখ্যাত পরিসংখ্যানবিদের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে। তাঁর চোখের কোণে আবছা মতো পিচুটি।

হরিসাধন বলেছিলেন, আমার দু-চোখে ক্যাটারাক্ট। ভাবছিলাম পাকলে অপারেশন করাব। এখন তো লেজারে হয় সব। ঝামেলা নেই। হঠাৎ ডান চোখটায় হেমারেজ হয়ে গেল। ভেতরে ব্লাড ক্লট করল। কেন হলো বুঝতে পারলাম না। আমার পরিচিত ডাক্তারটি বলেছিলেন, খুব হাই ব্লাডপ্রেসারে এমন হয়। কিন্তু আমার প্রেসার তো নর্মাল। তবুও হলো, হিউম্যান বডি বুঝলেন—হরিসাধন তাঁর নিজস্ব অভ্যাসে, ছাত্রদের তিনি যেমন বলতেন বা পুরনো পার্টি জীবনে যেমনটি ট্রেনিং ছিল—সেই আপনি বলে অমিয়কেও তাঁর নিজস্ব স্মৃতির সূত্রে নিয়ে আসতে পারেন।

অমিয় বারণ করে, স্যার আমায় কেন আপনি বলছেন! আমি তো

ওটা অভ্যাস। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে সব।

ধীরে তুমিতে চলে আসতে পারেন হরিসাধন। তাঁর পাজামায় ঝোলের হলুদ-দাগ। নিচের ঠোঁটের পাশে চিক চিক করে ওঠা একটি পাকা দাড়ি, সেখানে অমিয়র চোখ আটকে যায়। হরিসাধন প্রথম দিন বলেছিলেন, সাউথের শংকর নেত্রালয় থেকে অপারেশন করাবেন, দেরি আছে। এই একটু শীত পড়লেই, ওখানে একজন ছাত্র আছে ওঁর।

অমিয় বিছানায়, লম্বা কোলবালিশে ঠেস দেয়া মানুষটিকে দেখতে পায়। ডিকটেশান নেয়ার আগে বারান্দা থেকে ছোট, হাল্কা, কাঠের চৌকো টেবিলটি সে নিয়ে আসতে পেরেছে। তার ওপর আজকের, গতকালের গোটা চারেক ইংরেজি-বাংলা দৈনিক। একটি ইংরেজি আর দুটি বাংলা দৈনিক তিনি তো এখনও কমপ্লিমেণ্টারি পান। সকাল আটটায়, রোজই, তাঁকে কাগজ পড়িয়ে শোনানোর মেয়েটি আসে। তিনি যে ইংরেজি দৈনিকটিতে সাপ্তাহিক কলম লেখেন, সেই লেখাটিও ঐ মেয়েটি ডিকটেশন নেয়। তার জন্যে মাস মাইনের বন্দোবস্ত আছে।

শ্রুতিলিখনে বসার আগে ঐ হালকা, ছোট টেবিলটি থেকে যাবতীয় দৈনিক, 'স্প্যান', আর আরও কি কি যেন পলিথিনের সরু ফিতে দিয়ে বোনা লোহার ফ্রেমের হালকা চেয়ারটিতে নামিয়ে রাখতে পারে। কাঠগোলাপের কচি-কলাপাতা রঙের ছায়া তখন লোহার নিচু গ্রিল ঘেরা বারান্দায় ভেঙে, শুয়ে পড়ে, একটু একটু করে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

হরিসাধনের শোয়ার ঘরে হালকা চেয়ার থাকে। তার পিঠে তোয়ালে। এর ঠিক পেছনে একটি ড্রেসিং টেবিল। তার আয়নাটির সামনে একটি খালি কফির শিশিতে ধান। পুরনো দাঁড়া ভাঙা চিরুনি। আলপিনের কৌটো। রান্নার মেয়েটির বছর দেড়েকের ছেলে এসে ড্রেসিংটেবিলের ড্রয়ার ধরে টান দেয়। ড্রয়ার খোলে না। শব্দ ওঠে। হরিসাধন চমকে উঠে—সুমিত্রা, সুমিত্রা, তোমার ছেলে। অ্যাই যা, যা এখন, বলে যেন বা বেড়াল তাড়াচ্ছেন, এমন ভাবে আবার ডেকে ওঠেন—সুমিত্রা, সুমিত্রা।

শিশুটি ততক্ষণে নিচের ড্রয়ারটি খুলে ফেলেছে। শব্দে চমকে উঠে হরিসাধন বিছানায় রাখা তিন ব্যাটারির বড় টর্চটি নিয়ে যেন বা ভয় দেখাচ্ছেন, এভাবেই—কী হলো—সুমিত্রা—বলে ডেকে উঠে আবারও অমিয়কে দেখে নেন। ড্রেসিংটেবিলের আয়নায় ঠেস দেয়া ইলেকট্রনিক কোয়ার্জ-এ সময় দেখে নিতে পারে, দশটা দশ। এ কোয়ার্জ-ঘড়িটির বুকে

তার খেপ খাটা দৈনিকটির নাম লেখা সোনালী অক্ষরে। দশ বছর পূর্তি উপলক্ষে, এই তো গত ডিসেম্বরে হরিসাধন সেনকে 'খবর' গ্রুপ অফ পাবলিকেশন্স-এর উপহার।

হরিসাধনের কণ্ঠস্বর সুমিত্রা-নন্দনকে ভয় দেখাতে পারে না। তিনি টর্চ হাতে 'হেই' করেন। অমিয় তখন হরিসাধনের স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে ১৯০৫-এ ছিল। বঙ্গভঙ্গের বছর। হরিসাধনের বাবা এফ-এ—ফার্স্ট আর্টস পাশ করলেন। অমিয় এই স্মৃতি ফেরানোর খেলায় হরিসাধনের প্রপিতামহী, ঠাকুরদা-ঠাকুমা, বাবা-মা, জ্যেঠামশাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে কখনও ১৮৯০ কখনও ১৯০০ কখনও বা আরও পেছনে চলে যেতে পারছিল।

পাশে চওড়া মার্জিন রেখে লিখবে। দরকার হলে 'বেলুন' করে কথা ঢুকিয়ে দেব। তবে তোমার ওপর ডিপেণ্ড করা যায়। আমি তো তোমার লেখা জানি।

আসলে অমিয় বারে বারে তে-ভাগা পর্বে যেতে চাইছিল। দক্ষিণ বঙ্গ, কাকদ্বীপ, চন্দনপিঁড়ি, শহিদ অহল্যা,কমিউনিস্ট পার্টি, লাঙল যার জমি তার।

আমার বড় মামার ছিল বদলির চাকরি। আর সত্যিকথা বলতে যদি বল 'দুয়ারে বাঁধা হাতি' বলে যে প্রবাদ, তা তো আমার মামাদের ওখানেই দেখেছি। বড় মামা ছিলেন বন-পরিদর্শক। ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন নওগাঁ, শিলচর, আসাম—আচ্ছা অসম বলব কি—নাহ্, তুমি আসামই লেখ, বলতে বলতে হরিসাধন সেই দরজায় হাতি বাঁধা সময়ে ফিরে যেতে পারেন। , মামা হাতিতে চেপে বন পরিদর্শনে যেতেন।

অমিয় হরিসাধনের একটানে বলে যাওয়া অনেক বড় বাক্যকে কেটে টুকরো করে, সিম্পল সেনটেন্সে নিয়ে যেতে পারে। খবরের কাগজের পাঠক এত দীর্ঘ বাক্য পড়তে চায় না। তা সে শারদীয়া সংখ্যাতেও।

রান্নাঘর থেকে কি একটা ঝাঁঝালো ফোড়নের গন্ধ বাতাসে উড়ে এলো। সুমিত্রার ছেলেটি এবার খাটে ওঠার চেষ্টা করে, হরিসাধন টের পেয়ে হাতের টর্চটি নিয়ে তাকে ভয় দেখাতে চান—সুমিত্রা, সুমিত্রা বলে ডেকে তিনি আবারও টর্চ নিয়ে ভয় দেখাতে থাকতেন। শিশুটি তার দুপাটির গোটা তিন চার দাঁত ও লাল মাড়ি বের করে হেসে ফেলে। তার দুচোখে দুষ্টুমির আলো।

হরিসাধন এসব কিছুই স্পষ্ট দেখতে পান না, তার নগ্ন শরীরটি পেট অব্দি

উঠে আসতে চায় খাটের ওপর। তার লম্বা চুল, যা তেলে ময়লায় লেপ্টে আছে মাথার সঙ্গে, তার ঠিক ওপর দিয়ে একটি মাছি উড়ে যায়। অমিয় কলম থামিয়ে বসে থাকে।

তুমি লেখ, বলতে বলতে হরিসাধন খাট থেকে উঠে সোজা দাঁড়িয়ে যান, মেঝেয়। তাঁর পাজামার দড়িটি তেমনই ঝুলে থাকে, শিশুটি পালায়। সে জানে হরিসাধন তাকে ধরতে পারবেন না।

খাটে ফিরে এসে লম্বা কোলবালিশে ঠেসান দিয়ে হরিসাধন তাঁর প্রপিতামহীর কথা বলে চলেন। বিধুমুখী নামের এই নারী ঢাকাতে, তাঁর ছেলে—হরিসাধনের ঠাকুরদার কোয়ার্টার্সে এসে সিলেটি ভাষায় লোকাল মেয়েদের সঙ্গে গল্প করতেন। তাঁর পুত্র জয়নারায়ণ তখন প্লীডারশিপ পাশ করে উকিল। জয়নারায়ণ তাঁর মা বিধুমুখীকে প্রশ্ন করেন, এই যে তুমি ওদের সঙ্গে সিলেটের ভাষায় কথা বলো ওরা কি তা বোঝে? তার উত্তরে বিধুমুখীর স্পষ্ট জবাব—ওদের কথাও আমি সব বুঝতে পারি না। কিন্তু না বুঝলেই বা কি, সময় তো কাটে—

আমার ঠাকুরদা জয়নারায়ণ ঠাকুর-দেবতা তেমন মানতেন না কিন্তু কোনো শুভ কাজ বা বাইরে যাওয়াটাওয়া করতেন পাঁজি দেখে। অশ্লেষা, মঘা, কালবেলা, ডাকিনী: যোগিনী—সব মানতেন তিনি। আর খেতেন পেটেন্ট ওষুধ। সে ওষুধ ডাকযোগে আসত, কোনো কোনোটা। একবার আমার এক ডাক্তার আত্মীয় ওষুধের শিশি খুলে, শুঁকে, নেড়েচেড়ে বললেন, আসলে সোডি-বাই-কার্ব। বুকজ্বালা, অম্বল, সবেতেই চলবে।

সাধারণত ফুলস্কেপের চার পাতার বেশি কোনো দিনই লেখা হয় না। অমিয়র চোখ ব্যথা করে। পিঠে অস্বস্তি ফুটে ওঠে। —সার, আমি যাই—বলতে বলতে অমিয় নিজের ব্যাগ—কাঁধ-ঝোলাটি গুছিয়ে নিতে পারে। ফোল্ডিং ছাতাটিও, যা রাখা ছিল ড্রেসিং টেবিলের সামনে। তারপর সে বাথরুমে যেতে চায়। এবং হরিসাধনের অনুমতি নিয়ে।

বাইরেরটায় যেও, ভেতরে জল নেই। হরিসাধন সোজা হয়ে দাঁড়ান।

তুমি তা'লে পরের মঙ্গলবার, বলতে বলতে তিনি পাজামার দড়িটি কোমরে শক্ত করে নিতে পারেন। কিন্তু দড়িটি বেরিয়েই থাকল। তুমি একটু মনে রেখ—সোম, বুধ, শুক্র—আমি ডিকটেশন দি অন্য লেখার। তার মধ্যে একদিন ইংরেজি ডেইলির কলমে।

মনে আছে সার, আমি সামনের মঙ্গলবার—বলতে বলতে অমিয় উঠে পড়ে। বাইরে সেই কাঠগোলাপের কচিকলাপাতা রং পাতায় মেঘের, ঘন কালো মেঘদলের রং আটকে যায়। বৃষ্টি ভেজা ঠাণ্ডা বাতাস উড়ে আসে। দূরে কোথাও হয়ত বৃষ্টি হচ্ছে। অমিয় বাথরুমে গিয়ে দেখতে পায় দাগ ধরা প্যানে কালচে ফাটার দাগ। দেয়ালে মাকড়সার জাল, ঝুল। বেসিনের কলটি চিরকালের জন্যে বন্ধ। জল দিতে হয় বালতি থেকে।

হরিসাধন আজও চিত হয়েই শুয়েছিলেন। আজকেও আকাশ বৃষ্টিমেশা মেঘ নিয়ে গম্ভীর মতো। তার ঘন ছায়া পড়েছে এই পাড়ার গায়ে। হরিসাধন ডিকটেশন দিচ্ছিলেন। বলার আগে তিনি জলে ভেজানো দাঁত মাড়ির ওপর বসিয়ে দেন।

জানো, আমার ঠাকুরমার ভাইয়েদের একটা ধারা ইসলাম নিয়েছিল। মানে মুসলমান হয়ে গেছিলেন, হরিসাধন সহজ গলায় বলে যান।

অমিয় হরিসাধনের এই সহজ উচ্চারণেও কেমন যেন কেঁপে ওঠে ভেতরে ভেতরে। তার বাঁ পায়ের পুরনো ব্যথা, সেই ইমারজেন্সির ভেতর আলিপুর জেলব্রেক। পাঁচিল টপকে, গোরু-মোষের খাটাল পেরিয়ে, গঙ্গার গেরুয়া জলে। তখন তো আগুন মাখানো থ্রি নট থ্রি ছুটে আসছে মৃত্যু মুখে নিয়ে। বাঁ পায়ের পাছার ঠিক নিচে সেই গুলির দাগ, কালো গভীর গর্ত, যেমন এই পৃথিবীর দূরত্ব থেকে দেখা চাঁদের পিঠ। অমিয়র পা শিরশির করে ওঠে। ইদানীং বাঁ-পা বুঝি বা আরও কমজোরি হয়েছে। অমিয় অনেক দিন ধরেই এমন বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণের মধ্যে ছিল। আজ সিঁড়ি ভেঙে উঠতে গিয়ে আবারও পায়ের কমজোরিটুকু টের পাওয়া যাচ্ছিল। আর এখন, হরিসাধনবাবুর বাবার মামারা হঠাৎ ইসলাম নিয়েছিলেন, কোন সামাজিক প্রেক্ষিতে—সে কি বর্ণবিদ্বেষের আগুনে, নাকি জমির লোভে অথবা পেশীশক্তির ভয়ে। অমিয় বার বার খোঁচা দিচ্ছিল হরিসাধনকে। হরিসাধন তো তেমন গম্ভীরভাবে কিছু বলছেন না, খুব সহজ মেজাজে যেমন তিনি বলতে পারেন, কমিউনিস্ট পার্টি বা বামপন্থীদের আজও কোনো ডাটা তৈরির টিম হলো না, সেই কবে হাওড়ায় হাওড়া জুট মিল, বেঙ্গল জুট মিল, ফোর্ট উইলিয়াম জুট মিলে আনডিভাইডেড পার্টির আণ্ডারগ্রাউণ্ড অর্গানাইজেশন তৈরি করতে গিয়ে মনে হয়েছিল কেন আমরা ইণ্ডিয়ান জুট মিল অ্যাসো-

রিয়েশান—আই. জে. এম-এর ডাটার ওপর ভিত্তি করে কথা বলব ! সেই থেকে স্ট্যাটিসটিকসে ঝুঁকে পড়া, পাট এদেশে জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে আগস্টের মাঝামাঝি পর্যন্ত কেটে পচানো হয়, যাকগে এসব. এত সব কথা তো এই যে আত্মকথন. তাতে যাবে না, এমন ভাবনা হরিসাধনকে থামিয়ে দেয়। আর হয়ত তিনি তাঁর প্রায় ইউরোপিয়সুলভ মানসিকতায়—বড্ড 'আই' প্রজেকশান হয়ে যাচ্ছে ভেবে নিজেকে গুটিয়ে নেন।

অমিয় হরিসাধনের বাবার মামাদের ইসলাম নেয়ার কারণ খুঁজতে থাকে মনে মনে। হয়ত মামারা নন, তাঁদেরও বাবা—আর এক জেনারেশান আগে—এসময়টা অমিয় সিগারেটের তেষ্টা অনুভব করে। তার মনে হয়, কিছু একটা টক্সিক—যা শরীরে মিশলে মাথাটা পরিষ্কার হতো। সারের সামনে সিগারেট খাওয়া যায় না। রুচি, সংস্কারেও কিছুটা আটকায়।

বাবার সেই মামারা, বুঝলে—খাঁ সাহেবরা, হরিসাধন কেটে কেটে বিস্তারিত করেন—বাবা মামাবাড়ি গেলেই ঐ মামাদের বাড়ি থেকে—'ঐ'টা কোটেড কোরো. বলে হরিসাধন গলা খাঁকার দেন, তাগড়া খাসি, সুগন্ধি গোলাওয়ের চাল, ভালো গাওয়া ঘি পাঠিয়ে দিতেন। বাবা বাড়ি ফিরে বলতেন, মাতুলান্ন গ্রহণ করলে আয়ু বাড়ে। আর মামাবাড়ি থেকে ফেরার সময় তিনি প্রায়ই একবস্তা 'লালী চাপরাশ' নিয়ে ফিরতেন।— কি সুগন্ধ চালে! ভাত ফুটলে তো কথাই নেই, কাঁচা চালের সুঘ্রাণে নতুন জীবন পেত বাতাস। শাদা চালের ওপর খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লাল দাগ। সে চাল হাতে নিয়ে আমিও দেখেছি।

পাম্প কি নিভিয়ে দেব ?

এই জিজ্ঞাসায় হরিসাধন ১৯৯২-এর দক্ষিণ কলকাতায় ফিরে আসেন।—তুমি তো আজ ঘড়ি নিলে না মদন, এখন আমায় জিজ্ঞেস করছ, আন্দাজে কি করে বলি। কতদিন বলেছি ঘড়ি নেবে। সাত মিনিট, আট মিনিট—যথেষ্ট।

এসব বলতে বলতেই হরিসাধন খাটে উঠে বসে পড়তে পারে। কোলবালিশের ঠেসান ছেড়ে, শিরদাঁড়া টান করে।

—যাও এবার বন্ধ করে দাও, যা হয়েছে হয়েছে—বলে তিনি আবার স্মৃতিজীবী হয়ে যেতে পারেন, অন্তত এটুকু সময়ের জন্যে। আমার বাবার সেই খাঁ সাহেব মামারা চাকরের মাথায় চাল-ঘি, হাতে খাসির দড়ি দিয়ে

বলতেন, ওবাড়ির সদর দরজায় নামিয়ে দিয়ে আসতে। ভাগ্নেরা খাবে। ওদের তো এবাড়িতে জলগ্রহণের উপায় নেই। এবাড়ির চাকর-বাকররা তুলে নেবে। দুই বাড়ির মাঝে বিশাল পুকুর, কলাবাগান, ধু-ধু মাঠ। ঐ দুই খাঁ সাহেব ভালো, দামি লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি গায়ে পুকুরের ওপারে, কলাঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকতেন—যদি একবার ভাইগ্‌ন্যাগো দেখন যায়। তাঁদের চোখে জল চিক চিক করে উঠত। ভাইগ্‌ন্যাদের দেখার প্রত্যাশায় কেটে যেত কত যে সময়।—অরা তো আর আমাগো বাড়ি আইতে পারব না—এই দীর্ঘশ্বাস থাকত দুই খাঁ-সাহেবের গলায়। হয়ত গোপনেই।

হরিসাধন আসলে ঠিক পর পর সব গুছিয়ে বলতেও পারেন না। যেমন তাঁর মনে পড়ে, তিনি অমিয়কে বলেও যান—তখনকার দিনে জগন্নাথ ধামে গিয়ে ফলদান করার রেওয়াজ ছিল। যে ফলটি ঠাকুরকে দেয়া হলো, সেটি আর খাওয়া যাবে না—এমন সংস্কার। আমার ঠাকুরদা পুরীতে গিয়ে চালতা দান করলেন। আর ঠাকুরমা কামরাঙা।

বলতে বলতেই হরিসাধন এক ঝলক হাসিতে নিজেরে গাম্ভীর্যকে শুধু ঐটুকু সময়ের জন্যেই পাশে সরিয়ে রাখতে পারেন। কিরকম বুদ্ধি বলত! এত ফল থাকতে—

অমিয় সেভাবে সারের হাসিকে ফলো আপ দিতে পারে না। সে দেখতে পায় দুজন স্নেহময় মামা তাঁর ভাগ্নেদের জন্যে পোলাওয়ের চাল, ঘি, আস্ত খাসি পাঠিয়ে ভাগ্নেদের শুধুই চোখের দেখা দেখতে দাঁড়িয়ে। তাঁদের চোখে জল।

সার. আপনার তে-ভাগা-ফেজ্‌টা, যতটা বলা যায়—আণ্ডার গ্রাউণ্ড পার্টি, রণদিভে লাইন। পূরণ চাঁদ যোশী বনাম বি. টি. রণদিভে, ঝানভ্‌—এটুকু বলেই অমিয়র মনে পড়ে 'খবর' গ্রুপ অফ পাবলিকেশনস-এ তাঁকে শুধুই হরিসাধনবাবুর মা-বাবা, ঠাকুমা, ঠাকুমার শাশুড়ি আর ঠাকুরদার কথাই লেখার প্রস্তাব দিয়েছে। যিনি শারদ সংকলন সম্পাদনা করছেন, তাঁর সঙ্গেও একই কথা হয়েছে হরিসাধনবাবুর। ফলে তে-ভাগা-পর্বটা অন্য কোনো কাগজে সুন্দর করে, অনুলেখক হিসেবে নিজের নামটাই থাকবে অমিয়র, তার সঙ্গে এক্সট্রা ভাউচার-পেমেণ্টের আলো। এসব ভেবেই—সবটা মাথায় রেখে—হরিসাধনের পুরনো খোঁচা খাওয়া স্পর্শকাতর জায়গাটিতে হাত দিতে পারে অমিয়।

এ আর নতুন কি আছে বলো! সেই তো ফর্টি এইটে, সবে বৃটিশ গেছে। পার্টি ব্যাণ্ড। তেলেঙ্গানা, তে-ভাগা—কাকদ্বীপ চলেছে। আমরা সবাই খুব উঁচু গলায় 'এ আজাদি ঝুটা হ্যায়' বলছি। কাকদ্বীপ মুভমেন্টের নেতা কংসারী হালদার, কিভাবে যে অ্যাসেমব্লিতে হাজিরা দিয়ে গেল, তাজ্জব সবাই। সেই সময় জেলে বুঝলে। বি. টি. আর-এর 'কল' ভেসে এলো—জেল ব্রেক করো। ভেঙে বেরিয়ে এসো। আমার ডান পায়ের হাঁটুতে গুলি লাগল। এখনও দাগ আছে। পুরনো ক্ষত। বলতে বলতে হরিসাধন পাজামা তুলে ধরলেন। রোমহীন ফর্সা ফর্সা পায়ের কালচেমতো হাঁটুতে অনেকটা গভীর কালোগর্ত।

বুলেটটা যখন ঢুকছে, মনে হলো খুব জোরে পোড়া লোহা ঠেসে ধরল কেউ, হাড়-মাংসের গভীরে। ডান পা সেই থেকেই ল্যাঙা—কমজোরি। অমাবস্যা পূর্নিমায় হাড়ের ভেতর ব্যথা হয়। তবে ঐ যে বললাম, এতো ঠিক আত্মজীবনী নয়, অন্তত তোমার কাগজের জন্যে—তুমি যে অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এসেছ 'খবর'-এর শারদীয় সংখ্যায় ছাপবে বলে, সেখানে তো শুধুই আমাদের পরিবার, সে জায়গায় তে-ভাগা, গুলি, এ আজাদি ঝুটা হ্যায়—এই সব তো আসে না। বরং এটা শুনলে তোমার ভালো লাগবে আমার বাবা কীভাবে সেযুগে মা-কে কাশী নিয়ে গিয়ে দু মাস প্রায় ঘর ভাড়া করে ছিলেন। কাশীর সঙ্গে পুব বাংলায় আমাদের গ্রামের জিনিসপত্রের দামে খুব একটি আহামরি পার্থক্য ছিল না। পিতৃদেব তাতে খুশী হন নি। তিনি কাশীতে অনেক সস্তায় থাকতে চেয়েছিলেন।

অমিয় তার বাঁ পায়ের থাইয়ের পেছনে জমে থাকা যন্ত্রণার সরীসৃপটির আবারও খুব জোরে নড়ে ওঠার ঝাঁকানি টের পেল। গোটা শরীর দুলে উঠছে।

পাজামার ওপর দিয়ে বোধহয় নিজের একাত্তর বছরের পুরনো ডান পায়ের গুলিবিদ্ধ অংশটিতে আঙুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে সেই সময়টিকে ছুঁতে চাইছিলেন হরিসাধন। ডান হাতটিতেও তো এখন আর তেমন জোর নেই। জেলে সেপাইয়ের সাড়ে চার হাতি লাঠিতে চুর চুর হয়ে গেছিল ফর্টি এইটে, অনশন—জেল ব্রেক পর্বে।

বেলা বেড়ে যাচ্ছিল নিজের নিয়মে।

কামিনী গাছ, কাঠ গোলাপের পাতায় মেঘলা ভাঙা রোদ সরে সরে যাচ্ছিল।

আর আশ্চর্য, তারা দুজনে দুজনকে কোনো নতুন কথাও শোনাতে পারছিল না।

কথোপকথন

পূর্ণেন্দু পত্রী

শুভঙ্কর। এত বছরের পরও পুরনো হল না ভালোবাসা।
তোমার চোখের ফ্রেমে আজো দেখি কবেকার
নিকোনো উঠোনে
সূর্যমুখী নারীদের আলপনার প্রতীকী পিপাসা।

তোমার কি ঘুম নেই? নিরন্তর উন্মেষ কেবলই?
তুমিই কি জয়দেব চণ্ডীদাসের পদাবলী?

তোমাকে যখনই দেখি আলোকস্তম্ভের মতো লাগে।
কত সব অশ্বমেধ, কত সব অভ্যুত্থান পৃথিবীর ধুলোয় মাটিতে
স্বর্গের ঝিলিক দিয়ে হঠাৎ হারালো। তুমি আজো
পুরোভাগে।

স্পর্শ কি সোনার কাঠি? তাই চিরজীবিতের মত
ভুলে যেতে পারি গায়ে চিরে-বসা সময়ের ক্ষত?

আরেক পৃথিবী যেন তার নীল সামিয়ানা সহ
আমাকে রয়েছে ঘিরে, এই বোধ, এ তোমারই অনুগ্রহে
রচিত আবহ।

নন্দিনী। ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে মিছে বানিও না দামী।
রাজচন্দ্রনন্দিনী নই, নই কোনো অসামান্য আমি।
তবু কোনো রত্নকণা কোনো খানে যদি লেগে থাকে
সে আমার নয়, তুমি দিয়েছ আমাকে।

তোমারই ছিটোনো জলে কুঁড়ি পেল পূর্ণাঙ্গ বিকাশ।
ঘুমন্ত আমার জাগা ব্যাপ্ত করে দিয়েছ এমন
একমাত্র আকাশেরই সঙ্গে মেলে হিসাব-নিকাশ।

ভীরুতার শিকলের ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে হাঁটাহাঁটি
তুমি যদি না ঘোচাতে, ভবিষ্যৎ ষোলআনা মাটি।
আজ যে ডানায় উড়ি, সে-স্বাধীনতার
প্রত্যেক পালক জানে কারুকাজ কার।

শুভঙ্কর। অতীতের সেই সব দিন
তাহলে এখনো অমলিন ?
স্মৃতিতে সোনালি হয়ে জ্বলে ?
নৌকো ডুবে যায়নি অতলে ?

মনে পড়ে ? সব মনে পড়ে ?
প্রথম আলাপ কোন্‌ ঝড়ে ?
প্রথম চিঠির দ্বিধা ভয়
প্রথম চুম্বনে বিশ্বজয়।
মনে পড়ে ? সব মনে পড়ে ?
আগুন ছড়ালো শুকনো খড়ে।

নন্দিনী। আমার বৈশাখে তোমার ঝড়
তোমার শ্রাবণেই ভিজলো চুল।
ছোট্ট রেস্তোরাঁ, অন্ধকার,
জ্যোৎস্না বুনে যায় ক্ষ্যাপা আঙুল।

তোমার চিঠি পেলে রুদ্ধশ্বাস,
আঁচল হয়ে যায় পুজোর মেঘ।
দেখিনি পারিজাত, তবুও তার
গন্ধে ভুরভুর চাপা আবেগ।

সকাল গুনগুন্ ভৈরবীর
লুকনো স্বরে স্বরে। আর বিকেল,
সে যেন মালকোষ। ছুঁয়েছে যেই
দুঃসাহসই সোজা, বাকি বিকেল।

তখুনি যমুনার বাঁশীর ডাক
ময়লা শাড়ি ছেড়ে নতুন সাজ।
বৃন্দাবন সেই রেস্তোরাঁ।
পৌঁছবোই যত পড়ুক বাজ।

শুভঙ্কর। তখন সর্বাঙ্গময় ক্ষুধা
তুমি যেন অন্নের বসুধা।
ঐশ্বর্য সাজানো থরে থরে
বহু অপহরণেরও পরে
যায় না জলের মতো ক্ষয়ে।
ভরা থাকে স্বর্ণখনি হয়ে।

গিনেসেয় ছাপানোর মতো
কৃপণতা যদিও বিখ্যাত।

নন্দিনী। তুমি তো ক্ষুধায় গরুড়কে হার মানাতে।
হাজার খেয়েও শত অনাহার বানাতে।
আমরা, নারীরা, তোমাদের হ্যাঁ-এ হ্যাঁ দিলে
পৃথিবী কখন ডুবে যেত মহাসলিলে।

মশাই, একটু খিদে বাকি রেখে খাওয়া
সেটাই নিয়ম, খানিকটা ফাঁকা হাওয়া
দুটি ওষ্ঠের মাঝখানে যদি না থাকে
ভালোবাসা শুধু জানবে যান্ত্রিকতাকে।

শুভঙ্কর। বাগানের মালি শুধু জানে
গাছ চায় কতখানি জল।
প্রত্যহ? না হপ্তায় হপ্তায়?
যৎসামান্য? নাকি অনর্গল?

শাল-পিয়ালের কেউ নই,
অশথও নই, কিংবা বট।
গুল্ম আমি, তাই সারাক্ষণ
চেয়েছি উপুড় জল-ঘট।

দীঘি কি কখনো ফুরিয়েছে?
ফুরোয় তো গেলাসের জল।
অঙ্গে অঙ্গে সোনার ফলস
তবুও তৃষ্ণার্ত রাখা ছল।

নন্দিনী। সাত-সাতটা বছরে একটুও বদলাওনি তুমি, সত্যি।
তোমাকে মনে পড়ে হুবহু সেই
নদীর মতো যার মোহানা নেই।
কেবলই জলরাশি, ঢেউয়ের নাচ
মাতাল ধ্বনি ভাঙে পাথুরে ছাঁচ।

অবাক লাগে তুমি কত না দিন
হুবহু রয়ে গেলে শ্যাওলাহীন।
যখনই কথা বলো, আগুনে তাপ।
জেগেছে তলোয়ার, ভেঙেছে খাপ।

তোমার আশ্বিন এমনই নীল
নিমেষে একাকার সারা নিখিল।

শুভঙ্কর। সিমেন্টের গুঁড়ো, সুরকি বালি,
এরা শুধু উপাদান। এদের ছুঁয়েছ তুমি তাই
মহিম ভাস্কর্য হয়ে উঠেছে তারাই।
এই হিসেবেরই মধ্যে রয়ে গেছে ব্যক্তি-বিশেষের
একাধিক পাপড়ি খুলে একাধিকবার
জাগবার ইতিহাস। ক্রম উপাখ্যান উন্মেষের।

মা হালিমার সন্তান

অমর মিত্র

রফিকুলকে যেতে হবে শোভান আলির ঘরে। সে জব্বার বৈদ্যর কেউ নয়, জব্বার বৈদ্যর সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক নেই। হাঁটান ছেলের জন্য জব্বার বৈদ্য তার জমি খরচ করতে পারবেনা। তাকে এই তিরিশ বছর লালন পালন করেছে সে হালিমা বিবির জন্য, এই ঢের। রফিকুল জব্বার বৈদ্যর জমির অধিকারী হতে পারে না। অথচ রফিকুল কত পরেই না জেনেছিল সে যাকে বাপ বলে জানে, সেই মানুষটা তার বাপ নয়। সেই মানুষটা তার কেউ নয়। সে আসলে শোভান আলির রক্তের মানুষ। তাকে নিয়ে মা হালিমা বিবি, যখন জব্বার বৈদ্যর ঘরে এসে উঠেছিল, তখন সে দু বছরের শিশু। দু বছরের সন্তানকে শোভান আলির ঘরে রেখে হালিমা বিবি তো জব্বার বৈদ্যর ঘরণী হতে পারে না, তাই রফিকুলকেও নিয়ে এসেছিল। রফিকুলকে মেনে নিয়েছিল জব্বার বৈদ্য হাঁটান ছেলে হিসেবে। এখন মা হালিমা নেই, রফিকুল এ বাড়ির কেউ নয়। রফিকুল ফিরে যাক শোভান আলির কাছে। শোভান আলির সম্পত্তিতে তার হক আছে। সম্পত্তি সে সেখানেই নিক।

রফিকুল তার অন্য দুই ভাই, সিরাজুল আর আক্রামুলকে বলল, এক মায়ের পেটের ভাই আমরা, আমারে না দিয়ে তোরা ভাত খেতে পারবি ?

সিরাজুল আর আক্রামুলের বাবা জব্বার বৈদ্য। রফিকুলের সৎ বাপ যে সেই হলো তাদের আপন বাপ, মা তাদের একজন। তারা চুপ করে থাকল প্রথমটায়, তারপর সিরাজুল বলল, আপনি বাঁচলি বাপের নাম, চোদ্দ বিঘে

জমি, এর ফরাজ কষতে কষতে কতডা আর থাকবে, দুই বুনতো অংশ নেবে, তুমি জুড়লে আমাদের থাকবে না একটু'ও, নিজির পথ ছাখো।

রফিকুল বলল, মা বলে গেচে আমি সমান ভাগ পাব।

—মা বলে গেলে তো হবে না, এ হল বাপের জমি। তুমি বাপের কেউ না, তুমি অন্য বংশের লোক, তুমি হলে গিয়ে কোকিল পাখি। এবার নিজির জায়গায় যাও। হাঁটান ছেলের জমি নেই।

হালিমা বিবি মরার পরে দেড়মাস কেটেছে। এই চৈত্রমাসের রোদ্দুরেও এখনো যেন সেই কবরের মাটি শুকোয়নি। সিরাজুল আক্রামুল হঠাৎ যেন গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। মা নেই তো রফিকুলেরও এ বাড়িতে ভাত নেই। রফিকুলের জমিতে ভাগ নেই। জব্বার বৈদ্য, হালিমা বিবির স্বামী বুড়ো এখন নাকি হেবানামা দানপত্রও করে দেবে তার দুই ছেলেকে। সব সম্পত্তি দুই ছেলেকে দেবে। রফিকুল এবার নিজের পথ দেখুক। শোভান আলির ছেলেকে বুড়ো কিছুই দেবে না।

রফিকুল এই প্রথম এতদিনে এই বুঝি টের পেল সে এ বাড়িতে ছিল তার বড় জোর ছিল মা হালিমা বিবি, যে এখন শুয়ে আছে কলাবাগানের পিছনে। সে তার মায়ের প্রথম সন্তান। প্রথম সন্তানকে নিয়ে মা শোভান আলির ঘর ছেড়েছিল জব্বার বৈদ্যকে ভরসা করে, সে তো তিরিশ বছর আগের কথা। রফিকুল শুনেছে তার বাপ শোভান আলি মাকে যন্ত্রণা দিতেই ঘরে মায়ের সতীন এনেছিল। সতীন নিয়ে মা ঘর করতে চায়নি। মা তাই জব্বার বৈদ্যকে আশ্রয় করেছিল সন্তান নিয়ে। রফিকুল শুনেছে মার সঙ্গে জব্বার বৈদ্যর নাকি ভালবাসা ছিল। শোভান আলির ঘরে তার ঘর করতে যাওয়ার অনেক আগে সে ভালবাসার সূত্রপাত। শোভান আলি তা টের পেয়েছিল, শোভান আলি তা শুনেছিল বোধহয়, তাই মাকে যন্ত্রণা দিত।

মা বলত, ভালবাসা হয় জব্বার বৈদ্য আশ্রয় দেয়ার পর। তার আগে জব্বার বৈদ্যকে সে চিনত মাত্র। ওই শোভান আলি, মায়ের প্রথম পক্ষ ছিল সন্দেহ প্রবণ, মেয়ে মানুষের রূপ ছিল তার সন্দেহের কারণ। শোভান আলি ছিল সম্পত্তিমান কিন্তু কুদর্শন। শোভান আলির ঘরে ঝি হয়ে থাকতে হত মাকে। জব্বার বৈদ্য মাকে উদ্ধার করে বাঁচিয়েছিল। বলতে বলতে মার চোখে জল এসে পড়ত কৃতজ্ঞতায়।

রফিকুল নরম গলায় বোঝায় সিরাজুলকে, আমার মা তোরও মা, আমরা কি বুঝিচি বাপ আমাদের আলাদা।

সিরাজুল ঠাণ্ডা গলায় বলে, শোভান আলি বড়লোক, তার ঘরে গেলেতো আমরা বাঁচি। এইটুকুন জমি, তার ভাগ দিলে খাব কী ?

রফিকুল টের পায় মা মরে যেতে সে এখন অনাথ। বৈদ্য বংশের সঙ্গে তার কোন রক্তের সম্পর্ক নেই। জব্বার বৈদ্য সম্পর্ক পাতিয়েছিল তার মা হালিমা বিবির সঙ্গে। সেই সম্পর্কের সুতো ধরে সে জব্বার বৈদ্যর আপন হতে পারছেনা। মায়ের সঙ্গে জব্বার বৈদ্যর সম্পর্কে আর যে দুটো ছেলে দুটো মেয়ে, তারাই এ ভিটের অংশীদার। রফিকুল এখন বাইরের মানুষ, যেমন বাইরের মানুষ শোভান আলি।

ক'দিন ধরে খুব ঝামেলা চলছে। রফিকুলকে জমি থেকে তুলে দিয়েছে তার দুই ভাই। জব্বার বৈদ্য সব দেখেও চুপ করে আছে। জমিতে এখন বোরো চাষ। রফিকুল নিজে করলেও তা তুলতে পারবেনা জমি থেকে। ভাগ পাবেনা এক কণাও। রফিকুল গিয়ে পড়েছে সিরাজুলের বাপের পায়ে, এডা কী হচ্ছে তুমি বেঁচে থাকতে, আমি তোমার হাঁটান ছেলে, তুমি আমার ভার নিয়েছিলে বলেইতো মা আমাকে নিয়ে এসেছিল এ ভিটেতে, এখন তুমি চুপ করে কেন ?

জব্বার বৈদ্য চুপ করে ছিল বহুক্ষণ। তার নমাজ পড়ার সময় হয়েছিল তখন, উঠে গিয়েছিল নিঃশব্দে। রফিকুল বসেই ছিল বুড়োর দাওয়ায়, নমাজ শেষে ফিরে এলে আবার ধরেছিল তাকে, কী হবে ?

—কী হবে ? বুড়ো ভাঙা গলায় বলেছিল, যা না শোভান আলির কাছে, সে বড়মানুষ, নিজির ছাবালরে ফিরাবে না।

রফিকুল ঘাড় হেঁট করে নিজের ভিটেয় ফিরেছে। এখানে পরপর চারটে ভিটে, একটাতে বুড়ো আর মা হালিমা থাকত, অন্য তিনটেয় তিন-ভাই। তিনজনের সংসার আছে, তাই ভিটে তুলতে হয়েছিল আলাদা। মুলি বাঁশ, মাটি আর খোলার চাল। রফিকুল ভিটেয় ফিরলে তার বিবি রাবেয়া জিজ্ঞেস করে, কী বলল উনি ?

—আমি পাবনা।

—এক মার বেটা হয়ে অন্য দুজন পাবে ?

—ওরা মার বেটা নয়, জব্বার বৈদ্যর বেটা।

রফিকুলের ভাইরা তাই বলেছে। তারা জব্বার বৈদ্যর ছেলে, মা হালিমার নয়। তাদের বর্গাচাষ আছে, সে জমি রেকর্ডও করা আছে, সেখানে তারা পিতৃপরিচয়ে পরিচিত, যেমন সিরাজুল বৈদ্য পিং জব্বার বৈদ্য। সেখানে তাদের মাতৃপরিচয় নেই। মাতৃপরিচয়ে মানুষ পরিচিত হয়না। মা পেটে ধরে মাত্র। কিন্তু পরিচয়টা হলো বাবার। মাও বাবার পরিচয়ে, মানে মা তার স্বামীর পরিচয়ে পরিচিত, এ ব্যতীত তার কোন পরিচয় নেই। সুতরাং কে কাকে পেটে ধরল তা দিয়ে কোন বিচার হয়না। তাদের মা হালিমা বিবি না হয়ে অন্য কেউ হলেও তারা জব্বার বৈদ্যর পরিচয়ে পরিচিত হত। সুতরাং রফিকুল কী করে দাবি করে। ঔরসের পুত্র ব্যতীত সম্পত্তির হকদারির কোন ইতিহাস কারোর জানা নেই। সুতরাং রফিকুল শোভান আলির কাছে থাক। রফিকুল এ বংশের কেউ নয়। জব্বার বৈদ্য, তার বাপ ইসমাইল বৈদ্য, তার বাপ আক্কাছ বৈদ্যর রক্ত রফিকুলের ভিতরে প্রবাহিত নয়। সে জমি পাবে কেন?

রাবেয়া সিরাজুলের বউ আমেনাকে বিকেলে পুকুরঘাটে বলেছে, লোকটা তার বাপের নাম সিরাজ ভাই এর বাপের নামে লেখে, আমি জানি আমার শউর ওইজন, আমরা তো কুমোরহাটের সেই ছোবান আলিকে জানিনে, আমার শাউড়ি তুমারও শাউড়ি। আমার শাউড়ি আর,ডু বছর আগে এ ঘরে এলে তো এ ব্যাপার হতনা।

সিরাজুলের বউ আমেনা এমনিতে নরম স্বভাবের মেয়ে, সেও ফোঁস করল, তা বললি ত হবেনা। বাপ বলেতো একটা ব্যাপার আছে।

রাবেয়া বোঝে আমেনা তার স্বামীর কথা বলছে। সে মনখারাপ করে জা-এর পিছু পিছু পুকুর থেকে ওঠে। আজ বিকেলে কেউ জলে ঢেউ তুলল না, কেউ লম্বা ডুলি করল না, গা ভাসালনা অনেক সময় ধরে, এমন কী কেউ তাদের বাপের ঘরের কথা তুলল না, বলল না মা ভাই এর কথা। ধীর পায়ে ভিজে কাপড়ের জল ছড়াতে ছড়াতে গিয়ে উঠল যে যার ভিটেয়। রাবেয়া কিছু বলতে গিয়েছিল, ভেবে রেখেছিল আমেনাকে বোঝাবে। আমেনাকে দিয়ে তার স্বামীকে বোঝাবে। আসল কলকাঠি নাড়ছে ত ওই একজন। ওর কথায় জব্বার বৈদ্য ঘাড় নাড়ছে, আক্রামুল লাফাচ্ছে। রাবেয়া বলতে পারলনা কিছুই। তার ভিতরে যে গোপন হীনমন্যতা জেগেছে ক'দিন ধরে তা বেড়ে উঠল যেন এই সময়। তার স্বামীতো হাঁটান ছেলেই বটে। এই কোবরেজ

বংশের সঙ্গে তার স্বামীর রক্তের সম্পর্ক নেই। এ ভিটের রক্ত তার স্বামীতে মেশেনি। যে ছিল তার বড় জোর, সে এখন মাটির নিচে, এতদিনে বোধহয় মাটি হতে আরম্ভও করেছে একটু একটু করে। হালিমা বিবি এখানে এসেছিল সন্তান জন্ম দিতে, আশ্রয় পেতে। তাই হালিমাবিবির কোন হক ছিলনা রফিকুলকে এ ভিটেতে প্রতিষ্ঠা করে। রাবেয়া সন্ধের সময় নিঃশব্দে কাঁদে উঠনে দাঁড়িয়ে। তার মাথার উপরে আকাশ খটখটে, নির্মেঘ। সেখানে অশ্রুবিন্দুর মত গ্রহতারা ফুটছে এক এক করে। হালিমাবিবির কথা মনে পড়ে রাবেয়ার। মনে পড়তে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে কাঁদে। রফিকুলকে পাঠাতে হবে শোভান আলির ঘরে। কেউ বোঝেনা শোভান আলির ঘরে হালিমাবিবির ছেলে গিয়ে দাঁড়ালে হালিমাবিবির বুকের উপরের মাটি আরো ওজনদার হবে। বুকে লাগবে।

দুই

শোভান আলিকে চেনে রফিকুল। চেনে মানে নামে চেনে, চেহারায় চেনে। সে হল মস্ত মানুষ। কুমোরহাট ওখান থেকে মাইল পনের দক্ষিণে। হেঁটে যাওয়া যায়, বাসে যাওয়া যায়। শোভান আলির নাম এই পনের মাইল দূরের মানুষও জানে। সে ভোটে দাঁড়িয়েছিল পাঁচবছর আগে। দাঁড়িয়ে হেরেছিল বটে, তবু তার নাম ভোলেনি লোকে। যেমন তেমন মানুষ ত ভোটে দাঁড়াতে পারেনা। ভোটে-হারা মানুষেরও তাই সম্মান আছে।

রফিকুল রাবেয়াকে জিজ্ঞেস করল, যাব তার কাছে, আইনত তার সম্পত্তিতে আমার ভাগ আছে অন্য ছেলের সঙ্গে।

—চেনে সে লোক ?

—না চিনলেও চিনাব। রফিকুল বলে।

—যদি সম্পত্তি না দেয় ?

রফিকুল চুপ করে থাকে। রফিকুল চুপ করে থাকে, তার বিবিও চুপ করে থাকে। রফিকুল যাবে যাবে করেও যায় না। যেতে তার ভয় করে। ভয় করে কেননা সে জানে তার মা হালিমা প্রহৃত হত লোকটার কাছে। লোকটা সন্দেহ করেছিল জব্বার বৈষ্ণর সঙ্গে মায়ের প্রণয় ছিল। জব্বার বৈষ্ণর প্রতি

ভালবাসা ছিল মায়ের। তার শোধ নিতে ঘরে যুবতী বউ থাকতেও আর একটা বিয়ে করে এনেছিল শোভান আলি। রফিকুল ভাবছিল গিয়ে বলবে, সতীন না থাকলে মা এঘর ছাড়ত না। মা কাঁদত, পানি ফেলত চোখের আপনি জানেন না আব্বাজান মা আপনারে কত মনে করত, মরার আগে বল্লে গেছে আপনার কাছে আসতে, আপনি আমার বাপ, এ বংশের রক্ত আমার ভিতরে, বস্তি বাড়িতে আর মন টেকেনা, রক্তের টানে এলাম এখেনে।

রফিকুলের বিবি বসে শুনেছে স্বামীর কথা। শুনেছে আর চোখভার করেছে। বলতে বলতে রফিকুল মাথার চুল ছেঁড়ে। এসব ত সত্যি নয়। এসব কথা হল মায়ের নামে মিথ্যে বলা। শোভান আলির ঘরে থাকলে সে মেরেই ফেলত হালিমা বিবিকে, সত্যি হল এটাই।

তবু রফিকুল চলল তার বাপের ঘরে। না গেলে তার উপায় নেই। সে যাবে হালিমাবিবির সন্তান হয়ে পিতৃ পরিচয় উদ্ধারে। এবার থেকে সে শোভান আলির নামে নিজের পরিচয় দেবে। শোভান আলির সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক। সে শোভান আলির পুত্র, কছিম আলির নাতি, তার বাপ শহর আলির পুতি। তার বংশপরিচয়ে শহর আলি—কছিম আলি—শোভান আলি আছে। সে শোভান আলির সম্পত্তির ফরাজ অধিকারী। সেই সাহসে রফিকুল চলল। গিয়ে বলবে, আমি হলাম হালিমাবিবির প্রথম পক্ষের···

রফিকুল তার বিবিকে বলল, যদি বোঝাতে পারি বুড়োকে তবে আর চিন্তা কী, এখেনে আর থাকবনা, এ জায়গা থাকার মত না, জব্বার বস্তি মাকে কথা দিয়ে এনেছিল এঘরে, তখন যদি মা জানত হাঁটান ছেলেরে ত্যাগ করবে তার দ্বিতীয় পক্ষ, আসতই না, মা ঠকেছে মরার পর।

মা ঠকেছে মরার পর। মা ঠকেছে সেই যৌবনকালে। শোভান আলি মেরেছে মাকে, জব্বার বৈত্তও তাই, মা তিনদিনের জ্বরেও উঠোনে বসে ধান ঝাড়ছিল রাবেয়া আমেনার সঙ্গে। ঝাড়তে ঝাড়তেই ঢলে পড়ল ধানের গাদায়। তারপর বেঁচেছিল তিনঘণ্টা। মা মরার পর কে কেমন তা প্রকাশ হয়ে গেল।

রফিকুল চলল তার বাপের কাছে। যাবে কোথায়? কুমোরহাটে নেমে খোঁজ নিতে জানা গেল এখন বাড়িতে পাওয়া যাবে না তাকে, পাশের মৌজা জেলেরহাটে তার মস্ত ইটখোলা, সেখেনে আছে। রফিকুল যেন বাঁচল।

বাপের ভিটেয় পা দেওয়ার আগে বাপের সঙ্গে দেখা হোক, তার বাপ আদর করে নিয়ে যাক তার ঘরে। আহা কতকাল বাদে কোলের বাছা ফিরে এসেছে কোলে, আয় বাপ বুকে আয়, বলতে বলতে সেই দুর্দান্ত শোভান আলি তাকে দুহাতে আঁকড়ে ধরবে। রফিকুলের বুক ঝমঝম করে। রফিকুল যেন বিদেশ গিয়েছিল, ফিরছে তিরিশ বছর বাদে। রফিকুল যেন হারিয়ে গিয়েছিল, ফিরছে হাজার পথ হেঁটে। অথবা রফিকুলের বাপ যেন বাণিজ্যে গিয়েছিল, ফিরল এতদিন বাদে, ঘরে রেখে গিয়েছিল দুবছরের শিশু, সে এখন বত্রিশের জোয়ান। মা মরে গেছে বাপের কথা ভেবে ভেবে। বাপ ছেলেতে দেখা হলে কার চোখের জলে ভাসবে কার বুক তা ভাবতে ভাবতেই রফিকুল ইটখোলার পথে হাঁটে। রক্তের টান তাই চৈত্র দিনের রোদ্দুরও এখন মিথ্যে হয়ে যায়। রক্তের টান তাই রফিকুলের সব আশঙ্কা উধাও হয়ে যায়। রফিকুল বড় বড় পা ফেলে রুক্ষ মাঠ জমিন ধরে হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে তার চোখ ভারি হয়ে আসে, বুক থরথরিয়ে কাঁপে, সারা শরীরে শিহরণ জাগে।

ইটখোলা দুই চিমনির। চিমনির মাথা কালো হয়ে আছে ধোঁয়ায়। এক একবারে হাজার যাট ইট পোড়ে। শোভান আলির অবস্থা রমরমে। রফিকুল পৌঁছে দেখল ইটখোলার অফিস ঘরে কালো চশমা চোখে বড় চেয়ারে এঁটে বসে আছে একজন। তার পাশে তক্তপোষে ক্যাশবাক্স নিয়ে প্রায় তার বয়সী আর একজন। কালো চশমায় তার বাপ, আর ক্যাশবাক্স নিয়ে তার সৎ ভাই। লাইন পড়েছে মজুরের। ভাইয়ের পাশে বসে ইটখোলার মুনশি হিশেব দিচ্ছে কোন মজুরের কত পাওনা হল। রফিকুল দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল এই ব্যাপার। দেখতে দেখতে তার ময়লা বিবর্ণ লুঙ্গি ঝাড়তে লাগল, গায়ের লংক্লথের পাঞ্জাবি ঝাড়তে লাগল। চৈত্রদিনের রোদে পুড়তে লাগল। পুড়তে পুড়তে শুনতে লাগল শোভান আলির হেঁকে ওঠা। পেমেণ্ট নেয়ায় আছে সব হারামখোর, কাজের বেলায় নেই, মুনশি হিশেব কষিস ভাল করে।

শোভান আলির ছেলে ক্যাশ দেওয়া বন্ধ করে তখন বলছে, আব্বাজান থামেন।

শোভান আলি তবু থামে না। চিৎকার করে যায়। কখনো পুলিশকে গালি দেয়, কখনো সরকারী লোককে গালি দেয়, ঘুষ দিতে দিতে তার জীবন গেল।

রফিকুল দেখছিল তার বাপকে। আহারে, এইজন সেইজন, যার টানে সে

এসেছে। এই বাপের ঘরে মা হালিমা থাকলে ওই ক্যাশবাক্স নিয়ে আজ সে বসতই। রফিকুল ভাবছিল ছুটে গিয়ে পা জড়িয়ে ধরে, মা হালিমা অপরাধ করেছিল, সে প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছে, সে রফিকুল, শোভান আলি তোমার ছেলে, তোমার রক্ত তার ভিতরে, সে এখন প্রায় পথের ভিখিরি, রক্তের সম্পর্ক মনে কর, তুমি কত বড় মানুষ আব্বাজান।

বছরের শেষ মাসটা বড় তেজী। তার গা পুড়ছিল, মাথার চাঁদি পুড়ছিল ওই ভাটার ইটের মত। চিমনির ধোঁয়া, মাটির নিচের আগুনের তাপ, আর আকাশের তাপে রফিকুল কাঁচা মাটির ইটের মত পুড়ে পুড়ে কঠিন হয়ে যাচ্ছিল। বুকে যে রস জমেছিল এতটা হেঁটে আসার পথে, তা শুকিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। রফিকুল ছটফট করে।

মজুরি দেওয়া শেষ। রফিকুল থরথর করে। দুবছরের শিশু এখন পরিপূর্ণ মানুষ, তাকে ত চিনবেনা শোভান আলি। নাকি চিনবে? রক্তের সম্পর্ক! সে যেমন চিনেছে ওই জনকে, ওইজনও তেমনি চিনবে ঠিক। রফিকুল এগয়। তার সৎভাই ক্যাশবাক্স অফিস ঘরের ভিতরে রেখে হেঁটেছে কাজের দিকে। তার পিছনে পিছনে মুনশিও। এখন শোভন আলি একা বসে। গায়ে অর্গাণ্ডির ফিনফিনে গুলাবি পাঞ্জাবি এঁটে বসেছে থলথলে মাংসের উপরে। চেকলুঙ্গি দাবনার উপরে তোলা।

রফিকুল এখন কী বলবে। জব্বার বৈদ্যর হৃদয়হীনতা, তার সহায়হীনতার কথা নাকি কাঁদবে বাপের পা ধরে, কত দেখতে ইচ্ছে করে, রক্তের টান ত যায় না। রক্তের টান যায় না, রক্তের টানে আগুনে রোদ মিথ্যে হয়, সকাল থেকে না খাওয়া মিথ্যে হয়, অভাব মিথ্যে হয়, দেহে বল আসে, তবু রফিকুল কাঁপতে লাগল শোভান আলির সামনে দাঁড়িয়ে। সাহস আনতে পিছন ফিরে তাকায়, চিমনি, ধোঁয়া, তার উপরে আকাশ। আকাশ নেমে গেছে বহুদূরে বোরোধানের জমির উপরে। রফিকুলের জব্বার বৈদ্যর জমির কথা মনে পড়ে। সে জমিতেও এমন ধান, চোখে জল আসে তার। অভিমান হয়। পা ধরবে শোভান আলির? রফিকুল আবার সামনে তাকায় ঝাপসা চোখ নিয়ে। রোদ থেকে ছায়ায় চোখ ফেরানোয় তার দৃষ্টি আঁধার হয়ে আসে। সে নড়ে, বাঁকে, নিচু হয়, সোজা হয়।

…কেন? আচমকা জিজ্ঞেস করে শোভান আলি, কে দাঁড়ায়ে?

—আজ্ঞে আমি রফিকুল।

—কে রফিকুল ?

রফিকুল বলল গাঁয়ের নাম। মায়ের নাম বলল না। তার মনে হচ্ছিল সামনের মানুষটি অন্ধ। চোখে ছাখে না। ঠিক যেন তাই। জিজ্ঞেস করল, আপনার চোখ ?

—তুমার কি হবে জেনে, ইট নেবা ? হাঁকড়ে ওঠে শোভান আলি।

রফিকুল স্থির। এবার তাহলে বলবে মা হালিমার কথা। তার পরিচয় তো হালিমা বিবির পরিচয়। তার তো এখনো পর্যন্ত কোন পিতৃপরিচয় হয়নি। তার যেন কোন পিতৃপুরুষ নেই, ছিল না। মানুষের পরিচয় যেভাবে হয়, তার বোধহয় সেভাবে হবে না।

রফিকুল আচমকা জিজ্ঞেস করে, আলি সায়েব আপনার বিবি !

হঠাৎ যেন সতর্ক হল শোভান আলি, নাজমার কথা বলতেছ, তুমি তার কেউ হও নাকি ?

রফিকুল বুঝল নাজমা মানে দ্বিতীয় পক্ষই ত শোভান আলির বিবি, হালিমা তার কেউ নয়। শুধু রফিকুল তার ছেলে।

রফিকুল এবার সাহস সঞ্চয় করে বলল, আলি সায়েব আমি হালিমা বিবির কথা বলচি. আপনি জানেন···

শোভান আলির মুখখানি বিকৃত হয়ে গেল, ফ্যাকাশে হয়ে গেল, থরথর করে কাঁপতে লাগল বুড়ো, হেঁকে চিৎকার করল, সে তো মরেচে, মতলব কী তুমার ?

রফিকুলের বুক এবার নদীর ঢেউ-এর মত উথাল পাথাল, রফিকুল আরো এগিয়ে এসে বলল, আপনার বেটা, যারে নি গিয়েছিল সে, তার খবর রাখেন, আপনার রক্তের জন।

প্রায় লাফ দিয়ে ওঠে যেন শোভান আলি, তুমি বলার কে, তুমি কে, ওই হারামখোর জব্বার যতই বলুক যতই এ নিয়ে গোল পাকাক, একবার বিবি নেছে আমার, এবার সম্পত্তি নিতি পারবে না, কোন ছুতোয় পারবে না, যারে নি গিই ছিল সে আমার না।

রফিকুল দু হাতে বাঁশের খুঁটি ধরল, হাটান ছেলে যেটা নিয়ে গিয়েছিল জব্বার বণ্ডি।

—চুপ করো। গর্জন করে ওঠে শোভান আলি, আমি খবর পেইছি ওরা ধান্দা করাবে ওই হাটান ছেলে দিয়ে, আমি বলতিচি হালিমার ও বাচ্চা

আমার না, ওভা জব্বারের, তাই হালিমারে তালাক দিলাম, আটকাইনি তখন, এখন কোন উপায়েই সম্পত্তি পাবে না, আমি কোর্টে যাব।

রফিকুল ভেঙে পড়ে। মড়মড়িয়ে গাছের মত ভেঙে মাটিতে বসে পড়ে। দু হাতে মুখ ঢাকে, ঢেকে আবার বলে, লোকে জানে, সব্বজনে জানে সে আপনার ছেলে।

—বলে ওই সম্পত্তির জন্য, তুমি কি তার হয়ে দালালি করতে এয়েচ, ওটা আসলে জব্বারের হাটান ছেলে নয়, আমি বলি ওটা হল গিয়ে জব্বারের বাচ্চা। সে আসুক, তারে আমি দেখাব, সব কেলেংকারি ফাঁস হয়ে যাবে।

রফিকুল ছিটকে বেরিয়ে আসে। ইট পোড়ানর অঙ্গার যেন তার গায়ে এসে ছিটকোচ্ছে। রফিকুলের গায়ে ছ্যাঁকা লাগে। সে ফেরে শূন্য হয়ে। ভাবে জব্বার বস্তির ছেলে হবে তো দু' বছর তারে রেখেছিল কেন শোভান আলি। সব মিথ্যে। শোভান আলির কথা মিথ্যে। কিন্তু এ নিয়ে লড়তে গেলে মা হালিমার বুকে কবরের মাটি আরো ভার হবে। সে তো মা হালিমার ছেলে বটে, তার পেটের ছেলে। এইতো হল সত্য। মেয়েমানুষ তাই হালিমা বিবি মরার পরেও কলঙ্ক মাখে, পোড়া ইটের ছাই মাথায়। তাকে শোভান আলি, কিংবা জব্বার বৈদ্য। জব্বার বৈদ্য এতদূর তাকে পাঠিয়ে হালিমা বিবির মান রাখল না।

সন্ধেয় ফিরে রাবেয়াকে এ কথা একটু একটু করে বলতে সে তার বাচ্চা কোলে নিয়ে উঠনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ কেঁদে ওঠে। কাঁদিস কেন, জমি না পাই পাব, সম্পত্তি না পাই পাব। রফিকুলের বউ তবু কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে বেরোয়। সিরাজুলের ভিটেয় যায়, কেঁদে ডাকে আমেনাকে। তার কান্নায় আমেনা বেরিয়ে আসে, বেরিয়ে আসে আক্রামুলের বউ হাসিনা। তারা শোনে হালিমা বিবির অপমানের কাহিনী। শোন আমেনা শোন হাসিনা শোভান আলি কী বলেছে। হালিমা বিবির মান রাখেনি। মেয়ে মানুষের মান নেই।

রফিকুল দূরে নিজের ভিটেয় বসে একবার যেন শোনে কান্নার রোল উঠল। উঠতে উঠতে থেমে গেল। সে অপেক্ষা করছিল সব মেয়ে মানুষ কখন কাঁদতে আরম্ভ করে। বাতাস নেই। বাতাসে শব্দ নেই। রফিকুল কান পেতে থাকে। কাঁদতে গিয়েও থেমে গেল আমেনা হাসিনা, কেননা তাদের ঘরে বোধহয় স্বামী আছে। স্বামীরা না বললে তারা এখন এই জন্য মা হালিমার নামে কাঁদতেও পারবে না। রফিকুল নিজে জব্বার বদ্যি আর শোভান আলির অপরাধ কাঁধে নিয়ে দুমড়ে যায় ক্রমশ। দুমড়ে যেতে যেতে আবার শোনে কান্নার রোল উঠতে উঠতে থেমে যাচ্ছে। রফিকুল কান পেতে আছে কান্নার জন্য। কেউ যদি কাঁদে তবুও হালিমা বিবির বুক থির হয়।

ক্লাদা

সাধন চট্টোপাধ্যায়

—এই শহরে কাদা নেই।

—তা'লে ?

—ক্লাদা আছে। পাঁক, ডাষ্টবিন, পচাগলা আবর্জনা থেকে জন্ম।···দোহাই, ছোঁবেন না কেউ। কলেরার বীজে ভরা। আসুন, শপথ নেই, শহর ভেসে গেলেও আমরা যেন এর মাছে হাত না দেই···

ভাষণ শেষ না হতেই, উনি কোথায় যে হারিয়ে গেলেন, ফের মুখোমুখি হলাম সত্তর বছর পর। আজ। নাকি হারিয়ে যাননি তিনি, আমিই শহর ছেড়ে এসেছিলাম পুরো না শুনেই ? সাড়ে তিন কুড়ি বছর পর, কূট মিমাংসা বড্ড জটিল ; আবছা মনে পড়ছে ঘোরের মধ্যে উঠে এসেছিলাম। সেদিন বৃষ্টি হয়েছিল, গোটা পরিবার নিয়ে বাবা জংশন স্টেশনে হাজির হলেন বিকেলে। আমাদের ডাকগাড়ি রাতের প্রথম প্রহরে।

আজ, সত্তর বছর পর, সেন্টপার্সেন্ট পাল্টে যাওয়া শহরে ওনার মুখোমুখি··· বিস্ময়কর।···প্রসঙ্গ মুলতুবি থাক এখন।

আমরা যে বাসায় বসবাস করতাম—পরিত্যক্ত দুর্গের মত ছিল দেখতে। অতীতের মজবুত গাঁথুনির বাহুল্যে বড় বড় ঘর—ঘুলঘুলির মত জানালা। স্পষ্ট আলো নেই কোনো পরিবারের সঞ্চয়ে ; অদ্ভুত চিকন ছায়াজড়ানো, কিন্তু আঁধার ঘরও বলা যাবে না। পুরো দালানটায় প্রায় ডজনখানেক পরিবারের বাস। বাঙালি নয় সব—ভিন্ন ভাষাভাষী। অষ্টম সিডিউলে তা স্বীকৃত কিনা কে জানে।

তখন দালানকোঠা ইদানিংকালের শহরের মত উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য ছিল না। ধূসর, ঘিঞ্জি এবং বিনীত শুদ্ধতায় পায়রার বক্‌বকম জড়িয়ে থাকত। পথঘাট অনেক সরু, ইতিহাসের গন্ধমণ্ডিত। নেহাৎই বালক বয়স। ঐ সব গলিপথে ঘুরে বেড়ানো—চিলডাকা দুপুর কিংবা মেঘলা বিকেলে—দারুন রোমাঞ্চকর। আমরা থাকতাম শহরের যে অংশে মামুলি মানুষ জড়িয়ে বাস করে। উনি থাকতেন আমাদের দুর্গ বাড়িটার গজ ত্রিশ দূরে। মনে পড়ে, দুপুর বর্ষণের পর এক বিকেলে ভেজা গাছের মাথায় অনুজ্জ্বল রোদ ওঠায়, পশ্চিমের আকাশ মেদুর হয়ে উঠেছিল এবং আমরা, জনা চার সহচর, ও পথে হাঁটতে গিয়ে দেখেছিলাম মোটা বেড়ালের তাড়া খাওয়া একটি বেসতর্ক মোরগ ওনার খাপড়ার চালে উঠে পড়েছে। এই খাপড়া দিয়েই বিহার, যুক্তপ্রদেশে বিস্তীর্ণ বস্তি গঠিত। গলালম্বা করে ঘন ঘন ডাকছে মোরগটা। চোখ ও ঝুঁটিতে বিপদের তৎপরতা। পালক ও মাথার রক্তলাল ফুল আলোয় পরিশুদ্ধ লাগছিল বেশ। আমরা ওর পাখিত্ব আবিষ্কার করে কৌতুহলী হয়েছিলাম, নইলে মাটিতে হাঁটা প্রাণী মনে হয় হাঁস মুরগিকে। উনি বাড়ি ছিলেন না তখন। কচিৎ ওনাকে ঠিকানায় পাওয়া যেত। তবে দরজার পাশেই লটকানো থাকত মস্ত একটা ডাকবাক্স। সাক্ষাৎ না পেলে ঐ বাক্সে চিরকুট রেখে যাওয়ার নিয়ম; কে, কখন, কি প্রয়োজনে এসেছিল। কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তির মত উনি চিরকুট পড়ে নিজে দেখা করে আসতেন। বেনিয়ম ঘটত না। উনি কি করেন, কেন এ ডাকবাক্স, চিরকুট কিংবা ওনাকে পেয়ে রাস্তায় ভীড় জমিয়ে ঘিরে থাকে কেন—বুঝতাম না। চোখজোড়া ছিল ছায়াচ্ছন্ন এবং প্রশান্ত। মোহনশক্তি ছিল—মানতেই হবে! খেলাচ্ছলে আমরা একবার চিরকুট ফেলে এসেছিলাম। পাঠশালায় আমাদের মধ্যে টিফিনে তর্ক হয়েছিল। কেউ বলেছিল, ক্ষুদে বৈজ্ঞানিকের মতো, বজ্রপাতের সঙ্গে লোহার টুকরো বড় মাটিতে পুঁতে যায়। কারও মত—ওটা আগুনের গোলা। কেউ কেউ বলেছিল মেঘে মেঘে ধাক্কা লেগে আগুন জ্বলে। বিতর্কের মিমাংসা না ঘটায়, আমরা ডাকবাক্সে চিরকুট ফেলে এসেছিলাম। উনি উপস্থিত হলেন পাঠশালায়। হেসে যেভাবে বজ্রের ব্যাখ্যা করলেন, কিছুই বুঝিনি। তবে টের পেয়েছিলাম আমাদের ভাবনাগুলো সঠিক ছিল না।

উনি দীর্ঘ দেহী; আশপাশে এত উঁচু মানুষ চোখে পড়ত না। নজর আটকে থাকা, রংচংয়ে আলখাল্লার মত পোষাক। খুব ফিটফাট ছিমছাম

ব্যক্তি। প্রায়ই দেখতাম উঠোনের দড়িতে সাবানকাচা অনেকগুলো রঙিন পোশাক ঝুলছে। খাপড়ার চালার পেছনে অনতিদীর্ঘ একটি বাগান। বাতাবি, কামরাঙা, কুল, সবেদার গাছ ছিল। উনি দরিয়া দিলের মানুষ। দেয়াল টপকে চুরি করতে হত না। অবরে-সবরে বাড়ির দরজায় মুখোমুখি হলেই স্নেহের আকর্ষণে ডেকে ফল বিতরণ করতেন। যেন চট করে বিলিয়ে না দিলেই মালিকানার মায়া জন্মে যাবে ওনার। ভোগের রিপু জেগে উঠবে, —এই ভয়।

আমরা, জনা তিনচার, সুযোগ পেলেই শহরের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াতাম। শুধু মামুলি মানুষদের অঞ্চলেই নয়, সম্ভ্রান্তদের ছড়ানো ছিটনো প্রাণকেন্দ্রেও। গীর্জা, বাসস্ট্যাণ্ড, বিচিত্র দোকানপাঠ, ইটরং-এর বাংলো, সার সার দুই তিন তলা বাড়ি···আমাদের নেশা ছিল পথে পথে বিভিন্ন ব্র্যাণ্ডের সিগরেট প্যাকেট কুড়োনো। তবে শহরে দুটি আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য ছিল আমাদের। স্ট্যাচু এবং পাখি।

শ্বেতপাথরের অনেকগুলো মর্মর মূর্তি ছিল। মহাপুরুষদের পরিচয় বাল্য বয়সে জানা ছিল না। কিন্তু বুক আর মাথাওয়ালা প্রতিকৃতিগুলো ছিল আমাদের অত্যন্ত প্রিয়। দীর্ঘ সময় তাকিয়ে থাকলে মনে হত মিটিমিটি হাসছে। তবে ওগুলো কোনোকালে কেউ সাফা-সুফো করত না। রাজ্যের পাখির বিষ্ঠা ও ধুলোয় মলিন। কারও মাথায় চাপানো গান্ধি টুপি, কারও পাকানো স্তূপাকৃত রাজস্থানী পাগড়ি, কারও শোলার হ্যাট। কেউ বা বেআব্রু মর্মর টাকে সরু পাথরের ফ্রেমের চশমা পরে আছে। কোনো কোনো স্ট্যাচুকে দেখলেই মনে হত ক্রুদ্ধ সাহেব। সবার গায়ে পরিচয় খোদাই, ছিল কিন্তু আবর্জনার আস্তরণে বাল্য বয়সে কোনোদিন তা উদ্ধার হয়নি। আমরা সুযোগ পেলেই গার্জিয়ানদের ফাঁকি দিয়ে পাদদেশে হাঁ করে মুগ্ধিয়ে যেতাম। আমাদের পাড়া থেকে শহরের এই অংশ প্রায় মাইল দুয়েক দূরে। আপশোষ ছিল আমাদের কোনো স্ট্যাচু নেই কাছাকাছি।

আর পাখিগুলো থাকত সার সার দোতলার বারান্দায় টাঙ্গানো। সুদৃশ্য খাঁচায় ভরা। আমরা হাততালি দিতাম, হুশহাস আওয়াজে চাইতে বাধ্য করাতাম। পাখিগুলো ঝিমত প্রায়ই; বিষণ্ণ মুখে ছোলায় ঠোকর দিত মাঝে মাঝে। আমাদের অত্যাচারে ত্যক্ত হয়ে খাঁচায় চঞ্চু ঠুকত, যেন বলত 'পাকা ছেলে'! 'পাকা ছেলে'। বিচিত্র বর্ণের কথা বলিয়ে পাখি। আমাদের

এইসব বিস্ময়কর দ্রষ্টব্যের কথা জানতে পেরে, উনি একদিন গম্ভীর মুখে বলেছিলেন – শহরের সব স্ট্যাচুই স্ট্যাচু নয়।

—মানে? আমরা অভিভূত হয়েছিলাম।

—দু চারটে নকলও আছে। দিনে ঐভাবে থাকে; অন্ধকারে উড়ে যায়। আর পাখিদের ব্যাপারগুলো শুনে বলেছিলেন—খাঁচার পাখি কথা বলে না।

—আমাদের যে ডাকে? মৃদু প্রতিবাদ করতে উনি জ্ঞানীর মত হাসলেন। বুঝিয়ে বললেন—ছেলেমানুষ তো, ওটা তোমাদের মনে হয়।···আসলে, কথা বলে একমাত্র স্বাধীন পাখি, আকাশে সাঁতরায় যারা।

কথাগুলো যাচাই করা দুঃসাধ্য। আমরা বালক, গভীর রাতে শহরে ঘুরবার সুযোগ ছিল না। হয়তো উনি ঠিকই বলেছেন, ঘুরে ঘুরে সবকিছু দেখা ওনার কাজ। তবু কৌতূহল ডানা মেলত। রাতে বিছানায় ছমছম করত বুক। কল্পলোকে দেখতাম, থমথমে স্তব্ধ রাতে, হাওয়ায়-হাওয়ায়, দু একটি নকল স্ট্যাচু চুপিচুপি খোলস ছাড়ছে। পাথরের শূন্য মুড়োটা জেগে আছে শুধু। কালো পোষাকে শহরময় ঘুরছে লুটপাটের জন্য। দাপাদাপির পর ভোরের আলো না ফুটতেই উষালগ্নে শ্রদ্ধা ও সম্মানের কঠিন আদলে ফের স্ট্যাচু হয়ে উঠবে। তবে, পাখির কথা বলার বা না বলার যুক্তি আমি স্বীকার করিনি। স্পষ্ট কানে শুনেছি যা, কি করে মিথ্যে হয়? আকাশ পারের পাখি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারে না? তালে, খাঁচা থেকে 'রাধাকৃষ্ণ' 'জয় সিয়ারাম' 'কে-এলি!' 'পাকাছেলে!' মন্তব্যগুলো কেমন করে আসে! আমাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কথা শুনতে পেয়ে, উনি হাসতে হাসতে বুঝিয়েছিলেম—ওগুলো মিথ্যে কথার মরীচিকা! ভাষা একমাত্র তারাই বলতে জানে, যারা খাঁচার বাইরে।

আমাদের মহল্লার মামুলি মানুষগুলো বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য। দারুন প্রাণবন্তও বটে। কেবল কপালে তাদের অর্থ ও ক্ষমতার সুযোগ জুটতনা। হৈহুল্লোড়, চেঁচামেচি, জন্মমৃত্যু মৈথুন এবং উৎসবাদি—বাকি সবই ছিল। স্যাঁকরা, ঘোড়ারগাড়ি-চালক, দোকানদার, খেলোয়াড়, ছাতিসারাইওয়ালা, ঠিকেদার শ্রমিক, কানখোচাই ও আতরওয়ালা—বিচিত্র 'জীবিকার পরিবার।' প্রত্যিটি দরজায় ওনার অবাধ প্রবেশাধিকার। উনি যেন বিশ্বাসের ও ভরসার স্থির পাত্র। উনিইতো একবার রাতভোর বৃষ্টিতে শহরের এ অঞ্চল ডুবে গেলে, আন্ত্রিক-প্রতিরোধী হ্যালোজেন ট্যাবলেটের প্যাকেট হাতে রাত জেগেছিলেন।

আমার, নেহাৎ বালকরা, ওনার ধারেকাছে বিশেষ ঘুরঘুর করতাম না। তবু উনি মাঝে মাঝে ফুটবলে উৎসাহ দিতে মাঠের পাশ দিয়ে তালি বাজিয়ে যেতেন। আবার দু-তিনমাস একনাগাড় তাঁর সাক্ষাৎ মিলতনা। এই ছিলেন 'উনি'; সারারাতের বৃষ্টিতে ডুবন্ত শহরে যখন বিপর্যস্ত ঘোলাজলে কিছু মানুষ মাছধরার সুযোগ খুঁজছিল, উনি বলেছিলেন,—আমরা কেউ মাছে হাত দেবনা···আসুন শপথ নিয়ে···কথাগুলো সম্পূর্ণ হয়নি, শহর ছেড়ে ডাকগাড়ি ধরতে আমাকে নিয়ে আসা হল।

স্টেশনে পা দিয়ে বুঝেছিলাম কোনোদিন ফেরা হবে না এখানে। গাড়ি ছাড়তেই ইঞ্জিনের শব্দে দু চোখ ফুটে জল উথলেছিল। দুর্গের মত বাসা, বাল্যসাথীরা, পাঠশালা, ওনার পোষাক, হাসি, রহস্যময় কথা, রাতের বিলীন কিছু স্ট্যাচু, কথা কইয়ে পাখিগুলো, বাতাবিলেবু···তাছাড়া আমাদের বয়স-সন্ধিক্ষণে প্রথম বীর্যের উদ্গম, অপরাধের আলোছায়া এবং কলম্বাসের অজানা সমুদ্রতীরের মত রহস্যময় নারীদেহতটের চকিত কাল্পনিক বোধের স্মৃতি—কত চপল, ঘন, ভূমিকম্পবাহী অপরাধ-ভাবনার সুখ—সব পড়ে রইল এ শহরে। কোনোদিন ফিরে আসবে না। দিশেহারা শুদ্ধ চিন্তা গুমরে ওঠার মধ্যে হঠাৎ জিদ ধরলাম, ফিরে আসবই। যৌবনের স্বাধীনতায় এখানে ফিরে আসব—এই সব হাজার চিন্তা উদ্যত হয়েছিল চোখের জল গোপন রাখার অবসরে, গাড়ির কামরাতেই।

কিন্তু সময় আপতিক। যৌবনেও এশহরে ফিরে আসতে পারিনি। বাধা ছিল না যদিও। আমাদের পরিবারের বন্ধন তখন শিথিল। মূলধারা শাখায় বিচ্ছিন্ন। আমার পিতাও তখন জবরদস্ত স্বভাবের ব্যক্তি আর নন। তারই অবিমৃষ্যকারিতায়, ঔদার্যে, আমাদের আর্থিক পরিণতি ভঙ্গুর—মা, আমি ভাই বোনেরা সিদ্ধান্তে অটল হয়ে গেছি। তাঁকে সরাসরি অভিযুক্ত করার মধ্য দিয়েই আমার প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা। ফলে, এ শহরে পা দেয়ার বাধা ছিল না। হয়নি, সময়ের 'চান্স ফ্যাক্টরের' জন্য। যৌবনের প্রথম সঞ্চার নিয়ে গোপনে ব্যস্ত হয়েছিলাম আমার 'আমি' তে। যৌবনবেলা কী রহস্যের! প্রতিটি প্রত্যঙ্গে কেমন ফুলধরে, বিশেষ কেন্দ্রবিন্দু অগ্নিগর্ভ হয়, কি বলব, ব্যাপ্তিময়তায় 'বর্তমান' এমন দুধার হয়ে ওঠে, অতীতকে সরে বসতেই হয়। সুদূর জেলা মফস্বলে—আমাদের নতুন আশ্রয় গড়ে উঠেছিল যেখানে—এইসব দেহজ নতুন অনুভূতির দৃঢ় শিকড় তাৎক্ষণিকতার মাটি এমন

আষ্টেপৃষ্টে বেঁধেছিল, নিজেকে খাপখাইয়ে নেয়ার নেশায় মেতেছিলাম। তবু অতীত নাছোড়বান্দা, সহজে হাল ছাড়েনা, স্মৃতির প্রবাল জমিয়ে তোলে। কখনো কোনো মানুষের মুখে এ শহরের প্রসঙ্গ সংবাদপত্র কিংবা অন্য উপায়ে কোনো কাহিনী শুনলেই বুকের কাতনা নড়ে উঠত। সেই সব স্ট্যাচু, কথাবলিয়ে পাখি, উনি, বাতাবিলেবু—আরও কত তুচ্ছ, টুকরো স্মৃতি কৌতুহলের মন্থনে গুরুত্ব পেয়ে যেত। অথচ আমার তখন কাঁচা গোফ, পায়ে স্পষ্ট লোমকূপ, সবল গ্রীবা ও পেশি। এইসব শিশুবোধের কৌতূহলে মনে হত ভাবনার কিছু কিছু গভীরে সময়ের জংগমতা নেই।

সত্তর বছর পর, আজ শহরে পা দেয়ার দীর্ঘকাল আগে, শুনতে পাই. শহরে ক্রমাগত চারবছর যুদ্ধ চলেছিল। অবিশ্বাস, গুপ্ত হত্যা, ধ্বংস, ক্ষয়-ক্ষতি কম হয়নি। আমাদের দুর্গের মত বাসাটির অংশ বিশেষ ভগ্নস্তূপ করা হয়েছিল। বহু মামুলি মানুষ স্বজন বন্ধু খুইয়ে প্রাণ নিয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল। বহু যুবক-যুবতীকে হত্যা করে টাঙ্গানো হয়েছিল প্রকাশ্যে।

সেইসব দুর্দশার দিনে স্ট্যাচু কিংবা পাখির কথা মনে আসেনি। কৌতূহলের প্রলেপ খসে স্মৃতি তখন অকিঞ্চিৎকর। তাছাড়া, আমি তখন পরিণত বিশ্বাসে পৌছেছিলাম—স্ট্যাচু খোলস ছাড়ে না; খাঁচার পাখি নকলকথা বলে মাত্র। সেই দীর্ঘ, রহস্যময় মানুষটির—ক্লাদাময় শহরে ও সময়ে মাছ স্পর্শ করতে বারণ করতেন যিনি—নিরাপত্তা ও বেঁচে থাকার কথা ভেবেছি। শহরের হিংস্রতা তাঁকে গ্রাস করেনিতো।

বলেনা,জীবনের প্রতি ঘাটে প্রাণের দাবি জায়গা করে প্রথমেই; যৌবনের পরিপূর্ণ উদ্দাম শেষে আমিও সংসারে তাই নারীকে আলিঙ্গন করলাম। কর্তব্যে, প্রেরণায়, সম্পর্কে, সঙ্গমে—তার হৃদয়, কটাক্ষ, হাসি, লজ্জাহীনতা এবং বেলাভূমির মত, তার নিরাবরণ দেহরেখা আমার পেশিতে লীন হতে থাকল ঘামে, রক্তে, ঘন নেশায়। খেলা। এবং ক্লান্তিশেষে টের পেলাম বংশধারা এবার আমি টেনে নিয়ে চলেছি। ইতিমধ্যে বাবা গত হয়েছেন। সময়কে ঘিরে আমি ব্যস্ত হই প্রতিদিনের 'বর্তমান' নিয়ে। আর অতীত তখন প্রশমিত, স্মৃতি শুধু শৌখিন রোমন্থনভোগ্য। দুর্নিবার নয়।

তবু শহরের সামান্য খবর আচমকা স্রোত থেকে পেছনে মুখ ফিরিয়ে আনে। সেই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পর, শুনেছিলাম, নাগাড় দুবছর শহরে অগ্নিকাণ্ড ঘটান হয়েছিল! সাহায্যের কোনো দমকল ঢুকতে দেয়া হয়নি।

ইঁট-কাঠ, কাঁচাপাতা, চুল-খুলি-চামড়া শব্দ করে পুড়েছে। বড় বড় সাইনবোর্ডে প্রশাসনিক নির্দেশ জারি হয়েছিল 'লিচুর মত চোখগুলো ছুলে খেয়ে ফেল' 'রক্তের বদলে রক্ত, নখের বদলে নখ, লিভারের বদলা হিসেবে অণ্ডকোষ খুবলে আনতে হবে' 'ঘিলুর রোষ্ট সহযোগে মদ টানো' ইত্যাদি।

ওনাকে নিধন করা হয়েছে নিশ্চয়ই ; নিরবচ্ছিন্ন আগুনের মধ্যে কোনো উঁচু মানুষ টিঁকে যেতে পারে না। শুনেছিলাম ওনার মস্ত ডাকবাক্সটি দাউদাউ শিখায় ছাই হয়ে গেছল এবং সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক আনুকূল্যে আকাশ-ভাঙ্গা ছ'মাস নাগাড় বৃষ্টিতে উনি টিঁকে গেছলেন। আমাদের দুর্গের মত বাসাটা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত ও নিশ্চিহ্ন। ঢেউখেলানো খাপড়ার চালা থেকে কত মানুষ যে ছিটকে গেছে, গুম হয়ে গেছে, হিসেব-নিকেশ ছিল না! শুনেছি পাঠশালাটি রক্ষা পেয়েছিল। পাখিগুলো টিঁকে গেছে এবং স্ট্যাচুরা। কেবল দু একটি নকল পাথর মুখ থুবড়ে দগ্ধ কঙ্কালের মত হারিয়ে গেছে, নতুন গড়ে তোলা যায়নি আর। শহরে তেমন শিল্পী ছিল না। নামী ভাস্কররা পুড়ে মরেছে—বাদবাকিরা পাখিদের জন্য খাঁচা তৈরীতে ব্যস্ত।

পরের খবর, বৃষ্টিপাতের কাদা শুকোলে, শহরে সমবেত প্রার্থনার আয়োজন হয়েছিল। জাতি, ধর্ম, দল ও বিশ্বাস নির্বিশেষে। ভেবেছিলাম সেই ক্রান্তিকালে, গণঅনুষ্ঠানে পুরোনো শহরবাসীটির উপস্থিতি একান্ত কর্তব্য।

তবু হয়ে উঠল না। যখন জানলাম দুর্গের মত বাসাটি নেই, বিনীত শুদ্ধতার পায়রাগুলো পুড়ে গেছে, পাড়ার পেছনে গোধূলিতে ঘোড়াগুলো ক্লান্ত ছবির মত দাঁড়িয়ে ঘাস খায় না, ডাকবাক্স নেই, লালনীল পোষাক ঝোলেনা ওনার দড়িতে, লেবুগাছ নেই—বর্তমান শহরবাসীরা এগুলো নিছক রোমন্থন-বিলাস মনে করে—ওমুখো হতে মন চাইল না। স্মৃতি মধুর, বাস্তবের মুখোমুখি বড্ড করুণ হয়ে যায় ; তাই স্মৃতি বেঁচে থাক স্মৃতি হিসেবে। শুনলাম, সমস্ত জল্পনা-কল্পনা চমকে দিয়ে উনি জন-অনুষ্ঠানের প্রথম সারিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কবে, কখন, কোন ডাকগাড়ি আমায় শহর ছাড়তে বাধ্য করেছিল? আজ কল্পনা অতখানি ব্যাক্‌গিয়ার করতে পারে না। সত্তর বছর পর আমি শহরে পা দিলাম। বার্ধক্যের ভার আনত আমার দেহে। সংসারে নতুন

নতুন সম্পর্ক নানাভাবে শিকড়-বাকর, ঝুড়ি নামিয়ে 'বর্তমানকে' আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে কেবল ডালপালা ছড়াতে চাইছে বাকি ভবিষ্যৎটুকুর জন্য। সেখানে শহর, স্মৃতি, স্ট্যাচু, কথাকইয়ে পাখি, আঁশটে মাছ এবং দীর্ঘদেহি 'উনি' কোথায়? আজ কেউ আমাকে সনাক্ত করতে পারবে না। সত্তর বছর—সাতটি দশক—প্রায় ছ'টি যুগ—কম কথা নয়! শুনেছি সময়ের ধারণা আপেক্ষিক। আমার দশ বছর অন্যের একশ হয়ে যেতে পারে। আমার সত্তর এই শহরে সতেরো। সময় কেন দীর্ঘ হয়ে গেল আমার কাছে? আসলে কত বছর পর এলাম? আমাদের পাড়ার আতরওয়ালা চিনতে পারল কি করে? প্রথম সে আমাকে আজ জড়িয়ে ধরল। আর শহর? সম্পূর্ণ ওলটপালট। এমনকি পুরোনো ধূলি-কণাটি পর্যন্ত।

সেই মেদুর বিকেলে কোথায় যেন বেড়ালের তাড়া খাওয়া তৎপর মোরগটাকে রক্তময় ঝুঁটি নাড়াতে দেখেছিলাম? সুপার মার্কেটের উজ্জ্বল নিয়নে সব পুরোনো স্থানাঙ্কগুলো চাপা পড়ে গেছে। আমি আজও মাছে হাত দেইনি। সেই অর্ধভাষণ···!

দুর্গের মত বাসাটা—আজাদ স্কোয়ার। কালো চকচকে পিচে সাদা জেবরার দাগ, ট্রাফিক আইল্যাণ্ড। বিজ্ঞাপন—কোনো বিজনেস্ গ্রুপের সৌজন্যে। ছোট্ট নিখুঁত বাগান—সেই গ্রুপই যত্ন আত্তি করে। প্রিমিয়ার, মারুতি, কণ্টেসা—নাইলন টায়ার চড়িয়ে শব্দহীন চলে যায়। মানুষ বিজ বিজ করে। বিজ্ঞাপনের উগ্র অস্তিত্ব—বিশেষত কাঁচের শো-রুম গুলোতে। দুপুরের পিচ্‌গলা রোদের শব্দজঞ্জালের আড়ালে ছমছমে ষড়যন্ত্র কানে অনুভূত হয়, যেন টাইম-বম কিংবা অজ্ঞাত হণ্ডাচারি গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে স্পীডে বেরিয়ে যাবে এক্ষুণি।

আমাদের পরিচিত পুরোনো অঞ্চলটায়, ওনার খাপড়ার চালার পাশ দিয়ে ইউক্যালিপটাস এবং লাল সুরকির পথ বেয়ে, যেখানে মালিকরা সন্ধ্যায় ঘোড়াগুলো ছেড়ে দিত, গ্রিলঘেরা অনেকগুলো সরকারী শহীদবেদী। যুদ্ধ, আগুন এবং বিভিন্ন ধরনের খুনোখুনিতে যাঁরা স্মৃতি হয়ে উঠেছেন।

উনি এই নতুন শহরেও আছেন। সম্মানীয়, একনম্বর নাগরিক। বলা যায় এ শহর, জড়িয়ে থাকা সময়—ওনারই।

—সত্তর বছর পরেও?

আমার প্রশ্নে আতরওয়ালাটি বিস্ময়ের ইঙ্গিত করলেন। বুঝলাম, সময় আপেক্ষিক—সত্তর কারো কাছে সতের হতে পারে।

—চুল, দাঁত মজবুত আছে সব?

—হাঁ। সবই বাঁধানো, কেনা। আপনি কি ওনাকে দেখেছেন কোন দিন?

আতরওয়ালার তদন্তে স্বীকার করলাম—কক্ষনো না।

আতরওয়ালাটি তখন গর্বভরে বললেন, উনি এ শহরে এতই সম্মানিত, নাগরিকমঞ্চের উদ্যোগে জীবিত স্ট্যাচু বানানো হয়েছে, যা যত্নআত্তি করে একটি বিজ্ঞাপন সংস্থা। ঘড়ি ধরে সাফাসুফো করতে হয় কারণ ঐসব মৃতব্যক্তির স্ট্যাচুর মত বিষ্ঠা বা ময়লা পড়লে চলবে না। ওনার পক্ষে অসম্মানের।

স্ট্যাচুর প্রসঙ্গে দীর্ঘ কালের ব্যবধানেও, মনে পড়ল ছেলেবেলায় রাতে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ ছিলনা আমার। কি ভীষণ ইচ্ছে ছিল! যাচাই করতে পারিনি দুএকটি স্ট্যাচুর গোপনে খোলস ছাড়ার ঘটনা। আজ তা পূরণ করা যেতে পারে। সন্ধ্যের পর ঝড় বাদল নামল। কৈশোরে, আমার ডাকগাড়ি ধরার বিকেলেও বৃষ্টি ছিল। এ ধরনের পুনরাবৃত্তি কি অশুভ লক্ষণ?

মধ্যরাতে শহরে কোমর জল। ভূতগ্রস্ত পথঘাট। ঘোলা, পঙ্কময় স্রোত ঠেলে স্মৃতির উন্মাদনায় চালিত আমি। জানি, যে কোন মুহূর্তে প্রশাসন আমায় গ্রেপ্তার করতে পারে। উৎকোচের যথেষ্ট অর্থ আমার পকেটে; তাই পরোয়া করলাম না। হঠাৎ একটা স্ট্যাচুর নীচে অবাক হয়ে গেলাম। আস্তে নড়েচড়ে খোলস ফাটছে। ঝকঝকে মুড়োটা পড়ে আছে সাক্ষ্য হয়ে। পরিচিত আলখাল্লা ভিজে, অন্ধকার দুর্যোগে জাল ফেলছেন, মাছ স্পর্শ করছেন। অভ্যস্ত ভঙ্গিতে।

নিজেকে অবিশ্বাস করলাম। চোখ কান ঘ্রাণশক্তিকে দোষারোপ দিলাম। তবু মিথ্যে মিথ্যে হয়ে উঠল না। ঘোলাজল···মাছ···ধরছেন···!···!

উনি আঁশটে মাছ তুলে আনছেন; তাহলে নিশ্চয়ই শহরে ক্লাদা নেই আজকাল।

রক্ত

জ্যোৎস্নাময় ঘোষ

ভবভূতি বসে বসেই ঢুলছিলেন। তাঁর কদম ছাঁট মাথা অবিকল এক কদম ফুলের মতই দেখায়। তা সামনে ঢুলে ঢুলে পড়ছিল; আর ডাইনে-বাঁয়ে দোল খাচ্ছিল দীর্ঘ প্রবল সেই শিখা যার দাপটে দশ গাঁয়ে তার অখণ্ড প্রতি-পত্তি। পালপার্বণ দোল-দুর্গোৎসব কিংবা শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্মে এখনও, এই বিশ্বাসহীন শ্রদ্ধাহীন নিরালম্ব কালেও, ভবভূতি ভট্টাচার্য ভিন্ন চলে না। আদ্যোপান্ত এক পুরাকালীন ব্রাহ্মণ তিনি। তেমনি কঠোর, সংযমী, যজ্ঞ-কাষ্ঠের মত শীর্ণ, কিন্তু হোম-শিখায় মত দেদীপ্যমান। যেমন ভক্তি, তেমনি সমীহ'ও যজমানের। বিরহী গাঁয়ের এই নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ আজীবন এ-বিশ্বাস আঁকড়ে রইলেন যে যজমানকে পীড়ন করতে নেই। এবং, এ দিয়ে সংসারে যা অর্জন করে আনলেন, তা চাল কিংবা চুলো কোন সমস্যারই সুরাহায় এলো না।

হঠাৎ পাশের লোকটির ধাক্কা খেয়ে ঘুম-ঘুম জড়তাটুকু কেটে গেল তাঁর। আরক্ত অস্বস্তি নিয়ে তার দিকে তাকালেন। লম্বাটে মুখের খয়াখয়া লোকটি চিকন করে হেসে বলল, রক্তের জন্য এয়েচেন? তা একানে বস্-থাকলে কি তিনি হেঁটে হেঁটে চলে আসবেন! বেবাক লোক চলে গেল, আর বসে বসে ঢুলচেন!

চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন, বেঞ্চগুলো ফাঁকা, শুধু তিনিই বসে রয়েছেন। তাড়াহুড়ো করে জানালার সামনে এলেন। কাউণ্টারে কেউ নেই। খানিক দূরে জনাকয়েক যুবা পুরুষ প্রবল ক্রোধে গরগর করছে বলে মনে হলো তার। কাউণ্টারের গর্ত দিয়ে সেদিকে দৃষ্টি ফেলে রাখলেন তিনি।

আমি বলছি তেরো কিস্তি—

না, বারো কিস্তি—

চামচাগিরি করবিনে। বলছি তেরো—

মুখ সামলে কথা বলবি।

শালা, কেন্দ্রের দালাল—

এ কী, ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তপাত করবি না কি—

মুখে হোক, মুখে হোক—

নিরিমিষ, বাট মোস্ট এফেক্‌টিভ—কী চাই ?—বলে ছেলেটি কাউন্টারে এসে দাঁড়াল।

রক্ত। কাগজপত্র, কার্ড সেই সকালে জমা দিয়েছি।

নাম ?

সাবিত্রী ভট্টাচার্য। রোগিনীর নাম।

একগুচ্ছ কাগজের ভেতর থেকে কাগজখানা বের করে দু-এক মিনিট কী যেন দেখল, তার পর বলল, ব্লাড নেই !

আঁ্যা !

এ-গ্রুপের ব্লাড নেই। বলতে বলতে কাগজপত্র গর্তের ভেতর দিয়ে ঠেসেঠুসে বাইরে বের করে দিল।

তা হলে—

ভগবান, আল্লা, গড—ডাকুন যাকে খুশি—

রাজীবের নামটাও বলে দে।—ভেতর ডেকে কেউ চেঁচালো।

দাদা, জ্যোতির নামটাও নেবেন। রাজ্য বলে কথা—

তুমুল হাসিতে ফেটে পড়লো আভ্যন্তর বাতাস।

প্রায় ছুটতে ছুটতেই এলেন ভবভূতি। কিন্তু গেটের মুখে এসে থমকে পড়তে হলো। কলেজ স্ট্রীটে তখন এক জটিল যানজট। যত দূর চোখ গেল, তত দূর পর্যন্ত সার সার চক্রযান, অবিকল স্থির চিত্রের মত। দৃশ্যটি তাঁর মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে জেগে রইল অনেকক্ষণ। ডাঃ গান্ধির কণ্ঠ, চারপাশের প্রবল ধ্বনিতরঙ্গ ছাপিয়ে, গমগম করে বাজতে থাকলো।

গুজরাটের সেই বেনিয়াকে কখনও দেখেননি তিনি। দেখেননি মানে, চাক্ষুষ দেখেননি। ছবিতে দেখেছেন। শৈশবে ছড়া কেটেছেন তাকে নিয়ে, সাত আট নয়, গান্ধির জয়। জয় তো বটেই। উনিশ'শ পনেরয় ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ আর উনিশ'শ সাতচল্লিশে স্বাধীনতা—মাত্র বত্রিশ বছরে। 'ইণ্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত'-এ একক গান্ধিই হয়ে রইলেন তিনি। সীমান্ত আর বালুচ গান্ধিকে পাকিস্তানের ভাগে দিয়ে দিলেন। তৎসহ সময়োচিত কিছু উপদেশ : কিসের ভয়, কাকে ভয়—জিন্নাহ্, লিয়াকতকে ?

ফুঃ! তোমাদের তো ব্রহ্মকবচ পরিয়ে দিয়েছি, বাছারা—সত্যাগ্রহ অহিংসার কবচ। লড়ে যাবে। জহরের কথাটা ভাব। বয়স হলো না? আর কত কষ্ট দেব? মতিলালজী নেই, আমিই তো ওর বাপ এখন—বাপু। তা থিতু করে দিয়ে যেতে হবে না? খালি নিজেদের দিকটা দেখলেই তো চলে না, গফ্ফর। সারমাদ কী বল—

প্রথম দিন ডাঃ গাঙ্গির সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানিক অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ডাক্তার ওয়ার্ড পরিদর্শনে বেরিয়েছিলেন তখন। কথাগুলো তখনই মনের গভীর থেকে উঠে এসেছিল। ভবভূতি অবাক হয়েছিলেন। কে, কে পুঁতে রেখে গেছে এ-সব? তার বাবা? বাবা, কিন্তু বাপু নন—

বাবাই বলতেন, নেত্রকোণার খ্যাতিমান পণ্ডিত, একঘর পুঁথি আর পাণ্ডুলিপি ফেলে রেখে চলে আসতে হয়েছে যাঁকে। বলতেন, একালে কেবল বাপ হলে পুত্রের মঙ্গল নেই। বাপু হতে হয়।

ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে ছুটতে ছুটতে ডাঃ গাঙ্গির কাছে এসেছিলেন। সুকান্ত এই হাউস সার্জেন চায়ের গ্লাস থেকে মুখ তুলে হাত বাড়ালেন, কাগজখানার দিকে না তাকিয়েই বললেন, পাওয়া গেল না তো? কিন্তু রক্ত যে চাইই। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে—

কী করব এখন, বলুন—

ভবভূতির ব্যাকুলতা তাকে কতখানি স্পর্শ করল বোঝা গেল না। টেবিলে কলম ঠুকতে ঠুকতে বললেন, বাইরে থেকে কিনতে হবে। পারবেন?

মাথা নেড়েছিলেন ভবভূতি।

সঙ্গে সঙ্গে কলমের ঢাকনা খুলে ছাপানো কাগজখানা সামনে টেনে নিলেন আর একটু, লিখতে লিখতে বললেন, সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত নেই! অথচ —হঠাৎ করে থেমে গেলেন। কাগজখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, অন্তত দু বোতল চাই।

কাগজখানা আর ব্লাড স্যাম্পেল দুখানা নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে এসেছিলেন ভবভূতি। বেরোতেই সেই বিশাল হোর্ডিং-এ চোখ আটকে গেল তার। একটি ছেলের ছবি, পাশে খান চারেক লাইনের কবিতা—রামের রক্তে রহিম সুস্থ হয়েছে, রহিমের রক্তে রাম, অতএব অসুস্থের সেবায় রক্ত দান করে পুণ্য অর্জন করুন—বিষয়বস্তু অনেকটা এই গোছের।

হঠাৎই মনে হলো, হোর্ডিংখানা তার পেছনেই রয়েছে। গেটের মুখ থেকে

ঘাড় ফেরালেই কবিতাটি পড়ে নেয়া যায়। ফেরাতেই যাচ্ছিলেন হয়তো, ঠিক তখনই সামনের অজগরের শরীরটি দুলে উঠল। রক্ত বিষয়ক সুসমাচারটি আর পড়া হলো না।

সংস্কৃত কলেজে পড়ার সময় এদিকটায় এসেছিলেন বার কয়েক। দল বেঁধে একবার একটা সিনেমাও দেখে গিয়েছিলেন টাইগার-এ—হান্‌চ ব্যাক অব নতরদম। ভেবেছিলেন, জায়গাটি খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না তাই। কিন্তু সুরেন বাঁড়ুজ্জে রোডের মুখে বাস থেকে নামতেই সব কিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। মনে হলো, সম্পূর্ণ এক অপরিচিত জায়গায় এসে পড়েছেন। কতকাল আসেননি এদিকে, কত কাল? মনে মনে হিশেব করে দেখলেন, তা বছর পঁচিশেক তো হবেই। এর ভেতরেই কেমন আমূল পালটে গিয়েছে সব কিছু।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলেন কতক্ষণ। তারপর ঠিক সামনের লোকটিকেই জিগ্‌গেশ করলেন, হগ মার্কেটটা কোথায়?

হগ মার্কেট!—ছেলেটি ভুরু কুঁচকে মনে মনে যেন হাতড়ে বেড়ালো কিছুক্ষণ। তারপর হতাশ গলায় বলল, বলতে পারলাম না। সরি।

কথাটা শুধু দ্বিধাই বাড়াল। ঠিক জায়গায়ই নামলেন তো না কী? কিন্তু—ওই তো মেট্রো সিনেমা। হগ মার্কেট তো এর কাছেভিতেই ছিল। ছিল যখন, তখন অবশ্যই আছে।

ন্যায়শৃঙ্খলটি যে আদৌ অসন্তোষজনক হলো না তা যে তিনি ধরতে না পারলেন এমন নয়। কিন্তু মেট্রো সিনেমা তো অলীক নয়, তা রীতিমত বস্তুসতা, এই প্রতীতি থেকে খানিকটা ভরসাও পেলেন। স্থির করলেন, এবার আর পথ-চলতি কোন লোক নয়, সামনের কোন দোকানে জিগগেশ করবেন।

প্রবহমান জনস্রোত ঠেলে আসতে বেশ কিছুটা সময় লাগল। সামনের দোকানে পা বাড়াতেই থমকে পড়লেন। ভেতরে অনেক আলোয় অলৌকিক সব লোকজন কেনাকাটায় ব্যস্ত। ভবভূতি বুঝলেন, এখানে তিনি অপাংক্তেয়। এক এক করে সার সার দোকানের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেন, কিন্তু কোনটিতেই জিগগেশ করার ভরসা হলো না।

হাঁটতে হাঁটতে, তুলনামূলকভাবে, স্বল্পালোকিত একটি গলির মুখে চলে এলেন। এখানে একটি বন্ধ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আশেপাশে তাকালেন,

কিন্তু কোন মানুষটিকেই খুব একটা বিশ্বস্ত বলে মনে হলো না। আসলে ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা খাঁটি একজন বাঙালি দেখতে চাইছিলেন তিনি। কিন্তু ভবভূতি জানতেন না যে, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বাঙালির দেখা পেতে হলে অনন্তকাল তাঁকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো।

এমন সময় তিনি লক্ষ করলেন যে, একটি লোক কাছাকাছি যেন ঘুরঘুর করছে। মনে মনে শঙ্কিত হলেন তিনি। লোকটির পরনে আকাশী রঙের লুঙ্গি, ঘিয়ে ঘিয়ে হাফশার্ট, ছেঁড়াফাটা চটি। কিন্তু বেশ শক্তসমর্থ, ডানপিটে গোছের চেহারা। এ-ধরনের লোকই হয়তো গুণ্ডা হয়। এদের সম্পর্কে নানা রোমহর্ষক কাহিনী কাগজপত্রে দেখা যায় আজকাল। মনে হয়, যেন বা এরাই এই শহরের স্বীকৃত শাসক।

এই সময়ই, প্রায় তাঁর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, লোকটি জিগ্‌গেশ করল, রক্ত পেলেন না?

প্রথমটায় ভবভূতি বুঝতে পারলেন না, রক্তের-কথাটা লোকটি টের পেল কী করে। পর মুহূর্তেই মনে হলো, তাঁর হাতের স্যাম্পেলই তো তার বিজ্ঞাপন। গলার আওয়াজটি মিষ্টি বলেই হোক, কিংবা তার মুখখানা কোমল বলেই হোক, ভবভূতির মনে হলো, লোকটির কোন মন্দ উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। সংক্ষেপে তাঁর সমস্যার কথাটি তিনি বললেন।

লোকটি খুব আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল, কোন গ্রুপ?

এ পজিটিভ।

শুনেই তার মুখে যেন এক গভীর বিষাদ নেমে এল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তা ঝেড়ে ফেলে সামনের দিকে পা বাড়িয়ে বলল, আসুন।

তবু এক ডাকেই তার পিছু নিতে পারলেন না ভবভূতি। দ্বিধার শেকলে আটকা পড়ে গেলেন।

পেছনে মুখ ফিরিয়ে যেন ধমকেই উঠলো সে, কী হলো! সময় নষ্ট করবেন না। আসুন—

চকিতেই সাবিত্রীর মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল তাঁর আর পড়ি-মরি লোকটির পেছন পেছন ছুটলেন তিনি। লোকটির ব্যস্ততা তার এই দ্রুত পদসঞ্চালনে মনে হয়, সাবিত্রী যেন তার খুবই কাছের কেউ, তার জন্য যেন কিছু কর্তব্য থেকে গেছে তার।

সেই এক কাল ছিল সাবিত্রীরা যখন সত্যবানদের যমের থাবা থেকে ফিরিয়ে

আনতে পারত। মহিষবাহন সেই পুরুষটি তখন প্রকৃতই উদার ছিলেন, সাবিত্রীরা ছিল যথার্থই বুদ্ধিমতী— মৈত্রেয়ীর মত বিমূর্ত জ্ঞানে তাদের কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না। সাবিত্রীরা জানত, তাদের অমৃত কোথায় এবং কী। অথচ পালাগানের সংলাপের মত করে বলা সেই কথাটিই ভারতীয় নারীর আদর্শ বলে প্রচারিত হলো, 'যাতে অমৃত নেই তা নিয়ে আমি কী করব'। ভবভূতির মনে হয়, সাবিত্রী চরিত্রের যথার্থ মূল্যায়ন হয় নি ভারতীয় সাহিত্যে। সাবিত্রীরা কাব্যসাহিত্যে উপেক্ষিতাই হয়ে রইল। সেই সঙ্গে একথা মনে হতেই বড় বিব্রত বোধ করলেন সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগের একদা কৃতী এই ব্রহ্মচারী যে সাবিত্রীদের নিয়ে যখন যমে মানুষে টানাটানি, সত্যবানদের তখন করণীয় কী, এ-বিষয়ক কোন নির্দেশ বেদব্যাস রেখে যান নি। তাই হয়তো মাসের পর মাস ধরে যখন নীরবে—

এত দিন কী করেছেন?—হঠাৎ ডাঃ গাঙ্গির কণ্ঠ শুনতে পেলেন। এত দিন, মানে, কতদিন? কতদিন ধরে ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যাচ্ছিল সাবিত্রী, কতদিন? অথচ তিনি তো কিছুই—

আসুন—বলে প্রায়ান্ধকার একটি সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে গেল লোকটি।

হাঁপ ধরে যায় ভবভূতির, বড় বড় শ্বাস নিতে নিতে সিঁড়ি ভাঙতে থাকেন। বড়ই অপটু মনে হয় নিজেকে, কেমন যেন জীর্ণ। দোতলায় উঠতেই লোকটিকে দেখতে পেলেন। আলোকিত একটি দরজার ফ্রেমে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। তিনি এগোতেই প্রায় থাবা দিয়েই তার হাত থেকে কাগজ আর স্যাম্পেল-দুখানা ছিনিয়ে নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

ভেতরে আসতেই ভবভূতি দেখলেন, লম্বাপানা মাঝবয়েসী একজন 'কোটপ্যান্টটাই' স্যাম্পেল আর কাগজখানা নিয়ে কাচের দরজা ঠেলে অন্য একটি ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। সে ঢুকে যেতেই লোকটি ইশারায় তাঁকে বসতে বলল। তখনই তাঁর নজরে পড়ল, লোকটির চোখমুখ কেমন যেন ফুলো-ফুলো, নীরক্ত-নীরক্ত। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না, অস্বস্তি হয়, শরীরের ভেতর থেকে পচা মাংসের একটা গন্ধ যেন উঠে আসে।

শেষ পর্যন্ত বসেই পড়লেন। ছোট্ট সাজানো-গোছানো এই ঘরখানায় লোক কিছু কম নেই। বেশির ভাগই যেন, ভবভূতির মনে হলো, রক্তের জন্য এসেছে। লম্বা গদীমোড়া দুখানা বেঞ্চ জুড়ে বসে রয়েছে তারা, তিনি

যেমন বসে রয়েছেন তাদেরই দুজনার মাঝখানে। কেউ কোন কথা বলছে না। সকলেরই চোখ সেই বন্ধ কাচের দরজায়। এক কোণে একজোড়া চেয়ার টেবিল নিয়ে বসে রয়েছে একজন। খুবই নিস্পৃহতা নিয়ে বই পড়ছে সে। শাঁখের মত শাদা দেয়ালে রক্ত বিষয়ক নানা সচিত্র বিজ্ঞাপন কাচের তলায় জ্বলজ্বল করছে।

দরজা খুলে গেল। অধীরতা ছড়ালো সবার চোখেমুখে। দেখতে দেখতে উঠে পড়লো সবাই, ভবভূতি নিজেও। দু-একজন এগিয়ে যেতেই, বই থেকে মুখ না তুলেই, সিদ্ধান্ত জানানোর মত করে হেঁকে উঠল সেই 'টেবিল-চেয়ার', দরজার মুখে ভিড় করবেন না। পাগুলো থেমে গেল।

অচিরাৎ কাগজ আর স্যাম্পেল হাতে বেরিয়ে এল সেই কোটপ্যান্টটাই, চারদিকে নজর বুলিয়ে রোলকল করার সুরে বলল, সাবিত্রী ভট্টাচার্য—

ভবভূতি এগিয়ে গেলেন।

এই গ্রুপের ব্লাড নেই।

কথাটি বুঝি শেষ হলো না, হাত বাড়িয়ে কাগজপত্র নিয়ে নিল লোকটি, বাইরের দরজার দিকে পা বাড়াল।

কোথায় পাওয়া যাবে?

উত্তরটি উঠে আসতে খানিকটা সময় নিল, ডাঁটি ধরে একটানে চশমাটি খুলে ফেলল, ঠোঁট উল্টে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে, মাথা ঝাঁকালো স্প্রিং দেয়া পুতুলের মতো, তারপর বলল, বেলভিউ চেনেন?—চেনেন না? কপাল! —চশমা পরতে পরতে মৃদুহাস্যে ভেতরে ঢুকে গেল কোটপ্যান্টটাই।

ভবভূতি খেয়াল করলেন, সবকটি মুখের ভেতর থেকে সার সার দাঁতের পাটি বেরিয়ে এল। তখনই সেই 'চেয়ার টেবিল', তেমনি বই-এ মুখ রেখেই, বলে উঠল, কোথায় বলা যেত। যদি বলি, মিন্টো পার্কের কাছে, অমনি তো জানতে চাইবেন, মিন্টো পার্ক কোথায়? চালাক-চতুর কাউকে নিয়ে আসতে পারলেন না যে কলকাতা চেনে? আসুন।

বেরিয়ে এসে দেখলেন, বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, খুবই বিরক্ত যেন। কাছে আসতেই ঝামটে উঠল, হলো তো! অত মাটোমাটো হয়ে থাকলে চলে না, বুজলেন? কোথায় এসেছেন জানেন—এটা কোলকাতা শহর, সব্ বাঞ্চোৎ ধান্ধাবাজ। আমিও। তবে কাজটা তুলে দেব, তারপর অন্যকথা। যদি বিগ্রুপের রক্ত হতো—যাকগে, চলেন।

এই হলো 'মিণ্টু' পার্ক।—মিনি বাস থেকে নেমে সে বলল, এক চিলতে হাসলও সেই সঙ্গে।—আর ওই উত্তর-পুব কোণে হলো বেল ভিউ। চলেন। নার্সিহোম। বড়লোকদের চিকিস্‌সের জায়গা। এখানে কি যে-সে লোক আসতি পারে! এক এক দিনেই হাজার হাজার টাকা খর্চা। আমার তো মাঝেমধ্যিই আসতি হয়। না, চিকিস্‌সের জন্যি না, ওই রক্ত টক্তর ব্যাপারে। রক্তর বেজায় টান—

কিন্তু ভবভূতির মাথায় তখন অন্য চিন্তা ঘুরপাক খায়। কী ধান্দায় তার পিছু পিছু ঘুরছে লোকটা? সত্য বটে, এখনো পর্যন্ত সে তার উপকারই করেছে বলা যায়। কিন্তু পরে কোন্ মূর্তি ধারণ করবে কে জানে। তবে, মনে মনে হাসলেন, তুমি শ্রীমান যদি বাটপাড় হও, আমিও একেবারে খাড়া ন্যাংটা! অতএব, যে ধান্দায়ই ঘোরো না কেন সুবিধা কিছু হওয়ার নাই।

হঠাৎই থমকে দাঁড়ালো সে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে, কোন ভূমিকা না করে, বলল, এবার আর আপনি কিছু বলতি যায়েন না। যা বলবার আমিই বলব। চলেন, এসে পড়েছি—

খানিকটা এগোতেই বুঝলেন, প্রতিষ্ঠানটি প্রকৃতই অভিজাত। এ-রকম কোন জায়গায় এর আগে আসেন নি। খুব একটা অস্বস্তি বোধ করলেন। এ-কথা এখন তাঁকে মানতেই হলো যে, লোকটি না থাকলে কাচের ওই বিশাল দরজা খোলা তার পক্ষে আদৌ সম্ভব হতো না।

পাল্লাখানা ভেতর দিকে টেনে ধরে রেখে সে ডাকল, আসুন। ভেতরে ঢুকতেই বুঝলেন, হিমঘরে এলেন। আরও দুটো দরজা পেরোতে হলো। তারপর যে ঘরখানায় এলেন আয়তনের দিক থেকে সেটি বেশ বড়োসড়ো। চারপাশে ঘোরানো কাউণ্টার। এককোণে একজন লোক মাথা হেঁট করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কিছু দেখছে মনে হলো। ভবভূতিকে দাঁড় করিয়ে রেখে সে তার কাছে গেল। নিচু গলায় কিছু কথাবার্তা হলো তাদের। তারপর কাগজপত্র তার কাছে জমা দিয়ে সে ফিরে এল, বলল, বাইরে গিয়ে বসি, চলুন।

লম্বা কালিমত একটা ঘরে সার-সার চেয়ার পাতা। পাশাপাশিই বসলেন। আলো খুবই কম এখানে। কেমন যেন ভূতুড়ে ভূতুড়ে দেখায় সব কিছু। পেছন দিকে মাথা হেলিয়ে দিলেন ভবভূতি। শরীর জুড়ে ক্লান্তির ঢল নামল।

কটা বাজে ? আটটা, না কি, আরও বেশি ? সেই দুপুর বারোটায় রক্তের খোঁজে বেরিয়েছেন। অথচ ডাক্তার জানিয়েছেন, রক্তই একমাত্র চিকিৎসা এখন। পরবর্তি কয়েকটা দিন রক্তের জন্য তৈরি থাকতে হবে। নিজেকে এতখানি অসহায় মনে হয়নি কখনও। একমাত্র শ্রীপতির ওপরই যা ভরসা এখন। টেনেটুনে ও-ই তো নিয়ে এলো। খরচাও কম না কী।

শ্রীপতির নিজের অবিশ্যি মান্থলি রয়েছে। রোগিনীকে নিয়ে তবু ছখানা টিকিট কাটতে হলো। ছেলেগুলোকে খাওয়াতে হলো, ফেরার টিকিট কেটে দিতে হলো। খরচ-খরচা সব শ্রীপতিই করল। অফিস যাবার মুখে জিগ্‌গেশ করল, টাকাপয়সা কী এনেছো ? যা আছে দেখিয়েছিলেন। ম্লান হেসে বলেছিল, এ দিয়ে যে এক বোতল রক্তের দামও হবে না, মেসো !—এ-টাকাটা রাখো। দুবোতল রক্তের ব্যবস্থা কোর। তোমার নিজেরও কিছু লাগবে। কাল বিকেলের আগে দেখা হচ্ছে না। চলি। হ্যা, আমাদের অফিসের অনেকের ডোনার কার্ড আছে। সম্ভব হলে আজকেই পাঠিয়ে দেব। তাহলে আর রক্তের টাকা লাগবে না।—ছেলেটা কাছে থাকলে ভরসা পাওয়া যেত। কিন্তু অফিসের এক বন্ধুর বিয়েতে তার না থাকলেই নয়। বড়ই নিঃসঙ্গ, বড়ই অসহায় তিনি এখন। বারো ঘণ্টার বেশি সময় চলে গেলে, নীরক্ত সময়—

হঠাৎ লোকটির গলা শুনতে পেলেন, দরজার মুখ থেকে ডাকছে সে, চলে আসুন, হয়ে গেছে।

সে যে কখন পাশ থেকে উঠে গেছে বুঝতেই পারেননি ভবভূতি।

তারা ভেতরে যেতেই কাউন্টারের 'অণুবীক্ষণ' জিগ্‌গেশ করলো, ক বোতল চাই ?

ভয়ে ভয়ে বললেন তিনি, দু বোতল—এক বোতল হলেও চলবে। পরের কথাটি তাড়াতাড়ি যোগ করে দিলেন।

গ্রুপ মিলেছে, সার ?—লোকটি প্রশ্ন করল।

হুঁ। টাকা দিন। দুশো আশি।

দুশো—যেন দম বন্ধ হয়ে এল ভবভূতির।

আশি। দুবোতলের দাম।

আচার্য জগদীশ বসু রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে ধিক্কার দেয়ার মত করে বলে উঠল লোকটি, ছিঃ ছিঃ!

এতক্ষণ কোন কথা বলে নি সে। অথচ প্রতি মুহূর্ত, তার কাছ থেকে কিছু বক্রোক্তি শুনবেন বলে, কণ্টকিত হয়েছিলেন ভবভূতি।

ছিঃ ছিঃ!—ধিক্কারসূচক এই অব্যয় দুটি যেন গলা থেকে সে ঝেড়ে ফেলল আবার!—ছ্যাঃ! এক বোতল রক্ত কেনার মুরোদ নেই, আর রক্ত চাই, রক্ত চাই বলে নেচে বেড়াচ্ছেন। ফস করে অমনি দুবোতলের অর্ডার দিয়ে বসলেন কোন আক্কেলে!

আমি ভাবলাম বুঝি—মিনমিন করে বললেন ভবভূতি, নিজেকে প্রকৃতই একজন অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল তাঁর।—ব্লাড ব্যাঙ্কে তো—

হ্যা, ওখানকার দাম হচ্ছেগে রক্ত না পাওয়ার দাম। এখানে রক্ত পাওয়া যায়, দাম তাই একশ চল্লিশ। এক বোতলের জন্য কত দিতে পারেন বলুন দেখি ঠিক করে। হাতে রেখে বলবেন না।

একশ কুড়ি—

অ। আমার বি-গ্রুপের রক্ত। না হলে একটা ব্যবস্থা করে দেয়া যেত। অশ্বিনীর গ্রুপটা মিলে যায়। কিন্তু সে তো এতক্ষণ বাড়ি চলে গেছে। কাল সকালের আগে তো কিছু করা যাচ্ছে না—

কিন্তু—আমার যে—

বুজতি তো পারছি, সার। কিন্তু কী করি বলুন তো? আমাদের যেখানে কারবার, সেখানে আপনার গ্রুপের ডোনার মাত্র একজন—ওই অশ্বিনী। আড়াইশ সি-সি ঝাড়তি পারলে তারও উপকার হতো। বড়ই টানাটানি যাচ্ছে বেচারার—

আপনারা রক্ত বেচেন!

ধরতি পেরেছেন! বেচা কথাটা খারাপ শোনায়, ব্যাবসা বলতি পারেন। ডাক্তারবাবু আমাদের লোক খুব ভাল। মাদার ডাইরির দুধ আধ লিটার, দুখানা আপেল—মেরে দিন। বরাত ভাল থাকলি দশ দিনের মধ্যি আবার যে কে সেই। হ্যা, নগদ টাকাও মেলে। কত, তা বলা বারণ। পার্টি নিয়ে গেলেও কিছু পাওয়া যায়। আপনাকে নিয়ে যেতি পারলেও কিছু হতো। কিন্তু এ-শালা পাথর চাপা কপাল! যাকগে। কাল সকালে, ধরেন তো, নটার মধ্যি অশ্বিনীকে নিয়ে আমি মেডিকেল হাসপাতালে যাচ্ছি। বড়

গেটের কাছাকাছি থাকব। চলে আসবেন। এখন গোটা দুয়েক টাকা দেন দেখি। সেই সোনারপুর থেকে ডোনার নিয়ে আসতি হবে। হ্যা, আমার নাম দিবাকর। স্মরণে রাখবেন। টাকাটা—

ওয়ার্ডে ঢোকার মুখেই ভবভূতি শুনলেন নার্স'রা তাঁর খোঁজ করছে। শুনেই গা-হাত-পা ছেড়ে দিল তাঁর। দেয়ালে ঠেসান দিয়ে, চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে রইলেন কতক্ষণ।

তাঁকে দেখেই বয়স্কা নার্সটি তপ্ত কণ্ঠে চেঁচালো, রক্ত এনেছেন?—তা, পেয়িং ওয়ার্ডে ভর্তি করার বুদ্ধিটা কে দিয়েছিল? ডাঃ গাঙ্গি খুঁজছেন আপনাকে। এখনও আছেন হয়তো। দেখা করে যাবেন। হ্যা, আপনার এক বন্ধু এসেছিলেন। দুটো ডোনার কার্ড দিয়ে গেছেন।

কার্ড দুখানা নিয়ে বেরিয়ে এলেন। সাবিত্রী আছে এখনও, এই সংবাদ খুবই উতলা করে তুলল তাঁকে। সমগ্র কোষে কোষে রক্তের তৃষ্ণা নিয়ে পড়ে আছে সে, আর তিনি, এক অনাথ—বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে ওঠে। মেডিকেল হাসপাতালের সেই প্রসিদ্ধ সোপানশ্রেণীর শীর্ষে, পড়ে যেতে যেতেও, শেষ পর্যন্ত বসে পড়তে পারলেন ভবভূতি।

চারধার খুবই নির্জন, খাঁ-খাঁ। এক কলেজ স্ট্রীটই যা কিছু শব্দময়। এই দীর্ঘ সোপানশ্রেণীতে তারা, দুটি মাত্র প্রাণী, একজোড়া ছায়া নিয়ে বসে আছে শুধু—ওপরে ভবভূতি, আর তার বেশ কয়েকধাপ নিচে এক বৃদ্ধ ভিখারী।

দমবন্ধ এক শূন্যতার বলয়ের ভেতর কতক্ষণ আটকে রইলেন ভবভূতি। তারপর এক শব্দতরঙ্গের অভিঘাতে ফিরে এলেন। তাকাতেই দেখলেন, শহরতলির কোন এক পৌরসভার অ্যাম্বুলেন্স গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে উঠলেন। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে মনে পড়লো, ছেলেমেয়েগুলো একা রয়েছে, কী বা করছে কে জানে। ছোটটা যা অশান্ত—কুয়োর মুখটা উদোমই প্রায়, একখানা মাত্র পাট বসাতে পেরেছেন, অথচ ঘুরে ঘুরে ও কুয়োতলায় যাবেই। ভাবতেই গা কাঁটা দিয়ে ওঠে।

ডাঃ গাঙ্গি চলে গিয়েছেন। তার পরিবর্তে যে রয়েছে তাকে ছেলেমানুষই বলা চলে। বলল, কিন্তু পণ্ডিতমশাই, রক্ত যে চাই। 'পণ্ডিতমশাই' সম্বোধনে তার ওপর খুবই প্রীত হলেন ভবভূতি, ডোনার কার্ড দুটি দেখালেন। ভালো করে সে দেখলও না, সূক্ষ্ম একটি হাসির রেখা ছড়াল তার মুখে, বলল, দেখুন।

যত সহজে রক্ত দেয়া যায়, তত সহজে তা পাওয়া গেলে তো কোন কথাই ছিলো না। সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত নেই, বুঝুন। নেই তা নয়, তবে সকলের জন্য নয়—

বেরিয়েই, প্রথমে যে-চিন্তাটা মাথায় এলো, তা হলো, রাতটা কাটাবেন কোথায়। বাড়ি ফেরার প্রশ্নই ওঠে না এখন। শেষ ট্রেন চলে গেছে। তা ছাড়া, কাল সকাল থেকেই আবার রক্তের খোঁজে বেরোতে হবে। কিন্তু থাকেন কোথায় এখন?

সংস্কৃত কলেজে মাঝেমধ্যে আসতে হয়, টোলের বৃত্তির তাগাদায়ও শিক্ষা বিভাগে ঢুঁ মারতে হয় বছরে কয়েকবারই। কিন্তু সে তো এগারটা নাগাদ আসা, আর পাঁচটা দশের ট্রেন ধরে ফিরে যাওয়া। থাকার প্রশ্ন ওঠেনি কখনও। এদিকে, জঠরাগ্নির তাড়নাও কিছু কম নয়। ওই সকালে আসার সময় যা দু-চার গ্রাস মুখে দিয়েছেন, সারাদিন আর কিছু দাঁতে কাটেন নি। সে অবস্থাও ছিল না, তা ছাড়া, বাইরে খাওয়ার অভ্যাসও নেই। সন্ধ্যা-আহ্নিক করা হয় নি, এখন তা করার প্রশ্নও নেই, প্রশ্ন নেই খাওয়ারও।

খাওয়া নিয়ে মাথা ঘামালেন না। উপোস-আপাসে ছোটবেলা থেকেই অভ্যস্ত তিনি। তখন থেকেই পুজোআর্চার কাজে লেগে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু থাকার কী করা যায়? ভাবতে ভাবতেই সিঁড়িতে বসে পড়লেন। বসা তো যাক, তারপর—

বড় দুরন্তই হয়েছে ছেলেটা, সবসময় যেন টগবগ করছে। অথচ বড়ো ছেলেটি খুবই শান্ত, খুবই ধীমান। ক্লাস টেনে উঠেছে এবার। শিক্ষকদের আশা, মাধ্যমিক পরীক্ষায় এ-অঞ্চলের মুখোজ্জ্বল করবে উদ্দালক। একটা ব্যাপারে একটু খাটো হয়ে আছেন ছেলের কাছে। টোলের ছাত্রসংখ্যার রিপোর্ট পাঠাতে হয় নিয়মিত, সরকারি বৃত্তি নির্ভর করে এর ওপর। টোলে আজকাল আর কে পড়তে আসে? অথচ, বৃত্তির টাকাটা ছাড়াও যায় না। কাল্পনিক কিছু ছাত্রর নামই তাই পাঠাতে হয়। সে-তালিকায় উদ্দালকের নামটিও ছিল কিছুদিন। ব্যাপারটি প্রসন্ন মনে নিতে পারেনি ও। শ্রীপতি পেয়িংবেডে ভর্তি করাতে গেল কেন! বলছিল বটে, ফ্রী বেড নেই, আপাতত পেয়িং বেডেই ভর্তি করিয়ে দিচ্ছি, চার-পাঁচ দিন পর ফ্রী বেডে নিয়ে আসব। দরকার হলে ইউনিয়নকে দিয়ে—অশ্বিনীই তো লোকটার নাম, সেই এ-পজিটিভ রক্ত যার, সোনারপুরের লোক? কী জাত তা তো জিগ্গেস করা

হয়নি ? অব্রাহ্মণের রক্ত কি—সেরে তো উঠুক, পরে না হয় একটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নিলেই হবে। কুয়োর মুখটা—সুভদ্রার অবশ্য সব দিকে নজর—মেয়েটার বিয়ে না দিলেই নয়—বয়স বাড়ছে, কিন্তু সঙ্গতি তো—

কুয়োতলায় যেয়ো না, বড় দুঃসময় আমাদের এখন—কুয়োতলা··· উদ্দালক···সুভদ্রা···সাবিত্রী···কুয়ো—

সিঁড়িতে বসে বসেই ঢুলতে লাগলেন ভবভূতি।

রক্তের স্যাম্পেল এবং কাগজপত্র নিয়ে ভবভূতি যখন সেণ্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্কে এলেন, তখন সকাল প্রায় নটা। যদিও জানতেন রক্ত পাবেন না, তবু ডোনার কার্ড দুটি থেকে খানিকটা ভরসাও পেয়েছিলেন। পেয়ে গেলে বেশ কিছু টাকা সাশ্রয় হতো।

পৌঁছেই দেখলেন, এক নই-নেত্য কাণ্ড। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একটি ছেলে, অনেকটা ঝুঁকে পড়ে, কাউণ্টারের ফোকর দিয়ে ভেতরে চোখ ফেলে প্রবল কণ্ঠে চীৎকার করছে, পাওয়া যাবে না মানে! এক ক্লাব ছেলে বছর বছর ব্লাড ডোনেট করে আসছি। প্রতিবারই বলা হচ্ছে, দরকার হলেই রক্ত পাওয়া যাবে। আর এখন বলছেন রক্ত নেই!

আপনি তো কথাটাই বুঝতে পারছেন না—

খুব পারছি।—তার কণ্ঠের দাপটে ভেতরকার কণ্ঠ চাপা পড়ে যায়।—ধুর পেয়েছেন। ব্লাড ব্যাঙ্কের র‍্যাকেটের কথা সবাই জানে—

কে র‍্যা ? দেখি, টাদুর মুখখানা একবার!—কণ্ঠটি কাউণ্টারের কাছটায় এসে থামল।

এই যে, ভাল করে দেখুন—

দুদিকেই ভিড় জমতে থাকে। ভেতরকার লোকজন কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধের কথা ভুলে গিয়ে, একজোট হয়ে পড়ে মুহূর্তেই। বাইরে ভিড় জমে, কিন্তু ছেলেটির সমর্থনে এগিয়ে আসে না কেউ। মরিয়ার মত একাই চেঁচিয়ে যায় সে। দরজা খুলে একসময় কিছু লোক তেড়ে এলো তার দিকে। সে কাউণ্টারে হেলান দিয়ে খুব নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে বলল, ছোবে, হারুদাকে খবর দেতো। রক্ত যখন পাওয়া যাচ্ছে না, রক্তপাতই হোক।

বোঝা গেল, সে একা নয়। ভিড়ের ভেতর থেকে একটা কণ্ঠ শোনা গেল, এ-সব ছোটখাটো কাজে আবার হারুদাকে ট্রাব্‌ল দেয়া কেন—বলতে বলতে,

বোধহয় ছোবেই, তাদের সামনে এসে দুহাত কোমরে রেখে মিটমিট করে হেসে বলল, কী, রক্তবাবুগণ, লড়াই হবে না কী ?

'হারুদার' নাম শুনেই থমকে গিয়েছিল তারা। ছোবের কথার জবাবে মাঝবয়সী একজন এগিয়ে এসে আহ্লাদী কণ্ঠে বলল, এতো সেমসাইড হয়ে যাচ্ছিল, ব্রাদার। আরে বলবেন তো যে আপনারা—চলুন, চলুন, ভেতরে চলুন—

খুব আপ্যায়ন করে তাদের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো। খানিকবাদে, তারা চার হাতে চার বোতল রক্ত নিয়ে বেরিয়ে গেল। সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দিয়ে এল কয়েকজন।

কাউন্টার থেকে ভবভূতিকে যখন জানান হলো, রক্ত নেই, দশটা বেজে গেছে তখন। কাউন্টার ছেড়ে আসার সময় একবার ভাবলেন, বলে দেখব না কী যে, 'আমিও কিন্তু হারুদার লোক মশাই !'

নিচে নেমেই ছুটতে লাগলেন। এ পজিটিভ অশ্বিনীকে নিয়ে এতক্ষণে হয়তো পৌঁছে গিয়েছে দিবাকর।

কিন্তু বেশিক্ষণ ছুটতে হলো না। একসময় দেখলেন, দিবাকর এদিকেই আসছে, সঙ্গে আর একজন লোক, নিশ্চয়ই সেই এ পজিটিভ।

সে কাছে এসেই চিকন করে হেসে বলল, ব্লাড ব্যাঙ্কে গিয়েছিলে বুঝি ? পাওয়া গেল ?

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই ষণ্ডাগোছের কিছু লোক ঘিরে ফেললো তাদের। খপ্ করে অশ্বিনীর চুলের মুঠি চেপে ধরে হিংস্র কণ্ঠে গর্জে উঠল একজন, কী রে শালা, ফের আমাদের এরিয়ায় এসে বিজনেস মারাচ্ছ—

তার পাশ থেকে কেউ বলল, আপনি চলে যান তো, সার—

ঠিক তখনই সামনের লোকটির মুখে চকিতে হাত চালিয়ে ব্যূহ ভেদ করে তীরের মত বেরিয়ে গেল দিবাকর। চীৎকার করতে করতে তার পেছন ছুটল দুজন।

ওদিকে অশ্বিনীর সঙ্গে তখন ধস্তাধস্তি চলছে। মুখ চেপে বসে পড়েছিলো যে, একসময় সে উঠে দাঁড়ালো। বাঁ হাতের চেটোয় রক্ত মুছে, ডান হাত দিয়ে কোমর থেকে ইস্পাতের একটি শানিত ফলা বের করে ধীর পায়ে অশ্বিনীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

হাঁ-হাঁ করে উঠলেন ভবভূতি, সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে ফেললেন। তাকাতেই দেখলেন, লোকগুলো নেই, কেবল উপুড় হয়ে পড়ে আছে অশ্বিনী, তার তলপেট চিরে অজস্র ধারায় বেরিয়ে আসছে রক্ত। রক্ত, এ পজিটিভ।

সেই প্রার্থিত তরলের এই অযাচিত প্রবাহের সামনে বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলেন ভবভূতি !

উপন্যাস

অন্তঃপুরিকা

আফসার আমেদ

আবার দিন শুরু হয়েছে। ঝকঝকে দিন। রাতের ক্লান্তি ও অন্ধকার মুছে গেছে। মিস্ত্রিবাড়ির ছটি পরিবারের আঙিনা মুখর হয়ে উঠেছে কলকোলাহলে ও প্রাণতায়। এখানের সন্নিহিত ছটি পরিবার আসলে একটি পরিবারের মত। ছয় ভাইয়ের পরিবার। গতকাল এক পরিবারের এক কন্যার বিয়ে ছিল। উৎসবের দিন ছিল। ছটি পরিবারের উৎসব হয়ে উঠেছিল। হাসি হুল্লোড় ও প্রাণস্পর্শে আঙিনা হয়ে উঠেছিল প্রাণবন্ত। সারাদিন ধরে বিয়ে হবার ফলে রাতে ক্লান্ত হয়ে ওঠে বাড়ির আঙিনা। তখন একটি ঘরে নতুন বর বউ. জেগে জেগে কথা বলেছিল। মৃদু আলোর ভেতর। লজ্জা চমক ও স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ে তারা পরিচিত হয়ে উঠেছিল। বর-বধূর কাছে রাতটি ছিল খুবই মনোরম। এবং মধ্যরাতেই তারা জেগে উঠেছিল, সেজে উঠেছিল। আসমা আর মাসুদের বিয়ে হয়।

আসমা একেবারেই ছেলেমানুষ। বয়স মাত্র তার পনের বছর। শরীর এখনো পরিপূর্ণ হয় নি। বুক এখনো বাড়েনি। সে তুলনায় মাসুদ আলি যথেষ্ট পরিণত এবং অভিজ্ঞ পুরুষ। দাম্পত্যে সে ধারালো ও সুচারু। এই ছটি পরিবারের যৌথ দলিজে আশ্রয় ছিল মাসুদের। গতকাল সে এখানের জামাই হয়েছে। একই আঙিনা নিয়ে ছয় ভাইদের ঘরবাড়ি বসবাস ও সুখ দুঃখের বারোমাসি। উৎসবের দিনে সকলেই মেতে ওঠে। শোকে তেমনই অনুজ্জ্বল ও আহত হয়। ছয় ভাই-ই এ এলাকার ডাকসাইটে রাজমিস্ত্রি। সাকিম কালিনগর, মহকুমা উলুবেড়িয়া, জেলা হাওড়া।

ঘরবাড়ির পেছনে পুকুর। কালো গভীর জল ও চারপাশে তাল সুপুরির সারি। পুকুর পেরিয়ে গেলে ঘুঘুরডাঙা। গাছপাছালির ঘন সন্নিবেশ সেখানে। সেখানে পাখপাখালি গান গায়। খানা-ডোবা, বনজঙ্গল, কাঁটাঝোপ। তারও পেছনে গোরস্থান।

ফিরোজ, সিরাজ, রিয়াজ, সাহাদত, লিয়াকত ও হাসমত—ছয় ভাই। তাদের বুড়ি মা মরিয়ম এখনো বেঁচে আছে। অনেক দিন হল বাবা মারা যায়। বাবা আজমত আলি খুব নামকরা মিস্ত্রি ছিল। মাঝবয়সে মারা যায়। সে সব বছর চল্লিশ আগের কথা। তখন মরিয়মের যৌবন যথেষ্ট খরস্রোতা ছিল। বছর তিরিশ বয়স হবে, তখন আট সন্তানের জননী হয়ে গেছে। এখন মরিয়মের বছর সত্তর বয়স। বেশ কোমর নুয়ে গেছে। চুল পেকে শন হয়ে গেছে। চামড়ায় কুঞ্চন, কপালে বলিরেখা। অনেকগুলি দাঁত পড়ে গেছে। হামান দিস্তেয় ছেঁচা পান খায়। এখনো চোখে বেশ দেখতে পায়। চোখের চাহনিতে সারাক্ষণ এক সতর্কতা ও স্নেহ মমতার আবেগ ভরা থাকে।

বছর দুই হল মাসুদ এ বাড়ির দর্লিজে আশ্রয় পায়। ফিরোজকে বাবা পাতায়। মাসুদের কেউ ছিল না। এখানে এসে জোটে। বছর এগারো বারো হল তার স্ত্রী মারা যায়। তারপর এত বছর বিয়ে করেনি মাসুদ। ফিরোজ এ বাড়ির কর্তা। ফিরোজের আদেশেই মাসুদকে বিয়ে করতে রাজি হতে হয় আসমাকে। মাসুদকেও রাজি হতে হয়। অথচ মাসুদ রাজি হতে চেয়েছিল না। ফিরোজের বড়মেয়ে জাহিরা স্বামীপরিত্যক্তা হয়ে এ বাড়িতেই এসে জোটে বছর দুই। গোপনে তাদের ভাব ভালবাসা গড়ে ওঠে। জাহিরাকে নিয়ে পালাতেই চেয়েছিল মাসুদ দূরে কোথাও। মাসুদ সরুছুতোর। যেখানেই যাবে, সেখানে কাজ পাবে, খেটে খেতে পারবে। কিন্তু জাহিরা যেতে পারে নি। কেননা তারই চাচাতো বোন আসমা, তার ছোট বোন, তার সঙ্গে মাসুদের বিয়ে পাকা হয়ে গেছে, এক স্নেহমমতা ও ভীরুতায় জাহিরা পারে নি পালাতে মাসুদের সঙ্গে। স্নেহ নিষ্ঠুরতার শিকার হয় সে।

এসব কথা কেউ জানে না। শুধু ধরতে পেরেছে বুড়ি মরিয়ম। শকুনের মত সতর্ক ছিল তার চোখ। এ বাড়িতে এমন কিছু বাড়াবাড়ি হত, তা বোধ করেছে। এমন কি আসমাকে বুঝিয়ে মাসুদের সঙ্গে বিয়ের মন গড়ে দিয়েছে মরিয়মই। কেননা আসমার মন সাবিরকে নিয়ে মজে ছিল। সাবির মরিয়মের মেয়ের ঘরের ছেলে। বড় মেয়ে কনিজার ছোট ছেলে। এ বাড়িতে যাওয়া আসা এবং আসমার সঙ্গে এক ভাব ভালবাসা গড়ে ওঠে। সে কারণেই মাসুদের সঙ্গে আসমার বিয়ে হবে এটা শুনে খুব কান্নাকাটি করেছিল আসমা।

মরিয়মের কাছে। মাসুদের গুণকীর্তন করে, মাসুদের মন গড়ে দেয় মরিয়ম। তার কথার ভেতর এক যাদু ছিল। তার চাহনির ভেতর এক সম্মোহন ছিল। ভালয় ভালয় এ বিয়ে চুকে বুকে যায়।

আসমা ছেলেমানুষ, বালিকা, তার সরলতা অসীম। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে, ঘুমের ভান করে পড়েছিল বিছানায়। বাইরের আঙিনায় চাঁদের আলো গড়িয়ে পড়েছিল। আকাশে ছিল চাঁদ আর টুকরো টুকরো মেঘ। বিছানায় কনের সজ্জায় সজ্জিত ছিল আসমা। নতুন ভয় ও পুরুষের স্পর্শের সজাগতায় ভরা হয়ে উঠেছিল। তখন মাসুদ ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে দাঁড়িয়েছিল চাঁদের সামনে। আসমা বুঝেছিল, সদ্য বিবাহিত তার স্বামী তার সঙ্গে দাম্পত্য আলাপ করার আগে বাইরে চাঁদের আলোর সামনে দাঁড়িয়ে একা একা থাকছে কিছুক্ষণ। সে জানে না, তখন তারই বড় চাচার মেয়ে জাহিরাবুবুর সঙ্গে তার নববিবাহিত স্বামীর প্রেমাভিসার চলছে। আসমা সরলমতী ও বালিকা। এবং সরল বিশ্বাস নিয়ে ছিল। এক সময় স্বামী তার কাছে আসে। এবং তারা স্বামী স্ত্রীর স্বরে মেশে।

এই প্রেমাভিসার ও গোপন প্রণয় বুঝি কেউ জানবে না, জাহিরার এ বিশ্বাস ছিল। রাতে মরিয়মের বিছানায় শোয় জাহিরা। প্রেমাভিসারের পর মরিয়মের পাশে শুতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় জাহিরা। জাহিরা স্বামী-পরিত্যক্তা ছিল। মাতাল স্বামী। মারধোর করত। শ্বশুরবাড়ি থেকে না বলে চলে আসে বাপের বাড়ি। আর স্বামী রাগবশত দুচারদিনের মধ্যে আর একটা বিয়ে করে বসে। জাহিরা চেয়েছিল ঐ স্বামীর থেকে ছাড়পত্র করিয়ে মাসুদের সঙ্গে তার বিয়ে হওয়া। সেটা ছিল অসম্ভব। তবুও মাসুদ আলির সঙ্গে পালানো ছিল অনেক সহজ। মাসুদের সঙ্গে আসমার বিয়ে হওয়াটা মেনে নিতে হয়। এবং সে আর সতীনের সংসারে ফিরে যাবে না জানতো। এখানেই মাসুদ আসমাকে নিয়ে সংসার পাতবে। সেহেতু মাসুদের সঙ্গে তার গোপন প্রেম ধরে রাখতে পারবে। কেননা তার রূপে মুগ্ধ হয়েছে মাসুদ আলি, তাকে ভালবেসেছে। সেও মাসুদকে ভালবেসেছে, মাসুদের প্রতি আকর্ষণ তীব্র হয়েছে। মাসুদকে জীবনে পেল না, এই শোকে মরিয়মের পাশে শুয়ে অশ্রুপাত করছিল জাহিরা। মরিয়ম সান্ত্বনা দেয়। মরিয়ম জাহিরাকে জানায়, সে জানে মাসুদের সঙ্গে জাহিরার এক ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। দাদির এই কথায় চমকে ওঠে জাহিরা। এবং দাদির

প্রতি নীরবে ফেটে পড়ে। মরিয়ম সব জেনেছে, বুঝেছে। মাসুদকে পায়নি জাহিরা। এ সংসার থেকে মাসুদের কাছাকাছি থেকে আর একভাবে পাওয়ার সাধ তার তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সে গোপন প্রণয়ের কথা মরিয়ম জানতে পারায় সে প্রণয়ের গোপনতা আর থাকে না। এই ভিটেতে থেকে মাসুদকে প্রণয়ের সাধ নিয়ে যে দেখবে, সেই চাহনির অর্থ মরিয়ম ধরতে পারবে। মরিয়মের দৃষ্টিপাত তার ওপর প্রহরা চালাবে। মরিয়মের জীবিতাবস্থায় কিছুতেই এখানে থাকা সম্ভব নয় জাহিরার পক্ষে। বরং সে ফিরে যাবে সতীনের সংসারে। মরিয়মের মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যে-দিন মরিয়ম মারা যাবে, সেদিন থেকে আবার এখানে ফিরে আসবে সে। দাদি মরিয়মের মৃত্যুকামনা করে জাহিরা।

এসব কথা আসমার জানার কথা নয়। সে শুধু অনাস্বাদিত পুলক ও অনুভূতিতে ভরা হয়ে থাকে। যেদিন বিয়ে হয়, সে রাতেই স্বামীর সঙ্গে শুতে হয়েছে তাকে। সারা রাত স্বামীর সঙ্গে এক বিছানায় শোয়ার পর, সকালের আলো ফুটে উঠলে লজ্জায় মরে যায় আসমা। সে স্বামীর কাছে শুয়েছিল, এতে তার বড় লজ্জা। সকালের আলো ফুটতেই সে চুপি চুপি ঘরের খিল খুলে বেরিয়ে যায়।

তারপর মা বাবার বিছানায় গিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে। এবং ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বেলা আটটা বাজিয়ে দেয়।

বাইরে ঝকঝকে দিন শুরু হয়ে গেছে তখন। কোলাহলে ভরে উঠেছে। উঠোনে সকলের হাঁটা চলা ও কথা বলার শব্দে ঘুম ভেঙে যায় আসমার। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ে না তার বিয়ে হয়েছে। এক আনন্দময়তার আস্বাদ তার বুকের ভেতর ভার হয়ে ঠেলে আসে। সেই আনন্দের সজাগতার ভেতর চকিতেই তার মনে পড়ে যায়, গতকাল তার বিয়ে হয়েছে। গতরাতে সে স্বামীর পাশে শুয়েছিল। আর স্বামীর সঙ্গে রাত জেগেছে বলে বেলা পর্যন্ত মা বাবার বিছানায় এতক্ষণ সে ঘুমিয়েছে।

পিঠে কার হাতের স্পর্শ পায় আসমা। পাশ ফিরে দেখে তারই চাচাতো বোন ফুলসুরা তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সমবয়সী। সামান্য ছোট হবে আসমার থেকে। হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে আসমার কাছে। ফুলসুরা তাকে টেনে তোলে। ফুলসুরার হাতের টানে উঠে পড়ে আসমা।

ওদিকে রান্নাঘর থেকে উঠে এসে ঘরের দরজার কাছে চলে আসে

আসমার মা সালেহা। ভোর থেকে উঠেছে। কত কাজ করছে। ধোয়া মোছা ও ঝাঁটপাট, নাস্তার আয়োজন করেছে কোমর বেঁধে। নতুন জামাই-এর জন্যে নাস্তা করেছে। কয়েকজন মেয়েকুটুম আছে, তাদের দেখভাল করছে। সারাক্ষণই সে ব্যস্ততায় কাটাচ্ছে। তার দুই ননদ কনিজা ও খোদেজা তাকে সাহায্য করছে। ওরা সালেহার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ। এই বয়সে সে শাশুড়ি হয়ে গেছে। বয়স যে তার বেশি, তা নয়। জামাইয়ের বয়স বরং তার চেয়ে দু এক বছরের বেশি হবে। শাশুড়ি হবার এক লজ্জাবোধ তাকে ছেয়ে রেখেছে। মাথার কাপড় ফেলে দুপ দাপ এখানে ওখানে চলা-ফেরা করা যায় না, জামাইয়ের চোখে পড়ে যাবার ভয় থাকে। ঘরের দরজার কাছে এসে অনুচ্চ ও শ্বাসাঘাত মেশানো গলায় বলে সালেহা 'ও মা আসমা, ঝপ করে উঠে পড়, জামাই নাস্তা করে নি এখুনো, সেই শরবৎ খেয়েচে। নাস্তা তৈয়ের হয়ে আছে, নাস্তা নিয়ে যা না মা।'

মায়ের দিকে চোখে চোখ পড়ে যেতে কেমন লজ্জা পায় আসমা। অদ্ভুত শিহরন গড়ায় শরীরে।

সালেহা রান্নাঘরের দিকে ফিরে যেতে মুখ তুলে দেখল, তার স্বামী বাজার করে সবে ফিরেছে। এক ব্যাগ বাজার। একটা বড় কাতলা মাছ এনেছে। লিয়াকতের হাত থেকে বাজারের ব্যাগটা নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে যায় সালেহা।

রান্নাঘরের দরজার মুখে সালেহার বড় ননদ বটি পেতে মোরগ খুরথার করছে। সালেহার পুত্রবধূ সঈদা রান্নাঘরের ভেতরে উনুনের সামনে বসে ডিম ভাজছে।

ঘরের ভেতর বিছানায় বসে আঙিনা দেখা যায়। মাসুদ বিছানায় বসে দেয়ালে বালিশ ঠেশ দিয়ে আঙিনায় তাকিয়ে আছে। অনেকের চলাফেরা তার চোখে পড়ে। সকাল থেকে আসমাকে একবারও দেখতে পায়নি। সেই যে ভোরবেলা তার বিছানা থেকে উঠে গেছে, আর আসেনি। এখন বেলা আটটা পেরিয়ে গেছে। আসমার ভাই নণ্টুকে সঙ্গে করে সদর পুকুর থেকে গোসল করে এসেছে। নতুন লুঙি গেঞ্জি পরেছে। চমৎকার একটা ভাললাগা বোধ তার মধ্যে এসেছে। মল্লিক বাড়ির যৌথ দলিজে, এক টেরে, একা একা অনাত্মীয়ের মত বাস ছিল তার এতদিন। আজ সে এই বাড়ির জামাই। আগের সঙ্গে এখনের কত তফাৎ! অন্তঃপুরে বসবাসের সঙ্গে অন্তঃপুরিকাকে সে পেয়েছে। প্রায় বারো বছর নিদারুণ একাকিত্ব ও অবহেলার পর আজ

তার নতুন জন্ম হয়েছে। আজ তার সকলের কাছে আদর বেড়েছে। বিচ্ছিন্নতা ঘুচেছে। ব্যক্তিগত একাকিত্ব ও অসহায়তা ঘুচেছে। আসমা তার বউ হয়েছে। শূন্যতা আর নেই। বেশ ভরে উঠেছে। সামাজিক প্রতিষ্ঠাও তার তৈরি হয়। সে জন্যেই তার মনের ভেতর এক পরিতৃপ্তির আবেশ তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এমনকি জাহিরাকে জীবনে পেল না এই আশাহীনতার ভেতরও এই আবেশের কোনো বিরোধ হচ্ছে না। এমনকি আসমা তার চোখে একদম এক কিশোরী, এই সঙ্কোচও তাকে তেমন বিরোধিতা দিচ্ছে না, আত্মতৃপ্তির ক্ষেত্রে। বরং ব্যক্তিক স্বার্থে সে মজে উঠছে, ভরে উঠছে। তার থেকে আসমা প্রায় আটাশ বছরের ছোট। তবুও। এমন ত হয়েই থাকে। এমন ত ঘটেই থাকে। অনেকে বুড়ো বয়সে কচি বয়সের মেয়েকে বিয়ে করে ফেলে। তার এরকম বিয়েটাও আশপাশের ঘটনা দৃষ্টান্ত ও বাস্তবতার সঙ্গে বেশ এঁটে যায়।

আঙিনায় জাহিরাকে একবারও দেখতে পেল না মাসুদ। মনে পড়ে যায় রাত্রির ঘটনার কথা। অন্ধকার রান্নাঘরের ভেতর গতরাতে জাহিরার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিল সে। এটা ছিল একেবারে স্বপ্নের মত ঘটনা। যার মধ্যে কোনো বাস্তবতা নেই। ফলে ঘটনার কোনো আবেশ থাকে না। জাহিরাকে জীবনে পাবার আর কোনো উপায় নেই। বিয়ের আগে যদি জাহিরাকে নিয়ে পালিয়ে যেত সেটা আর এক রকমভাবে নতুন জীবন পেত মাসুদ। যেহেতু আসমার সঙ্গে তার বিয়েটা হয়ে গেছে, সেহেতু, এই জীবনের হাতে চলে যায় মাসুদ। এবং পরিতৃপ্ত হয়ে ওঠে। পরিতৃপ্ত হয়ে উঠতে চায়ও। এই নতুন পর্বান্তরকে সে ভালবেসে ফেলে।

একরাত্রি আসমাকে পাশে নিয়ে শুলেও ভাব ভালবাসা একদিনেই যে তৈরি হয়ে যায় তা নয়, এটা মনে হয় মাসুদের। বসবাসের নিবিড়তার ভেতর তৈরি হয় তা।

সকালবেলা শ্বশুরমশাই এসে দেখা করে গেছে। এ বাড়ির বড়ভাইকে সে বাবা বলেছে। আসমার বড়চাচাও খবর নিয়ে গেছে। সে এ বাড়ির কর্তা। সব ভাইয়ের মুরুব্বি। ফিরোজ আলি মল্লিক খুব রাশভারী লোক। তার কথাতেই আসমাকে বিয়ে করতে হয়েছে। কেননা মাসুদ ছিল তারই আশ্রিত। সকলেই তার আদেশ ও ব্যবস্থা মেনে নেয়। গোসল করে এসে বিছানায় সেই সবে বসেছে, দরজার বাইরে মেয়েদের গায়ে গা-দিয়ে হাসাহাসি

শুনতে পায় সে। তারপর রাণীর সঙ্গে আজমিরা আর ফুলসুরা সরবৎ নিয়ে তার ঘরে ঢোকে। রাণীর বয়স বছর দশ। ফুলসুরা আসমার বয়সী। আজমিরা আরো একটু ডাগর ও বয়সে মনে পরিণত। এবং চটুলও। খুব সুন্দর কথা বলতে পারে। অনেকটা ঝকঝকে দেখায় আজমিরাকে। আসমার ফুপুর মেয়ে। বিয়েতে এসেছে। চাহনিতে বেশ টান আছে, আকৃষ্ট করতে পারে। মেলামেশায় চটপটে ও উজ্জ্বল। কেমন যেন এক ধরনের চোখে লেগে যায় আজমিরাকে।

এ বাড়ির পুরুষরা কেউ আজ আর কাজে যায় নি। ফিরোজের বড় ও মেজ ছেলে বাদে সকলেই রাজমিস্ত্রি। ফিরোজের দুই ছেলে আহাদ ও আসাদ ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। কলকাতায় দোকান গড়েছে। আর সব পুরুষদের নিয়ে ফিরোজমিস্ত্রি কাজে যায়। ফিরোজের নেতৃত্বেই কাজের একটা দল গড়ে উঠেছে। তারা অন্তঃপুর আর দলিজঘর করে বেড়াচ্ছে। এদের প্রবেশ নির্গমন বাদ দিলে অন্তঃপুরিকাদের অন্তঃপুরের নিজস্বতা যেমন চলার তেমন চলে। রান্নাঘরে খাবার তৈরি করা, পুকুরঘাটে মাজাঘষা, জল তোলা, শিশুদের সেবা করা, স্নেহ ও আবেগের স্বরে কথা বলা, একে অপরের সংস্পর্শের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সমস্ত কিছু নিজেদের মত করে চলে। নতুন করে দিন শুরু হবার ভেতর দিয়ে তাদের অন্তঃপুরের জীবনে জেগে ওঠা, বেঁচে ওঠা। উপুড় হয়ে শিলের ওপর নোড়ার ঘষ ঘষ শব্দে দৈনন্দিনের একঘেয়েমি জেগে ওঠে বেজে ওঠে। কোনো নতুন কিছু নয়। কোনো অন্তঃপুর ব্যতিরেক বাইরের কিছু নেই তাতে। এবং অন্তঃপুরিকার নির্দিষ্টতায় তাদের শিল নোড়ার গায়ে দৈনন্দিনতায় জেগে ওঠা বেঁচে ওঠা।

নতুন দিন শুরু হল, নতুন কোনো কথা নেই, নতুন কোনো সাধের পূরণ নেই। নতুন পাওয়া নিয়ে বেঁচে ওঠা নেই। অন্তঃপুরের নির্দিষ্টতায় তাদের চাওয়া পাওয়া, মেলামেশা। অন্তঃপুরের নির্দিষ্টতা ছাপিয়ে কিছু পাওয়ায় তারা নন্দিত নয়। আসমার বিয়ে হত, হবে, হয়েছে, এটাই নির্দিষ্টতার জীবন। এটা নতুন কিছু পাওয়া নয়। এর বাইরে নিজস্বতায় পাওয়া সে আলাদা। যদি জাহিরা মাসুদকে জীবনে পেতে পারতো, তাহলে তা হত নতুন রকম ঘটনা। তার ভেতর বেঁচে ওঠার নতুন প্রাণতা গড়ে উঠতো। সে ঘটনায় নিজস্বতায় জেগে ওঠা হত।

পুরুষরা পুরুষদের মতই চলে। অন্তঃপুরে প্রবেশ ও নির্গমনের ভেতর

তাদের স্বচ্ছন্দ চলাচল। স্বচ্ছন্দ অধিকার। অন্তঃপুরিকাদের নিজেদের মত করে ব্যবহার করবার অধিকার নিয়ে তাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ ঘটে। নারী-শরীরের সঙ্গে মনও যেন সহজ আয়ত্তে থাকে। তার কোনো বাঁকাটেরা হবার জো নেই। হওয়ার কোনো উপায়ও নেই। শরীরের সঙ্গে মন মিলেমিশেই থাকে। মন তবু গোপন করা যায়, কিন্তু শরীর গোপন করা যায় না। হয়তো কেন, হয়েই থাকে, শরীর থেকে মন বিচ্ছিন্ন। শরীরই পায়। মনের সহজ-লভ্যতায় শরীর দেয়, মনের বিচ্ছিন্নতাকে সরিয়ে রেখে। এমনভাবেই দিন বয়।

এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে মরিয়মের। সত্তর পেরিয়ে গেছে। অভিজ্ঞতার অভিঘাতে ঝামার মত কঠিন হয়ে উঠেছে মরিয়ম। কত যে দিন বয়ে গেছে তার মন ও শরীরের ওপর দিয়ে! নরম পলির মত মনে আবেগ যে অবশিষ্ট নেই, তা নয়। সে সব কুসুমের মত প্রস্ফুটিত নরম বাসনা তার কল্পনা, কল্পনাই। বাস্তব নয়। যেহেতু সে সব স্বপ্নকামনার থেকে বাসনাকে সরিয়ে রাখতে পারে, অভিজ্ঞ হয়ে ওঠার জন্যে। যে কারণে আসমার সঙ্গে মাসুদের বিয়েটা তার কাছে বাস্তব মনে হয়। জাহিরা যে মাসুদে মজেছিল, এটা জানলেও, এই মনের কুসুমকামনা উপলব্ধি করলেও, এই ঘটনার পক্ষে তার অংশগ্রহণ নেই, বরং এ ঘটনাকে অবাস্তব করে তুলতেই তার তৎপরতা সে দেখিয়েছে। সেও নারী, তবুও। কেননা সে এই গতির ওপর বাস করে এসেছে, জীবন অতিবাহিত করে এসেছে। সে নারী হয়েও নারীর বাসনার বিরুদ্ধে তাকে যেতে হয়েছে। আসমা সাবিরকে ভালবাসতো জেনেও মাসুদের সঙ্গে আসমার বিয়ে হওয়া সে চেয়েছে। আসমার মন তৈরি করতে আসমাকে বুঝিয়েছে যাতে মাসুদকে বিয়ে করতে মন তার সে অনুকূলতা পায়। আর মেয়েরা চমৎকার সান্ত্বনার হাতে চলে যেতে পারে। আকাজ্ক্ষা অবদমনের হাতে পড়তে ভালবাসে। জাহিরার মনের আকাজ্ক্ষার বেদনার সঙ্গী হতেই, জাহিরার মনের কথা বুঝতে পেরে, তার জেনে যাওয়ার কথা বলেছিল। আগে থেকেই জানতো মরিয়ম। এ সংসারে স্বামী ছেড়ে কি অবহেলায় থাকে সে। তার অত রূপ নিয়েও সে অনাদরে দিন কাটায়। স্বামীর সংসারে সতীন। সতীনের সংসার করবে না বলে আর যায়নি। এই না যাওয়াটা জাহিরার এক প্রতিবাদ। নিজস্বতায় প্রস্ফুটিত হওয়া। পুরুষ সতীন আনলেও মেনে নেয়াই বাস্তবিক। মেনে নেয়নি জাহিরা। তার স্বামী

মহবুবকে ত্যাগ করেছিল। দুই কন্যা ও এক পুত্রসন্তান থাকা সত্ত্বেও। জাহিরার এই ব্যবহার পছন্দ হয়নি মরিয়মের। স্বামী যেমনই হোক, সে ত স্বামী। তার বিশ্বাসে মৃত্যুর পর পুনর্জাগরণের সময় সেই স্বামীকে পরম হিশেবেই পাবে। মেয়েছেলের জীবন কষ্টের, এটাও তার এক বিশ্বাস। স্বামী ছেড়ে আসাটা তার পক্ষে অনাসৃষ্টি হয়েছিল। মেয়েছেলের নশিব কেউ খণ্ডাতে পারবে না। তেমনি জাহিরার পক্ষে মাসুদের প্রতি প্রণয়াভিসার সে চায়নি। জাহিরা বুঝি মাসুদকে জীবনে চেয়েছিল। এটা জাহিরার অন্যায়। মন আকৃষ্ট হওয়াতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু জাহিরার প্রেমে পড়ার ঘটনায় যাওয়া অন্যায়, অহিত। এই প্রেমে পড়ার ভেতর নিজস্বতায় প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে চেয়েছিল জাহিরা। অনেক বেশি ঝুঁকি সে নিয়েছিল। অনেক বেশি সংসারের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল। অনেক বেশি মুখর হয়ে উঠেছিল। অনেক বেশি সমাজ-বিরুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। স্বামী সন্তান আছে, তবুও সে মাসুদের সঙ্গে গোপনে ভাব ভালবাসা করেছে। এটা কতখানি জাহিরার পক্ষে কলঙ্ক হয়, মরিয়ম বোঝে। মরিয়ম এটাকে রোধ করতে চেয়েছে। রোধ হয়েছে। জাহিরার মন পুড়েছিল, তাকে সান্ত্বনা দেয়া উচিত মনে করেছিল, সান্ত্বনা দিয়েছে।

পরচালনায় বসে চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে এসব কথা ভাবে মরিয়ম। জাহিরার জন্যে মন ভার হয়ে থাকে। যেমন কেউ অন্যায় করলে, তাকে শাসন করার পর মন ভার হয়ে থাকে, তেমন দশা হয় মরিয়মের। জাহিরা বড় কষ্ট পেয়েছে, কষ্ট পাওয়ারই কথা। এতদূর এগিয়ে যাওয়ার পর, সমস্ত আশা সরে গেলে কষ্ট লাগবে খুব। নিশ্চয়, আঘাতে জর-জর হয়ে কোথাও কোনো ঘরের বিছানায় শরীর খারাপের ভাণে পড়ে আছে। জাহিরাকে স্নেহ করবার জন্যে মন বড় ব্যাকুল হয়ে থাকে মরিয়মের। নানা কথায় তার মন ভাল করিয়ে তুলবে সে। তার গায়ের পাশে জাহিরাকে চাইবে। মন ভাল করবার জন্য ভাল ভাল, আবেগ নিয়ে, স্নেহ নিয়ে কথা বলবে। রুপোর একখানা গলার হার ও গোটা তিন মাথার কাঁটা আছে মরিয়মের। সময় বুঝে, তাকে ওগুলো দেবে, এই আশ্বাস দেবে এবং চুক্তি করবে সে। তার নিজস্ব রেকাবি, ডাবর ও জাঁতিখানা তাকে দেবে, এটা সে স্থির করে, এবং সান্ত্বনার স্বরে এসব প্রতিশ্রুতি সে দেবে। তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সে এসবের উত্তরাধিকারিণী হবে। একথায় জাহিরা বরং ব্যথা পাবে। তার

দাদির মৃত্যুর কথা নিজের মুখে বলতে বারণ করবে। আহা, কত আদরের নাতনি। এ বাড়ির প্রথম সন্তান জাহিরা। কত আদরে মানুষ হয়েছে। দুঃখ কষ্টের নশিব করেছে বলেই না আজ তার অনাদর, অবহেলা। এ সংসারে ও জীবনে তবুও স্বামী ও পুরুষের সঙ্গ, তার একটা আলাদা পরমতা আছে। সে সব পায়নি জাহিরা।

ফুলসুরা পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল, তাকে ডাকে মরিয়ম। 'নতুন জামাইয়ের নাস্তা হয়েছে?'

ফুলসুরা থেমে যায়। 'এই গা ধুয়ে এল আসমা। আসমাকে নিয়ে এই নাস্তা করাতে যাব দাদি।'

মরিয়ম হেসে ফেলে। 'ভাতারের কাছে শুলে তুইও সকালবেলা গা ধুবি লো।'

'দাদি!' দাদির কথায় রেগে জ্বলে ওঠে ফুলসুরা।

'পরের বছর তোরও বে হবে।'

'আমি বিয়ে করলে ত।'

'না, তোমাকে তাক কেটে বসিয়ে রাখবে। কথা দেখ ধিঙ্গি ছুঁড়ির!'

ফুলসুরা লজ্জায় লাল হয়ে চলে যায়। পেছন থেকে এসে কে যেন তার গায়ে হাত দেয়। চমকে ওঠে ফুলসুরা। পাশ ফিরে দেখে আজমিরা। দুজনে হেসে কুটিপাটি। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে হাসে।

ওদেরকে আসমার মা হাতছানি দিয়ে ডাকে। আসমার মায়ের মাথায় ঘোমটা। নাস্তার প্লেট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পরচালায়।

ফুলসুরা ও আজমিরা ছুটে গিয়ে হাতে হাতে নাস্তার প্লেট নেয়।

দরজার ফাঁক দিয়ে এটা দেখতে পায় মাসুদ। আসমাও তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে জলের জগ গেলাস ও দস্তরখান। নতুন একটা ছাপা শাড়ি পরেছে। মাথায় আঁচল তুলে দিয়েছে। এটা দেখে মাসুদের মনে এক নিমগ্নতা ও অপেক্ষা তৈরি হয়। মৃদু চঞ্চলতার ভেতর নিবিড় হয়ে থাকে। তার নববধূটি তার কাছে এখন আসবে।

গায়ে গা ঠেশিয়ে চঞ্চলতা ও চপলতায় হাসতে হাসতে মাসুদের ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে তিনজন। আগে ঢোকে আজমিরা ও ফুলসুরা, পরে আসমা ঢোকে। কি চমৎকার দেখায় আসমাকে। রাত্রিবেলা একঘরে ও এক বিছানায় শুয়েও, এখনের দেখায় আসমাকে নতুনতর ও অপরিচিত ঠেকে।

আসমার সঙ্গে পরিচিত হয় নি যেন। বিয়ের পর সত্যিকারের ভাব ভালবাসা হয়নি, চেনা জানায় তারা নিবিড় হয় নি। এক-রাত্তির এক-বিছানায় পাশাপাশি রাত কাটালেও। শরীরের সম্পর্ক শরীর দিয়েই হয়—তাতে শুধু শরীর দখলের অধিকার পেলেই হয়, কোনো বাধা থাকে না। চেনাজানার নিবিড়তা, সম্পর্ক অন্য জিনিশ, তা ঘটনার ভেতর মনের স্পর্শ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠে। তেমন চেনাজানা হয়নি আসমার সঙ্গে। সে কারণেই এ মুহূর্তে আসমাকে অচেনা ও অপরিচিত লাগে।

মৃহূ এক পলক চোখে চোখ পড়ে আসমার সঙ্গে। আসমা লজ্জায় পেছন ফেরে। জগের জল চলকে পড়ে। আসমার বাঁ পায়ের আঙুলগুলির ওপর জল পড়ে। পায়ে আলতার প্রলেপ।

আসমা মেঝেয় মাদুর বেছায়। দস্তরখান মেলে।

মাসুদের দিকে এগিয়ে আসে আজমিরা। 'ভাই, কি হল, এখনো উঠছো না?'

মাসুদ বলে 'আমাকে হাত ধরে তুলতে হবে।'

আজমিরা হাত ধরে টানে মাসুদের। আজমিরার পেছনে ফুলসুরা এসে দাঁড়িয়েছে। একটু তফাতে দেয়ালের দিকে দাঁড়িয়ে আড়চোখে বিছানার দিকে তাকিয়ে আছে আসমা। ঘোমটা ও নতুন শাড়িতে লজ্জাবনত হয়ে আছে।

সহসা আজমিরার হাত ছাড়িয়ে আজমিরার ডান হাতটাই চেপে ধরে মাসুদ। আর এই ঘটনায় হি হি করে হেসে ওঠে আজমিরা।

এই ঘটনা দেখে মন ব্যথা পায় আসমার। আজমিরার হাত ধরেছে মাসুদ।

মাসুদ বলে 'এবার কেমন মজা!'

'মজা কী দেখাবে শুনি? চুড়ি ভেঙেছে দুটো, কিনে দিতে হবে।'

চুড়ি ভাঙার কথা শুনে হাত ছেড়ে দেয় মাসুদ। অথচ চুড়ি ভাঙেনি।

হি হি হাসিতে গড়ায়, ফুলসুরার গায়ে ঢলে ঢলে পড়ে আজমিরা। 'কই হাত ধরে রাখতে পারলেনি ত ভাই?'

মাসুদ আজমিরার নাটুকেপনার কাছে হেরে যায়। স্মিতমুখে আজমিরার দিকে তাকিয়ে থাকে। আর দেখে।

'আচ্ছা, এবার আমি হাত ধরছি, এস, নাস্তা খাবে এস।'

আজমিরার নরম হাতের টানে নেমে আসে নীচে মাসুদ। আজমিরার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে। চকিতে আসমার দিকে তাকায়। আসমা কেমন লজ্জা ও ধূসরতায় স্থির দাঁড়িয়ে আড়চোখে দেখছে।

আজমিরা সিলিপচি টেনে জলভরা গেলাস বাড়িয়ে দেয় মাসুদের দিকে।

মাসুদ গেলাসের জলে হাত ধোয়। তারপর আজমিরার হাত ধরে টেনে হাত ধোয়ায়। 'নাস্তায় বসতে হবে।' তারপর ফুলসুরাকে টেনে আনে আজমিরার পেছন থেকে।

ফুলসুরা বলে 'আমার হাত ধোয়া আছে।'

ফুলসুরার হাত ছেড়ে দেয় মাসুদ।

আসমা জানলার দিকে সরে যায়। জানলার বাইরেটা দেখে। দূরের পুকুর ও গাছগাছালি দেখে। পুকুরে এক পাল হাঁস চরছে দেখতে পায়। ওরা খাচ্ছে, নানা কথা বলছে। ইয়ার্কি ফাজলামো করছে। এসবের থেকে সরে এসে নিভৃত দাঁড়ায় সে। মনে কেমন ব্যথা লাগে তার। কিন্তু এ ব্যথা কাউকে বলবার নয়। আজমিরা যেমন কথায় ব্যবহারে কেতাদুরস্ত, তেমন নয় সে। সে তার ব্যবহারের ভেতর সকলকে ম্লান করে দেয়। তার দিকেই তাকিয়ে থাকতে হয় সকলকে। তার স্বামীও তাকিয়ে থাকে। স্বামীর তাকিয়ে থাকতে ভাললাগে এটা বোঝে আসমা। আজমিরার ওপর রাগ হয়, কিন্তু কিছু বলতে পারে না। বলা যায় না। বোনাইয়ের সঙ্গে শালি ফাজলামো করবেনা কেন? তার স্বামীকে নিয়ে আজমিরার মস্করার উচ্চকিত উচ্ছলতার থেকে সরে এসে জানলার কাছে নিভৃত হয়ে পড়ে আসমা। একদিন মাত্র তার বিয়ে হয়েছে। তবুও, তার স্বামী আজমিরার সঙ্গে এমনতর ব্যবহার করলে তার বুকে বড় বাজে। মাসুদের সঙ্গে তার তেমন মেলামেশা, সম্পর্ক গড়ে না উঠলেও, একদিনের বিয়েতেই সে এই রকম ব্যবহারে যথেষ্ট আহত হতে পারে। যথেষ্ট গাঢ় হতে পারে।

হঠাৎই বাড়ির আঙিনায় হৈ হল্লা শুরু হয়। আসমা চকিতে জানলা থেকে মুখ ফিরিয়ে খোলা দরজার দিকে তাকায়।

ঘরের ভেতর মাসুদ আর আজমিরাদের হাসি মস্করা থেমে যায়।

আঙিনার হৈ হলা আরো বাড়ে। ভারী হয়ে ওঠে।

আজমিরা ও ফুলসুরা পাত থেকে উঠে পড়ে খোলা দরজা দিয়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে যায়।

মাসুদের সঙ্গে আসমার চোখাচখি হয়। আসমা চোখের ভাষায় জানাল সে জানে না, কী হয়েছে। ওই প্রথম সে চোখে-চোখে কথা বলল তার স্বামীর সঙ্গে। ঘটনার ভেতর সম্পর্কের এক নিবিড়তা তৈরি হল। দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় আসমা। দরজার পাল্লায় বাঁ-হাত ঠেকিয়ে আঙিনার দিকে চেয়ে থাকে। জটলার দিকে তাকায়। সে বুঝতে পারে, তার পেছনে মাসুদ এসে দাঁড়িয়েছে। এবং তাকে ছুঁয়ে দাঁড়িয়েছে। তাকে মাসুদ ইচ্ছাকৃত স্পর্শ করতে চাচ্ছে।

বালিকা রীণা ছুটে এসে আসমার সামনে দাঁড়ায়। 'ও আসমা বুবু, জাহিরাবুবুকে কুথাও পাওয়া যাচ্ছে নি।'

আসমার গা থেকে হাতের স্পর্শ সরিয়ে নেয় মাসুদ এই সংবাদের আঘাতে।

মরিয়ম তার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আকুলি বিকুলি করে আঙিনার জটলার উদ্দেশ্যে 'ওগো তোরা বলনা কী হয়েছে?

আঙিনায় মেয়েদের জটলা। তার ভেতর থেকে এ বাড়ির বড়কর্তার বড় পুত্রবধূ আয়েসা বেরিয়ে এসে দাদি শাশুড়ির সামনে চলে আসে।

মরিয়ম বুড়ি চিল চেঁচিয়ে আকুলি বিকুলি করে 'ওগো কী হয়েছে বলনা?'

আয়েসা বলে 'ওগো দাদি জাহিরাবুবুকে ঘরে দোরে পুকুর ঘাটে আগানে বাগানে পাড়াপড়শিদের ঘরে কুথাও পাওয়া যাচ্ছে নি।'

মরিয়মের গাল হাঁ হয়ে থাকে। জাহিরাকে ঘরে দোরে না পাওয়ার ব্যাপারে সে জানে ও বোঝে। সে ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে। আহা, কি সুন্দর মেয়েটা, বুকে ব্যথা পেয়েছে!

বর্ষা এসে গেল। বৃষ্টির দিন এসে গেল। খেতে চাষের কাজ চলছে। জলাজমি জলে পরিপূর্ণ। ছড়ানো ছেটানো দূরাগত শব্দ, কথা, চিৎকার নিকটে এসে মেশে। আর নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বৃষ্টিপাত হয়ে চললে একাকিত্ব ও নিমগ্নতা বাড়ে। নিজের সঙ্গে কথা বলা ঘটে। পাকে পাকে বিদ্যুৎলতার মত আত্মদাহ ও ক্রোধ মারে। স্বপ্নসাধের আশাহীনতা ভার হয়ে আসে। বর্ষার দিন বড় মনকে পোড়ায়। মনের সাধ ও আশাহীনতাকে জাগিয়ে তোলে। মেঘ ব্যেপে নেমে আসার ভেতর এক ধরনের বিচ্ছিন্নতার আবহ তৈরি হয়। নিষ্ফলতার জীবন পেলে, নিষ্ফলতা ঘিরে ধরে। জীবনের বড়

আঘাত থাকলে, সেই আঘাতের বেদনা জেগে ওঠে ধিকি ধিকি তুষের আগুনের মত। যেমন সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে আকাশ তারায় তারায় ছেয়ে যায়। ছেয়ে ওঠে জাহিরা। ব্যথায় ও ক্রোধাগ্নিতে। ক্রোধ জ্যা-এর বুকে তীরের ফলা যেন, টান টান ধরে রেখেছে এক নিপুণতায়, এক স্থির লক্ষ্যে। দাদি মরিয়মের প্রতি তার যে সংকল্প তার থেকে একচুল সরে যাওয়া নেই। কিছুতেই দাদিকে ক্ষমা করতে পারবে না সে। দাদি তাঁর অনেক বেশি প্রীতি ও ভালবাসার ছিল বলেই জাহিরার ক্ষমাহীনতা ও ক্রোধের এত তীব্রতা। এতই সে নিষ্ঠুর!

মরিয়ম জানে, সে মাসুদ আলিকে ভালবাসে। তার চাচাতো বোন আসমার সঙ্গে মাসুদ আলির বিয়ে হয়। স্বামীর কঠিন সংসার থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসিত হয়ে বাপের ঘরে মাসুদ আলির সঙ্গে গোপন প্রেম বজায় রাখতে চেয়েছিল সে, মাসুদের সঙ্গে আসমার বিয়ে হয়ে যাবার পরও। মাসুদকে জীবনে না পাবার আশাহীনতার ভেতর এইটুকু অবশিষ্ট আকাঙ্ক্ষাসাধ সে সর্বস্ব করেছিল। এ কথা জেনে ফেলে মরিয়ম। এই জানার ভেতর ও বাড়িতে থাকা সম্ভব নয়, বিশেষত মরিয়মের জীবিতাবস্থায়। মরিয়মের চোখ তাকে সারক্ষণ অনুসরণ করবে। মেয়ে হয়ে আর এক মেয়ের শত্রু সে। এক্ষেত্রে মরিয়মকে ক্ষমা করবার কোনো সান্ত্বনা খুঁজে পায়নি জাহিরা। সান্ত্বনার তার দরকারও নেই। সেই স্বামীর ঘরেই ফিরে এসেছে। দাদির মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত সে ও বাড়ি যাবেনা। এ কঠিন সংকল্প। এই কঠিন সংকল্পের থেকে তার নড়চড় নেই। যদি সে এই সংকল্প থেকে সরে যায়, তাহলে সে জীবনতৃষ্ণা থেকে সরে যাবে। সে এ সংকল্প থেকে দাদির বিরোধিতা করে। তার আর মাসুদের প্রেম দাদির কাছে কোনো মূল্য নেই। দাদি শুধু সান্ত্বনা দিয়ে এই সম্পর্কের সঙ্গী হতে চায়। আর কিছু তার কাছ থেকে পাবার আশা-উপায় ছিল না। কোনো উদারতার পথ সে খোঁজেনি। বরং সংকীর্ণতা দিয়ে উদারতাকে রোধ করতে চেয়েছে। তার কাছ থেকে মানবসম্পর্কের সমর্থনের কোনো নির্ভরতা খোঁজা বৃথা। অথচ সে ঐ বাড়ির সবচেয়ে বয়ঃজ্যেষ্ঠা ও প্রবীণা। তার কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সে যথার্থ পালন করেনি। সেই দাদির মৃত্যু সে চেয়েছে। বরং সে দাদির মৃত্যুর পর মিস্ত্রিবাড়িতে পা দেবে, এই তার সংকল্প ও কঠিন ব্রত।

এই সংকল্প রক্ষা করতে গিয়ে নিজেকে আরো মেরেছে জাহিরা। এই

সংকল্প রক্ষার যাবতীয় কষ্ট তাকে সইতে হচ্ছে। মাসুদকে চোখের দেখাও দেখতে পায় না। দেখার এই সংক্ষিপ্ত সাধটুকুও তার হাত থেকে চলে গেছে। মাসুদকে জীবনে পাবার সম্ভাবনা যেখানে তৈরি হয়েছিল, অথচ। সে জন্য সে দায়ী। তার ভীরুতা দায়ী। সমাজ সংসার দায়ী। ছোট বোনের ওপর বড় বোনের স্নিগ্ধ স্নেহ দায়ী। এসবের ভেতর থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে পারতো না যে তা নয়। মুহূর্তের দ্বিধার ফাঁকে সে সম্ভাবনার মৃত্যু হয়েছে। সময় পায় নি সে। যেন নিয়তির হাতে তাকে কজা হতে হয়েছে। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজেকেই যেতে হয়েছে।

ঝর ঝর বৃষ্টি ঝরেই চলে। আকাশ কালো করে বৃষ্টি নেমেছে। তাদের বাড়িটা পাড়ার পেছনে। সামনে দুচারটে বাড়ি আছে। পেছনে আদিগন্ত মাঠ। ঘরের জানলায় মাঠ নেমে আসে। খেত দিগন্ত। খেতে ছড়ানো ছেটানো শব্দ ধেয়ে আসে। বৃষ্টির ভেতর গোটা খেত এখন ঝাপসা হয়ে আছে। গাছগুলি বৃষ্টি মাখে, বৃষ্টিবাতাসের দোলায় দোলে। তেমনি দুলতে থাকে জাহিরা। এখন বর্ষার বৃষ্টিপাতে মুখর একাকী দুপুর। ঘরের ভেতর হালকা অন্ধকার ছেয়ে আছে। মৃদু আলোর ভেতর কাঁথা সেলাই করতে থাকে জাহিরা। এই কাঁথা সেলাইয়ের ভেতর এই সংসারে থাকার এক বোঝাপড়া তার তৈরি হয়। সামনে শীত আসছে। শীতে লাগবে এই কাঁথা। এ সংসারে থাকার এই দৈর্ঘ্য সে মেনে নেয়।

সেদিন ভোর রাতে দাদির ঘর থেকে যখন বেরিয়ে আসে, তখন আকাশে তারা ছিল দু চারটি। এবং রাত্রির শব্দ, মানুষের কোলাহলহীন নীরবতা। আট দশ কিলোমিটার পথ হেঁটে স্বামীর সংসারে ফিরে এসেছিল। যখন এখানে আসে তখন বেশ সকাল হয়ে গেছে। রোদে তাপ তৈরি হয়েছে। কল কোলাহলে গ্রাম পাড়া মুখর হয়ে উঠেছে। খিড়কির পথ দিয়ে উঠোনে উঠে এসেছিল। স্বামী তার আগে কাজে বেরিয়ে গেছে। শাশুড়ির সঙ্গে প্রথম দেখা হয়। তারপর ঘরজামাই ননদাই ছুটে আসে, ননদ ছুটে আসে। তারপর তার সতীন। সতীনকে সেই প্রথম দেখে সে। সকলে তাকে দেখছিল, সে যেন দেখার মত এক জীব, এমন চোখে। শাশুড়ি তাকে জেরা করেছে, কেন সে এসেছে? জাহিরা বলেছে, সে এখানে থাকবে, তার অধিকার আছে, এটা তার স্বামীর ঘর। এবং ভয় দেখায়, যদি তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়, তাহলে সে পঞ্চায়েতে যাবে। প্রধানকে বলে বিচার চাইবে।

এখানে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না বলে এতখানি জোর সে খুঁজে পায়। পঞ্চায়েতের শাসানিতে কাজ হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে সংসারের সমস্ত কাজ নিজের হাতে তুলে নিয়ে এ সংসারে থাকার এক যোগ্যতা অর্জন করে জাহিরা। কেন না শাশুড়িকে অনেকটা কাজ করতে হত। কারণ তার সতীন প্রথম পোয়াতি। সংসারটা নিজের হাতে তুলে নেয় জাহিরা। সংসারে সকলের কাছে নিজের প্রয়োজন তৈরি করে। জাহিরার স্বামী মইবু এসব দেখে দেখে জাহিরার থাকাটাকে স্বীকৃতি দেয়। জাহিরা ত আর স্বামী চায়নি, চেয়েছে আশ্রয়। নিজের পরিশ্রমের বিনিময়ে থাকা খাওয়ার নিশ্চয়তা। সেটা তার অধিকারে চলে আসে, দু চারদিনের মধ্যে। দু মাস হল এসেছে, স্বামীর সঙ্গে কথা বিনিময় করে না, দাম্পত্যে যায় না। স্বামীর কথা শোনে। কিন্তু তার প্রতি স্বামীর শাসনের অনধিকার তৈরি হয়। কেননা স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের অভিঘাতের ভেতর দিয়েই যে দ্বন্দ্ব তৈরি হত, অধিকার ও শাসন তৈরি হত তার অবকাশ থাকে না। স্বামীর রোষের আওতার মধ্যে ধরা পড়ে না জাহিরা। স্বামীর সংসারে স্বামীহীন হয়ে থাকে সে। থাকতে ভালবাসে, থাকাটা সে রক্ষা করেও। স্বামীর সঙ্গে পূর্বসম্পর্কের দোলায় দুলে ওঠে না আর। তার উপায় ছিল না বলে এখানে এসেছে। ভেতরে ভেতরে প্রতি-হিংসা ও ক্রোধে ভরে আছে জাহিরা। স্বামীর থেকে মন সরিয়ে নিয়েছে অনেক আগেই। স্বামীর প্রতি এক ধরনের ঘৃণা ও নির্মোহ অনুকম্পা সে মনে মনে ধরে রাখে। সে জন্যেই সে সতীনের সংসারে এসে থাকতে পারছে। এই থাকা তার পক্ষে এক ব্রতপালন।

এই দুবছরে তার স্বামী আরো খানিকটা রোগা হয়েছে। এবং আরো খানিকটা বয়স বেড়েছে। বয়সের তুলনায় বেশি বয়স দেখায়। আরো বেশি মগুপ হয়েছে। এবং হাড়ে হাড়ে বদমায়েশি বেড়েছে বরং কমেনি। প্রায় দিন সতীনকে নানাভাবে পীড়ন করে। আর সতীন হাসিনা হয়েছে তেমন নিরীহ, মেয়েমানুষ। হাসিনার বয়স কাঁচা। বড় বড় চোখ। রোগা শরীর। সেই শরীরে পেটে সন্তান ধারণের কষ্টই তার পক্ষে বেশি মনে হয়। কোথায় যেন হাসিনার প্রতি এক করুণা তৈরি হয় জাহিরার মনে। নিশ্চয় কাঁচা বয়স এবং নিরীহ বলে। এবং অত্যাচারী স্বামীর শাসনে তাকেই থাকতে হয় বলে, এক দরদ অনুভব করে জাহিরা। যেন মনে হয়, তার পরিবর্তে হাসিনা স্বামীর অত্যাচার সইছে। এই আশ্বাস নিয়েই সতীনকে

মেনে নিতে পারে জাহিরা। দুবছর আগে স্বামীর হাতে বেদম মার খেয়ে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছিল জাহিরা। কিছুদিন পরে নিশ্চয় সে ফিরে আসত; কিন্তু সতীন হল, সতীনের জন্যেই তর আসা হয়নি। সতীন না হলে তার ফিরে আসাটা অনিবার্য ছিল। এবং দাম্পত্যের কিছু আকর্ষণ তাকে ফিরিয়ে আনতো। অবশিষ্ট কিছুই যে ছিল না তা নয়। সেই মন নিয়ে, আশ্বাস আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ফিরে আসা হয়নি জাহিরার। এখন সতীনের প্রতি তার সমবেদনা হয়।

বড় ছেলে আজম তার হাত থেকে একেবারে সরে গেছে। তার বাপ তাকে যোগাড়ের কাজে নিয়ে যায় প্রতিদিন। আরো খানিকটা বড় হয়েছে, ডাগর হয়েছে। দুবছর মায়ের কর্তব্য থেকে সরে যাওয়ায় আজমের মায়ের প্রতি এ বিচ্ছিন্নতা সে জন্যই তৈরি হয়েছে। এক এক বার মনে বড় ক্ষোভ হয় জাহিরার। সে ত আজমের মা। ছেলের প্রতি জোর খাটাতে মনে মনে এক এক সময় উচ্চকিত হয়ে ওঠে জাহিরা। কিন্তু পরমুহূর্তেই গুটিয়ে যায়। তার মেয়ে দুটি অবশ্য তার কাছে আশ্রয় নিয়েছে। বড় মেয়ের বয়স দশ, ছোট মেয়ের বয়স আট। সাহানারা, জাহানারা। ওদের দুপাশে নিয়ে ঘুমোয় জাহিরা। ছোট চিমনির একটু আলোর শিখা ঘরে ধরে রেখে দুই মেয়েকে নিয়ে রাত্রিযাপন করে সে। কখনো অনেক রাত পর্যন্ত জেগে পড়ে থাকে। কখনো সংসারের খাটুনির ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে। যখন ঘুমতে পারে না, তখন অনেক কথা তার মনে পড়ে যায়। অনেক ঘটনার চলচ্ছবি তার চিন্তনকে চঞ্চল করে। সারা শরীর মন তার সংগীতের মত বেজে ওঠে। সে কি করে ভুলবে, তার চলে আসার আগের রাতে মাসুদ তাকে বুকের ভেতর নিয়ে নিয়েছিল। মাসুদ আলির দুই হাতের বেষ্টনির ভেতর ধরা পড়েছিল সে। মাসুদ আলির মুখে মুখ দিয়েছিল?

দুপুরবেলা তার খোঁজ নিতে রাহাত এসেছিল সাইকেল চড়ে। বাকুলে ঢোকেনি। রাস্তায় জাহানারার সঙ্গে দেখা হয়, মেয়ের মায়ের আসার কথা শুনে তখুনি সাইকেল ঘুরিয়ে পালায় রাহাত। জাহিরা যে মারা যায় নি, এই নিশ্চিন্ততা তাদের দরকার ছিল। বাপের বাড়ির সকলের রাগ হয়েছে, না বলে চলে আসার জন্য। রাগ হওয়া স্বাভাবিক। আর জাহিরার পক্ষে চলে আসা ছাড়া উপায় ছিল না। বাপের মতে আসতে গেলে বিলম্ব হত। তার স্বামীর সঙ্গে তার বাবার একটা বোঝাপড়া হবে তবে সে আসতে

অনুমতি পেত। এভাবে আসা ছাড়া উপায় ছিল না জাহিরার পক্ষে। বাপের বাড়ির সকলে তার বিরুদ্ধে চলে গেছে।

কিন্তু কেমন আছে মাসুদ আলি? আসমাকে নিয়ে কেমন সে আছে? নিশ্চয় তার জন্যে মাসুদ আলির মন পোড়ে। প্রথম প্রথম মাসুদ আলিতে আকৃষ্ট হয়েছিল মনে মনে। কিন্তু জাহিরার মন পোড়ে নি তখন। যখন তার জন্যে মাসুদ আলির মন পোড়ার সংবাদ পেল, সেই থেকে সেও পুড়তে লাগল। মাসুদ আলি ওরফে কুটুমভাই ওরফে সরুছুতোর আগ্রহ ও তৎপরতা না দেখালে এতটা মন পুড়তো না জাহিরার। মাসুদ আলিকে মনে মনে ভাল লাগা নিয়ে নীরবে কাল কাটাতো, জানতো না সে কথা সরুছুতোর। রাতের অন্ধকারে তেঁতুলতলায় মাসুদ আলি তার হাত না ধরতো, তাকে ভালবাসার কথা না বলতো তাহলে তার এমন পরিণতি হত না। পুরুষের চাওয়ার হাতে পড়ে সে তার প্রণয় তীব্র অনুভব করেছে। এবং ধীরে ধীরে সে প্রস্ফুটিত হয়েছে। মাসুদ আলির কাছাকাছি থাকা তার শেষ সম্বল হয়ে উঠেছিল। অবশিষ্ট আকাঙ্ক্ষার তার উপায় ছিল। তাও সে হারিয়েছে। ক্ষমাহীনভাবে তার দাদির মৃত্যু চায়। যেমন রকম এ সংসারে আছে, তাতে সেই মুহূর্তে, তখন, তার ফিরে যাওয়া কঠিন হবে না। কারণ এ সংসারে থাকাই তার ফিরে যাবার ব্রত। কেননা স্বামীর অধিকারে সে যায় না, স্বামীর প্রতি কোন অধিকার সে গ্রহণ করে না। নিজের পরিশ্রমের বিনিময়ে খায় থাকে।

মরিয়মের মৃত্যুর মুহূর্ত গোনে, দিন গোনে। সে-অপেক্ষায় থাকে সে। তার দাদির যথেষ্ট বয়স হয়েছে। কোমর পড়ে গেছে। দাঁত পড়েছে, চুল পেকেছে, শরীরের চামড়া লোল ও কুঞ্চিত হয়েছে। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়েছে। তার পক্ষে মৃত্যুর আসন্নতা সবচেয়ে বেশি। মনে মনে দাদির মৃত্যু প্রার্থনা করতে থাকে। সময়ের বিন্দুযাপনের ভেতর।

মেয়ে দুটি ননদের ঘরের পরচালায় তাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলছে। দুপুর ঘন বৃষ্টিপাতের ধারায় ভিজে। বাতাস ঠাণ্ডা ও স্নিগ্ধ। যখন কাজ থাকে না, তখন তার এই ঘরে একা পড়ে থাকে জাহিরা। এমনকি বাড়িতে স্বামী না থাকলেও হাসিনার ঘরে হাসিনার কাছে যায় না। একাকিত্বে থাকাটা নিজেই অভ্যাস করেছে সে। কাজের মধ্যে যখন থাকে, তখনও নির্মোহ ও নৈর্ব্যক্তিক এক ভঙ্গিতে থাকে। নিজের কণ্ঠস্বর ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া লুকিয়ে রাখে। একা ঘরে মৃদু আলোর ভেতর মেঝেয় কাঁথা সেলাই

করছিল জাহিরা নতমুখে, নিজস্ব ভাবনার স্রোতোধারায়। আপাত শান্ত ভঙ্গি এই থাকায়।

মুখ তুলে দরজার দিকে তাকায় জাহিরা। দেখে, তার সতীন হাসিনা দরজার ফ্রেমে শরীরের বাঁ দিকটা ঠেশিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। জাহিরা সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নেয়। হাসিনা একা থাকতে পারছে না। অথচ জাহিরা তার সতীন, তার কাছে সহজ সখিত্বে মিশতে পারে না। হাসিনাকে এভাবেই থাকতে দেয় জাহিরা। হাসিনা তার সতীন, তার প্রতি রোষ তার থাকে। তাকে কষ্ট দেবার প্রতিস্পৃহা তার থাকে। হাসিনা নিরীহ ও শান্ত হলেও। হাসিনার এই অসহায়তাকে সহায় সান্ত্বনা না দেবার ব্যাপারে মনকে-দৃঢ়বদ্ধ কঠিন করে। হাসিনার স্বভাবের মধ্যে ভালমানুষি থাকলেও। হাসিনা যতই শান্ত নিরীহ হোক, সতীন হবার জন্যে এটা তার প্রাপ্য। এরকম ব্যবহার সে হাসিনাকে দিয়েই থাকে। এটা নিশ্চয় হাসিনাও বোঝে। কখনো কখনো হাসিনাকে সঙ্গ দেয়, নানা কথা বলে, সে ত দয়া করুণায়। আর হাসিনার ভাল স্বভাবের জন্যে। হাসিনাকে মুখ না দিলে হাসিনার সাহস নেই জাহিরার সঙ্গে কথা বিনিময়ে যাওয়ার।

জাহিরা এইটুকু বোঝে, হাসিনার পক্ষে এ সংসারে সতীনের ওপর সতীন হয়ে আসবার ব্যাপারে কোনো কিছু করার উপায় ছিল কি? গরিব মা বাবা। খেতে পরতে পেত না। বিয়ে হওয়াই সমস্যা ছিল। সে ত আর বিয়ে করেনি। তার সম্মতি নেয়ার ব্যাপার ছিল না। এমন সংসারে আশাটাকে তাকে মেনে নিতে হয়েছে। কেউ কি চায় সতীনের সংসারে আসতে? জাহিরার এ সংসারে ফিরে আসার ব্যাপারে হাসিনার আপত্তির অবকাশ ও সুযোগ ছিল। সে সুযোগ নিতে পারেনি হাসিনা। কেননা হাসিনা মুখচোরা স্বভাবের। সতীনকে জ্বালাবার জন্যে স্বামীর কান ভারী করতে পারতো। যেমন নিষ্ঠুর স্বামী, সহজেই জাহিরা এ ব্যবস্থার শিকার হত। হাসিনা তা করেনি। হাসিনার ওপর এক ধরনের নিরুচ্চার মিহি স্নেহ তৈরি হয়েছে জাহিরার। আর হাসিনা গর্ভবতী। এরকমটা দেখার ভেতর এক প্রশ্রয় তৈরি হয়। কিন্তু হাসিনা সতীন, এটা ভুললে চলে না তার।

হাসিনার দিকে মুখ তোলে জাহিরা 'এসে বস না।'

হাসিনা তেমনই দাঁড়িয়ে থাকে দরজায় ঠেশ দিয়ে।

জাহিরা তেমন ভঙ্গিতেই কাঁথা সেলাই করে যায়। ইচ্ছাকৃতভাবেই

হাসিনাকে বেশি পাত্তা দেয় না। হাসিনাকে কাছে বসিয়ে কথা বললে নিজের একাকিত্ব ঘুচলেও সে এটা করছে না। আরো একটু ভাল মনে হাসিনাকে কাছে ডাকলেই, হাসিনা তার গায়ের পাশে চলে আসে। কিন্তু জাহিরা ভাল মনে স্বতঃস্ফুর্ত উদারতায় ডাকবে না। কেননা হাসিনা তার সতীন। নিষ্ঠুর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে সে। মুখ নামিয়ে সেলাই করতে থাকে, আর হাসিনাকে গুরুত্ব দেয় না।

হাসিনা দরজায় ঠেশ দিয়ে তেমনই দাঁড়িয়ে থাকে। গর্ভের সন্তানের ভার নিয়ে তার দাঁড়িয়ে থাকা। নিশ্চুপ গাই যেন। বড় বড় চোখ দুটি তেমনই। আগ বাড়িয়ে কিছু অধিকার করবার স্বভাবও নয় হাসিনার। সতীনের দিকে তাকিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। না হাসলেও মুখটাতে তার মৃদু এক হাসি লেগে থাকে। ঠোঁটের এমন গড়ন তার। কম বয়সের মেয়ে। কেমন বাচ্চা লাগে। কম বয়সের পোয়াতিকে আরো স্নিগ্ধ ও সুন্দর দেখায়। আরো মায়া।

মুখ তুলে দেখে জাহিরা, হাসিনা দরজার কাছ থেকে ফিরে গেছে। হাত থেকে ছুঁচ খসে পড়ে জাহিরার। চোখে ঘুম এঁটে আসে। কাঁথার ওপর কাত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

একটু আগেও ঝিম ঝিম হালকা ধারায় বৃষ্টি পড়ছিল। এখন আর বৃষ্টি নেই। জাহিরা রান্নাবান্না এখনো সেরে উঠতে পারে নি। সবে সন্ধ্যার মিহি অন্ধকার নেমে এসেছে। উনুনের পাশে মাটির তৈরি উঠোন পৈঠেতে রাখা শিশির লম্ফটা জাহিরার মুখটাকে আয়ত্ত ধরে রেখেছে। আলোটুকুর মধ্যে মুখটা পাতা রয়েছে। জাহিরার রূপ আছে অনেকে বলে। সেই মুখটা আলোয় খেলছে। মুখটা আলোর ডেলায় ধরা আছে।

'বু!'

পেছন থেকে তাকে ডাকে হাসিনা। জাহিরা হাসিনার দিকে ঘাড় ফেরায়।

'একটু চা বসাও বুবু, আজমের বাপ এয়েছে।'

ঘাড় কাত করে জাহিরা। হাসিনা তাদের স্বামীকে আজমের বাপই বলে। যেমনটা জাহিরা বলতো।

অমনি পরচালা থেকে চ্যাঁচায় তাদের স্বামী। 'মাগিট গেল কোথা?'

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে পরচালায় বসানো হ্যারিকেনের আলোর সামনে এসে পোয়াতি শরীর নিয়ে মইবুর মুখোমুখি দাঁড়ায় হাসিনা।

'লুঙিটা শুকিয়েছে যে দিয়েচিস?'

'গা ধুবার সময় ধুয়েচি, শুকোয়নি। সারাদিন পানি হচ্ছিল।' নীচু স্বরে বলে হাসিনা।

'ফের বিড় বিড় করে মন্তর পড়চিস? গা ধোবার সময় লুঙিটা ধুলি কেন?

চুপ করে থাকে হাসিনা।

'চুপ করে আছে গ্যাখ, চুপ শয়তান! ঠিক রাগের মাথায় সামনে পড়লে মেরে ভূত ভাগিয়ে দুব। শালি, শালির ঘরের শালি। দাঁড়া, ঘরে থাকি একদিন, মাল খেয়ে এসে তোকে শায়েস্তা করছি।'

রান্নাঘরের ভেতর জাহিরা চমকে ওঠে। কাজ থেকে মইবু মদ খেয়ে সন্ধ্যার সময় বা রাতে ফিরলে বিশেষ হুজ্জোত করে না। একটু আধটু বকে। ভালমানুষি স্বরে কথা বলতে চায়। তারপর খেয়ে দেয়ে সটান শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু রাগ জমিয়ে রেখে, বাড়িতে থেকে, কাছে ভিতে মদের ঠেক থেকে মদ খেয়ে এসে ঐ সময় তার জমানো রাগ নিষ্ঠুরভাবে প্রকাশ করে সে। সেটা ভয়ঙ্কর রকম ব্যাপার হয়। বাড়িতে থেকে মাল খেয়ে এসে তৎক্ষণাৎ পেটাবে। স্টেশন থেকে নেমে মদ খেলে দীর্ঘ পথ হেঁটে আসতে আসতে বেশি নেশা হয়ে যায়। তখন নিজেরই দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকে না। একটু বক বক করে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ে। বউকে পেটাবে, এই পরিকল্পনায় বাড়ির কাছে মদ খেয়ে তৎক্ষণাৎ ফিরলে সবে ধরা নেশার মধ্যে প্রচণ্ড হয়ে ওঠে, ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। মইবুর এরকম স্বভাবটা চেনে জাহিরা। এটা এক ধরনের মানুষের এক ধরনের স্বভাব। আজ মদ খেয়ে আসে নি। স্বাভাবিক অবস্থায় রেগে উঠলেও মারছে না। মারবে যখন পরিকল্পিত ভাবে মদ খেয়ে এসে মারবে। কাজ থেকে ফেরার সময়ে মদ খেয়ে ফেরার মধ্যে সেটার তফাৎ অনেকখানি। তখন কোনো জ্ঞান থাকে না মইবুর। একেবারে শয়তান উগ্রচণ্ড হয়ে যায়। মইবুর এ কথা শুনে সে জন্যে চমকায় জাহিরা। এরকমভাবে তাকে কতবার মেরেছে। শেষবার প্রচণ্ড মার খেয়েই সে চলে যায় বাপের বাড়ি।

এ-এক অদ্ভুত স্বভাব লোকটার। অদ্ভুত রকম লোকটা।

তাদের স্বামীর চিৎকার থেমে গেছে। স্বাভাবিক অবস্থায় একটু চ্যাচা-

মোচ করে। তারপর তখুনি নেমে যায়। তাতে মনে হতে পারে মানুষটা সত্যিই ভাল। সে যে বিনা দোষে রাগারাগি করে একথাও সত্যি নয়।

এই মুহূর্তে আঙিনা জুড়ে এক নীরবতা এঁটে থাকে।

মইবু পরচালায় তেলাইয়ের ওপর হ্যারিকেন পাশে নিয়ে বসে। মা ছুটে আসে। পাড়ায় ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনার অগ্রগতি ছেলেকে জানায়। খুব আত্মীয়স্বরে ছেলের সঙ্গে কথা বলে। পাশের ঘর থেকে মইবুর বোন রশিদাও ছুটে আসে। মা ছেলে মেয়ে তিন জনে আত্মীয়তার এক পরিমণ্ডল তৈরি করে। হাসিনা তাদের থেকে আলাদা হয়ে যায়। জাহিরা ত আলাদা হয়েই থাকে।

চা খেতে খেতে কথা শোনে কথা বলে মইবু। একটা সহজ ও স্বাভাবিক পরিবেশ গড়ে ওঠে এই মুহূর্তে। ছেলে আজম ও মেয়ে দুটিকে তখনই খেতে দেয় হাসিনা। হাসিনাই ভাত বেড়ে দেয় সকলকে। জাহিরা রান্না করেই খালাস।

হ্যারিকেন মাত্র একটি ও চিমনিও একটি হওয়ায় তখন জাহিরা নিজের ঘরে অন্ধকারে চুপ করে বসে থাকে। মেয়ে দুটো হাসিনার কাছেই এই দু বছর ছিল। ওদের এখনো অভ্যাস হাসিনার কাছে শোয়ার। খেয়ে দেয়ে ঘুম চোখ নিয়ে প্রতিদিনই ও ঘরের বিছানায় শুয়ে পড়ে। মইবুকে যখন খেতে দেয় হাসিনা, সেই ফাঁকে ওঘরে ঢুকে মেয়ে দুটিকে ঘুম থেকে তুলে নিজের মেঝের বিছানায় শুইয়ে দেয় জাহিরা। রাত্তিরবেলা ছেলে তারই ঘরে তক্তপোশের বিছানায় শোয়।

একটু পরে ননদাই কাদের আসে। পাশাপাশি বসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে দেশ রাজনীতির গল্প করে চলে তারা। কথার বিষয় জ্যোতি বসু। জ্যোতি বসুকে জাহিরা দেখেছে, উলুবেড়ের মিটিঙে।

দুটি পুরুষের কথার ফাঁকে এই সময়টুকু একটু মৃদু নিজস্বতায় থাকে জাহিরা। একটু অপ্রকাশ আড়াল হয়ে থাকে। সেই অর্থে সংসার তার নেই। মইবুর বউ হিসেবে তার কোনো প্রতিষ্ঠা নেই। জাহিরারও কোনো দাবি নেই এ-ব্যাপারে। পুরুষের হাতের কাছে কাছে থাকা, ইঙ্গিত ও চোখের ভাষা বুঝে স্বামীর অভিপ্রায় মেটানো এ ধরনের সম্পর্ক অথবা সেবা তাকে করতে হয় নি। এটা এক ধরনের স্বাধীনতা তার জোটে। স্বামীর আদেশ-নির্দেশের সীমায় তাকে তটস্থ হয়ে থাকতে হয়নি। এসব থেকে সে মুক্তি

পেয়েছে। এই কষ্ট সহ্য করছে হাসিনা। যে কিনা পোয়াতি। ঐ অবস্থায় হাসিনাকে মইবুর হাতের কাছে থাকতে হয়। ভারি শরীর, সারাক্ষণ কষ্ট পাওয়া শরীর। স্বামীর হুকুম তালিম করতে একটু দেরি হলেই মইবু খাপ্পা হয়ে উঠবে। মইবুকে ভয় করেই হাসিনা ঐ শরীর নিয়ে স্বামীর হাতের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। হাসিনার প্রতি যে প্রতিহিংসা থাকে জাহিরার, সেক্ষেত্রে এ ঘটনা শোধ দেয় জাহিরাকে। জাহিরা মনে মনে উল্লসিত থাকে। তাকে এসব কিছুই করতে হয় না। সমস্ত কিছুর থেকে ছিঁড়ে থাকা। হাসিনাকে দেখে মনে মনে বলে, ঠিক হয়েছে। সংসারের পরিচয় থেকে সরে গিয়ে অন্য একটা আরাম পায়। মইবুকে ক্ষমাহীনতার ভেতর আরাম। দাদির প্রতি ক্ষমাহীনতা ধরে রাখার ভিতর আরাম। একাকিত্ব যদি ব্রতপালন হয় তাহলে তার মার তেমন লাগে না।

তবুও হাসিনার এই ক্লেশ খচ খচ করে বুকে বেঁধে জাহিরার। আর যাই হোক মেয়েটি ভাল। ভাল মেয়ে সতীন হলে তার অন্যরকম একটা জ্বালা আছে। এ সংসারে দু বছর ছিল না জাহিরা, তার অবর্তমানে জাহিরার তিন ছেলে মেয়ের ভার বহন করেছে। জাহিরার প্রতি এক অবদান তৈরি হয়েছে হাসিনার। এ ধরনের অবদান সতীনের থাকলে তারও অন্যরকম একটা জ্বালা আছে।

জাহিরা একা থাকতে চায় না এখন, এই ঘরের অন্ধকারে, তবুও তাকে থাকতে হয়। তরে নিশ্চুপ থাকতে হয়, অথচ নিশ্চুপ থাকতে চায় না। সংসারের ভেতর নড়াচড়ার সাধ নিয়ে সে একাকি থাকে। হাসিনাকে পুরুষ দিয়ে সে সংসারে আছে। এ পুরুষের ওপর তার অধিকারের কোনো দাবি সে করেনি। মুখ বুঁজে সব মেনে নিয়েছে। সে জানে, যদি সে ক্রোধ জানাতো, বিরোধিতা করতো, তাহলে এই ব্যবস্থাই থাকতো। ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন হত না। জাহিরার ক্রোধ জানানো ও বিরোধিতা করা বৃথা যেত। তবুও কেন ক্রোধ ও বিরোধিতা জানাবে না? কারণ ক্রোধ ও বিরোধিতার সময় চলে গেছে। দু বছর এ সংসারে ছিল না সে। যদি এই সংসারে এই দু বছর থাকতো, তাহলে ক্রোধ ও বিরোধিতার ধার কমে কমে এমনই ব্যবস্থা মেনে নেবার প্রবোধ তৈরি হতো তার। যে স্বামীর ব্যক্তিত্ব ও সম্পর্ক তার কাছে তেমন পরম লোভন ছিল না, তবুও সংসারে থাকার এক বাস্তব-জীবনের দৈনন্দিন ছিল, সেই আশ্রয়চ্যুতি সে কামনা করেনি, ব্যবস্থাকে

মানেনি। ঐ স্বামীকেই সে প্রাণ দিয়ে ধরে রাখবার মন তৈরি করেছিল। সতীন আনার ব্যাপারে তার অসমর্থন দিয়ে ছিল। তার স্বামী বুঝতে না দিয়েই বিয়ে করে বসে। দু চারদিন বাপের বাড়ি চলে যাবার ফাঁকে হাসিনাকে নিয়ে আসে। মইবুর সঙ্গে যে মুখোমুখি প্রত্যক্ষ সওয়াল জবাব, বিরোধিতা, তার সময় হারিয়ে ফেলেছে জাহিরা। আর তারপর সে বাপের বাড়িতে মাসুদকে আবিষ্কার করে। মাসুদে আকৃষ্ট হয়ে মইবুর প্রতি ক্রোধ ও বিরোধিতাকে প্রশমিত করেছিল। এবং মইবুকে অস্বীকার করার নবজন্ম হয়েছিল তার। স্বামীকে পুরোপুরি অস্বীকার করার মন তৈরি হবার প্রাণতা সে খুঁজে পেয়েছিল। সেই অস্বীকারই এখনো সে করতে চায়। হাসিনার প্রতি যে হিংসা তা নিহিত সংস্কারের, মৃত নক্ষত্রের আলোর মতো। আর মই-বুকে অস্বীকার করতেই মইবুর সংসারে থাকতে এসেছে। বুড়িটা মারা গেলেই আবার সে ফিরে যাবে বাপের বাড়ি। সেখানে মাসুদ আলির কাছাকাছি থাকবে। মাসুদ আলিকে সে ভালবাসে। বুঝেছে, মাসুদ আলিও তাকে ভালবাসে। মাসুদ আলির স্খলন জানে না পতন জানে না, পরম জানে মাসুদ আলিকে। মন কেমন করা জানে। সমস্ত শিকড় থেকে ছিঁড়ে পড়বার সর্বনাশের উন্মাদনা সে জানে। এই বত্রিশ তেত্রিশ বছর বয়সে সে প্রেমে পড়ল। প্রথম প্রেমে পড়া তার। মইবুর সঙ্গে বিয়ে হবার চৌদ্দ বছর পরও যে প্রেম সে জানতো না। দাম্পত্য তার কাছে সেই সন্দেশ আনে নি।

কি সুন্দর আকাঙ্ক্ষার উন্মোচন তৈরি হয়েছিল তার। এই উন্মোচনই তার কম নয়। স্বামী থাকতে থাকতেই অন্য পুরুষের প্রতি তার আকর্ষণ তৈরি হয়। সে আকাজ্ক্ষা তৈরি হতেই পারে, হয়েই থাকে, কিন্তু তা নিরুচ্চার থাকার কথা। মাসুদ আলির কাছে নিরুচ্চার না থাকতে পারা এক রূপান্তর ও বিরোধিতা। নবজন্ম সে পেয়েছিল। মুহূর্তের দোলাচলে মাসুদকে সম্পূর্ণ নিজের মতো করে পাবার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তবুও মাসুদের কাছাকাছি থাকার আকাজ্ক্ষা তার অবশিষ্ট ছিল। সেটুকুও কেড়ে নিল তার দাদি, মরিয়ম। সে যাবে, আবার ফিরে যাবে, দাদির মৃত্যুসংবাদের অব্যবহিত অবিলম্ব নিকট সময়ে।

অন্ধকার ঘর। পরচালার আলোর মিহি আভা ঘরের ভেতর অন্ধকারের সঙ্গে মিশেছে। মেঝের তেলাইয়ে বসে এপাশ করে ওপাশ করে জাহিরা। সে একা একা নিশ্চুপ আছে এ সংসারে ওদের চোখে এটা বাস্তব করতে চায়।

এই অন্ধকারে ঘরের ভেতর ওদের চোখ যায় না, তাই সে নিশ্চল স্থির থাকে না। নিশ্চুপ স্থির থাকাটা তৈরি করে সে। তাই অস্থিরতা খুলে যায় তার এই মুহূর্তে। অনস্থির হয়ে পড়ে। উবু হয়ে বসে, আবার পা ছড়িয়ে বসে। মাটিতে করতল চাপে, আবার ফিরিয়ে নেয়। পিঠে এলানো চুলে খোপা বাঁধে। বুক থেকে আঁচল খসায়। আঁচলের থেকে একটা গুমো গন্ধ পায়। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল মাথায় দেয়া আঁচল, তা থেকে গুমো গন্ধ বেরচ্ছে। তেমন ভাবে শুকোয় নি এতক্ষণেও। উঠে পড়ে জানালার কাছে যায়। জানলার বাইরে খেতদিগন্ত অন্ধকারে ডুবে আছে। হালকা, অতি ধূসর রঙে খেতদিগন্ত দেখা যায়। দরজার কাছে মুখ বাড়ায় জাহিরা। দেখে, মইবু খাচ্ছে। এদিকে পিঠ করে বসেছে। সামনে হ্যারিকেন। মইবুর শরীরের ছায়া বড় হয়ে পড়েছে জাহিরার ঘরের সামনে। টিপি টিপি পায়ে বেরিয়ে আসে জাহিরা। সাড়াশব্দহীন মইবুর গায়ের পাশ দিয়ে চলে যায়। ঢুকে পড়ে মইবুমুক্ত মইবুর ঘরে। ঘুমন্ত ছোট মেয়ে জাহানারাকে বুকে তুলে ফিরতে থাকে তেমনই সাড়াশব্দহীন নিঃসাড়ে। মইবুর গায়ের পাশ দিয়ে চলে আসে।

মইবু সচকিত হয়। 'কে ?' পেছন ফিরেই জিজ্ঞাসা করল মইবু। উত্তর পেল না। তারপর হাসিনার দিকে চোখ ফেলে জানতে চাইল ইঙ্গিত চাহনিতে।

হাসিনা বলল 'বড়বুবু।'

মইবু 'ও' শব্দ করে তেমনই ভাত খায়।

একটু আগেই খাওয়া শেষ হয়েছে তাদের। জাহিরা হাসিনা ও তাদের শাশুড়ি একসঙ্গে খায়। আর খেতে-দেতে রাতও হয় বেশ। খাওয়ার সময় আবার ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি এল। চমৎকার এক শব্দ ও গন্ধ। শীতলতার স্পর্শ। কুপির শিখায় চমৎকার এক কাঁপন এসে জোটে। এসব চোখে পড়েছিল জাহিরার, এবং উপলব্ধি করেছিল।

খাওয়ার পর শাশুড়ির মনে পড়ে যায়, হাসিনাকে বলে ছিল তার ননদদের ঘরে এক বাটি তরকারি দেবার কথা। সেটা দেয়া হয় নি। হাসিনার মনে পড়ে নি। খাওয়ার পরে শাশুড়ির মনে পড়ে যায়। আর শাশুড়ি হাত ধুয়ে উঠে গদগদ করে চলে হাসিনার ওপর। অন্য সময় হলে মারতো। পুরুষ ও

ছেলেমেয়েদের খাওয়ার পর হাঁড়িতে তরকারি কমই থাকে। কেন না পুরুষ ত আর জানে না কতটা রান্না হয়েছে, সে তার মতো করেই খায়। মুখে স্বাদ পেলে বেশিই খেয়ে ফেলে। অবশিষ্ট তরকারি থেকে শাশুড়িকে একটু বেশিই দিতে হয়। শাশুড়ির থেকে কম নেবে, এটাই নিয়ম। নিজে একটু পাবার জন্যে হাসিনা বোধ হয় ইচ্ছে করেই ভুলে গেছে ননদদের একবাটি তরকারি দেবার কথা। সে হয়তো ভেবেছিল শাশুড়ির মনে থাকবে না। খাওয়ার পর শাশুড়ি ফদকাতে থাকে।

মইবু বিড়ি খায় ঘরের পরচালায় দাঁড়িয়ে। সে এ ব্যাপারে নাক গলাবে না। তার মায়ের এক্তিয়ারে এসব পড়ে।

হাসিনা একটাও কথা বলবে না। বললে ঝাঁপিয়ে পড়বে শাশুড়ি। চোপরা করলেই মারবে।

গদ গদ করতে করতে নিজের ঘরে চলে যায় শাশুড়ি। কুপিটা রেখে, দরজা অবজায় না। তার গদগদানি তখনো শেষ হয় না, দরজা খুলে রেখে শোনায় সে জন্যে। 'পাগুলে সইল, রশিদার ব্যাটা বেটিদের মুখে দিতে গেলে বউদের বুকে কষ্ট হয়। বাপবাড়ি থিকে এনে খাস লা তুরা? ব্যাটার রুজকার খাস। তোদের জিভ খসে খসে পড়ে যাক।'

ওদিকের ঘরের পরচালা থেকে রশিদা কথা বলে ওঠে 'ও মা কী হয়েচে?'

'আর কি হবে, বউয়ের গুণের কথা বলচি।'

'কেন কী হল?'

'তোদের এক বাটি তরকারি দিল নি?

'কেন মোরা খেতে পাই নি যে ওরা তরকারি দিলে তবে মৌদের মুয়ের ভাত পেটে উঠবে?'

ততক্ষণে নিজের ঘরে চলে আসে জাহিরা। শরীরে এক স্বস্তি ও আরাম পায়। এবার শুয়ে পড়তে পারবে। সারাদিনের খাটুনির পর ক্লান্তি নেমে এসেছে, পাখিদের ডানার মতো আরামের এক আকুলতা তার দেহে জড়িয়ে আনে। কিন্তু পড়লেই যে ঘুমতে পারবে, এমন কোনো অনুকূলতা নেই তার শরীর মনে। একা থাকার অস্থিরতায় জেগে পড়ে সে ক্লান্তির সঙ্গে আরো পরিশ্রম করবে। একসময় তার ঘুম এসে যাবে।

তার থুতনির ঘাম বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে মোছে জাহিরা। বুকের ভেতর থেকে তোলপাড় করে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘশ্বাস। এবং এরকম

করে শ্বাস ফেলতে সে আরাম পায়। এখনো বকছে বুড়িটা। বুড়িটাকে মারধোর করার উপায় থাকলে সে মারধোর করতো। ছোট্ট চিমনিটাকে দেয়ালের পেরেকে ঝুলিয়ে দিয়ে শিখা নরম দেয়। চিমনির শিখাটা তিলেক মথের মতো ত নড়াচড়া করে বাতাসের আঘাতে। তক্তোপশের ওপর ছেলে আজম ঘুমিয়ে পড়েছে। মেয়েটি তার মেঝের বিছানায় ঘুমচ্ছে। ওরা বেশি রাত পর্যন্ত জাগতে পারে না। বাঁশের টাঁটির দরজা। হুড়কো দিয়ে জাহিরা। বৃষ্টিস্নাত রাত, বড় নিমগ্ন করে, বড় স্মৃতিদিনে নিয়ে যেতে চায়, দিয়েছে বড় আকাঙ্ক্ষা সজাগ করে।

জাহিরার কত রূপ, লোকে বলতো, এখনো বলে। এই রূপের কোনো আশ্রয় সে খুঁজে পায় নি। তার রূপকে জীবনে সমর্থন করবার কোনো বাস্তবতা ঘটেনি। সে কারণে সারাক্ষণই সে ভুলে থাকে তার রূপের কথা। কখনো কখনো মনে পড়ে যায় সে রূপসী। অন্য পুরুষের তাকানোর ভেতর কখনো কখনো মনে পড়ে যায়। বিয়ে বাড়িতে ভাল শাড়ি পরলে তাকে আরো সুন্দর দেখায়, এটা জানে সে। ঐ শাশুড়ি তখন আট দশটা কনে দেখার পর তাকে দেখেছিল। পছন্দ করেছিল। তখন শ্বশুর বেঁচে। এই ঘর ও আঙিনায় তার কত শত স্পর্শ ছড়িয়ে বিছিয়ে আছে। কত মায়া তার তৈরি হয়েছিল। আঙিনার ধার ঘেঁষে দুটি নারকোলগাছটাতে এক মায়া বসেছিল তার। রান্নাঘরের পাশে পেয়ারা গাছটায়। নিজের হাতে বসানো চারটি সুপুরি গাছ এখনো সে মায়া রচনা করে। এই ঘর আঙিনার ওপরের আকাশ চাঁদ গ্রহ নক্ষত্রও এক মায়া রচনা করে থাকে তার মধ্যে। ছয় ঋতুর প্রবেশ ও প্রস্থান, উপস্থিতির অভিঘাত ও স্মৃতি তার অতিবাহিত জীবনের সঙ্গে লেপটে থাকে। স্বামীকে মুছে ফেলে, কিন্তু ওসব মুছে ফেলতে পারে না। ওসব ত উপস্থিতির সহচর ও উপলব্ধির সঙ্গী ছিল। পুকুরের ঘাটের পাথরটার স্বাদ তাকে মায়া দেয়। শিল নোড়া, জাঁতি, পরচালার খুঁটি বস্তুসম্বন্ধের এক নিবিড়তা স্বাদ ছিল, এখনো আছে।

খুব ইচ্ছে করে জাহিরার ছেলের সঙ্গে কথা বলতে। ‘ও বাপ আজম, নিদ গেলি?’

‘কেন?’

জাহিরার ঠোঁটের ওপর কেমন এক আনন্দ উঠে আসে। ‘কুথায় কাজ হচ্ছে রে এখন তোর?’

'বাপের সাথেই করচি, বাপ কাজ ধরেছে নিজে।'

'কুথা?'

'আব্দুল। বাপের কাজ শেষ হলে মিস্তিরির সাথে কাজ করব।'

'জোগাড় দিস?'

'হ্যাঁ। আর কিছু দিন যাক, দেখবে তখন মিস্তিরির কাজ করব।'

'সে অনেক বাকি।'

'মাঝে মাঝে কন্নিক ধরি ত।'

'তুই পড়ছিলি তখন স্কুলে।' দু বছর আগের সময়ের স্বর জাহিরার কণ্ঠে।

'মাস্টার মারল, আর স্কুল গেলু নি। বাপ সাথে করে কাজে লে গেল। মা, নতুন প্যাণ্ট শার্ট করব বলে ট্যাকা জমিয়েছি। একশ দশ ট্যাকা হয়ে গেছে।'

'তুই যদি সরুছুতোরের কাজ করতিস ভাল হত নি?'

'কাঠের কাজ?'

'হ্যাঁ। সে সব মিস্তিরির অনেক দাম।'

'বাপ ত কই বললনি ঐ কাজ শিখতে?'

'বাপ কি তোর সরুছুতোর যে সরুছুতোরের কাজ শিখাবে?'

'হ্যাঁ।'

'সরুছুতোরের কাজ শিখতে হলে সরুছুতোর লাগবে। না হলে কে শিখাবে? তোকে খুব খাটতে হয় রে?'

আজমের কোনো সাড়া পায় না। ঘুমিয়ে গেছে। জোগাড়ের কাজে খাটুনি আছে। প্রতিদিন এমনি ভাবে ঘুমিয়ে পড়ে। ছেলেকে একা পেয়ে বেশিক্ষণ কথা বলতে পায় না। অনেকক্ষণ ধরে যদি ছেলের সঙ্গে কথা বলতে পারতো, তাহলে বেশ লাগতো। এমনিতে তাড়াতাড়ি ঘুম তার ধরে না। ঘুম আসতে একটু সময় লাগে। সেই সময়টুকুতে অস্থিরভাবে তার থাকা হয়। যদি কোনো মন্ত্র থাকতো, মন্ত্র পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এসে যাবে, তাহলে খুব ভাল হতো। চিন্তা অদ্ভুতভাবে পাকায় প্যাঁচায়। ক্রমশ অস্থির-ভাবে জড়িয়ে পড়তে থাকবে। ছেলেকে যদি কাছে নিয়ে শুতে পারতো, তাহলে বুঝি তার তাড়াতাড়ি ঘুম এসে যেত। একটা আশ্রয় ও মানসিক নির্ভরতা তৈরি হতো তার। ছেলেকে কাছে নিয়ে শোবার খুব সাধ হয়. অথচ

পারে না, ছেলেকেও বলতে পারে না। কেমন একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে উঠছে ছেলের সঙ্গে। অথচ দুবছর আগে ছেলে তার কাছে শোবার বায়না করতো। অনেক বেশি তখন ছোট ছিল এবং ন্যাওটা ছিল। এখন অনেকটা বড় হয়ে উঠেছে আজম। জোগাড়ের কাজ করে মাথায় বড় হয়েছে। দু-বছর আগের আজমকে পেলে বড় ভাল হতো তার। সময়ের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সময় এমন অনেক কিছু প্রিয় খেয়ে নেয়। আর তার দু বছরের অনুপস্থিতিতে আজম তার বাপের দিকেই বেশি আকৃষ্ট। আগে কিন্তু তার দিকে টান ছিল। এখন বড় হয়েছে কিনা! শিশু যখন ছোট থাকে, মাতৃক্রোড়ে তার আশ্রয় ও নির্ভরতা থাকে। একটা বয়স পর্যন্ত এই স্বভাবের জের থাকে। পরে হারিয়ে যায়। আজমকে হারিয়ে ফেলছে জাহিরা। কেমন পর পর লাগে আজমকে। সে নিজেই ত বছর দুই হলো আজমকে সঙ্গ দেয়নি। এই বিচ্ছিন্নতার এক মার আছে। সে কারণেই আজম অনেক বেশি ছিঁড়ে গেছে। বড় নিষ্ঠুর আজম। প্রতিহিংসাপরায়ণ। ছেলের ছিন্নতার বেদনাই এতখানি! আরো কতখানি বেদনার জীবন তার সে তা উপলব্ধি করতে পারে। ছটফট করতে থাকে সে।

রাত শান্ত ও নিঝুম হয়ে ওঠে। ভারী ডানায় বাদুড় ও পেঁচা উড়ে যায়। ঘরের ভেতর ছোট্ট শিখার আলোটা ধীরে ধীরে ঘরটাকে প্রকাশমানতার উপযুক্ত করে। পাশের ঘরে মইবু ও হাসিনা শোয়। তাদের নানা খুটখাট শব্দ এতক্ষণ পর্যন্ত পাচ্ছিল, এখন আর পাচ্ছে না। ওরাও ঘুমিয়ে গেছে। আসন্ন দিনের ক্লান্তি ও একঘেয়েমি নিয়ে রাতটি যন্ত্রণাকাতর জাহিরার কাছে। দিনের নানা কিছু, নানা ঘটনা, সব কিছু কেমন অপ্রার্থিত অনভিপ্রেত ব্যথা দেয়। জাহিরা কোনো সুখ পায় না, আশ্রয় অবলম্বন খুঁজে পায় না। দিনের মধ্যে বাহিত হয়েছে শুধু।

মইবুর সঙ্গে সম্পর্কে থাকতে হয়নি, তবুও, এটা তার এক শান্তি। যদি সতীন না আনতো, মাসুদ আলির প্রেমের ভেতর থেকেই স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কে যেতে পারতো সে। যাওয়াটা তার উচিত ও বাস্তব হতো। এই ঔচিত্য ও বাস্তবতার বিরোধিতা করার কেউ ছিল না সে। যেহেতু মইবু সতীন নিয়ে আছে, সেহেতু মইবুর সঙ্গে সম্পর্কে যাওয়ার কোনো সাধ খুঁজে পায় না সে, মাসুদ আলিকে সর্বস্ব করে তোলে, মাসুদ আলি সহজলভ্য না হলেও। মইবুর ছায়া না মাড়ায় সে। মইবুর প্রতি মায়া না জন্মায় তার। এসব সে

হারিয়ে ফেলেছে। এসব হারাতে চায়ও সে। ভবিষ্যতে একদিনও স্বামীর সম্পর্ক চাইবে না। মইবুর সঙ্গে বিরোধ সপত্নীপ্রসূত। সে হাসিনা যতই ভাল মনের মেয়েমানুষ হোক। নারীর এক অপমানের জায়গা এখানে আছে, সেটাকে খুঁজে পেয়েছে জাহিরা। সে অপমানে জাহিরা ক্ষুভিত এবং স্বেচ্ছা বিচ্ছিন্ন হয়ে ওঠে মইবুর কাছ থেকে। কোনো সাধ তার অবশিষ্ট নেই, মইবুর কাছে যাওয়ার, মইবুর হাতে ধরা দেবার। তার সাধের হাত থেকে স্খলিত মইবু।

যদি মইবুর সাধ জন্মায় তাকে অধিকার করবার? শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে যদি মইবু? তার রূপ আছে, রূপের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার এক আশঙ্কা তৈরি হয় জাহিরার মনে। সেটা হবে তার শারীরিক নিরুপায়তা, যে কোনো পুরুষের লোভের ক্ষেত্রে। মইবুর বলপ্রয়োগের হাতে অসীম নিরুপায়তা। কেন না, অন্য পুরুষের লোভের শিকার হলে সে প্রতিরোধ করতে পারবে, চিৎকার করতে পারবে, কিন্তু মইবুর ক্ষেত্রে পারবে না। কেননা মইবুর অধিকার আছে, তার শরীর নেবার। বাধা দেবার রীতি নিয়ম সামাজিকতা নেই। সমাজপ্রণালীর নিয়মরীতির শিকার হয়ে উঠবে সে। দৈনন্দিনের কথা বলা, ঘটনায় যাওয়া, সম্পর্ক ব্যতিরেকেই মইবুর অধিকার আছে, তার শরীর অধিকার করার। রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে এমন এক নিষ্ঠুরতার আতঙ্ক নিয়ে থাকে জাহিরা। যেন মইবু তার রূপে পুনর্বার মুগ্ধ না হয়।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, সকলে ঘুমিয়ে পড়লে, রাত নিশুতি হয়ে উঠলে এমন একটা ভয় তার সঙ্গী হয়। ইঁদুরের শব্দেও ভীত হয়ে ওঠে। নরম বাতাসের বুকে বেগবান বাতাস খসখসিয়ে উঠলে ভয় পায় জাহিরা। বাঁশের দরজার অর্গল বাইরে থেকে খোলা যায়। মইবু যদি নিঃসাড়ে এসে তাকে অধিকার করে বসে? তার সঙ্গে সম্পর্ক ও কথা বলার সম্পর্ক ব্যতিরেকেই এটা মইবুর পক্ষে সম্ভব। কেননা মইবু পুরুষ। পুরুষের সাধের ও অধিকারের সীমা পরিসীমা নেই। মইবু তার কাছ থেকে গামছাটা হাত বাড়িয়ে নেয় না, জল চায় না, তবুও এরকম সম্ভাবনা থাকে। এটা জাহিরার মেয়ে হবার নিরুপায়তা। একজন স্বামীও তার কাছে এ ক্ষেত্রে ভীতিপ্রদ হয়ে ওঠে। স্বামীর লোভের চোখ থেকে শরীর নিরাপদ রাখার কথা ভাবতে হয়। বলপ্রয়োগের সম্ভাবনা থেকে শঙ্কিত থাকতে হয়। বলপ্রয়োগের কাছে পরাস্ত

হতে হবে তাকে। এটা সে জানে। তার স্বাধীনতা নেই। নেই ইচ্ছার সংরক্ষণ।

বৃষ্টি হয়ে যাবার পর, গাছের পাতায় পাতায় জল জমে থাকে তখনো, যেমন টুপ টুপ শব্দে ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়ে তেমন ধীরতায় ঘুমিয়ে পড়তে থাকে জাহিরা। সে জানে সে ঘুমিয়ে পড়ছে। এই সজাগতার ভেতর ঘুম তাকে আচ্ছন্ন করতে থাকে।

এবং ঘুম ভেঙে যাবার পর যখন সে জানে না, কতক্ষণ ঘুমিয়েছে, চোখ মেলে দেখতে পায় স্বামী তার টাটির দরজা খুলে সবে দাঁড়িয়েছে তারই সামনে। চিমনির ছোট শিখার আলো যথেষ্ট নয়, তবুও চেনা যায়। জাহিরা চিৎকার করতে পারে না। অন্ধকারের ভেতর অপরিচয় ও সম্পর্কহীনতার পরিবেশ তৈরি হয়। তার শরীর নিয়ে মইবুর লোভ আবার তৈরি হয়েছে তাহলে! আগেও বাধা দিত না, এখনো বাধা দেবার অধিকার নেই, এখন যদিও বাধা দেবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে বাধা দিতে পারবে না। তখন অবশ্য বাধা দেবার ইচ্ছা জন্মাতো না। মইবুর হাতের ও শরীরের তোলপাড়ে নিমজ্জিত হতো। এখনো নিমজ্জিত হবে। এখন বাড়তি একটা কিছু পায় জাহিরা, তা হল বাধা দেবার ইচ্ছা তার থাকে। বাধা দিতে না পারলেও এই ইচ্ছার জন্ম কম কিছু নয়। জাহিরা অপেক্ষা করে মইবু তার ওপর কখন ঝাঁপিয়ে পড়ে।

প্রায় এক সঙ্গেই রাজমিস্ত্রির দলটা ফেরে। সন্ধ্যার কিছু পরে। সকলের ফেরার অপেক্ষায় থাকতে হয় মরিয়মকে। পুরুষ ঘরের বাইরে থাকলে স্বভাবত নারীর মনে এক ধরনের আশঙ্কা থাকে। বাইরের রীতিবিধি তারা জানে না। একটা অচেনা ভয় থাকে। সকলে ফিরলে শান্তি পায় মরিয়ম। ছেলেরা আর নাতিরা। তার সঙ্গে আরো একজন যুক্ত হয়েছে, আসমার বর, মাসুদ আলি। সকলের চেয়ে খানিকটা আগেই ফেরে মাসুদ আলি। সকলের ফেরাটা গন্ধে অনুভব করতে পারে মরিয়ম। বর্ষা বাদলের দিন। এই সময়ে যে ওদের কাজ হচ্ছে, এতে অনেকটা আশ্বস্ততা। কারণ বর্ষাকালে রাজমিস্ত্রির কাজ মন্দা থাকে। তবুও কিছু কাজ হয়। ফিরোজ মিস্ত্রি সেসব কাজ পেয়ে যায়, ভাল মিস্ত্রির সুবাদে। রাহাত, শহিদ, রহম, মুক্তার, আশরফ এই পাঁচ নাতি বাপ চাচাদের সঙ্গে কাজে যায়। ওরাও ফিরেছে। ওদের ফিরতে

আবার একটু আধটু বিলম্ব ঘটে। মরিয়মের ছেলেরা ফিরতে দেরি করলে ওরাও যেমন মরিয়মকে দুর্ভাবনা দেয় তেমনি নাতিরাও। নাতিদের কম বয়স, তাদের প্রতি বাড়তি মমতা তার তৈরি হয়। ওদেরও ছেলে পুলে দেখেছে। অনেক বয়স হল তার, এত বছর ধরে যে বেঁচে আছে, এসব যে সে দেখতে পাচ্ছে এতে তার বড় শান্তি। ছেলেদের চেয়ে নাতিদের ওপর বেশি তার টান। আসলের চেয়ে সুদে বেশি টান। আর তার ছেলেরা যথেষ্ট বয়সে বড়। কতকাল যে তার হাত থেকে সরে গেছে! তাদের শৈশব বাল্য ও কৈশোরে নয়নের মণি করে স্নেহমমতায় আগলে রাখার অধিকার থেকে কতকাল মরিয়ম সরে গেছে। তেমন সহজ করে ছেলেদের পায় না আর। এখন তারা তাদের মতো করে ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনিদের নিয়ে বাঁচে। এতদিন যে মরিয়ম বেঁচে আছে, এটা আল্লার কাছে শোকর করে সে।

কতদিন সে বেঁচে আছে। কত কাল! দেশ দুনিয়ার কত পরিবর্তন হল। এতদিন বেঁচে থাকার ফলে শরীরটা তার পুরণো হয়ে উঠল। এই শরীরেই যৌবন ধারণ করেছিল। নিজেরই বিশ্বাস হয় না, এই শরীর কিছুকাল যৌবনের আধার ছিল। তার রূপ ছিল? যৌবন ছিল? ন বছর বয়সে তার বিয়ে হয়। খেলাবাটি খেলতে খেলতে তার বিয়ে হয়। সেই থেকে এতদিন সে এ সংসারে আছে। এখানে আসতে চাইত না সে। প্রথম দিন থেকেই স্বামীকে ভয় করতো। স্বামীর সংসার প্রথম থেকে যে করতে না চাওয়ার অসন্তোষ তাকে বিঁধেছিল, আজও যেন সেই ভাব বহন করে চলেছে। এত বছর বয়স পর্যন্ত। এত কাল। এত বছর বয়সেও অবচেতনের ভেতর সেই বালিকাবধূ হয়ে আসার ভয় গ্রাস করতে আসে। একটু আনমনার ভেতর এখনো চমকায়। প্রথম বিয়ে হয়ে আসার অসন্তোষের ঘোর এখনো তার মনের মধ্যে বহন করে নিয়ে চলে সে। সেই ঘোরে কখনো কখনো সে বালিকার মন খুঁজে পায়। যখন সে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে নি, নারী হয়ে ওঠে নি, তখন থেকে নারীর প্রতি অমোঘ নিয়মরীতির ব্যবহার সে পায়। নারী-শরীর হয়ে ওঠে তার। ঘোরের মধ্যে এখনো মনে হয় বালিকা শরীর নিয়ে এ সংসারে আছে সে।

বছর গেল, দিন মাস কত মুহূর্ত ঋতুপরিবর্তন কত কিছুর ধারাপাত ঘটে গেল এই জীবনে। এখন মরলেই বাঁচে মরিয়ম। বেঁচেছে ত বহুকাল। আর কোনো আশার অবশিষ্ট নেই, যা নিয়ে সে বাঁচতে পারবে। শরীরে

বার্ধক্য ও জরা তেমনই এসে পড়েছে। নিজে বাঁচতে চাইলেও যার কাছ থেকে বাঁচা যাবে না। মেয়েছেলের জীবন নিয়ে বাঁচা সুখকর নয়, এইটুকু সার বুঝেছে সে। এ জীবনের অনেক কষ্ট ও ব্যথা। নিজের মনে গুমরে মরতে হয়। কে জানে সতীনের সংসারে জাহেল স্বামী নিয়ে জাহিরা কত কষ্টে আছে! শৈশবে জাহিরা সকলের কত প্রিয় ছিল। মরিয়মও জাহিরাকে খুব প্যার করতো, এখনো করে। মাস তিন হল জাহিরা চলে গেছে। তারই ঘরে শুতো জাহিরা। সে শুতো তক্তপোশে আর জাহিরা মেঝেয় বিছানা পেতে। তার থাকার ভেতর নিশাসপতন ও নড়াচড়ার ভেতর সে জানান দিত তার শরীর পূর্ণযৌবনা। এক ঘরে থাকার ভেতর তার আর জাহিরার মধ্যে এই তফাৎটা ধরা পড়তো মরিয়মের চোখে ও অনুভবে।

পরচালায় অন্ধকারে বসে আলোয় থাকা নাতিদের দিকে মুখ করে আকুলি বিকুলি করে ওঠে মরিয়ম। 'ও রাহাত, ও আশরাফ, ও শহিদ, ও রহম, ও মুক্তার।' বড়ছেলের বড় মেজ ছেলে ছাড়া সব নাতিদের সে ডাকে। 'কই ভাই, তুরা মোর কথা শুনবিনি? মেয়েটা কতদিন হল গেছে, সতীনের সুমসার, একবার খোঁজ নিবিনি? কি রে তোরা? যা না একবার ও রাহাত, ও রহম, ও আশরাফ, ও শহিদ, ও মুক্তার। ও ভাই, ভাই রে! অর ভাতারটা যে জাহেল, বদমেজাজি, কত জ্বালাচ্ছে দেখ। বাপের ঘরের কেউ গেলে মনও থির হবে তার। কত বুঝি কাঁদে ছ্যাখ। তোদের না বলে চলে গেছে বলে আন করে থাকবি? সে কি মোদের তেমন মেয়েছেলে? স্বামী যতই জাহেল হোক, স্বামীর ঘর করতে হয়, তা জানে সে মেয়েছেলে, স্বামী সুমসার ছেড়ে এখেনে পড়ে থাকলে ভাল ছিল? সে গেছে তার নিজের সুমসারে। কাউর কিছু বলার আছে? যা না ভাই তোরা কেউ, মেয়েছেলের খবর এনে দে। বড় মুখের মায়ার মেয়েছেলে। সে মোর অতি মুখ ধরা। ও রাহাত!' শেষটা জোর দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে।

রাহাত জটলা থেকে এসে মরিয়মের কাছে দাঁড়ায়। 'কী বলছ দাদি?'

'তুই কে?'

'আমি রাহাত।'

'তা ভাই তুমি আমার চুলের মতো আয়ু পাও। তুমাকে দুয়া করচি। বড়বুনের কাছে যা ভাই একবার। সতীনের সুমসারে আছে, কতই না কষ্টে আছে।'

'আমি যাবুনি যা।'

'ও ভাই, উকি কথা? তুই মোর মাথা খাস ভাই। যাস একবার।'

'সময় পাচ্ছিনি দাদি।'

'মোর তারে সময় কর ভাই। মুই মরে গেলে মোর কবরে একমুঠো মাটি কম দিস।'

'মরার কথা বলছ কেন দাদি?'

'দাদি তোর আরো কত বাঁচবে বলত? কি ভাই যাবি ত?'

'আচ্ছা যাব।'

'কথা দিতে হবে তোকে ভাই।'

'আচ্ছা।'

'যাবি ত?'

'হ্যাঁ।'

'ভাইকে মোর আল্লা ঠেঙায় রাখবে, অনেকদিন বাঁচাবে। ও বাপ, কুথা নাকি বাবরের মসজিদ লিয়ে গণ্ডগোল?'

'হ্যাঁ গ দাদি।'

'বাবরের মসজিদটা কুথা বল ত? বাগাণ্ডা গড়চুমুকের দিকে নাকি?'

'সে অনেক দূর দাদি।'

'তালে ত অন্য জেলার ব্যাপার, তারাই বুঝবে।' একটু থেমে গিয়ে বলে 'যেয়ে বলবি, একবেলার তারে হলেও তার দাদি তাকে ডেকেছে। বলবি কি বিশের কথা আছে, অতি অবিশ্যি যেন আসে। মোর মাথার কশম দিয়ে বলবি। তালে এসবে।'

রাহাত ফিরে যায়।

মরিয়ম বলে 'ও ভাই চলে গেলি? ঘরের গাছের একটা রাতাবি লেবু লিয়ে যাস মেয়েটার লেগে।'

শান্ত হয়ে পড়ে মরিয়ম। আকুলি বিকুলি তার চলে যায়। এক নরম নৈশব্দ্য রচনা করে সে। এই মুহূর্তে তার থাকার মধ্যে এক বিষণ্ণতা ভরে ওঠে, একটু আগের সরবতার পাশাপাশি এই নীরবতা এক বিষণ্ণতা বিছিয়ে দেয় তার থাকার মধ্যে। তার থাকার অন্ধকারটুকুর মধ্যে। থাকাটাই অন্ধকার হয়ে ওঠে।

আম্মার ঘরের পাশেই তার দাদির ঘর। তার স্বামীর নাস্তা করার সময়

দাদির আকুলি বিকুলি শুনেছে। মাসুদকে হাওয়া করছিল বলে বেরতে পারেনি আসমা। নাস্তা খাবার পর মাসুদ দলিজের দিকে চলে যায়। তখন ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাদির সামনে দাঁড়ায় আসমা। 'ও দাদি, রাহাত ভাইকে দিয়ে বড়বুনকে ডাক করাচ্ছ কেন? তুমার কি এমন কথা তার সাথে?'

'সে তোকে কেন বলব লা?'

'ও দাদি বলবে ত, ওজু পেচ্ছাপের পানি তুলে দিই তুমার, বলবে ত।'

ফিসফিস করে ওঠে মরিয়ম। 'মুই মরে যাবার পর কয়েকখানা জিনিশ বড় বুনকে দুব, তোকে একটা কিছু দুব।'

'মোকে কি দিবে দাদি?'

জাহিরাকে দেবার পর কী থাকে ভেবে পায় না মরিয়ম। চট করে মনে পড়ে যায়। 'তুই মোর তক্তপোশটা লিস।'

'আর কাকে কাকে দিবে?'

'আর কাউরে লয়। সোনামুখি বড় বুনকে আর তোকে। তুই যে বুন পেটে ছেলে ধরেছিস লা! তুই মোকে বলিস নি, কিন্তুক মুই ঠিক বুঝতে পারি। কেউ বলে নি তবু মুই জানি।'

'দাদি!'

'ও বুন বে হতেই পেটে ছেলে ধরলি!'

'দাদি, মারব কিন্তু।'

মাসুদ দলিজ থেকে ফিরে এসে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে এদিকে মুখ করে আসমাকে বলে, 'কই গো শুনছ?'

'কি বলচ, যাচ্ছি।'

'যা লো তোর ভাতার তোকে ডাকছে।'

'দাদি, গাল দুব কিন্তু।'

'গাল দিলে তোর মুয়েরই খারাবি হবে।'

ঘরের ভেতর চলে আসে আসমা। মাসুদ ঘরের ভেতর দাঁড়ান অবস্থায় পাশ ফিরে আসমাকে দেখে।

মাসুদ ঘাড় ফিরিয়ে বলে 'ভাবনু আজ আর বাজারের দিকে যাবুনি।'

'কেন তুমি বাজার যাচ্ছিলে নাকি? এই ত টর্চ লিয়ে বেরিয়েছিলে!'

'আর ত যেতে ইচ্ছে করছে নি।'

'যাবে কেন? খাটাখাটনি করে ফিরেছ, ঘরে আরাম কর ত।'

'কী খেতে চাস, কী খেতে মন করে আমাকে বলিস।'

আসমার মুখ লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। সে গর্ভবতী হয়েছে, সে কারণেই। তার সঙ্গে স্বামীর খিলবেড়া দেয়া ঘরের সম্পর্ক তার শরীরে প্রকাশ পেয়েছে, সকলে জানতে পেরেছে। সে এক লজ্জার ব্যাপার। স্বামীর পরিণত মনের কাছে নিজের এই লজ্জাবোধকে মেলাতে পারে না। তার স্বামী কেমন কত সহজে নেয় ব্যাপারটা। তার স্বামী হাত ধরে, একটু টানে, তবেই না মাসুদ আলির কাছে চলে যেতে পারে আসমা। কদিন ধরে তার শরীরে কতই না অস্বস্তি এসেছে। খেতে পারে না। খেয়ে উঠেই বমি হয়ে যায়। সবকিছু গন্ধ লাগে। এত বমি হল সেই প্রথম, মা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল তার পাশে। ডাক্তার দেখাবার কথা বলল না। কদিন পরে আয়েশাভাবি তাকে বলে। লজ্জায় মরে যায় সে। মা বুঝতে পেরেছে জানতে পারে। মা আবার তার আব্বাকে বলেছে। কী লজ্জা, কী লজ্জা! গতকাল খাওয়ার পর যখন বমি করছিল তখন জলের গ্লাস হাতে নিয়ে মাসুদ আলি ছিল। তার স্বামীকে তখনো সে জানায়নি। যখন স্বামীর পাশে শোয়, তখন মাসুদ আলি বুঝতে পেরেছে, এটা জানায়। স্বামীর কাছেও তার কত লজ্জাবোধ।

বরং তার লাফদড়ি ঘুটুম খেলার প্রতি বেশি আগ্রহ। সন্তান পেটে ধরবার কোনো আনন্দবোধ তার মনে এখনো ধরা পড়েনি। 'আম খেতে ইচ্ছে করছে।'

'আম ত এখন বাজারে নেই। ভাদর মাস শেষ হয়ে আশ্বিন মাস পড়তে চলল, এখনো আম?'

কি ভেবে আসমা বলল 'তুমাকে কিছু আনতে হবে নি, যাও।'

বুকের কাছে ধরে নিয়ে দাঁড়ায় আসমাকে। আসমা শার্ট খামচে ধরে মাসুদের।

আসমা অনুযোগ করল 'জানিনি আমার কী হবে?'

মাসুদ বলল 'কীসের কী হবে?'

'আমার ভয় করে।'

'ভয় কি?'

'তুমি কী জান, মেয়েদের কষ্টের কথা?' মৃদু রাগতভঙ্গিতে আসমা বলে। আসমা মাসুদের বুকের ওপর মাথা রাখে। আসমা শুনতে পায়, মা তাকে

ডাকছে। 'এই মা ডাকছে।' মাসুদের হাত শিথিল হয়। আসমা নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়।

মাসুদ বলল 'তালে আমি দলিজে যেয়ে বসি।'

'বাজারে যাবেনি কিন্তু!'

'আচ্ছা যাব না।'

বাইরে বেরিয়ে যায় আসমা। এক দেড় ঘণ্টা এখন ফিরতে পারবে না আসমা। মাকে রান্নায় সাহায্য করবে। কেন না মুক্তারের বউ, আসমার ভাবি কয়েকদিন হল জ্বরে ভুগছে। টর্চবাতি নিয়েই বেরিয়ে আসে মাসুদ আলি। বাজারেই সে যাবে। কী করবে, ঘরে বসে বসে?

আসমার গলায় বাঁ হাতটা বেড় দিয়ে মাসুদ আরো খানিকটা ঘুমোবার চেষ্টা করে। বিছানার পাশ থেকে আসমা না উঠে যায়, সে জন্যে আসমার গলায় বাঁ হাত বেড় দিয়ে রাখে। ঘুমের মিহি তন্দ্রায় ভেতর চলে যেতে চায়।

আসমার ঘুম ভেঙে গেছে। এখনি ওঠার ইচ্ছা। সকাল হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে। আর শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না তার। তার স্বামী গলায় বেড় দিয়ে রাখলে কষ্ট হয়। ছটফট করে। 'ছাড়ো না, লাগচে।'

'আরো একটু শুয়ে থাক।'

'না। গলায় লাগচে।'

আসমার শ্বাসরোধ হয়ে আসে যেন। 'আমি বাচ্চা মেয়ে জান না, আমার লাগে?'

এই কথায় চমকে ওঠে মাসুদ। তন্দ্রা তার চটকে যায়। আসমার গলা থেকে হাত সরিয়ে নেয়।

তখুনি বিছানা থেকে উঠে পড়ে মেঝেয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শাড়ি ব্লাউজ পরতে থাকে। বিছানায় কাত হয়ে আসমাকে দেখতে থাকে মাসুদ। 'কি বললে, একটু আগে?'

'তুমি জান না আমি বাচ্চা মেয়ে?' কৌতুকের চোখে তাকায় আসমা।

গলায় বেড় দিয়ে যখন ছিল, সত্যিকারের স্বরেই আসমাও কথা বলেছে। আসমা বাচ্চা মেয়ে ত মাসুদের কী এসে যায়? তার বরং উল্লাস বাড়ে। তার কম বয়সী বধূটি। শরীর স্বাস্থ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে। আসমাকে ঘিরে

তার এক মাদকতা, টইটম্বুর হয়ে থাকা তার। বিছানায় উঠে বসে মাস্থদ।
'শুন ?'

শাড়ি ঠিক করে কাছে এগিয়ে আসে আসমা। 'কী বলচ ?'

'কী খেতে চাও তুমি কিন্তু কাল বলনি।'

আসমা মুচকি হাসে। মাস্থদের কথা বলার বিষয়ে আসমা আজকাল পরিণত হয়ে উঠছে 'বিষ খেতে চাই।'

'এই পাগলি!' হাত ধরে ফেলে আসমার। 'ওকথা বললে কেন ?'

'আচ্ছা বলে ফেলেছি, মাপ করে দাও।'

'আর কখনো বলবে ?'

'না।'

মাস্থদ এ বিষয়ে কথা বলে ওঠায়, মাস্থদের প্রতি আসমার মুগ্ধতা বাড়ে। কোথায় যেন বয়সের অসমতার এক অস্বাচ্ছন্দ্য কখনো কখনো আসমার মনে আসে। যা এই মুগ্ধতা দিয়ে পলকে সরিয়ে ফেলতে পারে আসমা। মাস্থদেরই মুগ্ধতার হাতে বন্দি হয় সে। 'যাও এবার উঠে পড়, মুখ ধোও, গোসল করে এসো। কাজে বেরতে হবে না ?'

মাস্থদ উঠে পড়ে। তাক থেকে তেলের শিশি পেড়ে চুলে তেল ঘষে। করতলে গুঁড়ো মাজন নেয়। আসমার দিকে চোখ ফেরায়।

আসমার সঙ্গে মাস্থদের চোখাচখি। আসমা ফের মুগ্ধ হয়।

মাস্থদ চোখ বিঁধিয়ে রাখে। 'আজ যদি না কাজে যাই ?'

'কেন, যাবে না কেন ?

'তোমাকে ছেড়ে আজ যেতে ইচ্ছে করছে না।'

আসমা হেসে ফেলে। ফের মুগ্ধ হয় মাস্থদের কথায়। 'বাজে বকো না ত।'

'বাজে কথা ?'

'হ্যাঁ বাজে কথা।'

'ঠিক আছে।'

'কী ঠিক আছে ?'

'আমিও আজ বেরব, রাতে ফিরব না।'

'য়্যাঁ, ফিরবে না !'

'গোলায় থাকব।'

কাছে এসে মুখ চেপে ধরে মাসুদের আসমা। 'আর বলবে?'

মাথা নেড়ে না জানায় মাসুদ।

মুখ থেকে হাত সরিয়ে নেয় আসমা। 'ঠিক আছে, তুমি আজ কাজে যেও না।'

'আজ যেতেই হবে।'

'তবে বলেছিলে কেন যাব না?'

'তোমার মন চিনছিলাম।'

থমকে যায় আসমা। 'আমার মন কেমন?'

'ভাল।'

'বেশ।'

'কী বেশ?'

'আমাকে ছেড়ে থাকতেই তোমার ইচ্ছা করে। একটু আগে মন রাখা কথা বলছিলে।'

মাসুদ মনে মনে হাসে। আসমার মন তোলপাড় করতে চায় সে। তেমনটা ঘটে এই মুহূর্তে 'সত্যি বলচি তোমার মন রাখা কথা বলিনি।'

'ঐ যে বললে মন চিনছিলে? কী চিনলে?'

'তুমি আমাকে খুব ভালবাস।'

'বাসিই ত।' বলেই ফিক করে হেসে ফেলে আসমা। তাকে মাসুদ ছুটে ধরতে আসছে দেখে পালায় ঘর থেকে। একেবারে ঘর থেকে বেরিয়ে আঙিনা পেরিয়ে বাবা মার ঘরের দিকে ছোটে।

মাসুদ দেখে হাসে। তারপর গামছা টেনে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় মাসুদ। মুখে জড়িয়ে থাকে তার এক পরিতৃপ্তি, প্রসন্নতা।

আসমাও খিড়কির ঘাটের দিকে বেরিয়ে যায়।

বুড়ি মরিয়ম ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পরচালায় বদনা হাতে ধরে বসে থাকে। বাইরে বেরবে, বেরতে পারে না। মাথা কেমন করছে, শরীরে তার শক্তি নেই। যারা যারা ঘুম থেকে উঠেছে, সকলেই কাজে ব্যস্ত। কেউ যে তাকে ধরে ধরে ঘাটের দিকে নিয়ে যাবে, তেমন কেউ নেই। জাহিরা থাকলে এই অভাবটা তার হতো না। তার সব কাজ একাই করে দিত।

রোদ গড়ায় আঙিনার মাটিতে। রোদের রঙের দিকে স্থির তাকিয়ে থাকে মরিয়ম। এরকম শারীরিক অস্বস্তি ও কষ্ট মাঝে মাঝেই হয়ে থাকে।

একটু পরে ঠিক হয়ে যাবে জানে মরিয়ম। বসে বসে তাই রোদ দেখতে থাকে সে। এক নিঃঝুমতার ভেতর রোদের দিকে তাকিয়ে থাকে। আর সকলের তারুণ্যের চপলতার স্বর শুনতে পায়, চলাফেরার শব্দ পায়। সেই একমাত্র বৃদ্ধা। সমস্ত প্রাণচঞ্চলতা থেকে নিজের অংশগ্রহণ হারিয়ে যাচ্ছে। রোদ দেখার ভেতর এক মায়া এসে তার ঠোঁটে লাগে। জীবনের মায়া। চঞ্চলতার মায়া। যদি সে এখন কোনো ঘরে শিশু হয়ে জন্মাতো, তাহলে নতুন করে তার শুরু হতো। এতদিনের জীবনযাপন সে তাহলে মিথ্যে করে দিতে পারে। সে জানে তা হবার নয়। যে কাল ও ইতিহাসের ভেতর নিজেকে বয়ে এনেছে তাকে অস্বীকার করার তার উপায় নেই। এই জরার শরীরকেও তার অস্বীকার করার উপায় নেই। উপায় নেই ছেলেমেয়ে নাতি নাতনিদের অস্বীকার করার। চোখ ভিজে ওঠে মরিয়মের। সে আরো বাঁচতে চায়, এ কথা কাকে বলবে? সেটা তার পক্ষে খুব লজ্জার হবে। একা বসে বসে রোদের রঙ দেখতে থাকে মরিয়ম। রোদের রঙে এক লীলা আছে।

আসমা ঘাট থেকে ওঠার মুখে ঘাটের গুঁড়িতে এসে দাঁড়ায় তার মা। ঘুটে ছাই দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে বেরিয়ে এসেছে। মাথায় কাপড় নেই। পুকুরে এক ঝাঁক হাঁস চরছে। তাদের ডানার ঝাপটানি ও ডেকে ওঠা আরো বেশি চঞ্চল ও প্রাণবন্ত করে সকালকে।

আসমা ঘাট থেকে ফিরতে ফিরতে পেছু ফিরে মাকে দেখে। মাথায় কাপড় নেই, পিঠ ফাঁকা। তার জামাই এই পথ দিয়ে ফিরবে, যদি শাশুড়িকে এই অবস্থায় দেখে ফেলে সেরকম একটা ভয় পায় আসমা।

ঘরে ফিরে এসে বিছানা গোছায় আসমা। টেনে টুনে বিছানার চাদর ঠিক করে দেয়। বালিশ দুটো ঠিক মতো সাজায়। তারপর বিছানার মাথার দিকের জানালার পাল্লা খুলে দেয়। খানিকটা রোদ গড়িয়ে পড়ে বিছানায়। তারপর ঝাঁটা নিয়ে ঘর ঝাঁটাতে থাকে।

বাইরে থেকে দরজার মুখে এসে দাঁড়ায় মাসুদ সেই সময়।

আসমা মুখ তুলে দেখে মাসুদের মুখে এক হাসি লুকিয়ে আছে। 'কি হল হাসছ যে?'

'তোমাদের খিড়কির ঘাটে কে একজন মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কে বল ত, কোনোদিন দেখিনি?'

ঝাঁটা ফেলে দাঁড়ায় আসমা 'কেমন দেখতে?'

'ভালই দেখতে।'

'কে না কে ঘাটে আছে, তোমার অত খোঁজ কেন, জামাই মানুষ!'

'আহ্, দেখেই এস না।'

রাগত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে ঘাটের দিকে চলে যায় আসমা। দেখে তার মা। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ফিরে আসে। ঝাঁটা তুলে ঝাঁট দিতে থাকে।

মাসুদের কৌতূহল মিটছে না। 'কে বল ত?'

তীক্ষ্ণ চোখে আসমা মাসুদের দিকে তাকায়। তারপর মুখ গুঁজে বলে 'মা।'

'ধ্যেৎ!' অস্বীকার করে মাসুদ।

'ধ্যেৎ কি, মা-ই ত। আমার মায়ের কম বয়েস জানতে না?'

'অত কম বয়েস জানতাম না।'

'তুমি জামাই মানুষ খিড়কির ঘাটের দিকে তাকাও কেন?'

'আচ্ছা আর তাকাব না।'

'না, মাকে তুমি অমনভাবে দেখবে না।'

'আমি কী করে জানব ওটা তোমার মা?'

'বিয়ের পরের দিন রুমালে ট্যাকা বেঁধে মাকে সালাম করেছিলে, দেখনি?'

'তোমার মা ত তখন ঘোমটা দিয়েছিল। মুখ দেখিনি।'

'বেশ করেচ যাও।'

কথাটা শেষ হওয়ার মুহূর্তে একটা হৈ চৈ শুরু হয় এ বাড়ির আনাচ কানাচে। হৈ চৈ শুনে ঝাঁটা ফেলে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যায় আসমা। একেবারে ঘাটের দিকে চলে যায়। দেখে মেজচাচি ও তার মা তার দাদিকে ঘাট থেকে তুলে মাটিতে শুইয়ে দিয়েছে। ঘাটে পড়ে ডান হাঁটু রক্তারক্তি। ডান কনুই ছড়ে গেছে। যে যেখানে ছিল সকলে ছুটে আসে।

ফিরোজ ছুটে এসেছে। দেখে তার মায়ের ঐ অবস্থা। চোখ নাড়ছে। সারা শরীর কাঁপছে। মাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নেয় ফিরোজ। তার মায়ের বিছানায় শুইয়ে দেয়। বিছানায় শুইয়ে দিতে সরল হয়ে শুয়ে পড়ে মরিয়ম।

রাহাত ডেটল তুলো নিয়ে ছুটে আসে।

ফিরোজ গিন্নি আসুরা একটা গেলাসে জল ও চামচ নিয়ে মরিয়মের

মাথার কাছে বিছানায় উঠে যায়। মরিয়মের গালে জল দেয়, মরিয়ম খায়। অস্বাভাবিক রকম চোখের চাহনি। সহসা স্তব্ধ হয়ে যায় সকলে। সময় পাথর ও নীরব হয়ে ওঠে।

ছোট্ট ঘরটুকু উপচে পড়ে ভিড়ে।

গুন গুন সুরে অনেক মেয়ে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে।

কে যেন ডাক্তার ডাকতে গেল।

ফিরোজ মায়ের মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে। 'মা, তোমার কি কষ্ট হচ্ছে?'

'কে ফিরোজ!' ফিরোজের দিকে তাকিয়ে থাকে মরিয়ম। 'বড়.বুন কই?'

ফিরোজ বলে 'কে, জাহিরা?'

'তাকে ডাকতে লোক পাঠাও। তাকে আমি দুব কিছু।'

'আচ্ছা লোক পাঠাচ্ছি, তুমি চুপ কর।'

হাতে পায়ে তুলোয় করে ডেটল লাগায়। জ্বালা পায় মরিয়ম।

'রুপোর একখানা গলার হার আছে, মাথার তিনখানা কাঁটা আছে, ওগুলো বড় বুন পাবে, জাঁতিখানাও পাবে, ডাবর রেকাবি পাবে। ওগুলো সব বড় বুনের।'

'এত কথা বলছে,সে মানুষ আবার মরছে.পড়ে যেয়ে ভিমরি খেয়েছে গ।' সিরাজ গিন্নি বলে ওঠে।

কে যেন ভিড়ের মধ্যে থেকে বলল 'যাক, বেঁচে গেছে মাগি।'

'বড় বুনের কাছে খবর পাঠালি তুরা? বড় বুনকে দেখে তবে মুই মরব। বড় বুনের হাতে পানি খেয়ে মরব।'

'তুমি মরে যাচ্ছ যে ডাকবে তাকে?' ফিরোজগিন্নি আসুরা মুখ ঝুঁকিয়ে কথাটা বলে।

'কে বড় বউ?' বড় বউয়ের দিকে তাকায় মরিয়ম।

'এই কট ফট কথা বলচ, আরো ঢের দিন বাঁচবে তুমি।'

'বলচিস! বড় বুনকে দেখার তারে মন কেমন করচে।'

মাসুদ ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল, তারও এটা মনের কথা। বড় বুনকে দেখার জন্যে মন ছটফট করে ভীষণ। সেই যে চলে গেল আর এল না। কেন এল না?

রাহাত এগিয়ে আসে 'যাচ্ছি দাদি।'

'সাথে করে আনিস।' টুকরো একটু হাসি ঠোঁটে এসে পড়ে মরিয়মের। মেয়েরা গা ঢলাঢলি করে হেসে ওঠে।

ছেলেরা বেরিয়ে যায়। মেয়েদের কাছে এক কৌতুকের ব্যাপার হয়। হাসাহাসি করে, নানা কথা বলতে থাকে। মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ নীরব অশ্রুপাত করছিল, তারা সব চোখ মুছে ফেলে একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে থাকে। যেসব কথা বলেও তাদের ফুরোয় না।

বেলা দশটার সময় ছোটভাই রাহাত এল। জাহিরার ছোটভাই। মাথায় ও শরীরস্বাস্থ্যেই বেড়েছে, কিন্তু জাহিরার চেয়ে কত ছোট রাহাত। পরচালায় চৌকি পেতে বসতে দেয় তাকে জাহিরা। সাইকেল দাঁড় করানো থাকে উঠোনতলায়। পাখা হাতে হাওয়া করতে থাকে ঝপ ঝপ জাহিরা। 'কি খপর সব ভাল ত?'

'হ্যাঁ সব ভাল। দাদি তোকে দেখতে চেয়েচে বড়বুবু।'

ওদিক থেকে শাশুড়ি কট কট করে বলে চলে 'তবুও ভাই এল। এদ্দিন তত্ব তালাশ নেই।'

রাহাত শুনে বলল 'বড়বুবু, তোর শাশুড়ি গদ গদ করে কথা শুনালে ভাল হবেনি কিন্তু। আমিও কথা জানি।'

চাপা স্বরে ধমকায় জাহিরা 'চুপ কর।'

'তুই মোর সাথে চল। সাইকেলে চড়িয়ে তোকে লিয়ে যাব। দাদি শুধু তোর কথা বলচে। তোকে দেখার তরে ছটফট করচে।'

'কেন?'

'বলচে যে মরে যাব, তার আগে যেন দেখা হয়। তোর জন্যে রুপোর হার-কাঁটা জাঁতি-ফাঁতি কীসব রেখে যাবে, সে সব তোকে বলবে।'

'কেন, দাদির কি মর মর অবস্থা নাকি?'

'না না। আজ ঘাটে পড়ে যায়। চোখ উলটে যায়। তারপর ঘরে লিয়ে আসতে ঠিক হয়ে যায়।'

'দাদি তালে ত এখনো বাঁচবে, পরে যাবখোন।'

'দাদি যে বলল সাথে করে আনতে?'

'খালিখামাখাই যেয়ে কী করব বলত। সময় করে যেতে হবেনি? দাদির শখ হয়েচে বলে কী করে যাই বল ত। মরলে একটা কথা ছিল।'

'তালে তুই এমনিতে দেখতে যাবিনি ?'

'পরের ঘর করি জানিস ত ?'

'দাদি তোকে দেখতে চেয়েচে যে।'

'ছাড় ত বুড়ি মাগির দেখার সাধ।'

'বাপ মোকে পাঠাল।'

'সে সময় বুঝে যাবখুনে।'

'আজকে গেলে সাথে যেতে পারতিস।'

'এবেলা থাকবি ত রাহাত ?'

'না।'

'কেন ?'

'তোর এমন ঘরে সংসারে কে থাবে থাকবে ?'

জাহিরা হাসে 'তোর বুনটা যে থাকে ?'

'বুনের নসিব।'

'ও আচ্ছা।'

'কী বলতে চাস তুই ?'

'তুই যা. দাদি মরে গেলে খপর পাঠাস, তখন যাব।'

চমকে ওঠে রাহাত। থতমত খায়। 'দাদি যদি শুধোয় কেন এল না, দাদিকে কী বলব ?

'দাদিকেও ওকথা বলবি।'

'বলব, তুমি মরে গেলে তুমাকে দেখতে এসবে বড়বুবু ?'

জাহিরা নীরব থাকে।

রাহাত আঙুলে রুমাল জড়ায়। মুখ নিচু করে। ভাবে। তারপর জাহিরার দিকে আবার তাকায়। 'তাহলে দাদিকে তুই দেখতে যাবিনি ? ঘাটে পড়ে যেয়ে হাত পা কেটে মরতে মরতে বেঁচে গেছে।'

'থাক ত এ বেলা।' রাহাতের হাত চেপে ধরে জাহিরা।

রাহাত জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রাগত ভঙ্গিতে জলচৌকি থেকে উঠে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে উঠোনতলায় নেমে পড়ে লাফিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে জাহিরাও রাহাতের পেছু পেছু নীচে নামে।

রাহাত ততক্ষণে সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়েছে।

'এই দুপুরবেলা না খেয়ে যাসনি ভাই।'

রাহাত পেছু না ফিরে সাইকেল টানতে টানতে বাকুল থেকে বেরিয়ে যায়।

রাহাতের চলে যাবার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে জাহিরা। মুহূর্ত মধ্যে দৃষ্টির সীমা থেকে সরে যায় রাহাত।

জাহিরা ভেবে পায় না এতখানি নিষ্ঠুর হতে পারল কী করে? সহসা রাগের প্রাকার এসে তার ওপর হামলায়। মনে মনে বলে, মরে না ও বুড়ি! দেখতে চেয়েচে! মর না, মরলে তবে যাব। এ সংসারে কি সে থাকতে চায়? থাকতে কি চেয়েছিল? তাকে এ সংসারে আসতে হল কেন

সহসা কান্না এসে ঝাঁপায় জাহিরার শরীরে। মুখ বুক ব্যেপে কান্না আসে। দাদির প্রতি এত রাগ থাকা সত্ত্বেও মায়া মমতায় বুক তার কেমন করতে থাকে। প্রাণটা ছটফট করে। কেমন যেন নরম হয়ে উঠতে থাকে।

পেছন ফিরে তাকায়। সংসারের কাজকর্ম সব পড়ে। রান্নাবান্না হয়নি। দেখে হাসিনা দিনমাসের পোয়াতি শরীর নিয়ে শুয়ে আছে ঘরের দরজার সোজাসুজি মেঝেয়। গতকাল তাদের স্বামীর হাতে হাসিনা চোরের মতো মার খায় ঐ শরীরে। সতীন মার খেলে ভাল লাগবারই কথা। জাহিরার ভালও লেগেছিল। মার ছাড়াতেও যায় নি। কেন না মইবুর সঙ্গে তার কথা বলা ও ব্যবহারের সম্পর্ক নেই। অথচ শরীর দখল করতে আসে মইবু রাতের বেলা। জাহিরা বাধা দিতে পারে না। হাসিনা চিৎকার করতে লাগল আর মইবু বেদম মেরে গেল, একটা গাছের ডাল নিয়ে। কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য! রান্নাঘরের টাটির ফাঁক দিয়ে বুক ঢিপ ঢিপ নিয়ে দেখছিল জাহিরা। একবার মনে হয়েছিল হাসিনা মরেই যাবে। শাশুড়ি আর ননদ দূর থেকে মজা দেখছিল।

অনেক পরে, ঘণ্টা দুই পরে হাসিনার কাছে গিয়েছিল জাহিরা। যখন সতীন মার খাচ্ছে, এমন প্রতিহিংসা শুকিয়ে যায়। যখন সে আর একজন মেয়ে হয়ে ওঠে, তখন হাসিনার কাছে ছুটে আসে সে। পা হাত পিঠ মুখ জুড়ে মারের আঘাত। ফেটে ফেটে রক্ত বেরিয়ে শুকিয়ে গেছে। দেখে শিউরে উঠেছিল জাহিরা। পেটে দিনমাসের সন্তান হাসিনার। রোগা কমবয়সী শান্তশিষ্ট স্বভাবের মেয়েটি। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছিল জাহিরার। হেঁচকি তুলে তুলে তাকে দেখে কেঁদে উঠেছিল হাসিনা। হাসিনা তার চেয়ে কত ছোট। হাসিনার সাধ থাকে সে জাহিরার স্নেহস্পর্শে

তার দিকে মুখ ফেরায়। জাহিরা শাশুড়িকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। শাশুড়ি ছাগলের দড়ির খুঁটো পোঁতার সময় নেয় না। কিছু বুঝতে পেরে ছাগলের দড়ি ছেড়ে দ্রুত পায়ে ফিরতে থাকে। রশিদা, মায়ের ফেরার রকম দেখে পেছু ফিরে জাহিরাকে উৎকণ্ঠিত দেখে সে-ও বুঝতে পারে। চাল ধোওয়া ফেলে রেখে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ঘাট থেকে উঠে আসে। তিন জনে দ্রুত এগিয়ে যায়।

ছাড়া ছাগল ধানখেতে গিয়ে পড়ে। চালের ধুচুনিতে কাক ও পাখি এসে দানা খুঁটে খায়।

ঘরে এসে তিন জনেই দেখে হাসিনার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। কাঁদছে।

ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দেয় জাহিরা।

পুরুষরা বেরিয়ে গেল যখন, যখন মরিয়মের রকম দেখে মেয়েরা সকলে হাসাহাসি করছিল, যখন মরিয়ম মরবে না সকলে বুঝেছিল, যখন রাহাত সাইকেল নিয়ে জাহিরার শ্বশুরবাড়ি চলে যায়, জাহিরাকে আনার জন্য, তার দাদি তাকে দেখতে চেয়েছে সেজন্য, ঠিক তখনই মরিয়ম শেষ নিঃশ্বাস ফেলে। তার মৃত্যুর সময় কাউকে সে বুঝতে দেয়নি। তার মৃত্যুর সময় কেবল আসমা ছিল, আর কেউ ছিল না। একটু পানি চেয়েছিল শুধু। আসমা এক চামচ পানি মুখে দেয়, দ্বিতীয় চামচ পানি ঘিটতে পারেনি মরিয়ম। আসমারি চোখের সামনে মারা যায় মরিয়ম। যখন মরছিল তখন চিৎকার করতে পারেনি আসমা। সে শুধু তাকিয়েছিল স্থির চোখে দাদির মুখের দিকে। ধীরে ধীরে মরতে থাকে; তারপর এক সময় ডান দিকে কাত করে ফেলে মুখটা। তখনই চিৎকার করে উঠেছিল আসমা। তার চিৎকার শুনে সকলে ছুটে এসে মরিয়মকে মৃত দেখে।

রাহাত বড় বুনের শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে এসে দেখেছিল মেয়ের দল তখন পর্দা ঘিরে উঠোনতলায় মরিয়মকে গোসল করাচ্ছে। জাহিরাকে খবর দিতে আর যায় নি রাহাত। জাহিরা বাদে আর সকল আত্মীয়-কুটুম্ব আসতে তবে কবর দেয়া হয় মরিয়মকে। বেলা দুটো বেজে যায়। মিস্ত্রিবাড়িতে শোকের ছায়া নেমে আসে। মেয়েরাই বেশি কাঁদে। মেয়েরাই বেশি আকুলি বিকুলি করে।

আসমা আঙিনায় লুটিয়ে কেঁদেছিল; ভাবিদের গলা জড়িয়ে। তাকে টেনে নিয়ে যায় মাসুদ। মাসুদের ঐদিন সত্যই কাজে যাওয়া হয়নি। আসমার কাছে কাছেই ছিল।

অন্তঃপুর জুড়ে এক মহা শোক নেমে আসে। সম্মিলিত কান্নায় মিস্ত্রি-বাড়ির আকাশ বাতাস ছেয়ে যায়।

মাসুদ ঐদিনে জাহিরাকে খুঁজেছিল। জাহিরা যদি আসতো মাসুদকে খুঁজতো। মরিয়মের মৃত্যুসংবাদ জাহিরাকে পৌছনো হয়নি। রাহাতকে বলা হয়েছিল আবার যেতে। রাহাত রাগ করে যায় নি। রাহাতের রাগ খুব।

আসমা ও মাসুদের আজ চলে যাবার দিনে, মাসুদ জাহিরাকে খোঁজে, আসমাও জাহিরাকে খোঁজে। বাপের ভিটেতে ফিরে যাচ্ছে মাসুদ। এখানেই ঘর করে সংসার পাতবার কথা ছিল। চাচার বিরুদ্ধে পঞ্চায়েত সালিশি বসিয়ে বাপের ভিটে পায় মাসুদ। ঘর ও বাস্তুর ভাগ পায়। এমনটা কখনো আশা করেনি মাসুদ। এখন তার ভিটে মাটি আছে। আসমা জানতো, সে সারাজীবন এই ভিটেতে থাকবে। নিজের ঘর ভিটের লোভের সঙ্গে এখানের সকলকে ছেড়ে যাবার বেদনা বড় বুকে বাজে। কাল থেকেই কাঁদছে। সারারাত ধরে কেঁদেছে, মাসুদের গায়ের পাশে, বিছানায়, একেবারে বুকের ওপর মুখ রেখে।

আসমা আজ শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে, বাপ চাচা চাচাতো ভাইয়েরা কেউ কাজে যায় নি। ফিরোজ মিস্ত্রি কাজের দল নিয়ে যায় নি।

সদাই আসমার মা চোখ মোছে, অশ্রু আবার গড়ায়, সদাই আসমার ঘরে ঢুকে ঝোলায় এটা ওটা পুরছে। আর চোখাচোখি হয়ে যাচ্ছে মাসুদের সঙ্গে। সালেহা লজ্জায় মরে যায়। এক বোয়েম চিনি, এক কৌটো শুঁটকি মাছ, গাছের শিম, নানা কিছু দিয়ে যায়, আর কাঁদতে থাকে।

ছোটভাই শাকিলের জন্যে মন কেমন করে ওঠে আসমার। তার একবারও সাবিরের কথা মনে পড়ে না। সাবির ত এ বাড়ির কেউ নয়। কিন্তু মাসুদের জাহিরার কথা মনে পড়ে। মন কেমন করে জাহিরার জন্যে। তারা যে চলে যাচ্ছে, এটা জাহিরা জানল না। তাদের দাদি দিন দশ হল মারা গেছে, সে খবরও জানে না। এই মুহূর্তে মাসুদের জাহিরার সঙ্গে সম্পর্ক মিথ্যে মনে হয়। জাহিরা বলে কোনো নারী এ সংসারে ছিল এটা সত্যি মনে হয় না। তাহলে ত দেখতে পেত তাকে।

বেলা চারটে বাজে। শার্ট-প্যান্ট পরে তৈরি মাসুদ আলি। নন্টু তাদের সঙ্গে যাবে। আসমাকে সাজায় তার চার ভাবি। আসমা কাঁদতে কাঁদতে সাজছে। পরচালায় দাঁড়িয়ে থাকে মাসুদ।

বালিকা রানী এসে তার হাত ধরে। 'চাচি তুমাকে ডাকছে?'

'কোন চাচি?' রানীর দিকে মুখ নামায় মাসুদ।

'তুমার শাউড়ি।' হাত তুলে দেখায় রাণী।

উঠোনতলা মাড়িয়ে দরজার সামনে চলে আসে মাসুদ।

সালেহা দরজার বাঁদিকের পাল্লাটা বন্ধ করে, ঘোমটা দিয়ে ভেতরে থেকে একটু মুখ বাড়িয়ে আছে। 'বাবা, মেয়েটা বড় সুখী, একটু দেখো। জান পড়ে থাকবে মোর আসমার দিকে।'

'ভাববেন না মা।'

'আর দাদির মতো থানায় এনো বাবা।'

'আচ্ছা।'

সালেহা কাঁদতে থাকে।

'কাঁদছেন কেন?'

'রানী হাঁ করে দেখছে।

'নিজে সাথে করে আনবে।'

সালেহা বাঁ হাত নাকে দিয়ে শিকনি বের করে এনে আঁচলে মোছে। 'মেয়েকে ভয় নয়, মেয়ের নসিবকে ভয়।' গলা ধরে আসে সালেহার।

'আপনি কিচ্ছু ভাববেন না।'

সালেহা বলে 'বিয়েতে অত কাঁদেনি, আজ যত কাঁদচে।'

মাসুদের সঙ্গে তার শাশুড়ি কোনোদিন কথা বলেনি, আজই প্রথম কথা বলছে। মেয়ের মঙ্গলের জন্য সমস্ত লজ্জা মুছে জামাইয়ের সঙ্গে কথা বলছে, জামাইকে অনুরোধ উপরোধ করছে?

বাইরে রিকশা প্যাঁক প্যাঁক করে।

শাশুড়ির দরজার মুখ থেকে সরে আসে মাসুদ।

ফিরোজ চেঁচায় 'একদম কাঁদবি না। তোরা দেরি করচিস কেন?'

আসমার বাপ লিয়াকত পরচালার খুঁটির গায়ে বসে আছে। তার কাছে যায় মাসুদ। কথা বলতে থাকে।

আসমা তেঁতুলতলার দিকে গেল, মেয়ের দলও গেল। গোরস্থানে দাদির কবরের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে আসমা ডুকরে কেঁদে ওঠে।

মাসুদ পাতানো বাপ ফিরোজের সঙ্গে দেখা করে কথা বলে। তারপর পাতানো মায়ের কাছে যায়, দেখা করে, কথা বলে।

আসমার চলে যাবার দৃশ্যটা এমনই হয়। অন্তঃপুর জুড়ে এমনই আলোড়ন হয়। তেঁতুলগাছের ডালে একটা হলদে পাখি মিষ্টি সুরে অনেকক্ষণ ধরে ডাকছে, তার ডাক কারু কানে গিয়ে পৌছয় না।

সকলে আসমাকে এগিয়ে দিতে দলিজের দিকে যায়। ফুলসুরা যায় না। কেন না তার তলপেট জুড়ে ব্যথা। শরীরের লজ্জামুখ থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে। এই প্রথম রজঃস্বলা হচ্ছে। তেঁতুলগাছে বসে হলদে পাখিটার মিষ্টি ডাক সে একমাত্র শুনতে পায়।

অমনি বিকেলের ধূসরতা আঙিনায় বিছিয়ে যায়। বিষণ্ণতার এক সংগীত। এক ম্লানতা। ফুলসুরা বড় ভাবির বিছানায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকে। আসমাকেও এমন পড়ে থাকতে দেখতো। আসমার কাছ থেকেই আগে থেকে জানতো। এই প্রথম সে ঋতুমতী হল। তার শরীর জননী হবার প্রতিশ্রুতি বহন করছে। পুরুষের শয্যার উপযুক্ত হয়ে উঠছে সে। ফুলসুরাও নারী হয়ে উঠছে। রমণের রমণী হয়ে উঠছে।

সবাই ফিরল। কেমন এক নিঃশব্দতা।

রানী এসে ফুলসুরাকে খুঁজে পায় বড় ভাবির বিছানায়। সে বলে 'বুবু, তুই শুয়ে আছিস কেন?'

মুখ ফিরিয়ে রানীকে দেখে ফুলসুরা। হালকা একটু হাসে।

'কি হয়েছে বুবু?' ফুলসুরার গায়ে হাত দেয়।

'কিছু হয়নি। তুই জানবিনি।' ফুলসুরা মনে মনে বলে 'তুই একদিন বুঝবি।'

'ঘুটুম খেলবি বুবু?'

'আজ নয়, কাল খেলব।'

ফিরোজের বড় পুত্রবধূ আয়েসা ঘরে ঢুকে ফুলসুরাকে ওভাবে শুয়ে থাকতে দেখে বুঝতে পারে। রানীকে বলে 'রানী, তুই যা ত এখন।'

রানী চলে যায়। আর বাইরে বসে একাই ঘুটুম খেলে।

আয়েসী ফুলসুরার কানের কাছে মুখ নিয়ে কথা বলে। ফুলসুরাকে অভিজ্ঞ করে তোলে। ফুলসুরা যন্ত্রণাঋদ্ধ শরীরে রাঙা হয়ে পড়ে থাকে।

বুড়ি মরিয়ম এখানে এখনো আছে মনে হয়। পরচালার এক ঠাঁয়ে বসে সব লক্ষ্য করছে। তার থাকাটা এতই দীর্ঘ সময়ের ছিল যে কদিন মৃত্যুর পরও তার থাকার রেশ থেকে যায়। বিভ্রম হয় অনেকের। অনেকে ভীত হয়ে ওঠে। সত্যিই যেন বসে থাকতে দেখেছে মরিয়মকে। রাতের বেলাই এই বিভ্রম তৈরি হয় বেশি। কারো কারো কানে এখনো আছড়ায় মরিয়মের আকুলি বিকুলি কণ্ঠস্বর।

মরিয়মের ঘরের তক্তপোশটা দেয়ালের দিকে কাত করে দেয়া হয়েছে। মেঝে ও দেয়াল তকতকে করে নিকনো হয়েছে। সকালবেলা বড়বউ মেজবউ পালা করে কোরাণ পড়ে। ফিরোজের পুত্রবধূরা-ও।

শাদা শাড়ি পরে আঙিনায় বসে আছে, এই বিভ্রমেই দেখে কেউ কেউ। মেয়েরা প্রায় সকলেই মরিয়মকে শাদা শাড়ি পরে আছে—দেখে আসছে প্রথম দেখা থেকে। কেন না মরিয়ম তিরিশ বছর বয়সের মধ্যে বিধবা হয়ে যায়। এতদিনে বৈধব্য বহন করে এসেছে। তিরিশ বছর বয়স থেকে খরস্রোতা যৌবনের ভার ধিকি ধিকি বয়ে নিয়ে গেছে যৌবন নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত। এতকাল শরীর বহন করে এসেছে। মনও।

ফিরোজের মেজ পুত্রবধূর চার বছরের খোকনটা খুব কাঁদে। এতক্ষণ ঘুমিয়েছিল বিছানায়। মাকে না দেখতে পেয়ে ভয়ে আশ্রয়হীনতায় জোরে কেঁদে ওঠে। এখন সে শিশু। মাতৃক্রোড়ের আশ্রয়ে তার বাড় বৃদ্ধি হবে। একদিন সে বড় হবে। পুরুষ হয়ে উঠবে। এই আঙিনায় সে একদিন পরম্পরা তৈরি করবে। সময় বদলে যাবে খানিকটা। ইতিহাস বহে যাবে। আকাশ ও গ্রহনক্ষত্রের চোখে-পড়বার মতো কোনো পরিবর্তন তখনও থাকবে না। ইতিহাসকে পুনর্বিচারের আরো আরো সূত্র ও বীক্ষা তৈরি হতে পারে। ব্রহ্মাণ্ডকে চেনা ও জানার আরো অনেক সমাধানসূত্র হয়তো জড়ো হবে। সব শিশুরাই বড় হয়ে এক শতাব্দী থেকে আরেক শতাব্দী ডিঙিয়ে যায়। মানবেতিহাস প্রবহমান থাকে।

শিশুটি মায়ের কোলে শান্ত হয়। নন্দিত হয়ে ওঠে। তাকে স্নেহমমতায় ভরিয়ে তোলে জননী। চার মাসের শিশু পুত্রটিও তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

তার জন্যেই তার স্তনদুটো ভরা ও নেমে থাকে স্তন দুটিই শিশুর খিদের কথা জানিয়ে দেবে। শিশুপালনে স্তন ও জননী সমার্থক হয়ে ওঠে।

হলদে পাখিটা তেঁতুল গাছের ডালে ডেকে চলে তখনো। দিনশেষের স্নিগ্ধ ও মিহি আলো ছড়িয়ে থাকে চারপাশে।

সব রান্নাঘরে উনুন জলে ওঠে। শিশু কাঁদে। মা আর্তনাদ করে। অন্তঃপুর জুড়ে অন্তঃপুরিকাদের তাপ-সন্তাপের ভেতর আশা-আকাঙ্ক্ষা এক এক রকমভাবে সজ্জিত হতে থাকে। আশাভঙ্গের পরও তার সজ্জা ফুরোয় না। এমনই তার প্রাণতা। বেঁচে থাকার শেষ নিশ্বাসেও আকাঙ্ক্ষা শেষ হতে নেই। কেউ রাতের বেলা খিলবেড়ায় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাজবে। কারু হাসির মধুরতা সজ্জা হয়ে উঠবে। জীবন সাজাবার প্রয়াসে তারা সক্রিয় ও সজাগ। বেঁচে থাকাই যখন জীবনের আর এক পরিচয়। বেঁচে থাকার ছেদ নেই। অন্তঃপুর সুর ছন্দ ভাষায় গীতিকা হয়ে ওঠে। হয়তো শিশু কোথাও কাঁদে, কাতর হয়ে ওঠে অন্তঃপুরিকা। হয়তো পুরুষ তাকে কাছে চায়, এই চাওয়ায় নিজেকে ভূমি থেকে ব্যোম বিছিয়ে দেয়। পাতালের ভোগবতী থেকে মাটির ওপরের গঙ্গা মিশিয়ে দেয়।

দাদির মৃত্যুর পর জাহিরার এ আঙিনায় ফেরাটা নিয়তি নির্ধারিত, অমোঘ ছিল। ফেরাটা, মাসুদ আলির দেখার সীমায় থাকার নিয়তি-নির্ধারিত হয়নি। ফিরেছে, যখন ফেরার বিরোধিতা করেছে। কেন না, দাদির মৃত্যু-সংবাদ অনেক দিন পরে লোকমুখে শোনে যখন, আসমা ও মাসুদ আলি এখানের বসবাস থেকে উঠে গেছে তখন। সে মইবুর সংসারে থাকতেই চেয়েছিল। যেমন করে ছিল সে। আগে মইবুর সংসারে ফিরে যাবার ইচ্ছা না নিয়ে ফিরে যায়। এখন মইবুর সংসার থেকে না ফেরার ইচ্ছেয় তাকে ফিরতেই হয়। তাছাড়া কোনো উপায় ছিল না। একমাত্র উপায় ছিল আত্মহত্যা করা। তা করতে পারেনি জাহিরা।

একটু একটু করে হাসিনার ওপর কর্তৃত্বের অধিকার সে অর্জন করেছিল। যে কর্তৃত্বের মধ্যে দায়িত্ব বহনের প্রতিশ্রুতি তৈরি হতে বাধ্য, এটা জেনে, সে কর্তৃত্ব গ্রহণে জাহিরার দ্বিধা ছিল। কেন না জাহিরা ছিল সতীন। প্রথম প্রথম শত্রুতার চোখে দেখতো, প্রতিহিংসায় ভরে থাকতো। কেননা হাসিনা তার স্বামীসংসার কেড়ে নিয়েছে। পরে হাসিনার শান্তশিষ্ট ভালমানুষি
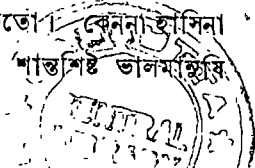
স্বভাবের টানে ভুলে যায়। হাসিনাকে স্নেহস্পর্শ দিতে চায়। এরকম করে হয়তো আমৃত্যু থাকা যেত। এ বাড়ি থেকে মাসুদ আলির চলে যাবার খবর শুনে, এমনভাবে কথাটাকে সমর্থন করেছিল জাহিরা। প্রেমে পড়ে গিয়েছিল হাসিনার। সেও একজন মেয়ে নাকি?

এমনভাবে থাকার বিরোধিতা করেনি হাসিনা। স্বামীর সংসারে আগের সতীনের বসবাস তার চোখে একটু বাড়াবাড়ি হলেও বিরোধ আনেনি। হাসিনা বিরোধী স্বভাবের মেয়েমানুষই নয়। সপত্নী সম্পর্কই বিরোধী স্বভাবের। হাসিনার শিশুকে নিজের শিশুর মতো বুকে তুলে নিয়েছিল। সংসারের সমস্ত কাজ সে করতো। করতেই হবে। উপায় কি? সংসারে তার থাকার অধিকার কি আছে? স্বামীর সঙ্গে বসবাসের চেনা সম্পর্ক নেই, থাকার নিশ্চয়তা তৈরি হয় কীভাবে।' তাই সংসারে সমস্ত কাজে জুতে দিয়ে তার থাকাটাকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। নিজের সংসারে নয়, হাসিনার সংসারে সে আছে, এটা মনে করতো। কখনো কখনো রাতের অন্ধকারে স্বামী তার কাছে আসতো, তার প্রচার প্রতিষ্ঠা ছিল না। দিনমানে সকলে দেখে, সকলে জানে যে মইবুর সঙ্গে আগের স্ত্রীর কোনো সম্পর্ক নেই। রাতের সম্পর্ককে তাই বড় করে দেখতে পেত না জাহিরা। বাস্তব ও সত্য জেনেও অলীক ও স্বপ্ন মনে করতো জাহিরা। কেন না এই সম্পর্কের ভেতর স্বভাবত যে স্বামী-স্ত্রীর দাবি তৈরি হয় তা মইবু তাকে দিতে চায়নি।

রাতের অন্ধকারের সম্পর্কের সময় একদিন, একবার জাহিরা কথা বলতে চেয়েছিল স্বামীর সঙ্গে। যখন বাপের সংসারে ফেরার কোনো উপায় ছিল না অবশিষ্ট। মইবুকে ভালবাসতে চেয়েছিল। তার এই মনের সাধের হয়তো মাটি আকাশ গ্রহনক্ষত্রও সঙ্গী হয়ে উঠেছিল। অন্ধকারের বুকে তার মুখের হ্লাদ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল গোটা আকাশের তারাদের মতো। উঠোনতলার নারকেল গাছদুটিও তার সাধের কথা জেনে যায়। কেন না মইবুতে পুর্নগ্রহণের বাসনা অসম্ভব ছিল। সেই অসম্ভবের লীলায় ভরে উঠেছিল সহসা। বেলন চাকি উনুন কাঁথাবালিশ শিলনোড়া ঘাটের পাথর পুব-পশ্চিম আঙিনা দরজা সব হেসে উঠেছিল। কিন্তু মইবু কথায় ও ভালবাসায় যেতে চায়নি। চোরের মতো তার শরীর ভোগ করাই ছিল তার অভিপ্রায়। ঐ স্বামীর সঙ্গে পুনর্বার কথার সম্পর্কে তার পক্ষে যাওয়া শুধু উচ্চারণ নয়, জীবনকে আর একবার

সাজানোর আয়োজন। সে সম্পর্কে যেতে চাইল না স্বামী। রাতের শরীর ভোগ করার ব্যাপারটা ছিল তার কাছে নিষ্ঠুরতা, নির্যাতন।

পুরুষের দুই হাতের মধ্যে লীলায়িত হতেই সে জানে। নিরুচ্চার, শুধু পুরুষের চাওয়া মেটানোয় নারীর বেশ্যাবৃত্তির মতো এক সহনীয়তা আছে। যে লীলায় সে লীলাবতী। সেই লীলার বিনিময় যদি তার থাকতো, সংসারের থাকার ভেতর সম্পর্কের সমর্থন, তাহলে থাকার ভেতর অবশিষ্ট কিছু প্রাণ থাকতো। তা যখন দিতে চায়নি মইবু, জোর করতে পারেনি সে। উনুন কাঁথাবালিশ হাসে না, কথা বলে না। ঘাটের পাথর হাসে না, কথা বলে না। পুব-পশ্চিম প্রসন্নতায় প্রসারিত হয় নি।

দিনের আলোয় কাছাকাছি থেকে গায়ের পাশ থেকে চলে যাবার সময় ও চোখে চোখ পড়বার সময় একদিন মইবুর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। 'শোন, আমি কি তোমার কেউ নই ?' এগিয়ে গেছে, স্বামী তার সঙ্গে কথা বলে নি। হাসিনার চোখে পড়ে যাওয়ায় আরো একটু বেশি অগ্রসর হতে পারে নি। যদি সে হাত ধরতে পারত!

অন্যদিন যে সময় হাসিনা ঘাটে ছিল সেদিন ঐ কথা বলে ঐভাবে এগিয়ে গিয়ে স্বামীর হাত চেপে ধরে জাহিরা। ঝনকা মেরে স্বামী হাত সরিয়ে দেয়। 'যা, ভাগ মাগী।' সম্পর্ক না থাকার ভেতর যে কথা বললে বাস্তব হয়, তেমন ভাবেই কথা বলেছিল মইবু। এই ঘটনা শাশুড়ি ও ননদের চোখে পড়ে গিয়েছিল। এক সময় ঐ ঘটনার সূত্রে তারা এসে নুনের ছিটে দিয়ে যায়, কথার বিষ ঢালে। এবং হাসিনাকে শুনিয়ে যায়, তার স্বামীর সঙ্গে তার বড় সতীন সোহাগ করতে গিয়েছিল। হাসিনা শুধু বড় বড় চোখ দুটি মেলে ধরেছিল। যেমন ভাবে দিঘির জলে আকাশ ছায়া ফেলে, তেমন ছিল তার তাকানো। এমনিতেই মমতাসিক্ত চোখ হাসিনার। এই তাকানোর মধ্যে নূপুরের মিহি স্বর মেখে থাকে। এমনভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই হাসিনার হাত থেকে সবচেয়ে পুরনো কাঁসার গেলাসটা বাসন-কোসনের ওপর পড়ে যায়। নূপুরের স্বর ও বজ্রনির্ঘোষ সমতা পেয়ে ওঠে।

তারপরে, কারোরই চোখকে জানতে না দিয়েই জাহিরা মনে মনে মইবুকে ভালবাসছিল। ভালবাসতে চাওয়ায় ভরে উঠছিল। এই চোদ্দ পনের বছর পর যেন মইবুর সঙ্গে তার প্রথম প্রেম হবে, এই রকম বাসনায় মনে মনে ভালবাসছিল জাহিরা। হাত থেকে এটা ওটা পড়ে যায়, এ কথা এই শোনে, ভুলে

যায়, কেউ ডাকলে শুনতে পায় না। হাসিনা ভাত বেড়ে দেয় যখন, মইবুকে থালায় কোন জায়গাটায় নুন থাকলে ঠিক হয়, এমন মগ্নতা তৈরি হয় জাহিরার মধ্যে। স্বামী ঘর দোরে থাকার সময়, দরজার একটা পাল্লায় একটু আড়াল হয়ে মুখ বাড়িয়ে থাকতো বাইরের দিকে। কিংবা অকারণে ঘোমটায় মুখ ঢেকে পাশ দিয়ে চলাফেরা করতো। যাতে তার মুখ দেখার বাসনা জন্মায়। ঘাটে গিয়ে কারোর সঙ্গে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছে, যাতে তার কণ্ঠস্বর তার স্বামী শুনে তার প্রতি গুরুত্ব দেয় ও সম্পর্কের কামনা তৈরি হয়। ঘাট থেকে ফেরার পর যাতে তার সঙ্গে কথা বলতে যায় স্বামী। ঘাট থেকে ফিরে এসে দেখেছিল, মইবু হাসিনার দিকে কামনার চোখে তাকিয়ে আছে। হাসিনার চোখ দুটি ও শরীর দিঘির মতোই শান্ত ও নির্জন হয়ে আছে। তখন থেকেই বুঝেছে, হাসিনা যতখানি স্বামীকে আকর্ষণ করতে পারে, সে তার ছিঁটেফোঁটা পারে না।

স্বামীর মন কাড়ার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে আর যা কিছু করে, তাতেই স্বামীর মন ভোলাতে চাচ্ছে, মন কাড়তে চাচ্ছে, এটা প্রদর্শন হয়ে ওঠে। আশ্চর্য, সে-সবের কিছুই জানে না। হাসিনার শিশুকে মুখ ফিরিয়ে কোলে নিয়ে বসে থাকলে মইবু হাসিনা ভেবে তার কাছে উপস্থিত হয়। তার প্রেমে পড়ার সম্ভাবনা জন্মায় যেন। এমনটা তার সতীন না-থাকা জীবনযাপনে স্বামীর প্রেমে পড়ার ইচ্ছে আগেও ছিল। তার সঙ্গে এখনের তফাৎ এমন কিছু নেই। তখন জীবনযাপন ছিল, প্রদর্শন ছিল না। এখন প্রদর্শন না করতে চাওয়ার ভেতরও প্রদর্শন এসে যায়, জীবনযাপন আসে না। মুখ না দেখতে দিয়ে ঘোমটায় উঠে গেলেও প্রত্যাখান জানানো হয় না, অভিমানের প্রদর্শন হয়। কথা বলার সম্পর্ক না পেয়ে নীরব চলাফেরা করলে, কথা বলতে চাওয়ার প্রদর্শন হয়। মুখে প্রসন্নতা ও বিষাদ আনলেও এক সতীনের হাত থেকে অন্য সতীন স্বামীকে কেড়ে নেবার ভাব প্রদর্শন হয়। থালাবাটি নড়াচড়ার ভেতরও। খুব যত্ন করে ঘর-উঠোন ন্যাতা দেবার ভেতরও। শালিক এসে উঠোনতলায় বসলে পরিতৃপ্তির মন নিয়ে তার দিকে তাকালেও হয়। মেয়ে দুটিকে খুব মারধোর করলেও। শাশুড়ি এসে বলে যায় 'কেন মারিস, কেন তোর এত রোষ বুঝিনি, স্বামী তোকে নেয় না, ঐ জ্বালায় জ্বলছিস।' আগে স্বামীকে আকর্ষণ করতে গিয়েছিল বলেই এসব কিছু প্রদর্শন হয়ে ওঠে, জীবনযাপন হয়ে ওঠে না।

আর, পরে বুঝেছে, হাসিনাকে অতখানি ভালবাসাও তার উচিত হয়নি। সতীনের জন্যে অতখানি দয়ার্দ্র কেউ হয় না। হওয়া সুখকর নয়। তার পাল্টা মার খাচ্ছে। প্রথম প্রথম সে ভালবাসতেও চায় নি সতীনকে। সেই ভালবাসা অর্জনেই সতীনের শিশুকে কোলে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে বসে। সংসারে কাজ কেড়ে নিয়েছে। সংসারের কাজ করতে গিয়ে ঘর রান্নাঘর করতে হয়, মইবুর পাশ দিয়ে চলে যেতে হয়। মইবুকে কেড়ে নিতে চাচ্ছে, এসব প্রদর্শন হয়ে ওঠে। আর প্রতিদিনে হাসিনার মন বিষিয়ে উঠতে থাকবে। মইবু যদি তাকে পুনর্গ্রহণ করতো সেটা আবার আলাদা ব্যাপার হতো। যতই শান্ত ও ভালমানুষ হোক না হাসিনা, তাকে নারী হয়ে উঠতেই হয়। এই প্রদর্শনই তাকে জ্বালায় পোড়ায়। দিনে দিনে রুষ্ট হয়ে ওঠে। যাকে ছোট বোনের মতো চিবুকে হাত দিয়ে স্নেহস্পর্শ-সান্ত্বনাসাধ দিয়েছিল। দিনে দিনে হাসিনার কাছে জাহিরা অসহ্য হয়ে উঠেছিল। মুখে না বললেও মনে মনে। ধীরে ধীরে হাসিনাকে ভালবাসার শিকার হয়ে ওঠে।

আগের মতো চুলে তেল দিয়ে চুল আঁচড়ে দিতে গেলে, আর গায়ের কাছে ধরা দিতে চায় না হাসিনা। চোখের সামনে হাসি হাসি মুখ করে নিজেই চুলে তেল দেয়, নিজেই চিরুনি দিয়ে আঁচড়ায়। আঁচড়াতে থাকে আর হাসতে থাকে। কেন না মুখের সামনে রুষ্টতা দেখানোর স্বভাব নেই হাসিনার। তাই হাসে। হাসি দিয়ে চুল আঁচড়াতে না দেয়া ঢাকে। তার ওপর রুষ্ট এটা বোঝায়। কথায় ও প্রত্যক্ষ ব্যবহারে বোঝায় না। হাঁড়ি বাসনে হাত দিয়ে বোঝায়।

হাসিনার ওপর কর্তৃত্ব অর্জন না করলে একভাবে এই সংসারে থাকার একটা স্থায়ী পরিবেশ গড়ে উঠতে পারতো। যদি হাসিনা তার ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে পারতো। তাহলে হাসিনা সতীন-ব্যথা পেত না। হাসিনার কথায় উঠতো বসতো, যখন তার বাপের বাড়ি ফেরার অনুকূলতা নেই, এইভাবে আমরণ থাকার সমর্থন সে পেত। চাকরানির মতো তার থাকার প্রয়োজন হাসিনা পরিতৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করতো। এখন কাজ করতে গেলেই প্রদর্শন হয়ে ওঠে, কেন না হাসিনার কাছে সে কর্তৃত্ব অর্জন করেছে। হাসিনা শোধ নেয়।

বিধিসম্মতভাবে তার স্বামী জাহিরাকে ত্যাগ করে একদিন। কেমন যেন কিস্সার মতো শোনায়, লোককাহিনীর মতো।

ছেলের জন্যে রুপোর এক পদক গড়ানোর খুব ইচ্ছে হয়েছিল হাসিনার। শিশুটিকে নিয়ে যখন শিশুর মামাবাড়ি যাবে, পদক হাতে দিয়ে নিয়ে যাবে। পদক গড়ানোর ব্যাপারে ওষ্ঠাগত ছিল হাসিনা। নানা কথার ফাঁকে জাহিরাকে এই সাধের কথা বলেও ফেলে। ঘরের ডিম, গাছের নারকেল বেচে কিছু টাকা জমায়ও। স্বামী নিজের পয়সায় গড়িয়ে এনে দেবে, স্বামীকে মুখ ফুটে বলতে পারে না। স্বামীর কাছে বিরূপ হয়ে ওঠে, এটা চায়না সে। জাহিরা যখন ঘাটে যায়, মাসখোরাকি চাল থেকে কিলো দশ চাল পাড়ার জয়নালের মায়ের কাছে বিক্রি করে দেয়। ঘাট থেকে ফেরার পথে জাহিরার চোখে পড়ে যায়। তারপর কিছুদিন যেতে ভাত চড়াবার চাল নেই। জাহিরাই রান্না করে। চাল বিহনে তাদের সেদিন রান্না চড়েনি। জাহিরা কী করতে পারে আর! না খেয়ে থাকতে পারে। না খেয়েই রাত্রি কাটায়।

পরের দিন অবশ্য স্বামী চাল কিনে এনে দিয়ে যায়। পরের দিন মদ খেয়ে এসে জাহিরাকে তালাক দিলে জাহিরা জানতে পারে তবে তার কারণ। তালাক দেবার আগে জানতে পারেনি তালাক দেবার কারণ। জাহিরাকে খাওয়ানো পরানোর ক্ষমতা নেই। হাসিনার চাল বিক্রি করাটা পরোক্ষভাবে এই ঘটনার পরিণতিকে প্রভাবিত করে।

তালাকের পূর্বাবস্থায় জাহিরার ঐখানে থাকার এক অর্থ ছিল। যা হোক না কেন। থাকতেইত সে চেয়েছিল। তালাকের পরে থাকাটা আর বিধি-সম্মত নয়। মসজিদের মোল্লা মৌলবিরা নড়ে চড়ে উঠবে। পুকুর ধারে শুষণি শাক তোলার সময় পায়ে উঠে জোঁক নিঃসাড়ে যে রক্ত চুষে খেয়ে মোটা হয়ে খসে পড়ত, তখনই জানতে পারতো রক্ত শুঁষে নিয়েছে জোঁকটা। এখন মোল্লা মৌলবিদের দিকে ঘুরে তাকালে এমনটা মনে হয় জাহিরার। মোল্লা মৌলবির কাছে তার কোনো সুবিচার নেই। ব্যবস্থা যাতে কায়েম হয় সেটা এখন তারা দেখবে।

মিস্ত্রিবাড়ির আঙিনায় অবশেষে ফিরল জাহিরা। চুলে জট ও উকুন ভর্তি। মা জট ছাড়িয়ে দেয়, উকুন বেছে দেয়। মায়ের এই ব্যবহারভঙ্গির কাছে এক আশ্রয় গড়ে ওঠে তার। মরিয়মের যা কিছু জিনিসপত্র ছিল, সব কিছু পেয়েছে জাহিরা। একটা ছোট্ট ছুঁচ পাওয়ার ভেতর, পাওয়ার এক তৃপ্তি থাকে, তার ভেতর না থেকে তার চলে না। যাপনের সময়ের কাছে যা কিছু আসন্ন থাকে, তা তাকে পেতে আছে, যতই ন্যূন হোক তার ভেতর তার

আকাঙ্ক্ষা আশ্বাস সজাগ। এমনই আসন্নতায় মাসুদ আলির প্রেম তার হাতের কাছে এসেছিল। সে দুলে উঠেছিল। মজে উঠেছিল। স্বামী সংসার থাকা সত্ত্বেও। মাসুদ আলি নেই, স্বামী সংসার নেই, একটু পান-সুপুরিতে আকাঙ্ক্ষা আশ্বাস নূ্যন হয়ে ধরা দেয়।

সহজে সব কিছুতে মানিয়ে নেবার স্বভাব জাহিরার। মেয়েরা যখন এক-সঙ্গে বসে কথা বলে, সেই কথায় মিশে, কথা কৌতুকের তৃপ্তিতে মেতে ওঠে জাহিরা। অন্তঃপুরের নিজস্ব কিছু কথা আছে, আলাপ আছে, যাপনের নিজস্ব ভঙ্গি আছে, নিজস্ব পরিতৃপ্তি গড়ে নেয় তারা। এখন এই হাসি কৌতুকের ভেতর জাহিরাকে দেখলে মনে হবে তার প্রত্যাখ্যাত পূর্ব জীবনের যা কিছু ব্যথা বেদনা, তা সত্যিকারের তার কাছে ছিল তুচ্ছ, ক্ষণস্থায়ী ও ভঙ্গুর। এখনের হাসি আনন্দের সমতুল্য নয়। চুল তেল দিয়ে বেঁধে দিলে আরো উজ্জ্বল ও রূপসী দেখায় জাহিরাকে। হাসলে, আরো দেখায়।

মিস্ত্রিবাড়ির আঙিনায় বিছিয়ে থাকে বিকেলের নরম আলো। রাজ-মিস্ত্রির কাজ করে যারা তাদের বউড়ি ঝিউড়ি তারা। দরিদ্র তারা। স্বামী প্রতিদিন খেটে আনলে তবে খেতে পায়। তারা অতি সাধারণ। তাদের কথাও সাধারণ। ব্যথাও সাধারণ। আঙিনা জুড়ে তারা নানা কথায় গা ঠেলাঠেলি করে হাসতে থাকে। হাসলে কতকিছুই তুচ্ছ হয়ে যায়।

জাহিরার মা আসুরা জাহিরার চুলের গোছা দু হাতে ধরে এবং হাসতে হাসতে বাঁ পাশে বসে থাকা মেজ জাকে কনুই দিয়ে ঠেলে। তারপর মেজ জা বড় জার হাত ধরে টানলে জাহিরার চুলের গোছা হাত থেকে স্খলিত হয়।

সারা পিঠ জুড়ে একরাশ চুল ছড়িয়ে পড়ে জাহিরার। নিজেই নিজের চুলের গোছা পেছন থেকে ধরে এবং ঐ হাসি কৌতুকের ভেতর খোপা বেঁধে ফেলে। চকিতে এক ঢাল চুল খোপা হয়ে যায়।

আসমার মা মুখ বাড়ায় 'কেন মোবারকের মা কি বলে, সেদিন এসে বলছিল, তোদের এক চিমটি তিতো দিবি, তিতো দিবি! মুই হাঁ, বলি তিতো কী গা মা। বলে ভাসুরের নাম ধরতে নেই। মুই বলি তুমার ভাসুরের নাম খয়রুল? মোবারকের মা এক হাত জিব কেটে ফেলে। খয়ের চাইতে এয়েছিল।'

আবার হাসি চলে। একে অপরে ঠেলাঠেলি করে হাসে।

ছোট বউ নাদিরা বলে 'মোর আব্বা কলকাতার গোলাম্ম কাঠের কাজ

করতো। কলকাতাতেই থাকতো। কলকাতা থিকে মাসের মধ্যে একবার দুবার ফিরতো। মুই তখুন ছোট চার বছর বয়েস হবে, রাস্তা থিকে দেখতে পেনু বাপ এসচে, বেগ ভর্তি জিনিশ লিয়ে এসচে। না জানি আব্বা কত কি খাবার এনেচে। ঘরে এসে মাকে জিগনু, আব্বা কী এনেচে? মা বলল 'যন্তর'—হাতুড়ি বাইশ র‍্যাদা তুরপুন এসব বেগ ভর্তি করে এনেছিল। মুই তখন যন্তর কারে বলে জানি নি, বাপ যন্তর এনেচে শুনে মুই বাইনা করতে লাগলুন মা মুই যন্তর খাব।'

হাসির হররা ওঠে আবার। প্রথমটা সম্মিলিত চিৎকার হয়ে ওঠে। পরে একে অপরের পিঠে যেমন গড়িয়ে পড়ে, তেমনই হাসিটাও গড়ায়। তরলের মত ঢল ঢল করতে থাকে। যে বলে, সেও হাসে। সে শুধু হাসায় না, হাসেও।

সামিমা, এ বাড়ির কচি বউ। আশরাফের বউ। ফুপতো বোনকে বিয়ে করেছে আশরাফ। সামিমা হল কনিজার মেয়ে। সবার হাসি শেষ হবার পরও সে হেসে চলে। সকলের দৃষ্টি পড়ে তার দিকে।

আম্বরা সেজ জার গায়ে ঠেলা দিয়ে বলে 'ওলো আশরাফের বউ কী বলবে ছাখ।'

আশরাফের মা মেজগিন্নি বউকে ঠেলা মারে 'কী কথা মনে এল, হাসচিস, বল না?'

সামিমা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসে, আর বলতে পারে না। ঘুমন্ত খাঁচার শালিখ যেমন ঢুলতে থাকে তেমন রকম ঢুলতে ঢুলতে হাসতে থাকে সামিমা। তার এই হাসির কথা বলতে না পারার ধরন দেখে দু একজন হেসে ওঠে, আর তাদের দেখাদেখি সকলেই হেসে গড়িয়ে পড়ে।

আসাদের বউ বলে 'মোর চাচি বলেছিল, তাদের বাপের দেশে এক মৌলবি ওয়াজ কত্তে এয়েছে। মৌলবিরা যে ঘরে ওয়াজ কত্তে যায়, সেখেনে যেয়েই বলে থাকে পেরথমে, শরীলটা ভাল নেই, বিশেষ কিছু খাবুনি। মৌলবি ই কথা বলা মানে, ভাল ভাল খাবার তৈয়ের করে খেতে দেয়া। ত এক ঘরের বউ ছিল ধুত্ত, সে মৌলবির ঐ কথা শুনে এক জামবাটি সাবু রেঁধে রেখে দেয়। ওয়াজ শেষ হলে সেই সাবু রান্না খেতে দেয়। ভারি জব্দ করেছিল।'

আসাদের মা বলে 'ও লো, মৌলবি সে সাবু খেল?' হাতটা এমনভাবে

আসাদের বউয়ের দিকে বাড়িয়ে ধরে যে, ঐ কথার থেকে এই হাত বাড়ানোর ভঙ্গি আরো কৌতুক ডেকে আনে। আর সকলে হেসে গড়ায়।

মেজ জা বলে হাসতে হাসতে 'ও লো সাবু খেয়ে কী করে রাত কাটাল মৌলবি ?'

এই কথায় আরো হাসি বাড়ে।

সঙ্গীদা বলে 'না খেয়ে নিদ গেল কী করে ?'

সঙ্গীদার শাশুড়ি আসমার মা বলে 'বালিশ কেমড়ে কেমড়ে খেয়েচে।'

হাসির হররা পড়ে যায়। এ ওকে ধরে। কেউ খুঁটি ধরে। খুঁটির নাড়ায় চালা কাঁপে। চালার বাঁশ থেকে ঘুন ঝরে পড়ে। যেন ইতিহাসের অসারতা ঝরে পড়ে।

নাদিরা বলে 'ডিডি টুই যে কঠা বললি ? আমি কঠাও বলিনি বাটটাও বলিনি।'

দু চারজন মৃদু হাসে।

জাহিরা নাদিরার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু আঙুলে গাল টিপে ধরে 'বল সুপুরি।'

নাদিরা বলে 'ঠুপুরি।'

নাদিরাকে ঠেলে দেয় জাহিরা। চিৎপাত হয়ে যায় নাদিরা। আর হাসির হররা আছড়ে পড়ে।

এই হাসিকৌতুকের ভেতর দিয়েই সময় গড়ায়। আঙিনায় রোদের তাপ কমতে থাকে। আলোর রঙ ধূসর হতে থাকে। মাটি ও বাতাসের ভেতর এক মৃদু আলোহীনতা জমতে থাকে। আকাশ আরো নীলাভ হয়ে উঠতে থাকে। আকাশ ও আঙিনা বাতায়নের মত হয়ে ওঠে, তাদের এই দলবদ্ধ বসে থাকবার ভেতর।

কবে ?

অন্নদাশঙ্কর রায়

হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক অন্তত সাত শতাব্দীর। একপক্ষে কেবল হিন্দু ও অপরপক্ষে কেবল মুসলমান এরূপ যুদ্ধ গোড়ার দিকে একবার কি দু'বার ঘটেছিল। তার পর থেকে হিন্দুপক্ষে মুসলিম সৈনিক লড়ে, মুসলিমপক্ষে হিন্দু সৈনিক। সব ক'টা যুদ্ধই রাজায়-রাজায়। কোনোটাই প্রজায় প্রজায় নয়। প্রজায় প্রজায় যা বেধেছে তা গোহত্যা নিয়ে বা মসজিদের সামনে বাজনা নিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা। এই কারণে কখনো কেউ ভারত ভাগ করতে বা বঙ্গভাগ করতে চায়নি।

বিরোধটা ব্রিটিশ আমলে প্রধানত ছিল চাকরি-বাকরির বখরা নিয়ে। হিন্দুদেরই ছিল সিংহের ভাগ। তারাই কলেজী শিক্ষায় অর্ধ শতাব্দী এগিয়ে রয়েছিল। মাদ্রাসা-শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানরা আধুনিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে কাজকর্মের উপযুক্ত ছিল না। তারপর বিরোধ বাধে মন্ত্রিত্বের বখরা নিয়ে। ত্রস্ত মুসলমানদের জন্যে বাঁধা চাকরি ও বাঁধা-মন্ত্রিত্বের ভিত্তিতে একটি মিটমাটের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু জিন্না সাহেবের মতে মুসলমান বলতে বোঝাবে শুধু লীগপন্থী মুসলমান, কংগ্রেসপন্থী বা ইউনিয়নিস্ট বা কৃষক প্রজা নয়। এই ইস্যুতেই মিটমাটের সম্ভাবনা গত হয়। জিন্না সাহেব হাঁকেন পাকিস্তান চাই তো কংগ্রেস নেতারা হাঁকেন পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাঞ্জাব চাই। এটাও সেই রাজায়-রাজায় যুদ্ধ। হবু রাজায় হবু রাজায়। দুঃখের বিষয় প্রজারা বিভ্রান্ত হয়ে চিরদিনের প্রতিবেশীকে মেরে তাড়ায়।

অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল ইউরোপের ইতিহাসে তিনশো বছর আগে। ক্যাথলিক ও প্রটেষ্ট্যান্ট দুই সম্প্রদায়ে। তার তুলনায় ভারতের ইতিহাসে তেমন কিছু ঘটেনি। বহু হিন্দুর আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা ছিলেন মুসলিম পীর ও ফকিরগণ। বহু মুসলমান রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করেছেন। মুসলিম ওস্তাদদের গানও একই বিষয়ে। কানু বিনা গীত নাই জসীমউদ্দীন লিখেছিলেন বলে মনে পড়ে। ধর্ম ভিন্ন হলেও সংস্কৃতি অভিন্ন ছিল তিনশো কিংবা চারশো বছর অবধি। আমীর খসরু তার প্রমাণ। মালিক মহম্মদ জৈসী তার প্রমাণ।

সেকালের কবিতায় যাঁদের উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁরা তুরুক কিংবা মোগল। তাঁদের বিপরীতে হিন্দু। হিন্দু অর্থে হিন্দের অধিবাসী। পরবর্তীকালে তুরুকের ও মোগলের পরিবর্তে মুসলমান অভিধাকে পাওয়া গেল। তখন হিন্দু হয়ে গেল হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী সম্প্রদায়। রোটি ও বেটি নিয়ে আপত্তি থাকলেও উভয় সম্প্রদায়ই উভয় সম্প্রদায়ের উৎসবে ও পার্বণে অংশ নেয়। মহরমের লাঠিখেলায় আমি হিন্দুকে বাঘ সেজে নাচতে দেখেছি। আমার পিতামহীর মানত ছিল যে আমিও মহরমে লাঠি খেলব। তবে আমার সাধ বাঘ সেজে নাচা। এটা ধর্মের অঙ্গ নয়।

পরকে আপন করাটাই মহত্ত্ব। আপনকে পর করাটা মূঢ়তা। সতেরো কোটি বঙ্গভাষী এখন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পরস্পরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছে। তারা মুখ ফেরাবে কবে?

ষাট বছর আগে আমাদের বাড়িতে একটি ছাত্রী আসত। বলত, "বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে আমার খুব ভাব।" সে নিজে কী। সে কি বাঙালী নয়। না; সে মুসলমান। তার মানে যে মুসলমান সে বাংলাভাষী হলেও বাঙালী নয়, সে মুসলমান। ঠিক একই রকম উক্তি হিন্দুর মেয়েদের মুখে আগেও শোনা যেত, এখনো শোনা যায়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে আছে মুসলমানদের সঙ্গে বাঙালীদের খেলা হয়েছিল। সেটা তাঁর বাল্যকালের স্মৃতি। কিন্তু এখনো কথায় কথায় বলতে শুনি, "আমরা বাঙালী, ওরা মুসলমান।" অথচ উভয়েই বাংলাভাষী।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর সে দেশে বাংলাভাষী মুসলমানের সঙ্গে উর্দুভাষী মুসলমানের যে বিরোধ বাধে সেটা ভাষাঘটিত, ধর্মঘটিত নয়। ঐতিহাসিক একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাংলাভাষীদের কয়েকজনের প্রাণ যায়। তখন থেকে তর্কটা অন্যরকম মোড় নেয়। "আমরা বাঙালী, ওরা বিহারী।" অথচ উভয় পক্ষই মুসলমান। পাটনা কলেজে যখন ছাত্র ছিলুম তখন আমরাও বলতুম, "আমরা বাঙালী, ওরা বিহারী।" অথচ উভয় পক্ষই হিন্দু।

পূর্ব পাকিস্তানের একটি মাসিকপত্রে একটি গল্প পড়ি। স্টেশন মাস্টার বলছেন, "আমরা বাঙালী।" অথচ মুসলমান। এই যে বাঙালী চেতনা এটা পার্টিশনের পূর্বে থাকলে পার্টিশন হত না। এখনো কলকাতার মুসলমান নাগরিকদের অনেকেই বাঙালী হয়েও উর্দুভাষী বলেই পরিচয় দেয়। উর্দুই তাঁদের সম্ভ্রান্ত বলে চিহ্নিত করে। এ মানসিকতা ঢাকাতেও ছিল

পার্টিশনের পূর্বে। এখন নেই। কিন্তু ইতিমধ্যে এক আজব তর্কের সূত্রপাতও হয়েছে। ওঁরা কি বাঙালী না বাংলাদেশী? তর্কটা মুসলমানে মুসলমানে। একালে মুসলমান মনে করেন তাঁদের মাতৃভাষা যখন বাংলা তখন তাঁরা বাঙালী। গোরু ছাগল বাংলাদেশী হতে পারে, মানুষ বাংলাদেশী নয়, বাঙালী। অপর একদল পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পার্থক্য বোঝাবার জন্যে মাতৃভাষার উপরে নয়, রাষ্ট্রের উপরে জোর দেন। রাষ্ট্রের নাম বাংলাদেশ, অতএব নাগরিকের পরিচয় বাংলাদেশী। আরো একদল বলেন তাঁরা বাঙালীও বটে, বাংলাদেশীও বটে।

মোট কথা বাঙালী বলে পরিচয় দিতে এখনো বিস্তর বাঙালীর দ্বিধা আছে। কিন্তু সেই যে ষাট বছর আগেকার ছাত্রীটি তাকে আমি আবার দেখি ঢাকায় আঠারো বছর আগে। ততদিনে সে উপলব্ধি করেছে সে বাঙালী। আমি মিটিং করতে বেরিয়েছি। হোটেলের ঘরে আমার স্ত্রী একা। তাঁর অসুখ করে। কোথা থেকে সুলতানা এসে হাজির হয়। সেবার ভার নেয়। ভাষার ডাকে। কবেকার পুরনো আলাপ। সেই সুবাদে এত মায়া মমতা।

জানিনে আজকাল সে নিজেকে কী মনে করে। বাঙালী না বাংলাদেশী? ওটা সত্যিই একটা কূট প্রশ্ন। জার্মানরা জার্মান, অস্ট্রিয়ানরাও জার্মান। তবু ভেদসূচক পরিচয়টাই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়। এটা মেনে নিয়েই মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু কবে?

সুকুমার সেনঃ ভাষাতত্ত্ব ও সংস্কৃতি-চর্চা

বিজিতকুমার দত্ত

'আমি কোন থিয়োরি নিয়ে শুরু করছি না। তাই ভরত-মুনিরদোহাই পাড়ব না। নাট্যশাস্ত্র, অভিনয়-দর্পণ ইত্যাদির প্রসঙ্গ তুলে নাট্যশাস্ত্রীদের গণ্ডিমধ্যে পদক্ষেপ করব না। ভারতবর্ষের শাস্ত্রকার-পণ্ডিতদের চিন্তাধারা যে খাতে প্রবাহিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে তা হল বিধি-বিধানের শান-বাঁধানো প্রণালী। এ প্রণালী diagnosis-এর নয়, autopsy-র। তবে দৈবাৎ হয়তো বা মৃতসঞ্জীবনের। নতুন পথে চলতে চায় যে শিক্ষার্থী তাকে বাঁধা-পথে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টাই শাস্ত্রকারের কাজ। তাই শাস্ত্র-সার্থের পদবীতে সজীব ইতিহাসের পদচিহ্ন কল্পনা করলে বিভ্রান্তি ঘটবে। এই হল আমার ধারণা। সেই ধারণার বশীভূত হয়ে আমি এই ঐতিহাসিক আলোচনায় পারতপক্ষে কোন শাস্ত্রের নজীর উপস্থাপন করব না, কোন শাস্ত্রকারকে সাক্ষী মানব না।' তাঁর 'নট নাট্য নাটক' বই-এর আরম্ভে নিজের রচনা প্রকরণ প্রসঙ্গে সুকুমার সেন এই মন্তব্য করেছিলেন।

বাঙালির ইতিহাস-সাধনায় এ পদ্ধতি একেবারেই নূতন এমন নয়, কিন্তু এই প্রকরণকে পণ্ডিত-গবেষকবৃন্দ কিছুটা এড়িয়ে গেছেন। পাশ্চাত্য গবেষণায় এবং নাট্যভাবনায় অ্যারিস্টটল যে স্থান অধিকার করে আছেন ভারতীয়দের কাছে সেই রকম স্থানই অধিকার করে আছেন ভরত-মুনি। সুতরাং ভরতের নাট্যশাস্ত্রের মূল্য যে অপরিসীম তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অথচ সুকুমার সেন সেই নাট্যশাস্ত্রের দোহাই যখন পাড়বেন না বলেন তখন বুঝতে পারা যায় ইতিহাস বিচারে তিনি নূতন দৃষ্টিভঙ্গির অবতারণা করতে চাইছেন। 'সাহিত্যে ও লোকব্যবহারে নাচ নাট অভিনয়ের' ইঙ্গিতগুলি তিনি জড়ো করেছেন। এবং সেই তথ্যের সাহায্যেই নাটকের উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতির ইতিহাস লিখেছেন॥ এবং 'সিজার এ্যাণ্ড পেস্ট' এই ঐতিহাসিক বিবরণকেও তিনি গ্রাহ্য করেননি। বস্তুত 'নট নাট্য নাটক' বইটি অনুধাবন করলে বোঝা যায়, বৈদিক সাহিত্য থেকে এই সময়ের লোকনাটক পর্যন্ত যে একটি ধারাবাহিকতা আছে তার সূত্র অনুসন্ধানই ছিল সুকুমার সেনের অন্বিষ্ট। নাট্যশাস্ত্রের

সংজ্ঞা অনুযায়ী ছকে কিংবা খোপে নিক্ষেপ করে ডঃ সেন ধারাবাহিকতাকে তুলে আনেননি। বোধ করি আনা যায়ও না। ছিন্ন সূত্রের সন্ধান করা ইতিহাসবিদের অন্যতম দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব তিনি পালন করতে চেয়েছেন সর্বদা। তাঁর প্রায় সব লেখাতেই এই দায়িত্বের অঙ্গীকার। ডঃ সেনের লেখার যে উদ্ধৃতিটি দিয়েছি তাতে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—এই গবেষক-পণ্ডিত সংস্কারমুক্ত হতে চাইছেন। এবং চাপা শ্লেষ ব্যবহার করে তিনি আমাদের গতানুগতিতাকে আঘাত করতে চেয়েছেন। 'শান-বাঁধানো প্রণালী'র কথা বলে বিদ্যাচর্চার স্থবির ভাবনাকে বিদ্রূপ করতে চেয়েছেন। এখানে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বিদ্যাচর্চার যোগসূত্রটিকেও আবিষ্কার করা যায়। তিনি কিঞ্চিৎ রূঢ়ভাষী ছিলেন একথা নিজেই স্বীকার করেছেন। রূঢ়ভাষী না হলে অনেক সময় আপোসের পথ ধরতে হয়। আর সেইখানেই ঘটে বিপদ। ফাঁকফোকর দিয়ে প্রচুর আবর্জনা ঢুকে বিদ্যাচর্চার পথটিকে আবিল করে তোলে। একটি গল্প তিনি তাঁর আলাপচারিতায় প্রায়ই বলতেন। খুব সংক্ষেপে সেটি বলি : বাপ ছেলেকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে গেছেন। ছেলে বাপকে জিজ্ঞেস করছে—এটা কি, ওটা কি ? বাপও উত্তর দিচ্ছেন এটা বাঘ, ওটা সিংহ ইত্যাদি। জিরাফের কাছে এসে ছেলে তো বিস্ময়ে হতবাক। ঐরকম লম্বা-গলা প্রাণীটিকে সে কিছুতেই আয়ত্তে আনতে পারছে না। বাপকে জিজ্ঞেস করলে, এটা কি ? বাপ বললেন, জিরাফ। তৎক্ষণাৎ ছেলের উত্তর, তবু আমি বিশ্বাস করি না। গল্পটি শেষ করেই ডঃ সেন বলতেন আমাদের পণ্ডিতবৃন্দ হচ্ছেন অনেকটা ঐ ছেলেটির মতো—জিরাফকে বিশ্বাস করতে পারেন না। বিশদ করে, তারপর তিনি বললেন, বেদের উৎপত্তি, তার সময় ইত্যাদি, গবেষণায় মোটামুটি স্থির হলেও পণ্ডিতবৃন্দ বেদকে অপৌরুষেয় বলেই মেনে নিয়েছেন। প্রমাণ দেখালেও তাঁরা বলবেন, 'তবু আমি বিশ্বাস করি না'। আমরা জানি উনবিংশ শতাব্দে অক্ষয়কুমার দত্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এইভাবেই বোঝাতে পেরেছিলেন বেদের প্রমাণসহ তথ্য। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দের মানুষের সেই উদারতাটুকুও আমরা মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলি। ড. সেন ইতিহাসভাবনায় সেই যুক্তিতর্ককে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। বিজ্ঞানকে, বস্তুনিষ্ঠতাকে অমান্য করে অন্ধতামসিকতাকে তিনি প্রশ্রয় দিতে চাননি। অচলায়তনিকদের মন্দির ভেঙ্গে দিয়েছিলেন তিনি।

বলা বাহুল্য, প্রচুরতম অধ্যয়ন এবং অপরিসীম শ্রম ছাড়া ইতিহাসবিদের

সাফল্য আসে না। 'নট নাট্য নাটক' আকারে বড়ো বই নয় কিন্তু প্রকৃতিতে বড়ো মাপের। তিনি শুরু করেন বৈদিক সাহিত্যে নাটকের কোনো ইঙ্গিত আছে কি না, আর সেই সরণি ধরে এগোতে থাকেন পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের সোপানে। পাণিনির একটি সূত্রকে আশ্রয় করে চলে আসেন পতঞ্জলির মহাভাষ্যে। আর ভাঁজে ভাঁজে খুলতে থাকেন নৃত্য, নাটক, নট ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ। তাণ্ডব, লাস্য, গ্রন্থিক, যাবক্রীতিক, বাসবদাত্তিক, খারবেল অনুশাসন, দমূক নৃত্য, গন্ধবেদযুধ (গন্ধর্ববেদযুদ্ধ) ইত্যাদি অসংখ্য শব্দ, পাথুরে প্রমাণ, সংস্কৃতির বিচিত্র উপাদান উঠে আসতে থাকে ড. সেনের রচনায়। এই সূত্রেই 'ভরত', কথাটির যে সম্প্রদায়, গোষ্ঠী (পুরাণ পাঠক, কারও কারও হয়ত নটবিদ্যাও জানা ছিল) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল বেদের সাক্ষ্যে তিনি তা দেখিয়ে দেন। প্রতিমা-পূজার সঙ্গে পুতুলবাজির (পুতুলনাচ) যোগসূত্রটি ধরিয়ে দেন ড. সেন। রামায়ণের 'কুশীলব', ব্যাপারটির সঙ্গে নটকর্মের সম্বন্ধ নির্ণয় করেন তিনি। বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হয়ে ওঠে পুরাণ-পাঠকের চরিত্র নির্ণয়ে। 'কুশীলব'-এর বিশ্লেষণ তো অভিনব। রামায়ণে এই শব্দ কুশলব। কুশীলব কথাটি সংস্কৃত সাহিত্যের ভালোলেখায় পাওয়া যায় না। অথচ অভিধানে আছে 'কুশীলব'। কালিদাস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ড. সেন দেখালেন—কুশীলবের যথার্থ অর্থ। তিনি মনে করেন মূল কথাটি কুশীলব। তার থেকেই এসেছে কুশলব। কুশী অর্থ শরদণ্ড। 'গাথা গাইবার সময় বাচক গায়ক হাতে 'কুশী' রাখত; আর লব মানে পশমের থুপি, কাটা চুলের গোছা। অতএব 'কুশী' আর 'লব' একসঙ্গে মিলনে যা হয় তা হল দণ্ড সমেত চামর। চামর নিয়ে রামায়ণ ও বিবিধ 'মঙ্গল' গানের বিধি আমরা জানি।' ড. সেনের শব্দবিদ্যার সরণি ধরে আমরা বাংলা 'মঙ্গল' গানের ইতিহাসে ঢুকে পড়ি। এইখানে তিনি ধারাবাহিকতাকে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন। রামায়ণের কুশলব (কুশীলব) নামদুটির রহস্য উন্মোচনে আরও একটি যোগসূত্র আবিষ্কৃত হল এইখানে। তা হল মঙ্গল-কাব্যের গায়েনবায়েনের আচরণের তাৎপর্য। বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে এ বিশ্লেষণ বিশেষ মূল্যবান।

ড. সেন 'সেকশুভোদয়া' গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছিলেন। এই গ্রন্থে উল্লিখিত অনেক গল্পই তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে ইতিহাসের ছিন্ন সূত্র উদ্ধারে। লক্ষ্মণ-

সেনের রাজসভায় এক নট ছিলেন গাঙ্গোক। এই নটের কাহিনী আছে সেকশুভোদয়ায়। সেই কাহিনীটিই বিস্তৃত হয়েছে বিদ্যাপতির 'পুরুষ পরীক্ষায়'। সেখানে গন্ধর্ব নামে নটের ভবভূতির উত্তররামচরিতের 'ছায়া'-অঙ্ক অভিনীত হবার বর্ণনা আছে। চৈতন্যভাগবতেও এক 'নটবরে'র উল্লেখ আছে। এই থেকে ড. সেন সিদ্ধান্ত করেন 'নটবৃত্তি জাতিগত জীবিকা'। বাংলা দেশের নট (নড়, নাড়, নড়ি) জাতির সৃষ্টি এইভাবেই। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টির পরিচয় এখানে মেলে। ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে নৃতত্ত্বের যুগ্মবেণী রচিত হয়েছে ড. সেনের 'মিথে'র প্রবন্ধগুলিতে। বাংলার ইতিহাসসাধনার এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোনো গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেন নি। প্রমাণ ছাড়া একপা-ও অগ্রসর হতে চান নি তিনি। তাঁর আলাপচারিতায় তিনি শ্রোতাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিতেন 'পাথুরে প্রমাণে'র কথা। তথ্য ছাড়া আলোচনায় এগোতেন না তিনি। বেশি অনুমানের বিপদ কোথায় দেখিয়ে দিতেন। তিনি যখন তাঁর মেধা আর বিদ্যাচর্চায় বাঙালির অগ্রগণ্য হয়ে উঠলেন তখন কেউ কেউ সংস্কৃতিচর্চায় প্রাগৈতিহাসিক মানুষ এবং তাদের সম্পর্কে নানা আনুমানিক 'গবেষণা' করবার চেষ্টা করেছেন। আদিবাসীদের সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতির যোগস্থাপনে তাঁদের উৎসাহের অতিরেক ড. সেনকে কঠোর করে তুলছিল। তিনি তাঁদের সামনে মেলে ধরতে চাইলেন গবেষণার প্রকৃত রূপটি কি হওয়া উচিত তার দৃষ্টান্ত।

ড. সেন গল্প করতে ভালোবাসতেন। গল্পকারদের প্রতি তাঁর কৌতূহল ছিল অত্যন্ত বেশি। ভালো গল্পলিখিয়েদের সম্বন্ধে তিনি তাঁর সাহিত্যের একটু বেশি জায়গাই দিয়েছেন। ক্রাইম কাহিনীর প্রতি আকর্ষণও বোধ করি এই কারণে। সেকশুভোদয়ার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এর গল্পরসও ড. সেনকে আকর্ষণ করেছিল। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, তিনি 'নট নাট্য নাটকে' যেসব তথ্য সংগ্রহ করছেন তা গল্পকাহিনী থেকেই। এইসব গল্পকাহিনীতে লুকিয়ে আছে সেকালের সমাজচিত্র, জীবনযাপন আর আশাআকাঙ্ক্ষার কাহিনী। আর যখন তিনি গল্পের অনুবাদ করেন (বেদ, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া, রামকথা, ভারতকথায় অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাষায়), তখনও অনুবাদের শ্রীছাঁদের দিকে ড. সেনের লক্ষ্য। কথ্যভঙ্গির টানটোনগুলি ফুটে ওঠে এই অনুবাদে। আর দেশের মাটির গন্ধ পাওয়া যায় শব্দব্যবহারে। ড. সেন উৎসাহী হয়ে ওঠেন 'গল্পের গাঁটছড়া' বই লিখতে।

প্রসঙ্গবিচ্যুতি ঘটল কিছুটা। কিন্তু একথাও বলব, গল্পের প্রতি মনোযোগ ড. সেনকে একজন দক্ষ সাহিত্যের-ইতিহাসের-গোয়েন্দা করে তুলেছিল। দশকুমার চরিতে যে ঐন্দ্রজালিক অভিনয় দেখালো এবং ইন্দ্রজালের সাহায্যে রাজপুত্র রাজকন্যার বিবাহ দিল তার সাজপোশাক, নট-নাম, ঐন্দ্রজালিক বিশেষণ অথবা বিশেষ্য সবই ড. সেনের মননে ভিড় করে আসে। নটের ব্যবহার, বেশভূষা, চোখে কাজলমাখা এ তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। নটনটীকর্ম যে হীনাবস্থায় পড়েছিল এও তিনি লক্ষ করেছেন। কালিদাসের নাটকের গল্পের প্রয়োজনীয় অংশগুলিকে তিনি উদ্ধার করেন তাঁর অনুবাদে। কালিদাস যে বিভিন্ন নাট্যপ্রকরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তার কিছু কিছু নাটকে একথা আমর জানতে পারি এইখানে। উর্বশীকে অবলম্বন করে যে নাটক রচিত হল সেখানে গীতসজ্জার প্রকরণ ড. সেন খুঁটিয়ে বিচার করেন এবং বলেন, 'নাটের পর নাট চলেছে,দ্বিপদিকায়,কুটিলিকায়, গণিতকে, চর্চারিকায়। নেপথ্য গান,—"খণ্ডিক", "চর্চরী", "কুটিলিকা" তালে (?)'। অবশ্যই তিনি বলেছেন এ নাটক বিদগ্ধ জনের। আসলে ড. সেন খুঁজছেন— বৈদিক-সংস্কৃত-পালি প্রাকৃতের পথে লৌকিক সংস্কৃতির মোরামগুলিকে।

তবে যেখানে ইঙ্গিত স্পষ্ট সেখানে তিনি ঋগ্বেদ-বৈদিক-সংস্কৃত ইত্যাদির মধ্যেই থেকেছেন। একটা শব্দ, কখনও একটি বিভক্তির হেরফের, কখনও টুকরো ছবি, কখনও মূর্তি, কখনও লেখ এইসব বস্তুর প্রতি ড. সেনের তীক্ষ্ণ নজর। 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটকের নাট্যনির্দেশ বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এ নির্দেশ পুতুলবাজি ছাড়া সম্ভব নয়। শকুন্তলায় আছে 'তারপর প্রবেশ করছে আকাশপথে রথে আরূঢ় রাজা আর মাতলি।' এখন আকাশপথে প্রবেশ করা পুতুলবাজি ছাড়া সম্ভব নয়। এই সঙ্গে আধুনিক গ্রীনরুম জাতীয় বস্তু না থাকাতে রঙ্গমঞ্চের খুঁটিনাটিও তাঁকে দেখতে হয়েছে। নটেরা বাইরে থেকে সাজ করে চাদর মুড়ি দিয়ে আসরে প্রবেশ করত। এই চাদর হ'ল তিরস্করণী, পটী (পট), নেপথ্য, যমনিকা (জবনিকা)।

হঠাৎ এরকম ব্যাখ্যায় কেউ চমকে উঠতে পারেন। যদিও পিশেনের এ সম্বন্ধে কিছু গবেষণা ছিল ; এ. কিথও কিছু আলোচনা করেছিলেন একসময়ে। কিন্তু ড. সেন যাত্রা সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই শব্দবিদ্যার পথ ধরে কিছু নূতন ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। অশোকের অনুশাসনে দেবতাদের প্রিয়দর্শী অশোকের কাহিনী

ড. সেনকে কতটা মুগ্ধ করেছিল জানি না, কিন্তু অনুশাসনের মধ্যে তিনি লক্ষ্য করেন ভারতীয় সংস্কৃতির মূল্যবান তথ্য। মিলিয়ে যেন মালতীমাধব আর উত্তরচরিতে উল্লিখিত যাত্রা-প্রসঙ্গ। আর যমনিকা ব্যাপারটি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন নেপালে প্রাপ্ত মৈথিলী-বাংলা নাটকের পরিবেশন পদ্ধতি বিশ্লেষণের সময়। 'নট নাট্য নাটক'-এ এভাবে তিনি আলোচনাকে এগিয়ে নেন ঋগ্বেদ থেকে ভাষা-সাহিত্য আলোচনায়। নেপালে প্রাপ্ত ভাষা নাটকে জমনিকা, যমনিকার কথা বারবার বলা হয়েছে। এবং পরিষ্কার বোঝা যায় যমনিকা মানে স্টেজ কার্টেন নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে যাকে আমরা অস্পষ্টভাবে ছুঁতে পারছিলাম ভাষা নটকের নিরিখে, সেই বস্তুই স্পষ্ট হয়ে উঠল।

এখন ও ধারাবাহিকতাকে স্পষ্ট করবার আকাঙ্ক্ষা। তথ্যপুঞ্জের বিশ্লেষণে ড. সেনের মেধাই কাজ করছে না, সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে কমনসেন্স বা কাণ্ডজ্ঞান। আগে বলেছি তিনি গল্পের মধ্যে থেকে তথ্য খুঁজে পান। গল্পপ্রিয় মানুষটি ডিটেকটিভের শ্যেনদৃষ্টি প্রসারিত করে দেন কাহিনীর পরতে পরতে। এই কমনসেন্স ড. সেনের ছিল অত্যন্ত সজাগ আর অতন্দ্র। সেজন্যে জটিলতা নেই তাঁর গবেষণায়। আমাদের কৌতূহলী জিজ্ঞাসাকে তিনি ইতিহাসের রূপরেখা আশ্রয় করে ঠিক লক্ষ্যেই পৌঁছে দিতে পারেন। ঋগ্বেদ-বৈদিক-সংস্কৃত পালি-প্রাকৃত এবং ভাষা-সাহিত্য জনজীবনের ছবি। আর খুব সাধারণ মানুষের মধ্যে যে নাট্যচর্চা চলে আসছে তাও যে একই সূত্রের বিস্তার তার প্রমাণ দেন তিনি লেটোর কাহিনীর বিবরণ দিয়ে। পণ্ডিতদের লোক-সাহিত্য 'গবেষণা'র তথাকথিত চর্চা অর্থহীন হয়ে পড়ে ড. সেনের গবেষণার কাছে। তিনি বলেছেন, 'লোকসাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বড় ঘোলাটে, দৃষ্টি বড়ই ঝাপসা।' এই ঘোলাটে, ঝাপসা দৃষ্টিকে পরিহার করতে চেয়েছেন লেটোর পালাটি উল্লেখ করে। একদা 'ভাষা' ব্যবহার করাকে পণ্ডিতেরা অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। আর বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক ঋগ্বেদের সঙ্গে লেটোর পালাকে জড়িয়ে সংস্কারের শানবাঁধানো পথটিকে অগ্রাহ্য করলেন। ইতিহাসে তিনি জাতপাত, ছোটবড়ো, উঁচুনীচুর ভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছেন ইতিহাস চর্চায়।

২

১৯৫৬ সালে 'চর্যাগীতি-পদাবলীর' ভূমিকায় ড. সেন পূর্বাচার্যদের কথা স্মরণ করেছেন। তাঁদের আবিষ্কার, বিশ্লেষণ, পাঠনির্ণয় সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য

করেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী এবং শহীদুল্লাহের কৃতিত্ব সম্বন্ধে তিনি যে অবহিত সেকথা বলে সবিনয়ে তাঁর কিছু নূতন প্রস্তাব এই গ্রন্থে পেশ করেছেন, তা জানালেন। সম্পাদনার ক্ষেত্রে তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তা কয়েকটি কথায় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন চর্যাকারদের সময় নিরূপণে 'অপরীক্ষিত তথ্য' ও 'অনুমিত আপ্তবাক্য' দুইকেই অগ্রাহ্য করেছেন। চর্যাকারদের ধর্মমতের গুরুত্ব নিশ্চয়ই আছে কিন্তু তা যতটুকু 'চর্যা'য় মিলেছে তার বাইরে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তিনি যাননি। তারপর গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যটি তিনি করেছেন, 'যাঁহারা বারবার বলিয়াছেন—গুরু সে বোবা শিষ্য কালা তাঁহাদের গোপন নিগূঢ় ইঙ্গিত বুঝাইয়া দিবার মত অধ্যাত্মবোধ অথবা দিব্যদৃষ্টি আমার নাই। সুতরাং মনের কুয়াশা ও দৃষ্টির আবিলতা দিয়া ভিজা কম্বল আরো ভিজা করিয়া তুলিতে যাই নাই। যাঁহারা চর্যানীতির যথাসম্ভব প্রকৃত পাঠ ও বাহ্য অর্থ জানিতে কৌতূহলী, যাঁহারা বাঙ্গালা তথা আধুনিক ভারতীয় আর্য সাহিত্যের নবজাত রূপ দেখিতে উৎসুক, যাঁহারা আধুনিক ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের জিজ্ঞাসু শিক্ষার্থী তাঁহাদের জন্যই আমার এই বই।' ড. সেনের সম্পাদনার পূর্বেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংস্করণের পর মনীন্দ্রমোহন বসু 'চর্যাপদ' সম্পাদনা করেছিলেন। এই বইটিকে তিনি যে অগ্রাহ্য করেননি তার প্রমাণ তিনি 'দ্রষ্টব্য' গ্রন্থাবলীতে একে গ্রহণ করেছেন। শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর *Obscure Religious Cults, as the background of Bengali literature* গ্রন্থে চর্যাকারদের ধর্মসত্য, দর্শন বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন। ড. সেন তার আলোচনার পদ্ধতির সঙ্গে ড. দাশগুপ্তের গ্রন্থের কোনো সাদৃশ্য নেই বলে, বইটির উল্লেখ করেননি। রাহুল সাংকৃত্যায়ণের আবিষ্কৃত চর্যার আলোচনা তাঁর 'বাঙ্গালী' সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে আছে। ড. সেন সাহিত্য সমালোচনা করেছেন, 'সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে তার পরিচয় আছে। কিন্তু সমালোচনাকে অযথা পল্লবিত করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। গণিত তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল। জানি না সেই কারণেই কি না তিনি সংক্ষিপ্ত ঋজু ভাষায় লিখতে পছন্দ করতেন। আলোচনার বিষয়টিকে নানাদিক থেকে স্পষ্ট করে তুলতে চাইতেন। আগে জ্ঞান তারপর রসের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন। যদি বিষয়টিই অস্পষ্ট রইলো তবে রস বুঝব কেমন করে! রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে শুনতে যখন তিনি মুগ্ধ তখনই, বা তারপর চকিত হয়ে তার কথার মানে আবিষ্কারে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন ড. সেন। বলতেন,

রসগোল্লার রসই শুধু খাব ছিবড়েটা বাদ দিয়ে ? অর্থাৎ, জ্ঞানের ভিত্তিটির উপর ছিল তাঁর টান। সেখানে কল্পনা-জল্পনা, ভালোলাগা মন্দলাগার ব্যাপারই নেই। এম্পিরিক্যাল জ্ঞানে তাঁর দৃঢ় আস্থা। চর্যাগুলিকে তিনি সেইভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন। পাঠের সঙ্গতি নির্ধারণই তাঁর কাছে মুখ্য ছিল। চর্যার পাঠ মেলানো এখনও শেষ হয়নি। চর্যার কবিবৃন্দের, টীকাকারের, তিব্বতী অনুবাদের এবং দোহাকোষগুলির বারবার অনুশীলন শ্রমসাপেক্ষ ব্যাপার। এখানেও কমনসেন্সের প্রয়োজন। 'তাএলা' শব্দটি ড. সেনের কাছে কিছুদিন সংশয়ান্বিত ছিল। কেউ পাঠ নিয়েছেন 'ভাএলা' কেউ 'উএলা'। অবহট্‌ঠে প্রাপ্ত তাবেলা (অর্থ 'তদ্‌বেলা') শব্দটি যখন তিনি পেলেন তখন বুঝতে পারলেন 'তাএলা' পাঠটি শুদ্ধ। পুথি এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা'-র পাঠে কিছু গোলমাল ছিল। সে পাঠও পূর্ববর্তীরা বিচার করেছেন। ড. সেনও করেছেন। সব প্রশ্নের সমাধান তিনি করতে পেরেছেন এমন নয়। কিন্তু জ্ঞানচর্চার পথে অনুমানকে বিশেষ প্রশ্রয় দেননি তিনি।

ড. সেন বলেছিলেন অধ্যাত্ম বিষয়ে তাঁর কৌতূহল কম। ঠিকই। কিন্তু অধ্যাত্মবিষয়ের বস্তুগত একটি দিক আছে। সাধনমার্গের গুহ্যবস্তু চর্যাতে যতটা পাওয়া যায় তার পরিচয় উদ্‌ঘাটনে তিনি কিন্তু অক্লান্ত। এবং তান্ত্রিকতা শৈবধর্ম, সহজিয়াধর্মের খুঁটিনাটি তথ্যের বিশদরূপকে তিনি আমাদের গোচর করেছেন। নাথপন্থীদের সঙ্গে চর্যার সহজিয়াপন্থীর ক্রিয়াকলাপের যোগসূত্র দেখিয়ে তিনি ভারতীয় সাধনায় ঐক্য লক্ষ্য করেছেন। অবশ্যই এক্ষেত্রে আমরা শশিভূষণ দাশগুপ্তের '*Obscure Religions Cults*' এবং 'ভারতীয় সাধনার ঐক্য' এ দুটি বইয়ের কথা স্মরণে রাখব। চর্যার গানের গঠন যে পরবর্তী বাংলা কীর্তনপদাবলীতে অনুসৃত হয়েছে — এ অতি স্পষ্ট। কিন্তু ড. সেন যখন চর্যা সম্বন্ধে বলেন 'ভারতীয় সাধনার এই অপূর্ব রস অলৌকিকভাবে রবীন্দ্রনাথের মানসে ও বাচনে অনির্বচনীয় ও অভাবনীয় রূপে অভিব্যক্তি পাইয়াছে। সে কথা বর্তমান আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে। কিন্তু না বলিলে এই সুপ্রাচীন সাধনা ও সাহিত্যধারার প্রতি অবিচার হইবে।' তখন তাঁর ঐতিহাসিক বিবেকটিই যে উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠে তা আমরা বুঝতে পারি। চর্যাগীতিকারদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে মিলিয়ে দেখা কিঞ্চিৎ অভিনব। যদিও রবীন্দ্রনাথের গানকে তিনি 'অধ্যাত্মগীতি মার্কা' দেবার বিরোধী।

বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' সম্পাদনায় ড. সেন প্রচলিত সম্পাদনারীতি থেকে সরে এসেছেন। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত (বিষ্ণু পালের মনসা-মঙ্গলও এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত ড. সেনের সম্পাদনায়) এই কাব্যের সম্পাদনার আদর্শে তিনি অনেকটাই পাশ্চাত্য সম্পাদনার আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন। পুঁথি সম্পাদনার আদর্শ অবশ্যই এশিয়াটিক সোসাইটির বিদ্বজ্জন স্থাপন করেছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কথা আমাদের অবশ্যই মনে পড়বে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাধাগোবিন্দ বসাকও তাৎপর্যপূর্ণ কাজ করেছেন এই ক্ষেত্রে। বেদের একটি কনকরড্যান্স ভালোভাবে তৈরি হোক এ প্রত্যাশা কোনো তরুণ গবেষিকার কাছে করেছিলেন। জার্মান ভাষায় বেদের কনকরড্যান্স তৈরি হচ্ছিল। এর একটি সংস্করণের (পূর্ণাঙ্গ) আদর্শে বাংলায় অভিধান তৈরি হোক এ প্রত্যাশা অবশ্য পূরণ হয়নি। তিনি প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষার অভিধান (An Etymological Dictionary of Bengali Vol. I+II) প্রস্তুত করেছিলেন। পুথি সম্পাদনা করতে গিয়ে তিনি অভিধানের কার্ডও তৈরি করতেন। ছাত্রছাত্রী অথবা পুথিসন্ধানীদের তিনি শব্দসংকলনের জন্য অনুরোধ জানাতেন। সম্পাদনার সময় তিনি পর্যাপ্ত-ভাবে শব্দার্থ দিয়ে এ কাজটি কিছুটা করে ফেলেছিলেন। কিন্তু সেখানে বুৎপত্তিগত অভিধানের ব্যাপারটি ছিল না। আসলে ব্যুৎপত্তি নির্ধারণ করতে না পারলে তো তাঁর ঐতিহাসিক বিবেকের অস্থিরতা কমছিল না। ভারতীয় ভাষার উৎস এবং বহতা নদীর টানে সে ভাষার রূপান্তর, পরিবর্তন (রূপগত, ধ্বনিগত), শব্দের এই 'দর্শন' তাঁকে উৎস থেকে মোহানায় চলাচল করতে হয়েছে। অনেক সময় পরিণতি দেখে উৎসকে বুঝেছেন, কখনও উৎস থেকে পরিণতির দিকে গেছেন। ভাষার diagnosis তিনি করেছেন, post-mortem নয়। ড. সেনের কাছে ভাষার প্রাণশক্তির বৈচিত্র্য এক মহাবিস্ময়ের ব্যাপার ছিল। এজন্য শব্দবিদ্যাচর্চায় তিনি উৎসাহ এবং আনন্দ—দুই-ই পেয়েছেন। সেটা রবীন্দ্রনাথের বাংলাভাষার পরিচয় বা শব্দতত্ত্ব আলোচনার মতো নয়। খাটি বৈয়াকরণের দৃষ্টি তাঁর। এর মধ্যে যে রস আছে তা আবিষ্কার করা প্রায় দুঃসাধ্য, কিন্তু দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাধনায় ড. সেনের ভাষাসিদ্ধান্ত সুসাধ্য হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য কবির পুথি সম্পাদনাকে ড. সেন পুণ্যকর্ম বলে ভাবতেন। এমন কথা প্রায়ই শোনা যেত যা শ্রোতাদের উৎসাহিত করত একর্মে এগিয়ে আসতে। কথাটি এমন কিছুই নয়, তবু বলি। তিনি বলতেন,

সমালোচনা-বিচারের নিশ্চয়ই মূল্য আছে কিন্তু পুথি সম্পাদনা করলে একজন বড়ো কবির সঙ্গে সম্পাদকও অমর হয়ে থাকবেন। বড়োর সান্নিধ্যে তাঁর অকিঞ্চিৎকর জীবন ফুটন্ত হবে। কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলের প্রতি তাঁর আন্তরিক টান ছিল। এই বইটির একটি ইংরেজি অনুবাদ করার সঙ্কল্পও তাঁর ছিল। বহুদিন ধরে মুকুন্দের পুথি খোঁজার টানে এদিক ওদিকে সংবাদ পাঠিয়েছেন। সেসব পুথি সংগ্রহও করেছিলেন। কবির বাড়ির পুথির সন্ধান তিনি জানতেন। দেখেছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু সেই 'কবির হাতের লেখা' পুথিটির উপর তাঁর বিশেষ আস্থা ছিল না। কবির জন্মশক নিয়ে পুথি সম্পাদনার আগেই বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু পুথিটির একটি ভালো পাঠ প্রস্তুত করবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে জেগেই ছিল। মাঝে মাঝে মুকুন্দের আত্মবিবরণীটি আবৃত্তি করতেন। নাকি আত্মবিবরণীটির রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা করতেন। তার নানা পুথি মিলিয়ে যখন কপি নিজেই করলেন তখন খুবই তৃপ্তি পেয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চণ্ডীমঙ্গলের পাঠ তাঁর মোটেই ভালো লাগেনি। কিছু ব্যঙ্গবিদ্রূপও করেছেন ঐ সংস্করণটির প্রতি। বিদ্যার ক্ষেত্রে শৈথিল্যকে তিনি বরদাস্ত করতেন না। আপোষ তো করেনও নি। ড সেন-ই প্রথম বললেন কবির নাম মুকুন্দরাম নয় মুকুন্দ। কেননা, যত পুথি তিনি দেখেছেন তাতে মুকুন্দরাম কোথাও পাননি। কারও কারও ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সামান্য মনে হতে পারে। কিন্তু ড. সেন তা মনে করবেন কি করে? কিন্তু আজও 'তবু আমি বিশ্বাস করি না' পন্থীরা এ আবিষ্কারকে মেনে নিতে কুণ্ঠিত। শানবাঁধানো পথের মায়ার টান বড়ো বেশি! আর একজন কবি ড. সেনকে উতলা করত। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি রূপরাম তাঁর প্রিয় কবি। দশ বারো বছর আগে বর্ধমানে মনসামঙ্গল আর ধর্মমঙ্গল গাইয়ের দলকে তিনি বীরভূম জেলা থেকে বর্ধমানের বাড়িতে এনে গানের আসর পেতেছিলেন। শ্রোতাদের গান শোনবার জন্য খুব তাতিয়েছিলেন। শ্রোতাসমাগমও হয়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই প্রাচীন গানকে পরিত্যাগ করলেন নবীন শ্রোতার দল। ড. সেন লক্ষ করেননি। তিনি তন্ময় হয়ে শুনছিলেন সে গান আর তুড়ি দিচ্ছিলেন। তাঁর কাছে এ গানের মধ্যে বাঙালির সজীব প্রাণধারার ধ্বনি বেজে উঠত। ড. সেন গাছগাছালি, পাখপাখালি, খাওয়া-দাওয়া খেলা-দোলা, চলনবলন সব কিছুর মধ্যে দেশের ইতিহাসের সন্ধান পেতেন। আর বাঙালির সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহান্বিত করতে চাইতেন।

এই ব্যাপারে মঙ্গলকাব্যে উল্লিখিত সাংস্কৃতিক উপাদান সংচাইতে বেশি পাওয়ার কথা। আর গীতপদ্ধতি? পরিবেশনের প্রকরণ? এ তো তিনি প্রত্যক্ষ করছেন বীরভূমের মানুষগুলির কাছে। যাঁরা ড. সেনের কাছাকাছি এসেছিলেন তাঁরা জানতেন পুথি সম্পাদনা বিদ্যাচর্চার পদক্ষেপ তো বটেই, আর তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশচর্চা। এ জন্যই হুড়ুম যে জানে না তাকে হুড়ুম বস্তুটি চাক্ষুষ করাতেন। নিরামিষ খাদ্যের তালিকা চয়নে তিনি ছিলেন অক্লান্ত। কবিকঙ্কণের রন্ধনতালিকায় উৎসাহী ছিলেন তিনি। রূপরামের ধর্মমঙ্গল তো তাঁর জেলার সম্পদ। অতএব কবির জন্মভিটা দর্শনে যান সুনীতিবাবুকে নিয়ে। মেমারি নেমে প্রাচীন পুরাকীর্তি পায়ে হেঁটে দেখে আসেন। ভুবনেশ্বরে গিয়ে ধৌলী না দেখা পর্যন্ত তিনি শান্তি পান না। আর নিজের সংগ্রহে জমতে থাকে নানা ঐতিহাসিক রত্ন। কিন্তু রূপরামের সম্পাদনা যখন তিনি দ্বিতীয়বার করলেন তখন আমরা এক প্রৌঢ় জিজ্ঞাসার ফসল দেখতে পাই। ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গবেষণা মূল্যবান। তিনি মাণিক-রামের ধর্মমঙ্গল সম্পাদনাও করেছিলেন। তারপর ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে আরও কিছু গবেষণাকর্ম বিভিন্ন গবেষক করেছিলেন। হরপ্রসাদের মনে হয়েছিল ধর্মঠাকুর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতা। আর লোকায়ত ভাবনার অনুমানভিত্তিক তথ্যও জড়ো করছিলেন কেউ কেউ। ড. সেন সম্পাদনাসূত্রে ধর্মঠাকুরের ইতিহাস বিস্তৃত করলেন। এর আগে পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'গোর্খা-বিজয়ের' ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন তিনি। সেই ভূমিকাতেই নাথপন্থের যে বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছিলেন তা গবেষকদের ঈর্ষার বস্তু। ধর্মঠাকুরের শরীরে লোক-উৎপাদনকে তিনি অগ্রাহ্য করেননি। কিন্তু ঋগ্বেদ বৈদিক সাহিত্যের উৎসে নিয়ে যান তিনি আমাদের ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' কাব্যের পরিচয় সূত্রে ধর্মমঙ্গল কাব্যের সৃষ্টিবর্ণন নিয়ে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। আর এখানে তিনি যমযমী, বরুণ-বরুণীদের প্রসঙ্গকে বিস্তৃত করেন। ধর্মের প্রতীক কূর্মের পরিকল্পনার দৃষ্টান্ত খোঁজেন প্রাচীন সাহিত্য থেকে। বুটপরা সূর্যের সঙ্গে ধর্মের অন্তরঙ্গ যোগটি উঠে আসে তাঁর গবেষণায়। হরিশচন্দ্র লুইয়ার কাহিনী বিশ্লেষণ করে শুনঃশেফের কাহিনীকে টেনে আনেন আর লুইয়ার জের যে এখনও বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে তা তিনি আবিষ্কার করেন। ধর্মমঙ্গল, অনিলপুরাণ অপর সাংখ্যাত পদ্ধতি। সাংখ্যাতকে তো তিনি শব্দবিদ্যার সাহায্যে এখনও অনুষ্ঠিত নদীর জাতের সঙ্গে মিলিয়ে

দিতে চাইছেন। সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্বের সাহায্যে এই গবেষণকর্মটি তৈরি হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি জ্ঞানচর্চায় একটি অগ্রবর্তী পদক্ষেপ। গোপাল হালদারের অনুরোধে পরিচয় পত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন 'বোড়োর বলরাম' এও তাঁর জেলার সংস্কৃতির কথা। এই প্রবন্ধেও আমরা অনুরূপ জিজ্ঞাসার পরিচয় পাই।

সাহিত্য অকাদেমি থেকে তিনি প্রকাশ করেছেন চণ্ডীমঙ্গল, চৈতন্যভাগবত আর চৈতন্য চরিতামৃতের লঘুসংস্করণ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশ করেছে চৈতন্যচরিতামৃত। তাঁর চৈতন্যভাবনার কথা পরে বলছি। চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ দুটির সম্পর্কে তিনি 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সেজন্যে সম্পাদিত গ্রন্থে ভূমিকাকে দীর্ঘ করেননি। চৈতন্যচরিতামৃতের সম্পাদনায় সাহায্য পেয়েছিলেন তাঁর ছাত্র তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। তারাপদবাবু বৃন্দাবনের পুথিগুলির খোঁজখবর রাখতেন। এবং বৃন্দাবনের চৈতন্যচরিতামৃতের পুথিগুলির মধ্যে বেশ কিছু পুথির পাঠ যে ভালো এবং নির্ভরযোগ্য তা ড. সেনকে জানিয়েছিলেন। বৃন্দাবনের পুথির জেরক্স কপি তিনি লণ্ডনে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ড. সেনকে ফটোকপি জেরক্স কপি পাঠাতে থাকেন তারাপদবাবু। সঙ্গে বিলিতি ম্যাগনিফাইয়িং গ্লাস। দৃষ্টিশক্তি তখন ড. সেনের প্রায় নেই। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ড. সেন পুথির সঙ্গে তার গৃহীত আদর্শ পুথির পাঠ মেলাতে থাকেন। চৈতন্যচরিতামৃতের নানা সংস্করণ আছে। সেগুলির মধ্যে বেশ কিছু ভালো সংস্করণও আছে। বিস্তর বিশ্লেষণ, আলোচনা এবং দর্শনধর্ম বিষয়ে জ্ঞান সেসব সংস্করণে মিলবে। তবু কেন তিনি এ বই সম্পাদনায় এত আগ্রহ বোধ করেছিলেন? এর একটি কারণ ব্যক্তিগত। পারিবারিক জীবনযাপন তার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু দ্বিতীয় কারণ বিশুদ্ধ বিদ্যাচর্চা। তাঁর বক্তব্যই ছিল আলোচনা ইত্যাদি সবই মূল্যহীন যদি না চৈতন্যচরিতামৃতের যথাসম্ভব বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধার করা যায়। এই বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধার করতে গিয়ে চরিতামৃতের সংস্কৃত শ্লোকগুলি যে বেশির ভাগ প্রক্ষিপ্ত সে কথা তাঁর মনে হয়েছিল। চৈতন্যচরিতামৃতের বিশেষত্বের দিকগুলির মধ্যে সাহিত্যের ইতিহাসে অনালোচিত কিছু কথা বলেছেন। তান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে চৈতন্যভাবনার যোগাযোগ আবিষ্কার করেছেন। ড. সেনের পাঠই যে একেবারে নির্ভুল অথবা বিশুদ্ধ এই হয়ত বিদ্বজ্জন মহলে সর্বত্র গৃহীত হবে না কিন্তু এটা ঠিক তাঁর

দৃষ্টি অবজেকটিভ এবং যথাসাধ্য মূলের কাছাকাছি। প্রধানত তাঁরই প্রেরণায় বাংলা পুথির সম্পাদনাকর্ম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাচর্চায় - মূল্য পেতে থাকে। আর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে শিক্ষিত জনের মন কেড়ে নিতে থাকে।

৩.

চৈতন্যজীবনী অনুধ্যান ড. সেনের জীবনযাপন এবং বিদ্যাচর্চার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। পিতা হরেন্দ্রনাথ সেন সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ করেছেন। বাড়িতে সংসার বিরক্ত সাধুদের আনাগোনা ছিল। নবদ্বীপদাস বৈরাগ্যকে তাঁর বীরহাটা (বর্ধমান) বাড়িতে অনেকেই দেখেছেন। পিতার মানসিকতা তাঁকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল, সে উল্লেখ তিনি তাঁর আত্ম-জীবনীতে (দিনের পর দিন যে গেল, ১ম, ২য়) করেছেন। বেশ কয়েকটি বই পিতাকে উৎসর্গ করেছেন। উৎসর্গপত্রে বলেছেন পিতার মধ্যে তিনি ক্ষণে ক্ষণে অসাধারণকে প্রত্যক্ষ করেছেন। অভিধান গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে তাঁকে বিদ্যাচর্চায় দীক্ষা দেবার কথা বলেছেন। চৈতন্যজীবন কথা বাড়ির পরিমণ্ডলকে ঘিরে রেখেছিল।

তিনি বলেছেন 'মানুষের দেহে-মনে ঈশ্বরপ্রেমের ব্যাকুলতার এমন অপূর্ব প্রকাশ ইহার পূর্বে কেহ দেখে নাই, শুনে নাই, পড়েও নাই। কেবল তাঁহার গুরুর গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর দেহত্যাগকালে এমনি মহাভাব একবার দেখা গিয়ছিল'। 'চৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকায় বুদ্ধদেবের পর মানুষ রূপে অবতীর্ণ জীবদরদী চৈতন্যের কথা তিনি বলেছেন। 'এ হিস্টরি অফ ব্রজবুলি লিটারেচর,' 'বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ' 'রবীন্দ্রশিল্পে প্রেমচৈতন্য ও বৈষ্ণব ভাবনা,' 'পদাবলীর অভিসার গানের শ্রীক্ষেত্রে,,' 'চৈতন্যাবদান' গ্রন্থগুলি এই প্রসঙ্গে মনে পড়বে। চৈতন্যের কথা উনবিংশ শতাব্দে অনেকেই উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ তো আছেন-ই তার সঙ্গে শিশিরকুমার ঘোষ ইত্যাদির নূতনভাবে বৈষ্ণবধর্মচর্চার কথা আমাদের মনে পড়বে। কেশবচন্দ্র সেনের কীর্তনের কথাও আমাদের স্মরণে আসে। ড. সেন প্রায়ই বলতেন বৈষ্ণব ঘরের মেয়েরাই যৎকিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানতেন। তাঁদেরই মুখে মুখে উনবিংশ শতাব্দে চৈতন্যকথা ঘুরত। রবীন্দ্রনাথ 'বোষ্টমী'-কে পেয়েছিলেন এই সূত্রে। মধ্যযুগে যে ভক্তিবন্যার কথা বলা হয় তারও ইতিহাস আমাদের জানা ছিল। রমিলা থাপার এই ভক্তিবন্যার সঙ্গে সামাজিক ইতিহাসের গড়নটি কিভাবে

তৈরি হল তা দেখিয়েছেন। ড. সেন কিভাবে চৈতন্যকে পেলেন? তাঁর অন্তর মন কিভাবে গ্রহণ করেছিল চৈতন্যকে?

এই প্রশ্নের উত্তর মিলবে পূর্বোদ্ধৃত বক্তব্যে। এখন আর একটু বলি 'ধর্ম মানে মানুষের সর্বাত্মক প্রকর্ষ। ধর্ম শুধু আধ্যাত্মিক উন্নতি আনে না। সেই সঙ্গে আনে তার চিত্তেরও উন্নতি অর্থাৎ সাংস্কৃতিক উন্নতি, যাকে ইংরেজীতে বলে 'কাল্‌চারাল প্রগ্রেস'। চৈতন্যের ধর্ম থেকে আমরা আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক, স্পিরিচুয়াল ও কাল্‌চারাল অভ্রান্ত নির্দেশ পেয়েছি' ('চৈতন্যাবদান')। স্বরূপ দামোদরের কড়চার কথা আমরা জানি। এই কড়চার ভগ্নাংশ চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত হয়েছে। ড. সেন নিশ্চয়ই চৈতন্যের আবির্ভাবের কারণ হিসাবে গুরুত্ব দিতেন স্বরূপ দামোদরের এই শ্লোকটি 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ কলৌ/সমর্পয়িতু মুন্নাতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তি-শ্রিয়ম্‌...'। ড. সেনকে বোধ করি 'করুণা' শব্দটি স্পর্শ করেছিল। চৈতন্যের অধ্যাত্মভাবনার দিকটি সব গ্রন্থেই উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ করেই বিস্ময়ের সঙ্গে বলেছেন তিনি 'অজ্ঞান' এ বিষয়ে কিছু বলার অধিকার তাঁর নেই। কিন্তু যে বস্তুটির উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা হল চৈতন্যের আচার-আচরণ এবং তারও বেশি তাঁর সঙ্গীসাথীদের সম্পর্কে আলোচনা। রঘুনাথ দাসের গল্প বলতে তিনি ভালবাসতেন। রঘুনাথদাসের ত্যাগ ও তিতিক্ষা ড. সেনকে বড়ো বেশি বিচলিত করত। এবং চৈতন্যের রঘুনাথকে উপদেশের কথাগুলি 'ভালো না খাইবে রঘু ভালো না পরিবে,' 'গ্রাম্যবার্তা না শুনিবে গ্রাম্যকথা না কহিবে,' 'প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে') তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। চৈতন্যের স্পর্শে যে গৌড়িয়া সমাজ গড়ে উঠেছিল বাঙালি জাতির ভিত্তি সেইখানেই রচিত হয়েছিল। রঘুনাথের প্রতি চৈতন্যের উপদেশ সেই ভিত্তির এক একটি প্রস্তরখণ্ড। সুবুদ্ধি রায়, রূপ-সনাতন, বাসুদেব সার্বভৌম কাশীনাথ মিত্র, রায় রামানন্দ, হরিদাস, অদ্বৈত আচার্য, সীতাদেবী, শ্রীবাস পত্নী (চৈতন্যের দ্বিতীয় 'মা') নিত্যানন্দের কথা সাহিত্যের ইতিহাসে, চৈতন্যাবদান (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে পরিচ্ছেদটির নামও 'চৈতন্যাবদান') এঁদের বিস্তৃত পরিচয় উদ্ধার করেছেন ড. সেন। সেকালের মানুষের বিদ্যাচর্চা, আবেগ-ব্যাকুলতা, রাষ্ট্রনীতি, দয়ামায়া স্নেহ প্রেম এই বর্ণনার সূত্রেই এসেছে। একথাও ড. সেনের মনে পড়েছে যে চৈতন্য মা আর জাহ্নবীকে কখনও ভুলতে পারেননি। বৈরাগ্য গ্রহণের জন্য চৈতন্য খেদ প্রকাশ পর্যন্ত করেছিলেন।

বাঙালির সংস্কৃতির উদ্ধার করেছেন তিনি; সংস্কৃতিতে এনেছেন সজীবতার স্বতশ্চাঞ্চল্য (ড. সেন বলেছেন বাংলার লোকায়ত জীবনকে সাহিত্যে পুরো-পুরি প্রতিফলিত করতে চৈতন্যাবদানের গুরুত্ব অপরিসীম), মানুষের চিত্তে জাগিয়েছেন নির্ভরতা আর বর্তমান কালকে নিন্দা না করে প্রীতির চোখে দেখা। ড. সেনের ভাষায় 'চৈতন্যের ভক্তিস্রোত দেশের মানসিক ও সাংস্কৃতিক ভূমিকায় যেন পলি পড়িয়া গেল। হরিণাম-উপদেশ দিয়া চৈতন্য সাধারণ মানুষকে ঈশ্বরাভিমুখ করিয়া তাহার জীবন-মননের মান উন্নত করিতে চাহিলেন। সমাজেও সংসারে যাহারা অত্যন্ত দুর্গত, বিনা দোষে সমাজ সংস্কৃতি-বহিষ্কৃত। তাহারাও কৃষ্ণের জীব, তাহাদের দেহও কৃষ্ণের মন্দির—এই বিশ্বাস ও বোধ জাগাইয়া তুলিয়া তাহাদের শ্রেষ্ঠ মানুষের সমান আসনের অধিকারী করিয়াছিলেন'। ড. সেনের আগেও এইসব কথা মানুষের জানা ছিল না এমন নয়। কিন্তু চৈতন্যাবদান যে বিক্ষিপ্ত বাঙালির মধ্যে মেলবন্ধনের সেতুটি গড়ে দিয়েছিলেন সেদিকেই ছিল তাঁর মনোযোগ। চৈতন্যভাবনার সঙ্গে রবীন্দ্রভাবনার মিল তিনি দেখিয়েছেন চৈতন্যাবদান গ্রন্থে। চৈতন্যের দিব্যোন্মাদের সঙ্গে তিনি তুলনা করেছেন রবীন্দ্রনাথের ওই গানটির 'বিশ্ব যখন নিদ্রামগন গগন অন্ধকার / কে দেয় আমার বীণার তারে এমন ঝঙ্কার…'। বাঙালির সমাজসংস্কৃতিতে চৈতন্যের পরেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে সর্বাপেক্ষা প্রতিনিধিস্থানীয় পুরুষ বলে মান্য করতেন'।

৪.

ড. সেনের জন্ম ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে (কিঞ্চিৎ গোলমাল আছে এই তারিখে। ১৯০১ হওয়াই বোধ করি ঠিক)। তাঁর জন্মের আগেই বাঙালি নিজের পরিচয় আবিষ্কারে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। সে ইতিবৃত্ত অনেকে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'আত্মশক্তি'র ভাবনা তো আমাদের মনে পড়বেই। বাংলার প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার এই জাগরণের কথার সঙ্গে জড়িত। সাহিত্যের ইতিহাস রচনা যার মধ্যে অন্যতম। অনেকের সঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাধন্য এই বইটি আজও আমাদের কাছে মূল্যবান সম্পদ। ড. সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' রচনা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত। তাঁর কথায় 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসকে যথাসম্ভব কালানুক্রমিক এবং objective বা

বস্তুগতভাবে বর্ণনা করা বক্ষ্যমান গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। ইতিপূর্বে এই বিষয়ে যেসব নিবন্ধ ও গ্রন্থ রচিত হইয়াছে সেগুলির মূল্য কিছুমাত্র খর্ব না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে সেসকল হয় অসম্পূর্ণ, নয় subjective বা অ-বস্তুগত। দেশের ইতিহাসের যথার্থ ধারণার অভাবও আমার পূর্ববর্তিগণের মূল্যবান্ লেখার অন্যতম ত্রুটি বটে। সত্যকথা বলিতে কি, বাঙ্গালা দেশে তথা বাঙ্গালা সাহিত্যে "বৌদ্ধ" "শৈব" "ব্রাহ্মণ্য" "ঐস্লামিক" ইত্যাদি যুগবিভাগ একেবারে কাল্পনিক।' স্পষ্ট করেই ড. সেন তাঁর মেথডলজির কথা বলেছেন এইখানে। বস্তুত 'যুগবিভাগ' যে সম্ভব নয় এখন আমরা তা বুঝতে পারি। যদিও প্রাচীন ও মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগ বলতে ড. সেনের হয়ত আপত্তি হত না। 'বস্তুগতভাব'টি কি? ইতিহাস রচনায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি? এ সম্বন্ধে কারও কারও কিঞ্চিৎ সংশয় থাকলেও ইতিহাস রচনা যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে করা উচিত সে বিষয়ে আমরা এখন আর সন্দেহ করি না। নির্মোহ দৃষ্টি ইতিহাস রচনায় জরুরি। অভিমান ইতিহাস রচনায় অন্তরায়। বলা বাহুল্য, ঐতিহ্য আবিষ্কারের মোহে আমাদের দৃষ্টি আবিল হয়ে পড়ে। তখন আমরা পুথির রচনার সাল তারিখকে কেবলই উজানে ঠেলতে থাকি। ফলে রচয়িতার নির্দিষ্ট কালটি জানার উপায় থাকে না। অথচ ইতিহাস রচনায় সাল তারিখ-ই আলোচনার মণ্ডলটিকে স্পষ্ট করে দিতে পারে। দেশকালের ভূমিকায় জাতীয় সংস্কৃতির উদ্ভব, বিকাশ এবং পরিণতি লক্ষ করাই ইতিহাসবিদের দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে ড. সেন সদা সতর্ক। সেজন্যই দেখতে পাব পুথির পুষ্পিকাকে যেমন তিনি পরীক্ষা করেছেন, তেমনি গ্রাহ্য করেছেন পরোক্ষ প্রমাণের। পুথি অনুসন্ধানের জন্য তিনি কিছু সহযোগী পেয়েছিলেন। তিনি যখন ইতিহাস গ্রন্থ লেখেন তখন পুথি সংগ্রহ কম ছিল না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহ তিনি তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করেছেন। নিজের সংগ্রহও কম ছিল না। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের বাংলা পুথির বিবরণও হাতের কাছে ছিল। গৌড়লেখমালা, গৌড়রাজমালা তো ছিলই। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম সংস্করণের পাদটীকা দেখলেই বোঝা যাবে ড. সেনের শ্রমসাধ্য কাজটির নেপথ্যলোকের ভূমিকা। সাল তারিখ নির্ধারণে তিনি 'নেই আঁকড়িয়া' ছিলেন না। যখনই কোনো নূতন তথ্য পেয়েছেন পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনবোধে সেই তারিখটির পুনর্বিচার করেছেন। নিজের ভুল নিজেই

সংশোধন করেছেন। এই প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত দিই। তাঁর স্নেহধন্য ছাত্র তারাপদ মুখোপাধ্যায় চৈতন্যচরিতামৃতের রচনার সাল তারিখ বিচার করে ড. সেনের নির্ধারিত তারিখটিকে মানতে পারেননি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি সভায় তারাপদবাবু সে বক্তব্য পেশ করেন। সভার সভাপতি ড. সেন স্বয়ং। সভাশেষে বিচলিত ড. সেনকে দেখেছিলেন কেউ কেউ। এর পর তারাপদবাবুর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন তিনি। এবং সে আলোচনার ফলাফল গ্রন্থভুক্ত করেছেন।

প্রথম সংস্করণ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাকে শিরোভূষণ করে। পাঠকবৃন্দ বইটি পেয়ে কিরকম সাড়া দিয়েছিলেন তা আমার জানা নেই। কিন্তু সমালোচনা হয়েছিল কিছু কিছু। মূল অস্বস্তিটি ছিল ড. সেনের বিপুল তথ্যসংগ্রহ সম্বন্ধে। কেউ কেউ বলেছেন এ তো পুথির বিবরণ মাত্র। ইতিহাস কই? এ সমালোচনার উত্তর তিনি দিয়েছেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ডে। বহু অজ্ঞাত ও বিস্মৃত রচনা তিনি কেন কুড়িয়ে এনেছেন তার কৈফিয়ৎস্বরূপ বলেছেন এসব রচনা এক সময়ে যেভাবে হোক যে-কোন শ্রেণীর পাঠকের ক্ষণকালের জন্যও মনোরঞ্জন করেছেন, দ্বিতীয়ত পরবর্তী কালের অনেক মূল্যবান রচনার উপাদান এইসব অবজ্ঞাত ও বিস্মৃতপ্রায় লেখার মধ্যে লভ্য, তৃতীয়ত যথার্থ রসিক ব্যক্তি কেবল পর্বতের চূড়ার দিকেই তাকান না, প্রাচীরের গায়ে নামহীন ফুলের মধ্যেও স্বর্গের সৌরভ খুঁজে পান। ইতিহাসবিদ্‌কে এসব উপেক্ষা করলে চলে না। একবার ড সেন বাংলা থিসিসের বিষয়বস্তু দেখে বলেছিলেন, 'আমি যেসব লেখকের সামান্য বিবরণ দিয়ে দায়িত্ব পালন করেছিলাম এখন দেখছি সেইসব লেখকবৃন্দই বাংলা ডক্টরেটের থিসিস হচ্ছে; আমার অপরাধ কোথায়?

কিন্তু ড. সেন থেমে থাকেন না। প্রতি সংস্করণে ইতিহাসের ইঙ্গিতগুলিকে পরিস্ফুট করেন তীক্ষ্ণ মন্তব্যে। ড. সেন 'যুগবিভাগ' করেননি কিন্তু প্রতি শতাব্দের আলোচনার আরম্ভে শতাব্দের প্রবণতা যে ফুটিয়ে তোলেন কয়েকটি বিভাগে বিন্যস্ত করে। এই ইঙ্গিতগুলি এত জমাট-বাঁধা গদ্যে রচিত যে প্রতিটি সূত্র খুঁটিয়ে না পড়লে অনেক কিছু হারানোর সম্ভাবনা। তারাপদ অতিশয়োক্তি করেছিলেন কি না জানি না, তবে তিনি বলতেন ড. সেনের এমন এমন বই আছে যার প্রায় প্রতিটি ছত্রই এক একটি গবেষণার বিষয় হতে পারে। 'বিদ্যাপতি গোষ্ঠী' বইটির কথা তিনি এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তরূপে

উল্লেখ করতেন। উল্লেখ করতেন 'নটনাট্য নাটকে'র। 'আমার মাথায় থাকে আমার রচনার তিনভাগ, এক ভাগ রচনায় ধরা পড়ে'। ড. সেনের এই মন্তব্যটি তাঁর ছাত্রছাত্রীদের ভাবিয়েছে। আসলে ঐ এক ভাগের মধ্যে বাকি তিন ভাগের ইশারা ইঙ্গিত থাকে। তিনভাগের নির্যাস ঐ চতুর্থভাগে ছড়িয়ে থাকে। একটি উদাহরণ দিই। বিষ্ণু পালের 'মনসা মঙ্গল' তিনি সম্পাদনা করেছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে বইটি সম্বন্ধে লিখছেন, বিষ্ণু-পালের কাব্যের ভাষা প্রায় পুরাপুরি আঞ্চলিক কথ্য। রচনায় অন্য বিশিষ্টতা এই যে পদ্যছত্রে অনেক সময় অক্ষরসংখ্যার কমবেশি দেখা যায় এবং মিলের অভাবও দেখা যায়। "বাচাল" চিহ্নিত ছড়াগানের ধরনের পদগুলিতে এই ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এ বিষয়ে মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের সঙ্গে মিল আছে। ভোজপুরী বেহুলা-গানের সঙ্গেও মিল দেখা যায়। রচনার মধ্যে বিস্তর লোকোক্তি ছড়া, এমন কি মেয়েলি ছড়া ও, গাঁথা আছে। এখন এই 'আঞ্চলিক কথ্য', 'বাচাল', 'মানিক দত্তের কাব্য', 'ভোজপুরী বেহুলা-গান', 'লোকোক্তি ছড়া', 'মেয়েলি ছড়া,' গাঁথা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তর লেখা যেত। কিন্তু তাতে গ্রন্থ বেড়ে যায়। এ জন্যেই কি তিনি 'যাত্রী' (তাঁরই তত্ত্বাবধানে পত্রিকাটি কিছুকাল চলেছিল পত্রিকার উৎসাহী সাহিত্যজিজ্ঞাসুদের বলতেন, দশ লাইনে যদি তোমার প্রবন্ধ সম্পূর্ণ হয়, তবে দশ লাইনই লিখবে, এর বেশি নয়। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে' গদ্যভাষায় এই দশ লাইনের দশকুশি চাল। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম সংস্করণের সঙ্গে সর্বশেষ সংস্করণের (১৯৯১) উপক্রমণিকা' অধ্যায়টি তুলনা করলে বুঝতে পারা যায় ইতিহাস-রচনায় ড সেনের দুরদৃষ্টি এবং শ্রমসাধ্য প্রয়াশের বিবরণ। প্রথম সংস্করণে দুটি বিভাগ ছিল 'উপক্রমণিকা'র। সর্বশেষ সংস্করণে তা আটটি বিভাগে বিন্যস্ত হয়েছে। 'দেশ ও দেশনাম' থেকে 'সমাজ ও শিক্ষা সংস্কৃতি'র বিবরণ দিতে গিয়ে এ পর্বন্ত প্রাপ্ত তথ্যের নির্যাস এই অধ্যায়ে পাওয়া যাবে। তাঁর 'প্রাচীন বাঙলা ও বাঙালী' 'মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী' এবং 'বঙ্গভূমিকা' গ্রন্থে বাঙালির সাহিত্য সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বিস্তৃত পরিচয় আছে। কিন্তু 'ইতিহাস' গ্রন্থে নির্যাসে তাকে কিভাবে আয়ত্তে আনতে হয় সেই দুর্লভ মননের পরিচয় দিয়েছেন ড. সেন।

৫.

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের (অথবা 'ইসলাম বাংলা সাহিত্য') আর একটি বিষয়ও লক্ষণীয়। পুথি এবং বই তিনি খুঁটিয়ে পড়িয়েছিলেন। তিনি তো দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বলেছেন 'কাশীরাম দাসের শৈলারূঢ় প্রভুকে "রূঢ় নীল সেন" হইয়া ইতিহাসরসিকের ভ্রান্তিবিলাসের হেতু হইয়াছে।' কেউ কেউ পড়েছেন 'তামতী লালমণি'কে 'তামতিলাল মুনি'। বিদ্রূপের ছোঁয়া আছে এখানে। আমাদের শ্রমবিমুখতার প্রতি কটাক্ষও হয়ত আছে। বোধ করি এ আমাদের সচেতনতার জন্যই গ্রহণ করা উচিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যখন কিছু তরুণ গবেষকের ভারতকোষ সম্পাদনার ব্যাপারে নিষ্ঠা ও শ্রমস্বীকার দেখেছিলেন তখন তিনি বারে বারে উল্লাস প্রকাশ করেছেন। কিন্তু যে-কথাটি এখানে উল্লেখ করা দরকার তা হল পুথি ও বইপাঠের পর এমন সব তথ্য উদ্ধার করতেন যা হয়ত অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। এমন কথা বলব না, ড সেনের দৃষ্টিতে সব মূল্যবান তথ্যই ধরা পড়েছে। কিন্তু তিনি জাল ফেলে এমন সব তথ্য পেয়েছেন যা আমাদের সংস্কৃতি এবং সমাজ জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে খুবই জরুরি। পীরের গাথা ও গান সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিবরণ দেওয়ার সূত্রে বাংলার ধর্মমতের যে টানাপোড়েনের দিকটি ড. সেন উদ্ধার করেছেন তার মূল্য ঐতিহাসিকরা নির্ধারণ করবেন। 'অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী সন্ধি, অধ্যায় নূতন-পুরানোর যে অবিরাম দ্বন্দ্বসংঘাতের অস্থিরতা চলছিল প্রথম সংস্করণে তার আভাস মাত্র ছিল। সর্বশেষ সংস্করণে তাকে তিনি ঢেলে সাজিয়েছেন। এবং যেহেতু অকিঞ্চিৎকর রচনাকে তিনি কিছুতেই উপেক্ষা করবেন না, সেই হেতু দুষ্প্রাপ্য পুথি-পোথা থেকে তুলে আনেন দুর্লভ ঐতিহাসিক উপাদান। "দ্বিজ" রাধামোহনের একটি ছড়াতে চণ্ডালগড় থেকে শালিখা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের কাজে মজুর নিয়োগের যে খাঁটি বিবরণ আছে তা তাঁর চোখে পড়েছিল। নীলকর সাহেবরা জমিতে দাঁড়াপুঁতে, ভাবরার ঘরে আটকে, লেঠেল পাঠিয়ে বাংলার কৃষিব্যবস্থায় যে সঙ্কট তৈরি করছিল, ওই রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ অত্যাচারের কাহিনী পাওয়া যায় 'ফেলাত্র লাঁগল মাঠে পালায় ছুটে যত চাষিগণ / বেগার ধরিতে আইল কত শত জন'। সিপাহীরা যেন 'হাতে বেঁদে গোপ্তা মেরে রাস্তাতে খাটায়'। ইতিহাসবিদ্‌রা এই তথ্য থেকেই কৌতূহলী হবেন এরকম ছড়ার অনুসন্ধানে। 'বটতলার ছাপা ও ছবি' গ্রন্থে ড. সেন নামগোত্রহীন লেখক ও

চিত্রীদের পরিচয় দিতে এই কারণেই উৎসাহী হন। কেননা বাঙালির সংস্কৃতির 'ভদ্র' রূপটিই একমাত্র চরিত্র নয়, রাস্তার বেগার-মজুরও তাঁর কাছে সমান মূল্য পেয়ে যায়। সম্প্রতি ইতিহাসচর্চায়, সাহিত্যচর্চায় সমাজবিদ্যার বিস্তার ঘটেছে। এর মূল্য-বিচার আমাদের সাধ্যাতীত। কিন্তু ড. সেনের গ্রন্থে সমাজবিদ্যার আলোচনা বিস্তৃতভাবেই আছে। তিনি যখন কীর্তনের ইতিহাস লেখেন এবং এক সময়ে ঢপ কীর্তনের পরিচয়দানে চলে আসেন তখন সমাজ-বিদ্যার পরিচয় ফুটে উঠতে থাকে বিবরণের মধ্যে। কিন্তু পাল আর বর্মন-সেন রাজাদের সংস্কৃতি আলোচনায় যখন তিনি নিষ্ঠ তখনও কেবল সাহিত্যিক উপাদানগুলিই তাঁর একমাত্র বিবেচ্য হয়ে ওঠে না—মন্দির শিল্প, কারুশিল্পও সেই রচনায় মূল্যবান হয়ে ওঠে। স্থাপত্যরীতিও ইতিহাসের প্রকৃত পরিচয় গ্রহণে জরুরি বলে বিবেচিত হয়। টোটেম, টাবু, ফেটিশের তলানি আমাদের সংস্কৃতিকে কিভাবে জড়িয়েসড়িয়ে ছিল তাঁর খোঁজে ড. সেনের তীব্র কৌতূহল। নৃতত্ত্বের কথা আগে বলেছি। সাহিত্যের ইতিহাসে এবং 'পদাবলীর অভিসার: গানের শ্রীক্ষেত্রে' গ্রন্থে মেয়েলি অশ্লীল গানকে তিনি মান্য করেন বিশেষভাবে। প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা অশ্লীল মেয়েলি গানে পরবর্তীকালে 'কৃষ্ণলীলারই ঘোঁট জমেছিল'। ঈশ্বর গুপ্তের আলোচনায় ড. সেন পরিচিত কবিতা সম্বন্ধে যেমন আলোচনা করেন তেমনি তুলে আনেন ঈশ্বর গুপ্তের হাঁপু গান, বাবুদের সম্বন্ধে শ্লেষ এবং মেয়েলি রসিকতার কবিতা। একালের গবেষকবৃন্দ কেউ কেউ ড. সেনের এইসব উদাহরণগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন দেখতে পাই।

৬.

'আমি বহুকাল ধরে বেদচর্চা করে আসছি। এখন বেদের ভাষায় যে কোনো বিষয়ে অনায়াসে বই লিখতে পারি'। 'নট নাট্য নাটকে'র প্রসঙ্গে এই বেদচর্চার ইঙ্গিত দিয়েছি। ড. সেনের এই উক্তি যে অতিশয়োক্তি নয় তা তাঁর আলোচনার পদ্ধতি দেখলেই বুঝতে পারি। কখনও মঙ্গলকাব্যের 'দিগ্‌বন্দনা'র সূত্রে তিনি ঋগ্বেদের কালে পৌঁছে যান. কখনও ঋগ্বেদের কাল থেকে আধুনিক কালে এসে স্থিত হন।

এ বিষয়ে সামান্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেব। বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া

প্রয়োজন এই কারণে যে আমাদের সংস্কৃতির জড় যে ঋগ্বেদের কালে গিয়ে পৌঁছায় ড. সেনের দৃঢ় অভিমত ছিল এই। ভারতবিদ্যা এবং বাংলাবিদ্যার যোগসূত্রটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাঁর ইতিহাস চর্চায়। বাংলাবিদ্যা ভারতবিদ্যারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেজন্যই বাঙালির সংস্কৃতির পরিচয় উদ্ধারে ড. সেন প্রাচীন আর্য ও নবীন আর্যসংস্কৃতির প্রসঙ্গে টেনেছেন। ঋগ্বেদ এবং পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের এবং সেই সময়ের জনগোষ্ঠীর মানসিকতায় যে বিভিন্নতা ছিল তার উল্লেখ করে ব্রাত্য এবং নবীন বৈদিক সংস্কৃতির টানাপোড়েনে বাঙালির সংস্কৃতির বিবর্তনের রূপরেখা গড়ে উঠেছিল। এমনকি আমাদের গৃহদেবতার ভাবনার মূলেও যে বৈদিক ভাবনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে সে ইঙ্গিত পাই তাঁর রচনায়। এবারে ড. সেনের লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিই। 'খুব প্রাচীনকাল থেকেই মেয়েলি গানে অশ্লীলতার ছড়াছড়ি ছিল। এ অশ্লীলতা হল পরপুরুষ সংসর্গের। বৈদিকযুগেও এমন গাথা ছিল। সে গাথার কিছু ইঙ্গিত পাই অশ্বমেধ যজ্ঞের কর্মানুষ্ঠানের মধ্যে মন্ত্রের মতো দু একটি ছত্রে' (পদাবলীর অভিসারঃ গানের শ্রীক্ষেত্রে)। 'মধ্যদেশবিনির্গত' বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ আনাইয়া জমিজমা দিয়া স্থিত করানো এদেশের রাজশক্তির পক্ষে মানবৃদ্ধিকারক কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইতে থাকিল' (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড)। 'আমি বলছি বৈদিক সাহিত্যের কথা। বৈদিক সাহিত্যের গোড়াতে পাই ঋগ্বেদ, পদ্যে লেখা, চমৎকার পদ্য ও কবিতা। তারপরে দেখা দিল অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্য। তাতে সৃষ্ট হয়েছে চমৎকার গদ্য। এই বৈদিক সাহিত্যে গদ্যে ও পদ্যে দেখা দিয়েছিল ক্রাইম কাহিনীর সূত্রপাত (ক্রাইম কাহিনীর কালক্রান্তি)। 'অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যের শেষের দিকে—কৃষ্ণ-যজুর্বেদ-সংহিতায় পাঠান্তরে আর কোন কোন শ্রৌত সূত্রে —ভরতদের মধ্যে কুরুগোষ্ঠির সামাজিক ব্যবহারে একটি স্বতন্ত্রতার উল্লেখ আছে। এই স্বতন্ত্রতা বা বিশিষ্টতা, "কুরু—গাইপত", পাণিনির একটি সূত্রেও উল্লিখিত আছে [৬.২.৪২]। বৈদিক যজ্ঞ বাজপেয় অনুষ্ঠানে কুরুদের এক নিজস্ব, স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বিত হত' (ভারত কথার গ্রন্থিমোচন)। ঋগ্বেদের ভাষার প্রশংসা করে, পরে লিখলেন 'ঋগ্‌বেদের কবিতা, ভাষায় ও ভাবে পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যের মূল উৎস। ভাষায় ঋগ্‌বেদের উৎস-সন্ধান সহজ, বিদেশী পণ্ডিতেরা তার পথ বেঁধে দিয়েছেন। ভাবে সে সন্ধান সহজ নয়। সে পথের চিহ্ন কেবল অধ্যবসায়ী বিশেষজ্ঞের নজরেই পড়তে পারে * *

ধর্মভাবের কথা আমি লৌকিক—অ-ধর্মভাবের, বিষয়বস্তুর কথা বলছি' (গল্পের গাঁটছড়া, শিশুলীলা—সেকালের সাহিত্য')। 'সংস্কৃত সাহিত্যে ভূতের খুবই অল্পতা বটে, কিন্তু খাস বৈদিক সাহিত্যে, অর্থাৎ ঋক ও অথর্ব বেদে ভূত প্রেতের অভাব নেই। তবে ওসব নাম ওখানে নেই। ওরা সবাই একসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে একবচনে 'রক্ষস্' [রক্ষঃ] বলে '(গল্পের ভূত)'। রামকথার কোন ইঙ্গিত না মিললেও বৈদিক সাহিত্যে 'সীতা' আছেন, কৃষ্টপচ্যভূমির প্রতীক রূপে, কৃষিফলের ভাবরূপে। এ সীতার সঙ্গে বৈদিক দেবীভাবনার উষা সূর্য-সাবিত্রীরও যোগাযোগ ঘটেছিল (রামকথার প্রাক্-ইতিহাস)। একই সঙ্গে আর্কিটাইপ এবং সাহিত্যে প্রাপ্ত মিথের যোগ লক্ষ করা হচ্ছে এখানে। দেবী ভাবনা সম্বন্ধে তিনি ইংরেজিতে একটি গ্রন্থ লিখেচেন 'দি গ্রেট গডেসেস ইন ইনডিক ট্রেডিশন' নামে। এখানে অবশ্য মাতৃভাবনার প্রসঙ্গকেই বিস্তৃত করা হয়েছে।

৭.

আমরা বোধ হয় এবারে ড. সেনের আর এক জাতীয় জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হচ্ছি। ড. সেন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস বলেননি। বলেছেন 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস'। আমার এখন 'সংহতি'র কথা প্রায়ই বলি। ড. সেন ভারতীয় সংহতির গভীর ঐক্যটি উদ্ধারে ব্রতী ছিলেন। এবং নানা দেশের মিথের আলোচনার সূত্রে এই ঐক্য যে কত গভীর তা দেখিয়েছেন। রাম-কথার প্রাক্-ইতিহাসের সূচনাই হয়েছিল আমাদের এক সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের মুখে। সংকট কথাটি আমরা এখন কথায় কথায় ব্যবহার করি। কিন্তু যেদিন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'রামকথা' নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন সেদিন ড. সেন তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তার বিদ্যার ভাণ্ডার নিয়ে। সেকথা তিনি বইটির উপক্রমণিকায় বলেছেন। যখন মিথের আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন তখন বিদেশী পণ্ডিতদের বিশ্লেষণ তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল। কিন্তু তিনি বিষয়টিকে আরও ব্যাপক আরও গভীরভাবে অনুধ্যান করেছেন। একথা ঠিক ডি. ডি. কোশাম্বি এ বিষয়ে নিপুণ বিচার করেছেন। ড. সেন তাঁর কথাও বলতেন। 'রামকথার প্রাক্-ইতিহাস' গ্রন্থে তিনি ভূমিকায় যেকথা বলেছেন তা কেবল ইতিহাসচর্চার সরণি হিসেবেই নয় দেশের মানুষের বিবেকের কাছেও ড. সেনের আবেদন হিসেবে স্মরণীয়। তিনি 'প্রস্তাবনা'য় বলেছেন 'আমার

এই আলোচনা চলেছে ইতিহাস-নিষ্ঠার হাঁটা পথে, ধর্মবিশ্বাসের ব্যোমযানে নয়। ইতিহাসনিষ্ঠের ও ধর্মবিশ্বাসীর যাত্রাপথ ভিন্নমুখী। ইতিহাসের পথে এগোতে হলে তথ্যের পাথেয় চাই, যুক্তির যষ্টি অবলম্বন চাই। ইতিহাসপথিক কোন স্বতঃ সিদ্ধান্ত নিয়ে যাত্রা সুরু করে না। ধর্মের পথে ধাবমান হলে চাই শুধু সুদৃঢ় বিশ্বাস। ইতিহাসের সিদ্ধান্ত প্রমাণ-নির্ভর, আর সে প্রমাণ স্বাধীন অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাবনার ও ধারণার বাইরে থেকে পাওয়া, তা গুরুমুখ-নিঃসৃত মন্ত্রের মতো অথবা শাস্ত্রবাক্যের মতো স্বতঃপ্রমাণ নয়। * * ইতিহাস বিশ্বাস ও ধর্মবিশ্বাস দুইই সত্য, তবে তা একই চিন্তার স্তরে অবস্থান করে না এবং যুগপৎ সত্য নয়।'

রামকথার প্রাক্-ইতিহাসে মোট বত্রিশটি বিভাগে ড. সেন তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। ঋগ্‌বেদ, বৌদ্ধজাতক, জৈন-নকবিদের রামকথা, ইরাণীয় খোটানী ভাষায় রামকথা, বহির্ভারতের রামায়ণ, সংস্কৃতে রাম, অশ্বঘোষে কালিদাসে রামকথা, ভট্টিকাব্যে, অভিনন্দের রামচরিতে, ব্যক্তিনামে, রামকথার বিশ্লেষণে, আইরিশ মিথে, সীতা-শকুন্তলা কাহিনীতে, বাল্‌টো স্লাব মিথে, এই মিথের দোষ রূপে, ইরাণী ঐতিহ্যে, ফ্রিজিয়া, চ্যবন ও বাল্মীকি নামরহস্যে, বাল্মীকির গল্পে, কালিদাস ও বাল্মীকির তুলনায়, কালিদাস ও রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের মিল-অমিলে, পুরাণে, বেদে সীতা-সাবিত্রী ভাবনায়, সীতা হরিণী মিথে শূর্পণ ও রাম-সার্গবেয় কাহিনীতে, ইক্ষাকুবংশে ভাইবোনের বিবাহ প্রসঙ্গে, বানর-গাথায়, বাল্মীকি ও সীতা প্রসঙ্গে, রামকথার আভাস, উল্লেখ, পরিচয় মন্থন করে ড. সেন তার ছোটো বইটি রচনা করেছেন। বিদ্যার সাত-সমুদ্রের নাবিকের এই পরিক্রমা ইদনীং আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। এমন দাবি ড. সেন করেননি যে তাঁর সব যুক্তিই নিরেট। তিনি নিজেই বলেছেন কিছু ফাঁক থেকে গেছে তাঁর সমালোচনায়। একটা লৌকিক উপমা দিচ্ছি। ধান ভেনে চাল তৈরি করি। তুষ ফেলে দিই। তুষ অভাবীরা নিয়ে ঝেড়েঝুড়ে কিছু খুদ সংগ্রহ করে, আর মিল মালিকেরা সেই তুষকে কলে পিষে শিল্পের জন্য দামী তেল নিষ্কাশন করেন। তেমনি ড. সেন যে যেগুলিকে আমাদের আগে অবজ্ঞাত বলে মনে হয়েছিল তাকে পেষাই করেন, সার বার করে আনেন মূল্যবান তথ্য। না হলে দেবদত্তের কাহিনী সৃষ্টি হয় কি করে? পাণিনি পড়তে পড়তে দেখতে পেলেন প্রায়ই তিনি ব্যাকরণের সূত্রের উদাহরণ দিচ্ছেন দেবদত্ত নামে এক ব্যক্তিকে নিয়ে। ড. সেন সমস্ত বই থেকে

ছেঁকে তুললেন দেবদত্তকে। দেখা গেল দেবদত্তের জন্ম থেকে পরিণতি পাওয়া যায় দৃষ্টান্তগুলি সাজিয়ে দিলে। এ কৌতূহল শিশুর মতো। শিশুর মতো গল্প শুনতে শুনতে হঠাৎ প্রবীণ হয়ে উঠতেন। লোকগল্প, ছড়া আর গল্পগুলির বা ধ্বনিসমষ্টি থাকে সেগুলি সংস্কৃতির উপাদান হয়ে ওঠে যদি অন্যান্য মিথের সঙ্গে মিলিয়ে যায়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বাংলার ব্রতে' এই কাজই করেছিলেন সামান্যভাবে। ভারতকথার গ্রন্থিমোচনেও আমরা একই বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিভংগির সাহায্যে মিথের আলোচনা দেখতে পাই। প্রাচীন গালগল্পের মধ্যে যে রহস্য লুকিয়ে আছে তা ভেদ করা সুসাধ্য নয়। কখনও অন্য গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে, কখনও শব্দরহস্যের উন্মোচনে, কথা ও ঐতিহ্যের গভীরে গিয়ে এ রহস্যভেদ করতে হয়। তুলনামূলক মিথলজি সম্বন্ধে ড. সেনের কৌতূহল 'রাম'ও 'ভারত কথা' লেখবার আগেই সঞ্চারিত হয়েছিল। সে সম্বন্ধে দু-একটি প্রবন্ধ লিখতেও আরম্ভ করেছিলেন। তারপর সময় সুযোগ মতো বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে এই আলোচনাকে বিস্তৃত করেন। বলা বাহুল্য ভারতীয় মিথের বিস্তারিত আলোচনায় ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান চাই। আর বোধ হয় সবচাইতে বেশি চাই জাতীয়ভাবনার সংস্কার। ছেলেবেলা থেকেই আমরা যে মিথের সঙ্গে পরিচিত হই সেগুলি পলি পড়তে থাকে আমাদের চিত্তে। 'দিনের পরে দিন যে গেল' বইতে সে কাহিনী ড. সেন শুনিয়েছেন। 'সুকুমার সেনের প্রবন্ধাবলী' নামে বইটি এইরকম মিথের আলোচনায় সমৃদ্ধ।

'বিষ্ণু-কৃষ্ণ-কথা' প্রবন্ধের সূত্রপাতেই ঋগ্বেদের বিষ্ণু-ইন্দ্রের প্রসঙ্গ এনেছেন তিনি। দুই দেবতার লড়াইয়ের কথা বলেছেন, আবার সখ্যের প্রসঙ্গও বাদ পড়েনি। বিষ্ণু-ইন্দ্র যেন 'পুরাণের বলদেব ও বাসুদেব'। ঋগ্বেদের নাসত্য যুগলদেব, তাঁদের অন্য নাম পাই অশ্বী। এই যুগলদেবতা বিষ্ণু-ইন্দ্র জোটের সঙ্গে তুলিত হতে পারেন। বিশেষ করে বিষ্ণুর সঙ্গে অশ্বীদ্বয়ের মিল খুব গভীর। ড. সেনের ভাষায় 'বিষ্ণু মধুর ভাণ্ডারী অর্থাৎ আড়তদার, stockist। আর অশ্বীরা হলেন মধুদাতা অর্থাৎ দোকানদার, distributor। এভাবেই আলোচনা অগ্রসর হতে থাকে। প্রবন্ধের শেষের দিকে বিষ্ণুর প্রৌঢ়কিশোর / যুবা প্রসঙ্গ-এর আলোচনা করেন তিনি। শিশুকৃষ্ণের সঙ্গে যার সাদৃশ্য। শিশুকৃষ্ণের নাম কাহিনী খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দ থেকেই লভ্য। এইসব লৌকিক কাহিনী জনসমাজে বিশেষ করে নারীসমাজে গানে-গাথায় প্রচলিত। ড. সেনর

অনুমান খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দ থেকেই দক্ষিণ ভারত থেকে যীশু খ্রিস্টের ভাবনা এইসব কাহিনীকে পুষ্ট করে। সেই সূত্রেই কি কৃষ্ণ দেবতায় উন্নীত এবং কিছু ভক্তের আরাধ্য? বৌদ্ধ মহাযানী ভাবনায় করুণাঘন অবলোকিতেশ্বর বিষ্ণু-ভাবনায় এনে দিল করুণা। চৈতন্যের ভাবনায় পাই জীবে দয়া, নামে রুচি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক। এখানে বিশ্বজনীন (universal) ধর্মের ইশারা আছে। চৈতন্য মূর্তিপূজা করতে বলেননি, ঈশ্বরের নাম নিতে বলেছেন এবং আরও বলেছেন ঈশ্বরের অসংখ্য নাম, তার থেকে যে কোনটি নিলেই হবে। এইখানে চৈতন্য হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে মিলনের সেতু বেঁধে দিয়েছিলেন। মিথের আলোচনায় শেষের লাইনগুলি কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কিন্তু ড. সেনের দৃষ্টিতে অনেক সময়েই বিদ্যাচর্চার সঙ্গে জাতীয় চরিত্রের অনুধাবন বিশেষ একটা স্থান পেয়ে যায়। এইটি তারই উদাহরণ।

ছেলেভুলানো ছড়া, মেয়েলি ছড়া, ভূতের এবং রাক্ষস-খোক্ষসের গল্পকে আজীবন ড. সেন মান্য করে এসেছেন। দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলার পরও নূতন করে ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদার ঝুলি, রাক্ষস-খোক্ষসের গল্প, আর উনবিংশ শতাব্দ থেকে সংগৃহীত এবং লিখিত শিশুপাঠ্য ছড়া, গল্প, কাহিনীর খোঁজ নিয়েছেন। কেরীর 'ইতিহাসমালা'র আলোচনা তিনি করেছেন 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য' বইটিতে। কিন্তু কেরীর গল্পগুলি ইংরেজিতে অনুবাদ করতে গিয়ে হঠাৎ যেন তিনি বুঝতে পারলেন এগুলির উৎস লৌকিক। এরকম ঘটনায় তিনি খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। আরও উত্তেজিত হয়ে পড়লেন যখন তাঁর মনে পড়ল ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রিমদের কাহিনীর প্রকাশের কথা মনে পড়ল। কেরীর বইও ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। অনেককে শুনিয়েছেন সে কাহিনী। 'গল্পের গাঁটছড়া'য় বলেছেন বিদেশী পণ্ডিতেরা লৌকিক গল্পছড়ার গিঁট খুলে গাঁট ছাড়িয়ে ইতিহাসের নাগালের বাইরে যে প্রত্ন ও প্রাক-ইতিহাস, আর তারও অগোচর যে কালস্রোতের প্রতিষ্ঠান তা কিছু কিছু শুনতে পেরেছেন। ড. সেনও কিছু গিঁট খুলতে এবং গাঁট ছাড়াতে চেয়েছেন আমাদের বাংলার ছড়া এবং লৌকিক গল্পের। হালহেডের কাগজপত্রে প্রাপ্ত একটি লৌকিক বাংলা গল্পের সঙ্গে জার্মান লৌকিক গল্প এবং গ্রিমেদের বইতে প্রাপ্ত অনুরূপ আর একটি গল্পের তুলনামূলক আলোচনায় তিনি উৎসাহ পান। গল্প শোনাতে তিনি চান কি মিথের আলোচনায়, কি সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় কি শিশু গল্পের বিশ্লেষণে। ভারতীয় সাহিত্যে 'শিশুচেষ্টা'র

লোকগাথা, লোককথা অবলম্বনে আমাদের শিশুভাবনার চিত্রচরিত্র পরিস্ফুট করেন। একেবারে আদি থেকে একাল পর্যন্ত। ঋগ্বেদের অরণ্যানী দেবীর সঙ্গে কালকেতুর উপখ্যানের যোগ দেখতে পান ড. সেন। তারপর বলেন বাংলার দেবীকাহিনীর সুস্পষ্ট ছায়া মেলে জার্মান গল্পে, দুটি ইরানীয় গল্পে এবং একাধিক আর্মানী গল্পে। এর পর চলে আসেন লালবিহারী দে সংকলিত 'দি বল্‌ড ওয়াইফ', দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারসংগৃহীত গল্প, আর গ্রিম সংগৃহীত কাহিনীতে। তিনটি গল্পের মিল-অমিল প্রদর্শিত হয় ড. সেনের বিবরণে। এই রকমভাবে প্রায় একই গল্প কিভাবে বহুদূর বিস্তৃত হয়ে যায় তার উদাহরণ দিয়েছেন আর্মানী ও বাংলা গল্পের মিল দেখিয়ে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'ছেলে ভুলোনোছড়া' আর যোগীন্দ্রনাথ সরকারের। 'খুকুমণিরছড়া' ড. সেনের খুবই প্রিয় বই ছিল। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষোভ ও খেদ যেন ড. সেনকে স্পর্শ করেছিল। আশুতোষ বলেছিলেন একদা রবীন্দ্রনাথ ছড়া সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, কিন্তু বোধ হয় লোক-গঞ্জনার ভয়ে ও প্রবীণদের তাড়নে তিনিও ইহা হইতে অবসর গ্রহণ করেন, প্রবীণের বজ্রশাসনে মিলিত হইয়া আমরা এই রূপ অনেক জিনিস হইতে বঞ্চিত হইতেছি।' এই বঞ্চনাকে লক্ষ রেখেই লোকগাথা, লৌকিক গল্প আর ছড়ার রাজ্যে ড. সেন প্রবেশ করেছিলেন।

৮.

ভারতীয় সাহিত্য বিশেষ করে ঋগ্বেদের বহুভাবনার শেকড় আমাদের সংস্কৃতির সর্বত্র পৌঁছে গেছে একথা যেমন ড. সেনের সাধনায় পাই তেমনি তাঁর রচনায় ফুটে উঠতে থাকে রবীন্দ্রভাবনার দ্যুতি, রবীন্দ্রচিন্তার আভা। "আমাকে কেউ রবীন্দ্রনাথকে চিনিয়ে দেয়নি, আমিই আবিষ্কার করেছি বর্ধমান স্টেশনে কালো ট্রাঙ্কের ঢাকনায় R. N. Tagore লেখা পড়ে। একবার ট্রেনের দরজা খুলে যখন রবীন্দ্রনাথ একেবারে একা, তখন প্রণাম করে এসেছি। এই কথা বলে ড. সেন আনন্দ পেতেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হননি কেন, অথবা চিঠিপত্র লেখেননি কেন? এর উত্তর তিনি দিয়েছেন। আমাদের কাছে সে উত্তর কিছুটা ভাসা ভাসা মনে হয়েছে। যিনি সুনীতিকুমারের একনিষ্ঠ ছাত্র তিনি রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এলেন না এ প্রশ্ন আমাদের উদ্‌বেজিত করে। যতদূর

বুঝি ড. সেন কিছুটা স্বভাব-লাজুক ছিলেন। মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, সভা-সমিতিতে গিয়েছেন, সেমিনার করেছেন, সাহিত্য অকাদেমির মিটিং-এ গেছেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেছেন, এসবই আমাদের ধারণার বিপক্ষে। তবু বলব যাঁকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন তাঁর কাছে তিনি নিজেকে কিছুটা আড়াল করতেন। ভদ্রতাকে বড়ো বেশি মূল্য দিতেন। সুনীতিকুমার জোর করলে হয়ত তাঁর এই দ্বিধা ভেঙ্গে যেত। বোধ করি সে সুযোগ তিনি পাননি। মুখ ফুটে অনুরোধ করবেন—এরকম মানুষই তিনি ছিলেন না।

অথচ 'রবীন্দ্রনাথের গান', 'পরিজন পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রের ইন্দ্রধনু', 'রবীন্দ্রশিল্পে প্রেমচৈতন্য ও বৈষ্ণবভাবনা' এবং 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (তৃতীয় খণ্ড) তিনি লিখেছেন। এ ছাড়া রবীন্দ্র সম্পর্কিত বেশ কিছু প্রবন্ধও তিনি লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের গান ছিল তাঁর জীবনযাপনের পাথেয়। জীবনে যিনি ছিলেন প্র্যাকটিক্যাল বুদ্ধির মানুষ, বিদ্যায় পাণ্ডিত্যে যিনি ছিলেন নির্মোহ দৃষ্টির অধিকারী তিনি কিন্তু রবীন্দ্রবীক্ষায় কিঞ্চিৎ বিহ্বল, কিঞ্চিৎ আবেগপ্রবণ। কোনো রবীন্দ্রসমালোচনাকেই তিনি প্রসন্ন মনে নিতে পারতেন না। রবীন্দ্ররচনায় তিনি পেতেন প্রাণের আরাম, যন্ত্রণা-বেদনার উপশম। তিনি বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ জীবনের সর্বভূমির কাব্য ঋগ্বেদের ভাষায় তিনি "কবীনাং কবিতমঃ"।' আরও বলেছেন, 'ঋগ্‌বেদের কবিদের কাছে বৃত্রহন্তম্ ইন্দ্র যেমন প্রতিভাত ছিল বাঙ্গালা যাহাদের মাতৃভাষা তাহাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ তেমনি'।

৯

লেখা শেষ করতে গিয়ে ড. সেনের ব্যক্তিত্বের একটা আভাস মনে আসছে। সে ব্যক্তিত্বের প্রথম এবং প্রধান দিক হল আত্মপ্রত্যয়। এই আত্মপ্রত্যয়ই ইতিহাস রচনায় তাঁকে সাহস এবং শক্তি দিয়েছে। প্রচণ্ড অধ্যবসায়ী ছিলেন তিনি। আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এই অধ্যবসায়। তাঁর রচনায় দ্বিধা বা সংশয়ের স্থান খুবই অল্প। কখনও কখনও এই আত্ম-প্রত্যয় তাঁকে যে অবুঝ করেনি এমন নয়। তাঁর কিছু কিছু সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কোনো কোনো গবেষক সংশয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ড. সেন তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। তিনি যেমন বলেছিলেন নিজের ভুল তিনি নিজেই সংশোধন

করেছেন, তেমনি হয় গবেষকদের সংশয়কে নিরসন করতেন যদি সময় পেতেন। নূতন কালকে তিনি সাদরে গ্রহণ করেছেন। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' চতুর্থ খণ্ডে সে স্বীকৃতি আছে। এই খণ্ডের নূতন সংস্করণের জন্য একেবারে হালের কবিসাহিত্যিকদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করছিলেন। দৃষ্টিশক্তি হারিয়েও রেডিয়োতে আধুনিক কবির কবিতা শুনে খুশি হয়েছেন। কৌতূহলী হয়েছেন আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে।

বিলেত থেকে তারাপদ মুখোপাধ্যায় পুথির পাতার সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন ম্যাগনিফাইয়িং গ্লাস। ওই ম্যাগনিফাইয়িং গ্লাস যখন ছিল না তখনও চোখে এবং মনে ছিল আতস কাঁচ। যার সাহায্যে ড. সেন আমাদের অতীত-বর্তমানকে উদ্ভাসিত করে ভবিষ্যৎ বিদ্যাচর্চার পথটিকে সুগম করে দিয়েছেন। এই লেখায় সুকুমার সেনের পরিচয় দেবার চেষ্টা করিনি। অনধিকার চর্চা তিনি পছন্দ করতেন না।

'দর্শন-দিগদর্শন'-এর স্রষ্টা রাহুল সাংকৃত্যায়ন

অরুণা হালদার

বর্তমান বর্ষ মহাপণ্ডিত ত্রিপিটকাচার্য রাহুল সাংকৃত্যায়নের (১৮৯৩-১৯৬৩) জন্মশতবার্ষিকী। নানাভাবে নানাস্থানে হিন্দীসহ নানাভাষায় তাঁর সম্বন্ধে নানা লেখা প্রকাশিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। আমি তাঁর ছাত্রীস্থানীয়া ছিলাম—আদিযুগের বৌদ্ধশাস্ত্রশিক্ষা প্রসঙ্গে। সেই হিসাবে অকৃতী হলেও আমাকেও কয়েকটা প্রবন্ধ লিখতে হয়েছে। আমি আশা করছি এ-প্রসঙ্গে এইটাই হবে আমার শেষ প্রবন্ধ।

১

রাহুলজী আজমগড় জিলার পন্দাহা গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। ইংরাজী শিক্ষাসহ সংস্কৃত ও ফার্সী দুটি ভাষাই শৈশবে যথাক্রমে চতুষ্পাঠী ও মাদ্রাসায় শিক্ষা করেছিলেন। অপরিণত বয়সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও পরিবারগত প্রথায় তাঁকে স্বজাতিকন্যাকে বিবাহ করতে হয়। তিনি এই পত্নীসহ কখনও ঘরবসত করেন নি। 'চরৈবেতি চরৈবেতি' ছত্রটিই তিনি আজীবন অনুসরণ করেছেন। লাহোর থেকে কলকাতা, বারানসী থেকে কন্যাকুমারিকা, লঙ্কা, কলকাতা থেকে কচ্ছ এবং তাঁর মধ্যকার অজস্রস্থান তিনি পরিদর্শন করেন প্রথম দিকে ছাত্র হিসাবে এবং শেষদিকে পরিব্রাজক হিসাবে। প্রথমে ঘর ছেড়ে পারসামঠে পরিব্রাজক জীবন গ্রহণ করেন। তাঁকে ফেরানোর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। নাম হয় রাম উদার সাধু। অতঃপর লাহোরে আর্যসমাজী মতের সংস্পর্শে আসেন। এরই মধ্যে তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন এবং কারাবাসও করেন। কারাজীবনে কয়েকবার আবদ্ধ থাকাকালে রাহুলজী যেমন কুরানের সংস্কৃত অনুবাদ করেন তেমনই লেখেন ইউটোপিয়া। ভারতে লেখা এই প্রথম ইউটোপিয়া। দ্বিতীয়বার কারাবাস কালে লেখা হয় 'দর্শন-দিগদর্শন'। তাঁকে প্রধানত বৌদ্ধদর্শনের, বিশেষ করে সংস্কৃত-তিব্বতী-শাখার বৌদ্ধদর্শনের প্রধান কারিগর বলাই সঙ্গত। সব দিক দিয়ে বিবেচনা করে

আমি কারিগর কথাটা ব্যবহার করেছি। সংস্কৃত-তিব্বতী ভাষাজ্ঞান তিব্বতী-চীনা-লেক্সিকন সহযোগে সেইসব ভাষায় অনূদিত পুঁথির সংস্কৃতে পুনর্নবীকরণের মতো দুরায়াস কার্যকে অনায়াসভাবে সুসম্পন্ন করা, এটা রাহুলজীই পারতেন এবং পেরেছিলেন। আর এনেছিলেন অজস্র পুঁথির হস্তলিখিত কপি ও তখনকার দিনের ফটোকপি। যাঁরা তাঁর জীবনের প্রতিবর্ষের ফসলতোলার কথা জানতে চান তাঁদের 'জলার্ক' পত্রিকার রাহুল সংখ্যাটি পড়তে বলি। রাহুলজী প্রথম অধ্যাপনা কার্য শুরু করেন সিংহলে বিদ্যালঙ্কার পরিবেনে। এখানে পালি গ্রন্থ পড়ার সময়ই তিব্বতী ভাষা শেখার কথা তাঁর মনে আসে। রাহুলজী চারবার তিব্বতযাত্রা করেন। প্রথমবার দীর্ঘ যে দেড়বৎসর থাকেন সে-সময় সম্ভবত তিনি তিব্বতী এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁদের একটি কন্যাও ছিল। শুনেছি, রাহুলজীর মৃত্যুর পর তাঁরা ভারতেও একবার এসেছিলেন। তিব্বত থেকে আসার পর রাহুলজী ইয়োরোপ যাত্রা করেন—লণ্ডনে তিব্বতী পুঁথি ও চিত্রাদির প্রদর্শনী হয়। এখান থেকে ঘটে ১৯৩৭-এ প্রথমবার তাঁর সোভিয়েৎ (মস্কো) দেশ যাত্রা। লেনিনগ্রাদ বা পিটরসবুর্গ ছিল তখন আচার্য শ্চেরবাৎস্কই-এর সময় বৌদ্ধ গবেষণার কেন্দ্র। নিমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে পড়াতে গেলেও দুঃখের কথা এই মনীষীর সঙ্গে রাহুলজীর সাক্ষাৎ হয়নি। তাঁর সেক্রেটারী তিব্বতী বিশারদ এলেনা নের্বেতোভনা-র (পোলিশ-রুশীয়) সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় এবং ১৯৩৮-এ জন্ম গ্রহণ করে তাঁর পুত্র ঈগর রাহুলোভিচ সাংকৃত্যায়ন। রাহুলজী নিজেকে সংকৃতি গোত্রীয় বলে সাংকৃত্যায়ন উপাধি গ্রহণ করেন। ইরানের পথে ভারতে ফেরার পর ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে তিনি জড়িয়ে যান। প্রথমে রাহুলজী যোগ দেন নিখিল ভারত কিষানসভায়। তারপর যোগ দেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে। এই ভ্রমণপঞ্জীসহ চলে তাঁর লিখিনধারা অপ্রতিহত—অব্যাহত বেগে। তাঁর পরিশীলিত শৈলীতে সংস্কৃত ভাষার থেকে মানানসই শব্দচয়নের ফলে সমকালীন হিন্দি সাহিত্য দ্রুতগতিতে অনেকখানি এগিয়ে যায়। মানব সমাজ, নূতন মানবসমাজ বা তুমহারী ক্ষয়—এই দুটি বই পড়লে বুঝতে পারা যায় হিন্দীভাষা ও সাহিত্যের কী প্রবল উন্নতি তাঁর দ্বারা ঘটেছিল। নিজের ভোজপুরী ভাষাও উপেক্ষিত হয়নি। সেই সময় তিনি হিন্দী-সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথিতযশা লেখক হিসাবে হিন্দীসাহিত্য সম্মেলনে (বোম্বাই) সভাপতিত্ব করেন। তাঁর মতে, হিন্দীই ভারতের প্রধানতম বা একতম ভাষা বলে গৃহীত হবে।

এমন কী উর্দু ভাষাও লেখা হবে নাগরী অক্ষরে। এই মতামত প্রচারের ফলে তাঁর কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ খারিজ হয়। পরের দিকে আবারও তা লভ্য হয়েছিল কিনা জানি না, তবে প্রথমে সোশ্যালিস্ট (পার্টিভুক্ত) ও পরে কমিউনিস্ট বলে তিনি নিজেকে ঘোষিত করেন। ১৯৫০ সালে আপন সেক্রেটারী হিন্দী ও সংস্কৃত বিশারদ কমলা পড়িয়ার মহাশয়ার সঙ্গে তাঁর চতুর্থবার বিবাহ হয়। জয়া ও জেতা নামে তাঁর দুই সন্তান বর্তমান। ১৯৬১ সালে তিনি চীন যান, কিন্তু সেখান থেকে আর সোভিয়েৎ যেতে পারেননি। তাঁর ষ্ট্রোক হওয়াতে কলকাতায় চলে আসেন এবং এখান থেকেই দার্জিলিং যান স্বগৃহে। এখানেই ঘটে তাঁর স্মৃতিভ্রংশ। চিকিৎসার জন্য তাঁকে মস্কোয় নিয়ে যাওয়া হয়। দেখা করানো হয় তৃতীয় পত্নী ও পুত্র ঈগর-এর সঙ্গে। দুশ্চিকিৎস্য রোগ আর ভাল হয়নি। দেশে ফিরে স্বগৃহে দার্জিলিং-এ ১৯৬৩ সালের ১৪ই এপ্রিল রাহুলজী চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

২.

ধ্রুবপদের মতো রাহুলজীর জীবনে কয়েকটা জিনিস বার বার ফিরে ফিরে এসেছে। সেগুলি হলো (১) তাঁর সিংহলে অধ্যাপনা, (২) তিব্বত যাত্রা ও পুঁথিপত্র অন্বেষণ, (৩) অমানুষিক পরিশ্রম করে পড়া ও লেখা চালিয়ে যাওয়া, (৪) বৌদ্ধশাস্ত্র সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হওয়া ও তা পরিচয় করানো এবং সেই শাস্ত্র গভীর ও শ্রমসাধ্য অধ্যয়নের মাধ্যমে অধিগত করে দর্শন-দিগদর্শনের মতো একটি গ্রন্থ রচনা করা। অন্য কিছু নাহলেও শুধুমাত্র এই মহাগ্রন্থের জন্যই তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এই দুই জাতীয় গ্রন্থই তাঁর প্রধান ব্যসন বলা চলে। তিব্বতী-সংস্কৃত-সিরিজের বেশ কয়েকখানি গ্রন্থও তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ সম্পাদনার সাক্ষ্য বহন করে। এর মধ্যে অভিধর্মকোষকারিকা ও নালন্দিকা-বৃত্তি স্মরণীয় ও বরণীয় সৃষ্টি। হিন্দী গ্রন্থাদির মধ্যে বুদ্ধচর্যা ও দর্শন-দিগদর্শন আশ্চর্য আকর গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে বলা যায়। এ ছাড়া তাঁর গ্রন্থাদির সংখ্যা ১৫০ বা তার কাছাকাছি। তাঁর চরিতকার হিসাবে শম্ভুনাথ দাস হিন্দীতে ও প্রভাকর মাচওয়ে ইংরাজীতে তাঁর গ্রন্থাদির অসম্পূর্ণ এক তালিকা প্রকাশ করেছেন। 'জলার্ক' পত্রিকার রাহুল সংখ্যায় আছে প্রায় পূর্ণাঙ্গ তালিকা এবং লেখার সময়কালের নির্ঘণ্ট। পণ্ডিত জগদীশ্বর পাণ্ডে, শ্রী অচিন্ত্য বিশ্বাস ও অরুণা হালদার 'জলার্ক'তে "রাহুল সাংকৃত্যায়নের তিব্বতে সংস্কৃত

পাণ্ডুলিপির অনুসন্ধান","তিব্বত চর্চা ও রাহুল সাংকৃত্যায়ন","ত্রিপিটকাচার্য্য মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রাদির সামান্য আলোচনা" শীর্ষক নিবন্ধগুলিতে রাহুলজীর সংস্কৃত-তিব্বতী গ্রন্থাদি নিয়ে যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন সেগুলিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ — যেমন, 'ভোলগা সে গঙ্গা' বা 'জয় যৌধেয়', 'সিংহ সেনাপতি', 'দিবোদাস' প্রভৃতি বহু প্রচারিত সন্দেহ নেই। কিন্তু এগুলির মধ্য দিয়ে রাহুলজীর যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাবে না বলে মনে হয়। পূর্বেই বলেছি, তাঁর পড়ার এবং লেখার অসামান্য ও অলোকসামান্য এক ক্ষমতা ছিল। সেগুলি মূলত প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বৌদ্ধ দর্শনাদি সম্পর্কিত গ্রন্থে এবং অবশ্যই দর্শন-দিগদর্শনে।

৩.

ব্যক্তিগত ভাবনায় একটা কথা আমার মনে উদিত হয়েছে। সেটা হলো —রাহুলজীকে মার্কসীয় তত্ত্বে অনুপ্রাণিত বলে প্রতিপন্ন করা হয়। এ নিয়ে অনেক লেখাই আমাদের দেশে প্রচলিত আছে ভারতীয় কমিউনিস্টদের মধ্যে। অপর পক্ষে, তাঁকে সম্পূর্ণ হিন্দীভাষী জগতের এক বিশিষ্ট পুরোধা লেখক বলেই ধরা হয়। তিনি তাঁর মাতৃভাষা ভোজপুরী ও হিন্দী—এই দুটিকেই উন্নত স্তরে নিয়ে গেছেন এবং শেষ পর্যন্ত হিন্দীই হচ্ছে ভারতের একমাত্র রাজভাষা বা রাষ্ট্রভাষা, এটাই মানতেন। মুসলমানদেরও ভারতীয় হওয়া উচিত মনে করতেন এই ভাষার ক্ষেত্রে, এমন কি পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও। এই বিষয়টি সম্পর্কে 'জলার্ক' রাহুলসংখ্যার শেষ ভাগে তাঁর Friend, philosopher and guide ডঃ মহাদেবপ্রসাদ সাহার কিছু মতামত সংযোজিত হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকেরা তা দেখে নিতে পারেন। এক্ষেত্রে সঠিক অর্থে মার্কসীয় পদ্ধতির কী যোগ থাকতে পারে সেটা মার্কসবাদীদেরই বিবেচ্য। সেই আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। প্রকৃতপক্ষে যে বিশেষ গুণটি রাহুলজীর স্বাভাবিকভাবেই আয়ত্তে ছিল সেটা হলো তাঁর অপরিমেয় বহুশ্রুতত্ব এবং জ্ঞানাহরণের তীব্রতা ও নানা শাখায় যদৃচ্ছ বিচরণক্ষমতা। আমাদের মনে রাখতে হবে, রাহুলজী ছিলেন প্রধানত আত্মকর্তৃত্ববান তীক্ষ্ণধী ও স্বশিক্ষিত স্বদীক্ষিত মানুষ। তাঁর পাণ্ডিত্যের আরোহী সিঁড়িগুলি গঠিত হয়েছিল আমাদের প্রাচীন চতুষ্পাঠী ও মাদ্রাসা (তখন অনেক পরিবার উত্তরপ্রদেশ

এবং বিহারে আরবী ফার্সী শিখতেন) এবং পরে আর্যসমাজী স্কুলের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে একেবারে শেষ দিকে তিনি সিংহলে যাবার পর পালি শিক্ষণ এবং পরিশেষে তিব্বতী ভাষা আয়ত্ত করেন। একই সঙ্গে যুক্ত হয় তাঁর চীনা ভাষা শিক্ষা এবং ইয়োরোপীয় ভাষার মধ্যে ইংরাজীর অতিরিক্ত ফরাসী জর্মন ও রুশ ভাষার শিক্ষা এবং তার প্রায়োগিক ব্যবহার। শুনেছি, রুশ পত্নীসহ তিনি ফরাসীতেই কথা কইতেন। তৎকালে সমগ্র ইয়োরোপের মতো রুশ দেশেও ফরাসী সংস্কৃতি, ফরাসী রীতির সৌধ নির্মাণ এবং জর্মন দেশের মিলিটরী শিক্ষাও প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। এসবের মধ্য দিয়ে ধ্রুবপদ হিসাবে তাঁর পক্ষে প্রধানতম শিক্ষার কেন্দ্র রূপে বৌদ্ধধর্ম দর্শনগত সাহিত্যকেই আমরা মনে করতে পারতাম। কিন্তু সেদিকে তিনি অনেক কাজ করলেও সেটাকেই আচার্য শ্চেরবাৎস্কই, আচার্য লা ভ্যালি পুসাঁ, আচার্য প্রবোধ বাগচী বা আচার্য নলিনাক্ষ দত্ত মহাশয়দের মতো প্রধান মনে করেননি। অধ্যাপক তুচ্চি সহ এঁদের সকলের সঙ্গে তাঁর ভাবগত যোগাযোগ ছিল। তবুও কোনো অজ্ঞাত কারণে তাঁকে তথাকথিত এই স্কলর জগৎ গ্রহণ করেনি ; সম্ভবত, প্রচলিত আকাডেমিক স্কুলিংকে তিনি গ্রাহ্য না করাই এর কারণ। কিছুটা ইয়োরোপীয় স্কলরশিপের যে তীক্ষ্ণতা সেটা এখানে পাওয়া যায় না, এও সত্য। বৌদ্ধ ন্যায়গ্রন্থগুলির অবয়ব বিচার করলেও এবং ট্রাডিশনল ন্যায় সহ এগুলির খণ্ডন-মণ্ডনরীতি তাঁর চক্ষু না এড়ালেও মন তৃপ্তিলাভ করে না। আবার অপর দিকে গাঙ্গোপনিষদ বেদ অধ্যয়ন করে, বলা যায় সেই সমুদ্র মন্থন করে, তিনি তৎকালীন ইতিহাস-কল্পনাশ্রিত উপন্যাসাদিও লিখেছেন। তাহা বহু-পঠিতও বটে। তবু মনে হয়, এগুলি (ভোলগা সে গঙ্গা) চমকপ্রদ হলেও খুব বিশ্বসনীয় নয়। বিশ্বসনীয় করে তোলাও প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। সেজন্য রাহুলজী সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য থেকেই যায়, সশ্রদ্ধ বিস্ময় সহ তাঁকে দেখা সত্ত্বেও। তিনি এত অজস্র লিখেছেন যে, ঠিক প্রতি লেখাতে ভারসাম্য (balance) বজায় থাকে না, প্রতিটি লেখার ক্ষেত্রে সুবিচার হয় না। অসাধারণ মনীষা ও অসামান্য মেধা তাঁকে মাঝে মাঝে কিছু আশ্চর্যতম কল্পনা বা হাইপথেসিসের ধারক করেছে, কিন্তু তার প্রায়োগিক বাহক তিনি হতে পারেননি। প্রশ্ন থাকে — সেটা কি তাঁর বৈজ্ঞানিক মনস্কতার স্খলন? এ প্রশ্নোত্তরও অমীমাংসিত থেকে যায়। এই বহুশ্রুতত্ব-র সঙ্গে যুক্ত ছিল ভারতীয় রাজনীতি, যা তাঁকে কিছু দূর আকৃষ্ট করত মাত্র।

৪

আমার নিজের কাছে রাহুলজীর সর্বপ্রধান কৃতিরূপে মনে হয়েছে তাঁর দর্শন-দিগদর্শন গ্রন্থটি রচনা। এটাই একটা মানুষের সমগ্র জীবনের ফসল বলা যেতে পারত, যদি এই গ্রন্থকে আরও details-এ নিয়ে যাওয়া যেত। এই গ্রন্থেও পূর্বোক্ত কল্পনার চমক বা আশ্চর্য কিছু Hypothesis-ও উপলব্ধ হবে। এরূপ Hypothesis আমরা আচার্য সুনীতিকুমারের নানা গ্রন্থে (যেমন Balltoslav, Kirat Janakrti, Middle Indo-Aryan And Hindi প্রভৃতি গ্রন্থে লক্ষ্য করেছি।) কিন্তু, সেগুলি মানানসই লাগে এবং মনে হয় মাঝের প্রায়বিস্মৃত শৃঙ্খলা-শৃঙ্খলগুলিও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু দর্শন-দিগদর্শনে যখন দেখি পিথাগোরাস ও প্লেটোর দর্শনের যোগাযোগ, অথবা ধর্ম-কীর্তির ন্যায়গ্রন্থেই আমরা Dichotomy-র মাধ্যমে Thesis-Antithesis-synthesis পাই এবং সেটাই ক্রমান্বয়ে Dialectics-এ পরিণত হয়েছে ইয়োরোপীয় দর্শনে, সেটা আমাদের কাছে সহজে গ্রহণযোগ্য হয় না। বরঞ্চ যুক্তিগ্রাহ্য নিয়মে এটাই মনে হয় যে স্ব স্ব দেশেও বুদ্ধি ও যুক্তির নিয়মে Dialus বিকশিত হওয়া সম্ভব। এবং মানুষের দ্বারাই অন্য স্থানের ভ্রমণশীল মানুষে মানুষে তা সংবাহিত হতে পারে। দমনক-করটক কথা সীরিয়াস ভাষাতেও অনূদিত হয়েছিল—বার্লাম ও যোসাযোটের কাহিনী বৌদ্ধ জাতক-কথার আশ্রিত। আলবিরুণী বহু ভারতীয় দর্শনাদির আলোচনা ও শিক্ষা গ্রহণ করেন মূলতানী ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে। গ্রীক আলেকজাণ্ডারের সময় থেকে সুফী মনসুর পর্যন্ত (অন অল হক বা সোৎহং-এর উদ্গাতা হিসাবে মৃত্যুবরণ করেন)। তিব্বত-চীন-ভারত, আরব-পারস্য এবং আবারও সে সব দেশ থেকে নবজাগৃতির পথ ধরে শিল্প বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্যের পুনর্নবায়ন হয় ইয়োরোপে। ইয়োরোপের ইতিহাসে কলম্বাসের দেশ আবিষ্কার নানা চিন্তা বিস্তারেরও একটা কারণ হয়ে ওঠে। তার প্রভাব পড়ে ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান—দর্শনের উপর। সেটাই আবার নবরূপে Scientific learning-এর রূপ ধারণ করে ভারতে ইংরাজ রাজত্বকালে পুনর্দৃশ্যমান হয়। এই দীর্ঘ পটভূমিতে ভারতীয় দর্শন মিশ্রিত সুফী দর্শন নূতনরূপ নিয়েছে। গ্রীক আলেকজাণ্ডারের সময় আরিস্টটলের দর্শনের থেকে বৈশেষিক দর্শন ও ভারতীয় Atomism অনুসৃত বলে রাহুলজী বলেন। তাঁর মতে ঔলূক্য দর্শন কথাটি উলূক থেকে আসে এবং উলূক বা পেচক হলো আথেন্সের প্রতীক চিহ্ন। এগুলি আমরা

যুক্তি দিয়ে মানতে ততটা প্রস্তুত হতে পারি না। কারণ, বহু দীর্ঘকাল ধরে ভারতীয় দর্শন, বাস্তুশিল্প-বিজ্ঞান গণিতশাস্ত্র এগুলি ইউনানী দর্শনে গৃহীত হয়েছিল। ইউনানী দর্শনের মাধ্যমে তা ইয়োরোপে গিয়েছিল। কিন্তু তা হলেও আমরা মনে করতে পারি না বৌদ্ধ দুঃখবাদই শোপেনহাওয়ার অথবা ফ্রয়েডকে অনুপ্রাণিত করে। বরঞ্চ দারাশিকোহ-কৃত উপনিষদের অনুবাদ থেকে ইয়োরোপে ডয়সন প্রভৃতির উপনিষদ চর্চা এগিয়ে চলে, এমন মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। cypyc যে কুরু এ কথার Linguistic evidence আছে। কিন্তু রাহুলজী দর্শন-দিগদর্শনে Linguistic Evidence-এর দিকে যাননি। তাঁর ক্রান্তদর্শী দৃষ্টিতে যেমনটি মনে হয়েছে তিনি সেইভাবে তাঁর এই বিশাল গ্রন্থখানি শুরু ও শেষ করেছেন বলা যায়।

৫.

এই গ্রন্থখানি প্রধানত চারটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আছে গ্রীক— এর মধ্যে বর্ণিত হয়েছে অনেকগুলি স্কুলের বিবরণ। বহু ক্ষেত্রে এগুলি সম্পর্কে খুব অল্প কিছু বলার ফলে আলোচ্য দার্শনিকের প্রতি সুবিচার হয়নি, যেমনটি ঘটেছে সক্রেটিস অথবা প্লেটোর ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় ভাগে আছে সুবিশাল ইউনানী দর্শন। কিন্তু তার সঙ্গে শেষের দিকে যুক্ত হয়ে গিয়েছে St. Augustine-ও। অথচ যুগবিভাগের দিক থেকে তা হয় না এবং রাহুলজীর এ গ্রন্থে যুগবিভাগ অনেকাংশে কোথাও ব্যাপ্য ও ব্যাপকতায় অসিদ্ধ বলে মনে হয়েছে। তৃতীয় ভাগে এসেছে ইয়োরোপীয় দর্শন এবং সর্বশেষে এসেছে ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধদর্শন সহ ভারতীয় দর্শন। স্বাভাবিক যুগবিভাগ করলে প্রতিক্ষেত্রে এই চারটির অন্তত কিছুটা অংশ পাওয়া যেত। তা তিনি করেননি বলে অনেক ক্ষেত্রে সাল-তারিখ overlapping না হয়ে পারেনি। এ গ্রন্থ পড়তে গিয়ে কেবল এই কারণেই কয়েকটি গ্রন্থের নাম মনে পড়েছে। একটি হলো H. G. Wells-এর Outline of History, অন্যটি হলো Prof S.N. Dasgupta মহাশয়ের ছয় খণ্ডে লেখা (Mrs. Surama Dasgupta সম্পাদিত) History of Indian Philosophy ও Prof. Couze-র লেখা Buddhism এবং সর্বশেষ উল্লেখ্য গ্রন্থটি হলো মনীষী J. D. Barnal-এর Science in History-র চারখণ্ড।

প্রথম তিনটি গ্রন্থ রাহুলজীর সময়ে উপলব্ধ ছিল। শেষেরটি এক আশ্চর্য

বই এবং মানসিক সকল প্রয়াস তৃপ্ত করে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার সহ সংশ্লিষ্ট দর্শন সাহিত্য মানবিকীবিদ্যা তথা শিল্প-সংস্কৃতির আশ্চর্য উপস্থাপনার জন্য এই গ্রন্থখানি এ যুগের একটা দলিলও বটে। বার্ণালের পক্ষেই এই গ্রন্থ লেখা সঙ্গত ও সম্ভব, কারণ তিনি স্বরূপত ভৌতবিজ্ঞানী ও গাণিতিক। বর্তমান জগতের ভবিষ্যৎ ভাষার সম্ভাব্য রূপও গণিত বলে মনে করি। কাজেই তাঁর বইয়ের সঙ্গে তুলনা না করাই ভালো। Couze-র গ্রন্থে Buddhism-এর আদ্যন্ত ইতিহাস ২৫০০ বর্ষ ধরে দশকে দশকে শতকে শতকে বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে দেওয়া আছে। এ গ্রন্থও এক সুবিন্যস্ত ধারায় মনকে সুস্নাত করে এবং তৃপ্তি দেয়। শ্রীমদাচার্য দাশগুপ্ত মহাশয় সমসাময়িক দর্শনগুলির উত্থান-পতন ও পরিবর্তনসিদ্ধতা যথাসম্ভব সন-তারিখ সহ উল্লেখ করে দর্শন-জগতের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। জানি না, এগুলি সবই ইয়োরোপীয় ইতিহাস ধারা ও বিজ্ঞানমনস্কতার লক্ষণ কিনা। এদিক দিয়ে দর্শন-দিগদর্শন আমাদের কিছু পরিমাণে হতাশ করে। আরও একটা কথা, রাহুলজীর গ্রন্থখানির মধ্যে অসাধারণ অসামান্য উপাদান পাওয়া যায় ঠিকই। তথাপি, এক প্রকার প্রকীর্ণ আকর গ্রন্থ হিসাবেই এ গ্রন্থ আদরণীয় হয়ে আছে। কিন্তু এসকল উপাদান যে-গুণগত তীক্ষ্ণ মনীষার ছুরিকা সঞ্চালনে কর্তিত ও গঠিত হতে পারত তা হয়নি। এর কিছুটা কারণ হতে পারে ভাষাগত সমস্যা। ভারতীয় ভাষা, যথা হিন্দী ভাষা এখনও পর্যন্ত দর্শনের মতো বিষয়বস্তু প্রকাশের যোগ্য বাহন হয়ে উঠতে পারেনি। হীনমন্যতা না রেখেও বলা যায়, একটি লাইন ইংরাজী ভাষার ভাব বাংলায় প্রকাশ করতে অন্তত তিন লাইন লাগে এবং সেটা হিন্দীতে প্রকাশ করতে গেলে প্রায় নয় দশ লাইন লাগার কথা। আমার কথার সম্ভাব্যতা পাঠক যাচাই করে দেখবেন এবং আমার ভ্রান্তি হলে তা যেন ক্ষমার চোখে দেখেন। রাহুলজীর পরিশীলিত সংস্কৃতানুগ হিন্দী ভাষাতেও সেই Economy তখনও বা এখনও হিন্দীতে আসেনি। এটাও একটা কারণ হতে পারে। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন মনে করি, এ গ্রন্থ যদি শুদ্ধ সংস্কৃতে লেখা হতো তবে সেই সংস্কৃত ভাষার পিনদ্ধ রূপের এবং সংক্ষিপ্ত ভাষণের কারণেই এ গ্রন্থ সুমার্জিত হয়ে উঠত, এতে সন্দেহ নেই। তবে তা হতো দুরবগাহ্য। রাহুলজীর দেশপ্রেমের তথা ভাষাপ্রেমের একবিশদ উদাহরণ হিসাবেই আমরা এ গ্রন্থ অনুধাবন করতে পারি। তা না হলে কুরান যিনি সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেছেন, তাঁর পক্ষে এ কার্য অসাধ্য ছিল না।

ইতিহাস-ব্যাখ্যান ও উপস্থাপনার কথা বাদ দিলে এ গ্রন্থের প্রথম ও তৃতীয় ভাগটি, অর্থাৎ গ্রীক এবং ইয়োরোপীয় দর্শন অংশটি তিনি উপলব্ধ গ্রন্থাদির সাহায্যেই লিখেছেন। তাতে মনে হতে পারে—হেলেনিস্টিক মানবিক দৃষ্টি, বস্তুবাদী যুক্তি এবং সামগ্রিক তথা নান্দনিক দৃষ্টির সচলতা তাঁর চিন্তায় সন্যস্ত হয়নি। তেমনই তিনি চীনা জাপানী ধর্মদর্শনও বিশেষ আলোচনা করেননি। তা নাহলে তা ও তে কিং ও উপনিষদ-এর মধ্যে সাদৃশ্য আছে। দ্বিতীয় খণ্ড ইউনানী দর্শন তাঁর অগাধ পরিশ্রমের ফল বলা যেতে পারে। সাধারণ্যে অপরিচিত বলে এই অংশ পাঠ করে আগ্রহী পাঠক স্ব স্ব বিষয়ে উপকৃত হবেন। কিন্তু রাহুলজীর প্রকৃতিগত চিত্তস্ফুরণ ঘটেছে চতুর্থ খণ্ডে। এখানে তিনি বেদ-বেদান্ত-ব্রাহ্মণ্য দর্শন, চার্বাক বৌদ্ধ জৈন দর্শনাদির বিচার বিশ্লেষণে ত্রুটি রাখেননি। তাঁর সাল তারিখ সব সময়ে আধুনিক পণ্ডিতদের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু এও তো সত্য, আত্মবিস্মৃত ভারতীয় দার্শনিক বা লেখকেরা ইতিহাস-পথিক ছিলেন না। সুতরাং রাহুলজী যখন তাঁর সন-তারিখ সহ একটা বিশুদ্ধি বা Consistency রক্ষা করেছেন সেটিও একটি বিশিষ্ট দান বলে আমরা স্বীকার করে নিতে পারি। ভারতীয় চিন্তার ইতিহাসে রাহুলজীর এই সামগ্রিক অবদান তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে : তাঁর বৌদ্ধ দর্শনের ক্ষেত্রে—সিংহল-ভারত-তিব্বত মিশিয়ে যে সুমহৎ কৃতিত্ব—ব্যক্তিগত ভাবে তার সঙ্গে আমি তুলনা অন্য কিছুর করিনা—কিন্তু সেটা নিতান্ত ব্যক্তিগত মত। তাঁর দর্শন-দিগদর্শনেও এই বৌদ্ধদর্শনাংশ সুলিখিত।

৬

পরিশেষে এই প্রবন্ধ শেষ করার আগে বলা প্রয়োজন, আমার ক্ষুদ্র সাধ্যে এই বৃহৎ মনীষীকে আমি বুঝবার চেষ্টা করি মাত্র। তাতে সফলতা প্রাপ্তি ঘটে নি। আমার প্রার্থনা, আমার এই প্রয়াসকে পাঠকসম্প্রদায় যেন ভুল না বোঝেন। রাহুলজীকে মার্ক্সবাদী, সমাজবাদী, সাম্যবাদী, দার্শনিক, সমাজ-সংস্কারক বিশ্বপথিক, প্রব্রজিতসাধু, বৌদ্ধ-উপাসক লেখক, বহুভাষাবিদ বহু-শ্রুত—এসব বলেও তাঁর পূর্ণ বিবরণ দেওয়া যায় না। তিনি একজন জীবনবাদী মানুষ এবং সম্পূর্ণ আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদী-গৃহস্থও বটে। সর্বোপরি তাঁকে কিছুটা আধুনিক কিছুটা প্রাগাধুনিক, কিছুটা স্টোইক অথচ কিছুটা সুখবাদী চার্বাক পন্থীও বলা যায়। এছাড়া তাঁর বিশাল দেহ ও বিরাট চিত্ত নিয়ে সমগ্র বিশ্বের চারণপথিক আর দ্রষ্টামানব হিসাবে তিনি ভারতের অগ্রণী ও নমস্য এক ব্যক্তিত্ব বলেই স্বীকৃত হবেন।

ইজ্জত

ভগীরথ মিশ্র

এক

মেয়ে হুটোকে দেখেই বাবলি নাক সিঁটকায়। কাঁধ ঝাঁকায়। বলে, হ্যাখো দিকি, একেবারে পাশটিতে এসে বসল। চল, উঠে যাই। অন্য কোথাও বসি। আমাদের সামনে উত্তাল সমুদ্র। এখন জোয়ার চলছে। হাওয়া বইছে শনশন। পেছনের ঝাউবনে হাওয়াদের একঘেঁয়ে সুর। সী-বীচ থৈ-থৈ করছে মানুষে। জমজমাট। বেলাভূমি এবং ঝাউবনের মধ্যবর্তী লম্বা বাঁধ। তাতে মার্কারি আলোর সংখ্যা অনেক। কিন্তু তবুও তা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। ঝাউবন এবং বেলাভূমির একটা বড় অংশে আলো-আঁধারি ভাব। সেই আধো-অন্ধকার এলাকা থেকে কে একজন গেয়ে উঠল, এই হাওয়া—হাওয়া—।

আমি ওর নাম দিয়েছিলাম মোহিনী। পরে জানলাম, বাব্‌লি। পরে মানে, গতকালই। হুটোই ভাল নাম। এমন মেয়ের উপযুক্ত। বেশ মাদকতা আনে। ইংলিশ-মিডিয়ামে পড়া মেয়ে। শব্দটার মানে বোঝে না। বলে, মাদকতা মানে কি? আমি বাংলা-ইংরেজি মিশিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করি। সরল রেখায় হেসে বলে, বুঝেছি। সেক্স-আর্জ। আমি হাঁ-হাঁ করে উঠি। কি কথার কি মানে! মাদকতা হল, প্রেম পর্বের শব্দ। সেক্স-চ্যাপ্টার তার অনেক পরে। আমার ঘাড়ে ফাঁপানো চুলের ঢাল নামিয়ে দিয়ে বলে, বুঝেছি বাবা, বুঝেছি। গা কেমন সিরসির করে। রাইট? আই-টি অফিসারের একমাত্র মেয়ে ও। আমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। কারণ, পরে জেনেছি, ও মেয়ে ভীষণ স্ট্যাটাস কনসাস। কিন্তু তাও হল। হুটো কারণে। এক, আমি ওর একজন খুব ফেভ্‌রিট মাসতুতো দাদার সঙ্গে ফুটবল খেলি কোলকাতার এক শেষের সারির এ-ডিভিশন ক্লাবে। হুই, আমাকে অনেকেই খুব হ্যাণ্ডসাম বলে থাকে। কিং, আমার এক অতি খচ্চর বন্ধু, কোনো কথাই আটকায় না যার মুখে, নিজের বাপ-মাকে নিয়েও খচরামি-রসিকতা করে, মাঝে মাঝেই বলে আমাকে, কেরানী বাপের

ওরসে তো অমন রাজপুত্তুর বেরোবে না, তোর ব্যাপারখানা কি বল্ তো? মোহিনী আজ পরেছে গাঢ় কমলা রঙের সালোয়ার কামিজ। বুকে চুমকি বসানো ওড়না। গলায়, কানে বাহারী শাঁখের গয়না, উড়ু উড়ু মায়াবী চুল, ঘাড় অবধি ছাঁটা। গতকাল পরেছিল এমন এক রঙের মিডি, সে রঙ আমি চিনিনে। বিকেল গড়িয়ে এলে সমুদ্রটা রঙ বদল করে। গভীর ধূপছায়া রঙে অস্তগামী সূর্যের লালচে রোদ্দুর পড়ে এক আশ্চর্য অচেনা রঙ। ঠিক তেমনি রঙের মিডি পরে সী-বীচে একা একা ঘুরছিল বাবলি, গতকাল পড়ন্ত বিকেলে। ওর মাসতুতো ভাই কানন ছিল একটু তফাতে।

কাননের খুব ম্যান্‌লী চেহারা। কিন্তু নামটা শুনে মেয়েরা নাক সিঁটকায়। বলে, ফেমিনাইন ফ্লেভার আছে। নামটা মুখে মুখে বদলে নিয়ে, এখন ক্যানন। শুনতে ম্যান্‌লী তো বটেই, তার ওপর, ক্যানন নিজেই বলে, এ কামান থেকে যে গোলা ছোটে তার স্পীড জানিস? মাসতুতো বোনের সামনেই বলে। বাবলি হি-হি হাসে। আমি তো প্রথমে ভেবেছিলাম, মেয়েটা ক্যাননেরই মাল-কট। এমন হাতের মধ্যে হাত গলিয়ে হাঁটছিল!

দীঘার সমুদ্রে এবারে সুন্দরীদের উপস্থিতি নিতান্তই নগণ্য। পরন্তু অমরাবতী লেক-এ কিংবা সমুদ্রের ধারে সুসজ্জিতা যাদের বেজায় সুন্দরী মনে হচ্ছিল, তাদের বারো আনা খোলসই খুলে গেল সমুদ্রে চানের সময় কিংবা আরো পরে। মুখ থেকে গাঢ় প্রসাধনের প্রলেপ উঠে যেতেই একেবারে আটপৌরে। নোনাজল, নোনাবালি এভাবেই ক্ষইয়ে দিল তাদের মায়াবী খোলস, বারোআনা। বাকি চার আনা, পরে পরে, হোটেলের টেবিলে, পানের দোকানে···। একটি তো সী-বীচে আলু-কাবলির ঝালে হুশ-হাশ করতে করতে এমনই বিশাল হাঁ করল যে, তার দাঁতের কালচে মাড়ি আর গোপন রইল না। যারা কোলকাতার পার্লারে চুল বানিয়ে এসেছিল, প্রথম দিনের সমুদ্র স্নানেই তা লণ্ডভণ্ড। স্প্রে করা ঝিকিমিকি চুল নোনা জলের ঝাপটায় লাটঘাট। শরীরের মায়াবী ত্বকে নোনা জলের দংশন। মুখের ব্রণরাজি প্রকট। কোলকাতাবাসিনী ফরসা মেয়েগুলো কেমন তামাটে, অমসৃণ। একটি মেয়েকে খুব ধরেছিল মনে। খুব এক আশ্চর্য রূপ ছিল শরীরে। চোখ দুটিতে ছিল ভীষণ মায়াবীপনা। শরীর থেকে এক অচেনা সৌরভ বেরোচ্ছিল সারাক্ষণ। ক'দিন ওকেই অনুসরণ করে কাটিয়ে দিলাম। সকাল থেকে সন্ধ্যে। আমার অনুসরণ খুবই শিল্পসম্মত। যাকে অনুসরণ করছি, সে

বুঝতেই পারবে না যে তার আশে পাশে ঘুর ঘুর করছে এক ভোমরা। সেই মেয়েকে দেখলাম, হোটেলে, বাড়তি ঝোলের জন্য ঝগড়া বাধিয়েছে হোটেল-বয়ের সঙ্গে। ঠোঁট উলটিয়ে, ভুরু বেঁকিয়ে, চেরা গলায় সে তার বাড়তি ঝোলের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। বাড়তি ভাত মাখানোর জন্য ইলিশের বাড়তি ঝোল তাকে দিতেই হবে। সেই থেকে খুব মনমরা হয়ে ছিলাম। পরের সকালটাও তিক্ত, বিবর্ণ। বিকেলে দেখা হল বাবলির সঙ্গে, আমি তৎক্ষণাৎ যার নামকরণ করলাম, মোহিনী।

আড়ষ্টতা কিঞ্চিৎ কাটবার পর, আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল, কোথায় ছিলে তুমি এ' কদিন? কেন এখানেই তো ছিলুম। বাবলির ঠোঁটে চাপা হাসি। নো, নো, নেভার···, তুমি থাকবে, আর হাজার জনের মধ্যেও তোমাকে আলাদা করে নজরে পড়বে না, এ অসম্ভব। এমন সরল রেখায় চাটুকারীতে গ্রাম্য-বালাদের মন ভোলে হয়ত বা। বাবলির মত মেয়েরা চোখের সামনে একটি বোকা-বুদ্ধুকে আবিষ্কার করে মজা পায়। একটা হ্যাণ্ডসাম যুবকের স্তুতিতে একটি উনিশ বছরের তন্বীর শরীর যেমন, বাবলির ভাষায় সিরসির করে ওঠে, তেমনটা হয় না এমন ব্লাণ্ট বাক্যবন্ধে। বাবলি হেসে বলে, দুষ্টুমী করছিলুম। আমি এসেছি মাত্তর আজই সকালে।

তাই বল—, আমার কনফিডেন্স ঋজু হয়, তুমি ঘুরে বেড়াবে একদিন, দু' দিন, তিনদিন, আর আমি দেখতে পাব না, তাই কি হয়?

অল্প দূরে সমুদ্রের বুকে আলো-আঁধার। সামান্য তফাতে, পাশাপাশি একজোড়া পাথরে বসেছে মেয়ে দুটো। আমি বলি, এই মেয়ে দুটোর ওপর অত রাগ হচ্ছে কেন তোমার?

মেয়ে দুটো রোগা, সিড়িঙ্গে। শ্যামলা রঙ। বড় একটা ছিরি-ছাঁদ নেই। মুখে গাঢ় প্রসাধন, তবে খুবই আনাড়ী হাতের কাজ। কপালে প্রজাপতি টিপ। পরনে ঝিলমিলে সস্তা সিনথেটিক শাড়ী।

বাবলি বলে, এই মেয়েগুলো ভাল নয়।

—কি করে বুঝলে?

—মেয়েরা বুঝতে পারে।

—ওরা কিসে খারাপ?

বাবলি এক মুহূর্ত ইতস্তত করে। বলে, এরা ছেলে-শিকারে বেরিয়েছে।

—যাহ্। যত সব কষ্ট-কল্পনা। স্থানীয় গরিব ঘরের মেয়ে সব। ঘর-গৃহস্থালি সেরে একটুখানি জিরোতে এসেছে সমুদ্রের ধারে।

—তোমার মুণ্ডু! ওদের চোখে খই ফুটছে।

আমার চোখে গাঢ় অবিশ্বাস দেখে বাবলি বলে, বিশ্বেস কর, এই জায়গা-গুলো খুব খারাপ হয়ে গেছে। এইসব নুলিয়া, জেলেগুলো পচিয়ে দিচ্ছে আরো। কোলকাতা থেকে পয়সাওয়ালা ফুর্তিবাজ ছেলেরা আসে। এরা ঘরের বউ-ঝিদের লেলিয়ে দেয়। মওকা বুঝে মোটা টাকা হাতিয়ে নেয়।

—তাও কখনো হয়? গরীব বলে এদের ইজ্জত নেই? নিজের বউ-মেয়েকে লেলিয়ে দেবে পরপুরুষের দিকে?

—যা বোঝ না, তা নিয়ে তক্কো করো না। বাবলির গলায় উষ্মা, এদের মধ্যে এসব ইজ্জত-ফিজ্জতের বালাই নেই। ত্যাখ না, চাষের জমিতে কেমন হাঁটু অবধি কাপড় তুলে কাজ করে পুরুষদের মধ্যে। এক-হাট লোকের সামনে কেমন বুক খুলে দুধ খাওয়ায় বাচ্চাকে। কেমন, রাস্তার ধারে পুকুর ঘাটে সর্বাঙ্গ উদোম করে গা' ধোয়। রাঙাকাকু বলে, সতীত্ব-টতীত্ব বা ঐ জাতীয় ডেলিকেট ফিলিংগুলো নেই এদের মধ্যে। যাকে তাকে যখন তখন দেহদান করাটা এইসব গরীব ছোটজাতের মেয়েদের কাছে ডাল-ভাত।

—এ সব বলে নাকি তোমার রাঙাকাকু? তোমার সঙ্গে ওর এই সব ডিসকাশন চলে নাকি?

—আমাকে কেন বলবে? বাবলি বেজায় বিরক্ত,—ড্রয়িংরুমে নিজেদের আড্ডায় বলে। আমি শুনেছি। চল, আমরা ঐ—ওদিকটায় গিয়ে বসি।

তফাতে সরে গিয়েও অন্য ঝঞ্ঝাট। একটা মেয়ে পাশের দোকানে ঝুঁকে পড়ে শাঁখের গয়না দর করছে। বাবলি বলে, জ্বালালো!

—কি হল আবার?

বাবলি আঙুল তুলে দেখায় মেয়েটিকে। বলে, আমাদের হাউসিং এস্টেটেই থাকে। ওর বাবা কাজ করে বাপীর চেয়ে অনেক নীচু পোস্টে। দেখতে পেলেই ছুটে আসবে ভাব জমাতে। বড় ছোঁক ছোঁক স্বভাব এই নীচু পোস্টে কাজ করা মানুষের ছেলেপিলেগুলোর।

কথাগুলো আমার বুকে সরাসরি বাজে। আমি কেরানী বাপের কেরানী পুত্র। খেলোয়াড় কোটায় চাকরি পেয়েছি। চাকরি করি নামমাত্র।

ফুটবল খেলি বেশির ভাগ সময়। একটুখানি উড়নচণ্ডী স্বভাব আমার। বছরে দু'বার সমুদ্র দেখতে আসি। এই সমুদ্রটাই সবচেয়ে সস্তা।

এমন আভিজাত্য-সচেতন মেয়ে যে খোঁজ খবর না নিয়ে আমার সঙ্গে এমন মিশছে কেন, ভেবে পাই নে। নিজের পরিচয়পত্রটি দাখিল করলে কি দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে, মনে মনে কল্পনা করি। দেব না কি হাটে হাঁড়িখানা ভেঙে! সামলে নিলাম। ওতে সরাসরি খোঁচা দেওয়া হবে। কোনও সুন্দরীকে এমন ব্রুট্যালী খোঁচা মারা উচিত নয়। কোমরের তলাতে আঘাত করা কোনও স্পোর্টস্ম্যানেরই সাজে না। তাছাড়া, আমার ভয় আছে, যদি আমার স্ট্যাটাসহীনতায় আহত হয়ে, ও আমাকে এই মুহূর্তেই পরিত্যাগ করে! আমি যে বাবলির মোহিনী-রূপে এই মুহূর্তে হাবুডুবু খাচ্ছি।

রূপ একটা, সত্যি কথা বলতে কি, অসীম রহস্য আমার কাছে। তার উৎস ব্যাখ্যা করা কঠিন। শ্যামলা মেয়ে বিদিশা, আমার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ত কলেজে, একটু রোগার ওপর গড়ন, আলাদাভাবে চোখ, নাক, ঠোঁট, চিবুক অনন্য নয়। কিন্তু সব মিলিয়ে এবং তার সঙ্গে কণ্ঠস্বর, গ্রীবাভঙ্গি, দৃষ্টিনিক্ষেপ, ইত্যাদি সহ সকলের মধ্যে থেকেও আলাদা করে নজর কাড়ত। বিদিশা,—আমার মনে হয়, ঐ নামখানিও ওর রূপকে ফোটাতে সাহায্য করেছিল। সে ছিল এক আটপৌরে স্নিগ্ধরূপ আর বাবলির হল, মোহিনীরূপ, —যাদুকরী। সর্বদা সমুদ্রের মত রহস্য হয়ে টানে। কিন্তু দূর সৈকতে বসে তার তরঙ্গ-ভঙ্গিমা দেখতে দেখতে শুধু পলকহীন বিস্ময়ে কেঁপে কেঁপে ওঠা। জলে নেমে ডুব দিতে ভয়।

এতখানি দীর্ঘ সৈকত, নানান রঙের নারী-পুরুষের ভীড়, তার মধ্যে বাবলি একেবারেই স্বতন্ত্র। তার রূপ সমুদ্রের জলে যেন ধুয়ে যাওয়ার নয়। চাঁদের চারপাশে যেমন উজ্জ্বল জ্যোতির বলয় দেখি, বাবলির চারপাশেও তেমনি এক মায়াবী দ্যুতি। সে হেঁটে চলেছে, হাসছে, ঠোঁট নাড়িয়ে কথা বলছে, সমুদ্রকে দেখছে, সবই আলাদা আলাদাভাবে এক একটি শিল্পকর্ম আমার চোখে। হাজার মেয়ের মধ্যেও চোখ দুটি আটকে যায় ওর ওপর। চোখে সমুদ্রের ছায়া, হাসলে অহংকারী টোল পড়ে গালে। সে বারবার ঘাড় বেঁকিয়ে শাসন করে চুলের ঢাল।

এ মেয়ে নিশ্চিতভাবেই আমাদের চৌহদ্দির একেবারে বাইরের বাসিন্দা।

দুই

বাবলি এসেছে ওর মা-বাবার সঙ্গে। মাসতুতো ভাই ক্যাননও এসেছে ওদের সঙ্গেই। বোনের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার জন্য কেই বা আসে সমুদ্রের ধারে, ক্যানন জুটিয়ে নিয়েছে এক জলপরীকে সমুদ্রে চান করবার সময়। ওকে নিয়েই বেড়াচ্ছে সে। বাবলির মা-বাবা একটু রিল্যাক্স করতে এসেছেন। হোটেলের ব্যালকনিতে বিয়ার আর আইসকিউবের ট্রে নিয়ে বসে থাকেন ওঁরা। বাবলি একা একা ঘুরছিল। আমার মতো একটি হ্যাণ্ডসাম ছেলেকে পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। এ সব অবশ্য আমার অনুমান। আমার এ-ও অনুমান, বাবলি আমার সামাজিক অবস্থানের খোঁজ পেয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। শুধুমাত্র নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সে হজম করছে ব্যাপারটা, যতক্ষণ দ্বিতীয় একজনকে খুঁজে না পাচ্ছে।

সমুদ্রের কাছে এলেও, সমুদ্রে চান আমি করিনে। ঐ যে বললাম, সমুদ্রকে দূর থেকে দেখে রোমাঞ্চিত হই কেবল, জলে নামতে সাহসে কুলোয় না। সাহসে কুলোলেও, ইচ্ছে করে না। আমি সে সময়টা উঁচু বাঁধের ওপর ঝাউবনের ছায়ায় বসে বসে বই পড়ি কিংবা সমুদ্র দেখি।

এখন, সকাল দশটা সাড়ে-দশটা নাগাদ, সমুদ্রের তীর-জলে শয়ে শয়ে বহুবর্ণ বেলুন, চান করতে নেমেছে সুন্দরী তন্বীর দল। ছেলেদের সঙ্গে কিংবা একা একা। শাড়ি পরা মেয়েরা গাছ-কোমর বেঁধেছে। সালোয়ার পরারা ওড়না বেঁধে নিয়েছে আড়াআড়ি। সুইমিং কস্টিউম পরে নেমেছে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা, বাবলির ভাষায় যারা 'হাই-আপ্স্'। ঢেউয়ের সঙ্গে লুটোপুটি খাচ্ছে ঐ সব বহুবর্ণ বেলুনগুলি। আমি দূর থেকে অলস চোখে দেখছি ঐ সমবেত স্নানপর্ব।

সহসা মূল জটলা থেকে সামান্য তফাতে একটা মৃদু সোরগোল, একটা মেয়ে তীক্ষ্ণগলায় কাঁদছে, চেঁচাচ্ছে। একটা কিছু গোলমাল ঘটেছে ওখানে। ওকে ঘিরে রয়েছে জনা দশ-বারো বিভিন্ন ধরনের মানুষ। কৌতূহলের বশে হেঁটে গেলাম ওখানে। কাছাকাছি পৌঁছেই আমার সারা শরীর জুড়ে বিদ্যুত-চমক। একদল নানা বয়েসের মানুষ ঘিরে রয়েছে যাকে, সে বাবলি। তার পরণে হাল্কা সবুজ রঙের সুইমিং কস্টিউম, তার বাইরে শাঁখের মতো মসৃণ ভেজাভেজা হাত-পা, উরু-জঙ্ঘা বাহু, অনাবৃত পিঠ···। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে বাবলি। কান্নাটা তো বটেই, কান্নার মুদ্রাটিও ভারি বেমানান ঐ শরীরে।

ঘিরে থাকা মানুষগুলোকে লক্ষ্য করি। জেলে, নুলিয়া, স্থানীয় দোকানদার, কিছু 'সাতে-পাঁচে নেই' গোছের ভদ্রলোক ট্যুরিস্ট,—এই সব নিয়ে একটা পাঁচমিশেলী জটলা বাবলির চারপাশে। বাবলির কান্না মেশানো কথাবার্তা এবং চারপাশের জমায়েতের প্রতিক্রিয়া শুনতে শুনতে ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ বোধগম্য হল আমার। মা-বাবার তো প্রশ্নই ওঠে না, ক্যাননও নিশ্চয় তার জলপরীকে নিয়ে জলক্রীড়ায় মত্ত, দূরে কোথাও, বাবলি চান করতে এসেছে একলাই। এবং তার আভিজাত্য-চেতনা তাকে সকলের সঙ্গে মুড়ি-মিছরির মতো মিশে যেতে বাধা দিয়েছিল নির্ঘাৎ। সেই কারণেই একটুখানি তফাতে একা একা চান করছিল সে। একদল গুণ্ডক জাতীয় ছোকরা দূর থেকে গন্ধ পেয়ে ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে চলে এসেছিল ওর কাছাকাছি। ঢেউ ভাঙবার ছলে ওকে ধাক্কা মেরেছে বার কয়েক। দু'একজন নাকি আরো দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিল। ফুলে ওঠা ঢেউয়ের চূড়োয় ওকে জাপটে ধরে খুবই খারাপ কিছু করেছে

বাবলি ফুঁসছে, কাঁদছে, দূরে বুক-জলে চান করতে থাকা ছোকরাগুলোর দিকে বার বার আঙুল তুলে দেখাচ্ছে। বুঝলাম, ওরাই ওই অপকর্মের নায়ক। ইদানিং এটা বেড়েছে প্রায় সব সমুদ্রের পাড়েই। চানের সময় মেয়েদের সঙ্গে অসভ্যতা করা, তাদের নানাভাবে জ্বালাতন করা। আগে চলত গোপনে। ইদানিং তরুণদের একটা অংশ খুবই দুঃসাহসী হয়েছে। এই নিয়ে ফি-মরসুমেই কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে।

একজন স্থানীয় দোকানদার খুব স্মার্টলি বলল, কিছু হয়নি। বাড়ি যান তো। ট্যুরিস্ট-প্লেসে ওরকম একটু-আধটু হয়ই।

একজন মাঝবয়েসী সৌম্য চেহারার ভদ্রলোক বললেন, চেপে যাও মা, ওরা সব লোক্যাল ছেলে, ডেঞ্জারাস!

একজন ঝাঁকড়া-চুল কবি কবি চেহারার লোক বলল, সমুদ্র তো, মিলিয়ে-মিশিয়ে দেওয়াতেই তার আনন্দ।

বাবলি অসহায় চোখে তাকায়। অপমানের মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে গিয়েছে নির্ঘাৎ, কিছু হয়নি ভেবে সমুদ্রের জলে ধুয়ে ফেলতে পারছে না কিছুতেই। সহসা কান্নাটা বেড়ে গেল ওর। ভেজা ভেজা শাঁখের মতো শরীরখানি কান্নার দমকে দুলে দুলে উঠছিল বারবার।

নুলিয়া গোছের লোকগুলি অবাক চোখে দেখছিল শরীরের ঐ দুলুনি।

খুশি-মাখানো চোখগুলো চকচক করছিল লোভে। লোকগুলো বাবলির দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসছিল নিঃশব্দে। তাই দেখে কান্নাটা সহসা আরো বেড়ে যায় বাবলির। নিষ্ফল আক্রোশে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে ঠোঁট।

সহসা বলে ওঠে, আপনাদের মা-বোনকে কেউ এমন করলে কেমন লাগত? হাসতে পারতেন এই ভাবে?

নিজের কানকেও বুঝি বিশ্বেস করতে পারছিলাম না আমি। মুহূর্তের অসতর্কতায় কাদের সঙ্গে নিজের ইজ্জতখানিকে তুলনীয় করে ফেলল বাবলি!

কবির কথাই ঠিক, সমুদ্রই মিলিয়ে দেয় বুঝি।

আজীব কহানী

রাধাপ্রসাদ ঘোষাল

পহলেবার পোয়াতি হোকে গঙ্গা সমঝেছিল আদমি ক্যায়া চিজ হ্যা।' আইবুড়ো থাকা কালে অভাব বোঝেনি তেমন। দুসরি বার গর্ভ ধরলে সে পুরোপুরি গঙ্গা মাঈ হয়ে উঠল। আর চিনল অভাবকে। আদরের প্রতি ঘেন্না ধরে গেল তার। মরদে আর নতুন সোয়াদ লাগল না। দালাল ফড়ে আর ঘরের লোকে যে আলাদা করা দায়। লেকিন উহ লেড়কি বাঁচল না। তৃতীয়বার গাভিন পেয়ে সমস্যাটা·· তাই বড় করে দেখেনি সে। রাস্তাঘাটে কুত্তাবাচ্চার মত ঘুরে ফিরে, শুঁকে খেয়ে ঠিকই ইনসান হয়ে উঠবে। এই বিশ্বাসে তার পেট বেড়ে উঠছিল হররোজ। কিন্তু খালাস দিয়ে সে বুঝল ইয়ে তো ভুল হো গয়া রে। আর তখন চোখ গেল আকাশে। আসমানে।

মায়ের জ্বালা কে সইতে পারে—তার পালান টসটসে দুধে ভরে উঠল। দুধ যিতনা ব্যথা ভী উতনা। যত ব্যথা তত তিতিক্ষা। আর এই তিতিক্ষার উল্টো পিঠে চাপ চাপ কাদার মত জমে থাকে শরীর। ঘন কালো রঙ। স্বাভাবিক গন্ধ। আর তার ভেতরে ধন্দ···এইভাবে গঙ্গা মাঈয়ার জীবন কাটছিল ভালোয় মন্দে।

আচ্ছা···গঙ্গা···ভালোয় মন্দে জীবন, জীন্দেগি মানে একপ্রকার দিন গুজরান। গঙ্গার লোক বলতে সোয়ামী ঠাকোর। আহ্ রে তার চুলায় আগুন। কিন্তু সে আগ যে কিছুতেই লাগে না। শুধু কোথা থেকে যেন আঁচ এসে লাগে শরীরে। লোকটা কিছুতেই বুঝে পায় না তার জেনানা আকাশ-পানে তাকিয়ে কি এত ছাখে। বুদ্ধুর মত চেয়ে থাকে সে। সে অর্থে সৎপাল। নি-রোজগেরে ল্যাংড়া পুরুষ মানুষটা। যে গঙ্গাকে পই পই করে বলেছিল, পেট হয়েছে বৃহৎ আচ্ছা। তো আভি খসিয়ে দে—

পেট খসা বললেই কি আর পেট খসানো—, রাতে শোবার কালে মনে থাকে না পুরুষ মরদানাদের। তার গ্লানি নয়, অপরাধবোধ নয়, তা ছাপিয়ে গঙ্গার ভেতর যা উদ্বেল হয়ে উঠত, নাম দুঃখ। এ বস্তুটি ভারি কাদার মত থকথকে। আর তাতে এসে যেন মেশে আকন্দ আঠার রস। তখন নিজে ছাড়া নিজের কোন আশ্রয় খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই রিক্ততার দুখ, এক জায়গায় স্থিত দাঁড়িয়ে থাকলে আরও বাড়ে। স্থিতি মানেই মৃত্যু···গঙ্গা তাই সেখান থেকে নির্মম ভাবে সরে আসে ধীরে। দেহ থেকে কল্পনা যাতনা আর বিলাপ বিসর্জন দিয়ে হেসে ওঠে। সেই যে অভাবের শুরু তার আর শেষ থাকে না, শুধু শুধুই নিজের সঙ্গে রসিকতা করে যাওয়া। আদৌ হয়ত কোন উপলক্ষ্য নেই। ছোট ছোট ঘটনার ভেতর থেকে খুঁজে পেতে আনে ছোট ছোট উৎসাহ। তা মিথ্যে হবার নয়। আপন শক্তিতে তাকে সত্য করে তুলতে পারলে জীবনের পটভূমিটাই বদলে যেতে পারে। গঙ্গা মাঈ সেই পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে নিজের ভূমিকা সম্পর্কে মাঝে মাঝে সন্দিহান হয়ে ওঠে।

দৌড়ে আসা দুনিয়াকে লক্ষ্য করে খেঁকিয়ে ওঠে গঙ্গা মাঈ,—যা না যা। ভাগ হিঁয়াসে। নিদ টুটলো কী খাবার মাঙলি। কিঁউ রে। অব সুব্‌হা ···ইধার উধার ঘুম কে আ, উসকা বাদ বৈঠ যা। খা—কলজা হাড্ডি য়েক করকে খা। সুশা—লা হারাম কা বাচ্চা।

এক ছুটে দমকা হাওয়া কা মাফিক ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে আসে দুনিয়া। গঙ্গার বড়া লেড়কা। উমর আন্দাজ করলে হ'বে—দশ'গারো। ঘর থেকে বাইরে এসে তাকিয়ে দেখে আসমান আর জমিনে কোন ফারাক নেই। কিচ কিচ ডাকে ছুটছে জমিন···লোকজনেরা, গাড়িঘোড়া সব। চা ফুটছে দুকান মে। কচৌড়ি, আলু কা দম, মিঠাই। তার কচি দাঁতের আড়ালে ধারালো কোন ইস্পাতে আপনা আপনি শান লাগতে থাকে। দুনিয়া তারপর ঢুঁ ঢুঁ করকে দুনিয়া ঢুঁড়তে শুরু করে দেয়।

ঝুটা রোদে হি হি করে ঝলসাতে থাকে গঙ্গা মাঈর নাকফুল কি পাত্‌থর। চিকন কালা তার গায়ের রঙ। বাহুতে লাল ডোরে বাঁধা তাবিজ-মাদুলি। হাতের চিতে উল্কি আঁকা। বেশ ভারি ঠোঁট নিম্বু কা তরফ। কব্জিতে যেখানে বালা থাকার কথা সেখানে দুটি দাগ। আর ছোটা সা বুকের বাঁধ।

সৎপাল মরা থেকে যেন হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে ওঠে, কুছ চাউল-আউল খরিদ কে লে আয়—আউর রাঁধ। ভাত রাঁধ।

প্যায়সা ক্যায়া উপর সে কোই ফিকেগা? যো ম্যায় লে আঁউ?

খর চোখে তাকায় গঙ্গা। যেন বা সাপের চোখের ভেতর দিয়ে আগুনের ফুলকি নিকালতে থাকে। ঘর ছোড়কে বেরিয়ে যায় সৎপাল। কবুদিন আরাম না পাবে। ধূপ জাগে বারিষ যায় ··তো দুখ না যায়।

গঙ্গা মাঈয়ের দুখ কা কহানি বলতে গেলে দিমাগ ঠিক থাকে না। কান্না ছাড়া আঁশু কা বাদ তার আর কোন সম্বল নেই। বড়া লেড়কা খালি একটি কথাই শিখেছে, মাঈ ভুখ লাগা। তখন গঙ্গা রোটি বানায়, রাঁধে আলু কা দৌল। বাপ ব্যাটায় হাপুস খায়। নিয়ম একটাই, তা বেঁচে থাকা। খরিদ করা খানা জোগাড় করে আনবে জেনানা। বলিহারি সংসার। এরই সহজ পথে কিংবা কখনো একটু বাঁকা চোরা পথে হাঁটতে হয় গঙ্গাকে। গোপনে—ছুপা ছুপাকে। অভাবের মধ্যেও মনে খুশি রাখতে হয় নইলে শরীর বরবাদি হো যাবে। আর জন্মের দায় কার হাতে থাকে, সে তো দেওতা কা লিখাসুখা…দিল টুটবে তবু ও না টুটবে। তাই সংগত কারণেই গঙ্গা মাঈ য়ের ছোটা লাডলা বেটা মুনিয়া, গঙ্গা কা প্যায়ারে লাল, একদিন আধো আধো গলায় বলতে শিখল, মাঈ ভুখ লাগা—।

বুকের বাঁট মুখে ঢুকিয়ে দেয় গঙ্গা… লে খা। কিন্তু কোথায় দুধ, সুখ না হোবে তো দুধ ভি না হোবে। গ্লাসে করে পানি এগিয়ে দেয় গঙ্গা মাঈ। ঢক ঢক করে গিলে ফেলে পেটটাকে ডম্বরু বানায় মুনিয়া। চিবুক, বুক, পেট, নঙ্কু বেয়ে টপটপিয়ে পানি পড়তে থাকে। তা বাদে উও পানি পিসাব হোকে বেরিয়ে যায়। তবু স্বপ্না অউর ডর মাঈর সঙ্গ ছাড়ে না, পিছা পিছা সে ঘুমতে থাকে। বিড়ির টুকরো মুখ থেকে নামিয়ে সে দূরে ছোঁড়ে…আগুন ভি মরে ফৌত হয়ে যায়।

কারখানা কা মালিক মাড়বাড়ি হ্যা'। গঙ্গা মাঈ কানকা মাকড়ি মাঙলো—তো দিয়ে দিল। মাঙলো নাকফুল—তো ভী দিলো। দিলদার আদমি বটে। ধাঙড় চেহারা…খানা পিনা অর মৌজ করনা।

এক কদম পিছিয়ে আসে গঙ্গা। খিলখিলকে হাসে। গতর লাগায়। উল্লাশ রুপিয়া…

বঢ়িয়া…ইতনা কিঁউ?

রাত মে ভিডিও দেখেগি। পিকচার—

তেরা মর্দানা কিধার?

ও তো মাল পিকে…

আয়েগা ক্যায়া?

হিঁয়া ক্যায়সে আয়েগা, কিঁউ আয়েগা…

একটা সস্তা খিস্তি করে মালিক তার লাল ডাবরা খাবরা চোখ লে কে

তাকিয়ে থাকে। যদি পুছবে মালিক কা কারেকটার এ্যায়সা কিঁউ, তো জবাব এক হি হ্যা' কি…ও তো মালিক হ্যা'—। তো বাত এরকম আছে কি ও সাচমুচ মালিক কা মাফিক নেয়ি। শুধু উসকা এক ছোটাসা আইসক্রিম কারখানা আছে। উহ মালিক কা নাম বৈজুরাম।

তবিয়ত ক্যায়সি হ্যা'…

গঙ্গা খেল খেল কে হাসে। তবিয়ত ভালো না হোবে তো ক্যায়া করনে কে লিয়ে ইধার আয়া…মুখে না বলে হাসিতে ইশারায় বোঝায় সে।

হাঁ হাঁ মালুম হো গয়া। উধার যা। টেরেন লাইন কা পাশ যাকে দাঁড়া।

ব্যাস, অর কুচ নেই ?

আরে চিল্লা মৎ…

কমসে কম তো কুছ লাগেগাই। লেড়কা কা বিমার…

ফির ঝুটা বাত… ?

তো ক্যায়া তুমহারা সাথ ড্রামা কর রহি হুঁ ? …এই বাত বোলকে গঙ্গা মাঈ প্যারসে তাকাল একবার। আর তাতেই কাজ হল। কুচরামুচরা একটি দশ রুপিয়া কা নোট মালিক এগিয়ে দিল। দিয়েই বলল, ছুট মৎ। ….কেননা টাকা হাতে পেয়েই গঙ্গা দৌড় লাগিয়ে ছিল। কথা আছে না—দিমাগ কা হাল পানি বরাবর।

ইধারসে উধার উধারসে ইধার করে কোন মতে ঘর চালায় গঙ্গা মাঈ। পেটে দুটো ভাত আউর কুছ দিন বাদ বাদকে মাছ,—মছলি। বা তরকারি ভি। আর ল্যাংড়া সৎপাল—তার একেবারে কুত্তা কা মতলব। খাবে চাটবে চিল্লাবে—তাবাদে সরে পড়বে বলবে। বউ নেয়ি, তু তো বিলকুল রাণ্ডি আছিস।—কবুদিন কপালে হাত চাপড়াবে গঙ্গা। অউর বড়া লেড়কা ভুনিয়া… ? ও তো বাপ কা বেটা। বাপকা সাথ হী সাঠ। হারাম কা বাচ্চা। সব কুত্তাকা চিল্লানা এক হী হ্যা'।

তবু ছা-টাকে মানুষ করতে হবে। পেটে ধরেছ যখন তখন আর কে দেখভাল করবে। করছিলও গঙ্গা, কারো কাছে তার কোন চাওয়ার বা পাওয়ার নেই। চলছিল এইমত। বিপদ ঘটল এক বরবাদি মওসম মেঁ। বারিষ কা কাল, বরষাকাল। এই সময় আইসক্রিম কারখানায় মন্দা যায়। কৌন খায়েগা বরফ ? …মন্দা চলতে থাকে গঙ্গা মাঈয়ের। হাড়মাস য়েক

হতে থাকে। এদিকে ছোটা সা লাল—মুনিয়া ; সে তো সবে ভাত চিনতে শিখেছে। ভাত ক্যায়া চিজ হ্যা ও তো উসকা পয়চান হো গায়ে।

একদিন সারাদিন কেটে গেল। চাউল-আউল জুটল না। মর্দানা সৎপাল কৌন কৌন মুলুক মে থাকে। দুনিয়া ভি গায়কে তরহা আপনা খানা ঢুণ্ডকে শিখা গয়া—। শুধু মুনিয়া কাঁদতে থাকে। তাকে ভোলাবে কে, বোঝাবে কে। —মাঈ ভুখ লাগা। ভাত দে…

আসমানে তখন শাওন কা বাদল। কালো কালো চাপ চাপ বদ রক্তের মত মেঘ। গঙ্গা মাঈর মনে কিসের উদয় ঘটল। সে আকাশের ওই মেঘের দিকে তাকিয়ে তার প্যায়রে লালকে বলল, লে, ও তো গিরতা হ্যা'। খা লে। পেট ভর জায়েগা। আরে বেটা উও ভি ভাত হ্যা'। ভাগোয়ান কা হাত মে বানধা হুয়া হ্যা'। আ…খা লে—

টপ টপ বৃষ্টি পড়ছে একটি একটি করে। বড়া বড়া ফোঁটা। শিশুটি এসে আকাশের দিকে হাঁ করে দাঁড়ালে নির্ভুল ঢুকে যেতে থাকে মুখের ভেতর। একটু পরে খুশি মনে ভর পেটে হেলতে দুলতে বাচ্চা এসে ঘুমিয়ে পড়ে মেঝেতে, পেতে রাখা বিছানায়।

বাপ বিলকুল জানে। লেকিন ও তো বাপ নেহি…রাকসস্ হ্যা'। ভৌল ভৌলকে খইনি খায়েগা অর বহুকো পিটেগা। …মনের দুখে গঙ্গার চোখ ফেটে কষ বেরিয়ে আসতে চায়। বাচ্চা ঘুমায়। শাম কা বাদ। রাস্তাঘাট থেকে পিসাব গন্ধ আসে। ঝমর ঝমর করে বারিষ নামে ঝুপড়ির গায়ে মাথায়। চারপাশে শুয়োর ঘোঁত ঘোঁত করে। কেরাসিন কা বাতি কখন নিভে যায়। জ্যোৎস্নার আলো ঢোকে ঘরে…মেঘে ছিন্নভিন্ন খতরনক মওসম কা চাঁদনা। শালা জিন্দেগী তো এ্যায়সা হো…কেঁচো বুক টেনে টেনে ঘরে ঢোকে…আঙুলে করে তুলে রাস্তায় ছুঁড়ে দেয় গঙ্গা। আকাশ গজরায়। ঝড় লাগে। বাপ নাই। ভাই না। শুধু মা আউর বেটা। ঘুমিয়ে পড়ে গঙ্গা কখন। সবেরে উঠে দেখে মুনিয়া পিসাব করকে কাঁথা ভিজিয়ে রেখেছে। আর হাসছে।

বেটা তো হাসত হ্যা' লেকিন আসমান কা চেহেরে তো একই রহা। বাদল, বাদল আউর বাদল—

সকাল বেলায় আকাশ আনধার। মেঘভাব চতুর্দিকে। কালো আন্ধিয়া ঝরঝর করে ঝরছে আর থামছে। আবার ঝরছে। ডাকছে মেঘ। বিজলানি

চমকাচ্ছে। কাল সারারাত বাপ-বেটায় ঘরে ফেরে নি। ফিরবেই বা কিভাবে। প্রকৃতি গজরাচ্ছে, ফুলছে, ফুঁসছে। কার ওপর এত রাগ কে জানে। বারিষ একটু ধরতে গঙ্গা মাঈ মুনিয়াকে কোলে ধরে ঘরের বাইরে এল। এদিক ওদিক ঢুণ্ডকে যদি কিছু পাওয়া যায়। পেট তো জলতা হ্যা'। হা ভাগোবান—।

তো গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল বৈজুরামের কারখানার কাছে। যদি একবার বেরোয় অমনি ধরবে। মালেক বলবে, নায় রে। —তবু ছাড়বে না গঙ্গা। চোখের সামনে গতর দোলাবে। আঁচল টেনে ফির বুক বাঁধবে। হাঁটুর কাপড় তুলে একটু পা চুলকাবে। পেট দেখাবে বার বার। আজ উনক্কাশ নেয়ি, য়েক। শ্রিফ এক রূপিয়া…

দেখা হল না আসলি লোকের সঙ্গে। কাছে এসে হ্যা হ্যা করল কিছু বাতিল লোক। শুঁকেটুকে চলে গেল তারা। কেননা গঙ্গা মাঈ তো জানে, এ শালা রূপিয়া ডালনা কা পাটি নেয়ি হ্যা'। এ লোক মস্তি মারবে, আউর ভাগ যাবে। ভাগে গা—।

ঘরে ফিরে এল গঙ্গা। মুনিয়া বুকে হাত দিয়ে শুধু কুত্তা বাচ্চার মত আঁচড়াচ্ছে। গঙ্গা তার বাম দিকের মাইটি বাচ্চার মুখে গুঁজে দেয়। বাচ্চা রক্ত চোষকের মত ম্যানা শুষতে থাকে। শুষতে শুষতে ঘুমিয়ে পড়ে। তবু শালার বাপ লৌট কে নেয়ি আয়া। কৌন জানে উ শালা খতরনক জিন্দা হ্যা' কি নেয়ি। ঝড় মে কিঁউ পটক গয়া?

মাই টানতে টানতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে বাচ্চা। বুক থেকে নামিয়ে গঙ্গা কাঁথায় শুইয়ে দেয়। এভাবেই তুফান অতিক্রান্ত হতে থাকে। তারই পায়ের দিকে আঁচল পেতে একটু ঘুমিয়ে পড়ে গঙ্গা মাঈ।

অমনি বারিষ শুরু হয়।

ছোট ছোট ভাতের দানা কা মাফিক সাদা সফেদ বারিষ। আকাশ থেকে গরম ভাত নামতে নামতে মাঝপথে এসে ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে। মাটিতে যখন পড়ছে তখন একেবারে হিম…কাদার ওপর এসে পড়লে তাকে বিলকুল ডালভাত বলে মনে হয়।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় মুনিয়ার। সে মায়ের গায়ে মাথায় ফের কুত্তা বাচ্চার মত আঁচড়াতে থাকে। কাঁদন শুরু করে দেয়।

চোখ খুলে ভোলাতে চায় গঙ্গা মাঈ, ক্যায়া রে বাপ? বাত ক্যায়া… রোতা কেঁউ ?

মাঈ ভুখ লাগা…

তো যা—যা কে খা লে। ভোগোয়ানকা ভাত তো গিরতাই রহে তেরে লিয়ে। পটাপট খা লে। যা—যা—যা—

মুখে হাসি ফুটিয়ে গঙ্গা মাঈ বাচ্চাকে বেপথে পাঠিয়ে দেয়। তাকে উৎসাহিত করে; খা লে বাপ, পটাপট খা লে। আউর খা। আউর খা— আউর খা।—উৎসাহিত করে কেননা কাউকে মিথ্যের দিকে প্ররোচিত করতে হলে তাকে উল্লসিত করতে হয়। বাচ্চা জানে না ছলা। ছলনা। মা যত নেচে কুঁদে অঙ্গ দুলিয়ে তাকে খেতে বলে সে তত ঘর থেকেই ঘাড়টা পেটুক বিল্লি কা তরহ বাড়িয়ে দিয়ে পেট ভরে খেতে থাকে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আস্তে আস্তে রাত্রিতে ঢলে পড়ে। আজ ভী কেউ ফিরল না। আর ঘুম গ্রাস করে নিল মা অউর বেটাকে। রাত্রির একটা সুবিধে আছে—ভুখ বোঝা যায় না। মাঝ রাতে ঘুম ভাঙে, ফের ধরে যায় দিব্যি। পেটে শুধু জল কলকল করে।

সুবহা। আকাশের দিকে তাকিয়ে কান্না পেয়ে যায় গঙ্গার। হাল তো একই হ্যা। ইয়ে ক্যায়া রে বাবা। ময়লা হয়ে আছে দিক দিগন্ত। পার্ক সার্কাসকে ঠিকঠাক যেন চেনাও যাচ্ছে না। পথঘাট একেবারে ফাঁকা। বেহাল। শরীর কাহিল লাগে। কিন্তু মুনিয়ার মুখে ঠিকই মাই গুঁজে দিতে হয়। ইনজেকশন সিরিঞ্জের মত বাচ্চে টানতে থাকে।

উফ, বাসরে বাবা, বাস—

উমম—আ—হুউম—

লাগতা হ্যা রে লাল, কামড়াতে কিঁউ। ছোড়দে—তো—। নেহি তো— হারাম কা বাচ্চা।

এই সকালে হেলতে দুলতে অতর্কিতে বাপ বেটায় এসে উপস্থিত। বড়া লেড়কা দুনিয়া খুব খুশ মনে গানা গাইছে :

রামা হো বাতা বাঁইয়া
ম্যায়নে দিল তুঝকো দিয়া—আ—আ।
ম্যায়নে দিল—

মর্দানাকে দেখে গঙ্গার প্রায়-রুদ্ধ কান্না আঁধি কা মাফিক ছুটে আসে।

সব কথা শোনে সৎপাল। খোঁড়া পা তার অভাবের তাড়নে চলতে শুরু করে। এই ছুদিন তারা বাপে ব্যাটায় চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল কা চত্বরে ছিল। খানা দানার তেমন অসুবিধা হয় নি। বউকে ঘরে রেখে আরেকবার বড়া লেড়কাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সৎপাল।

মাই টানে মুনিয়া। ঘামের মত ফোঁটা ফোঁটা বেরচ্ছে বুক থেকে। মুনিয়া মৃদু হাসে।

অভাবেও সন্তানকে আদর করে গঙ্গা মাঈ, আরে রে মেরা লাল। লাল রে—

সারে তুফার সৎপাল ল্যাংড়া পায়ে পায়ে টেউন ঢুণ্ডলো। মেঘ যায় নি। শুধু যা একটু ম্লান। এখনও সরের মত একটা হালকা আচ্ছাদন আকাশের ওপর। রাত মে বহোত বারিষ হুয়া। মালুম হচ্ছে কিধার কিধার মে বাড় হো গয়া—নদীয়া মে।

রামজী কী কিরপা সে সারা তুফার মুনিয়া ঘুমিয়ে থাকল। আর ঘ্যান ঘেনে বৃষ্টি। গঙ্গা মাঈ ভি ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ খুট করে কিসকা শব্দে নিদ টুটলো। একটা কুত্তা হাঁড়ি খেতে ঘরে ঢুকছে।

তরসতরি উঠে যা যা করে গঙ্গা। খ্যা খ্যা করে চিল্লাতে থাকে কুত্তা। ঘুম ভাঙে মুনিয়ার। সে বলে ওঠে, মায় ভুখ লাগা—

এ তো আজিব বেটা। খালি খানা মাঙে। কি জবাব দেবে গঙ্গা মাঈ। তাকিয়ে দেখে আসমান কালো মেঘে ঢাকা।

হো মাঈয়া, মাঈয়া হো—

চুপ মার নেম্নি তো পবনপুত আয়েগা, অর খা লেগা—

নেম্নি, ভাত দে—

যা বেটা, যা—উহ তো গিরতাই হ্যা'। আসমান মে ভোগোয়ান কা ভাত তেরে লিয়ে—যা যা, খা লে না—

খেয়েদেয়ে পেট ভরিয়ে পৃথিবীর আদি সনাতন নিয়মেই ঘুমিয়ে পড়ল মুনিয়া। গঙ্গা মাঈ শুধু তার মুখের পানে আশ্চর্য চোখে তাকিয়ে রইল। এমন সময় ক্র্যাচ নেড়ে নেড়ে মর্দানা ঘরে ঢোকে। সৎপাল আর তার বড়া লেড়কা।

হা লে রাঁধ—এই বলে সৎপাল বউয়ের দিকে লক্ষ্য করে মেঝেতে ধপ করে ফেলে দিল একটা লাল গামছায় বাঁধা চাউল। অউর এক মরা মুরগা।

সমঝ গিয়া। —দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে গঙ্গা মাঈ।

ক্যায়া সমঝা ? কর্কশ গলা সৎপালের।

এ তো চোরি কা মাল—

হাঁ, জরুর, তো ক্যায়া ? নেহি পসন্দ ? শালি রাণ্ডি কা বেটি রাণ্ডি।

রান্না হয়। ভাত অউর মুরগা কা দৌল। সন্ধ্যার অন্ধকারে ইটের উনুনে শুধু আগুন জ্বলে।

নাকে মুখে খেতে থাকে তিনজন। গঙ্গা মাঈর মনে পড়ে ছোটা লেড়কা কুছ নেহি খায়া। ঘুম দিচ্ছে। মাঈ কিছুটা ভাত নিয়ে হাঁড়িতে তুলে রাখতে যায়। বাপ বলে ওঠে, হটা—

মুনিয়া কে লিয়ে—

ও তো শো গিয়া। উঠা কে কোই জরুরৎ নেহি। কাল সুবেরে হাম ফির লে আয়েগা—

সবার পেটেই খিদের আগুন। উসকো জাগানেসে ক্যায়া ফয়দা। খেয়ে দেয়ে হাত মুখ ধোকে সবাই শুয়ে পড়ল। শরীর কমজোরি। অল্প সময়েই সব চৌপট হয়ে গেল।

রাত মে গঙ্গা মাঈ এক বহোৎ কুছ স্বপ্ন দেখল।—আকাশ ছেয়ে আছে মেঘে। মুনিয়া নিদ টুটনে কে বাদ বলল, মাঈ ভুখ লাগা—

টপটপিয়ে নামছে বারিষ। দেখিয়ে দিল গঙ্গা মাঈ। বলল, খা খা বেটা। পটাপট খা লে। উহ তো ভাত হ্যা'।

দৌড়ে গেল মুনিয়া। দু চার ফোঁটা গিলে ক্রুদ্ধ হয়ে ফিরে এল হা হা করে। গঙ্গা মাঈ দেখল কি উসকা আঁখ লাল হোকে নিকালতে রহা। গোল গোল রাক্ষসের চোখের মত। বাচ্চাও বুঝে গেছে পানি কোনদিন ভাত হতে পারে না। জেনে গেছে মাঈ তাকে বেপথে চালিয়েছে। বার বার ঠকিয়েছে। গঙ্গা মাঈ ছাখে রাগে ক্ষোভে ধীরে ধীরে মুনিয়া—তার প্যায়রে লাল, রাকসস্ হোকে তাকে গিলতে আসছে গাঁ গাঁ করে। সে চিৎকার করে ওঠে, কভি নায়, কভি নায় রে—কভি নায়—

কে শোনে কার কথা। নিজের বাচ্চার কাছে হাত জোড়কে কাঁদতে থাকে গঙ্গা,—হুজৌর, এগ-কো বাত—ব্রিফ য়েক।

কিন্তু না, রাকসস্ তার বিরাট চেহারা ধারণ করছেই। এক্ষুনি গিলে নেবে। তাকিয়ে ঘরের কোনে কমণ্ডলুর মত একটা হাঁড়ি দেখতে পেল গঙ্গা।

মাঈ। তার ভেতর কিছুটা ভাত আছে। দৌড়ে গিয়ে সে হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে তারই এক মুঠো তুলে নেয়। তারপর সাধু কা মাফিক সেই ভাত ছুঁড়ে দেয় মুনিয়া রাক্ষসের গায়ে।

গায়ে-মাথায়-মুখে সেই ভাত ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাজ্জব করকে রাক্ষস্ মুনিয়া ছোটা হতে হতে স্বাভাবিক—আওরত কা লেড়কা হয়ে গেল। এ কেবারে গঙ্গা মাঈকে প্যায়রে লাল—মুনিয়া।

গঙ্গা মাঈ ঘুমের মধ্যেই হাত জোড়কে বলে ওঠে, রামজী কি কিরপা। হা ভাগোবান—

উসকা বাদ কুছ টাইম গেলো··· ।

ফির গঙ্গা মাঈয়ের আঁখ দিয়ে আঁশু নিকালতে লাগলো।

এষণা

রঞ্জন ধর

সারাদিন আকাশ মেঘলা ছিল, ঠিক ছুটির মুখে শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড বর্ষণ। একনাগাড়ে ঘণ্টাখানেক চলল। এতক্ষণে নিশ্চয় রাস্তায় জল জমে গেছে। ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে গেলে আজ আর হেনস্তার অন্ত থাকবে না। অফিসে নিজের সিটে বসে ভাবছিল নূপুর।

'কি, বাড়ি যাবে না?' কুশল রোজকার নিয়মে এসে তাগাদা দেয়।

'কি করে যাব, বৃষ্টি কি থেমেছে?' জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে নূপুর।

'বৃষ্টি থামার অপেক্ষা করলে আজ অফিসেই রাত কাটাতে হবে।' কুশল বলে, 'এ বৃষ্টিতে যাওয়া যাবে। আর দেরি নয়, উঠে পড়।'

নূপুর সিট ছেড়ে উঠে পড়ে। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে ছাতাটা হাতে নেয়। দু'জনে রাস্তায় নেমে বুঝতে পারে যানবাহন একেবারে বিপর্যস্ত। ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। এলোমেলোভাবে দু'চারখানা বাস চলছে, তাতে এত ভিড় যে উঠবার উপায় নেই। কুশল একা হলে হয়ত কোন রকমে বাদুড়-ঝোলা হয়ে যেতে পারত, কিন্তু নূপুরকে ফেলে তার যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। বৃষ্টি প্রায় ধরে এসেছে। কুশল বলে, ''চল, শিয়ালদা পর্যন্ত হাঁটা যাক, তারপর ট্রেনে যাওয়া যাবে। এ ছাড়া উপায় নেই আজ।' নূপুর আপত্তি করল না। এর আগেও কয়েকবার তাদের এ-ভাবে যেতে হয়েছে। কুশল নেমে গেছে বালীগঞ্জ স্টেশনে, আর নূপুর যাদবপুরে। আর অপেক্ষা না ক'রে তারা জল ভেঙে হাঁটতে শুরু করল।

ছুটির পর তারা রোজ একসঙ্গে বাড়ি ফেরে আজকাল। এই নিয়ে কর্মীদের মধ্যে কিছু গুঞ্জন আছে। সব তাদের কানে আসে। নূপুরের খুব খারাপ লাগে। কুশল তাকে ভরসা দিয়ে বলে, 'কিছু লোক যদি মিথ্যা গুঞ্জন করে মজা পায়, পেতে দাও। সত্যিই তো আর আমরা প্রেমে পড়িনি।' নূপুরের বিশেষ বন্ধু নমিতা একদিন বলেছে, 'কি রে একবার ঘা খেয়ে তোর শিক্ষা হল না? আবার সম্পর্ক পাতিয়েছিস সেই শয়তানটার বন্ধুর সঙ্গে!

তোর লজ্জা নেই ?' নূপুর জবাব দিয়েছে, 'আছে বৈকি ! তবে এ ব্যাপারে তোরা যা ভাবছিস, আদৌ তা নয়। তা ছাড়া কুশল তো বন্ধুর পক্ষ নেয়নি, তবে ওর কি অপরাধ ?' কুশলকে আজ আর বন্ধু হিসাবে অস্বীকার করতে পারে না নূপুর। বরং বলা চলে, সে অনেক বিষয়ে তার ওপর এতটা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে যে তার বন্ধুত্ব ও সাহায্য তার কাছে এখন অপরিহার্য। তবু কুশল একদিন বলেছিল, 'অনেক বাজে কথা রটছে, তুমি ভয় পেলে আমাদের আর মেলামেশার দরকার নেই।' নূপুর দৃঢ়ভাবে জবাব দিয়েছিল যে, সে ও-সব রটনা গ্রাহ্য করে না।

বৌবাজার স্ট্রীট ধরে জনস্রোতের মধ্যে মিশে গিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় তারা শিয়ালদা স্টেশনের কাছে আসে। ওভারব্রীজের সামনে এসে কুশল বলে, 'বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে। চল, আগে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।'

ছাতা দিয়ে তো শুধু মাথাটুকু বাঁচানো গেছে। সারা শরীরের কাপড়-জামা ভেজা। হাঁটু অবধি জল ভাঙতে হয়েছে সারা রাস্তা। ড্রেন উপচানো নোংরা জল। গা ঘিন ঘিন করছে। তাই নূপুর বলে, 'কাপড়জামা ভিজে একসার। এ অবস্থায় দোকানে ঢুকব ?'

'তাতে কি হয়েছে!' কুশল বলে, 'আজ সবার এক দশা। এর জন্য দোকানগুলো কি ফাঁকা পড়ে আছে ? বরং আজ বেশি ভিড়। এমনি ওয়েদারে দোকানে বসে খাস্তা কচুড়ি-সিঙ্গাড়া খাওয়ার একটা আলাদা মজা।'

অর্থাৎ কুশল না খেয়ে যাবে না, বুঝল নূপুর। সে হেসে বলে, 'তুমি একটি আস্ত পেটুক। বেশ, চল তা হলে।' একটা বড় খাবার দোকানে গিয়ে ঢুকল তারা।

সেদিন ট্রেনে দারুণ ভিড়। প্ল্যাটফর্মে ঢোকা যাচ্ছে না, এত লোক। একটা ট্রেন আসার সঙ্গে সঙ্গে এমন হুড়োহুড়ি পড়ে গেল যে ট্রেনের কাছে এগোন গেল না।

'যাবে কেমন করে, দেখছ অবস্থা !' নূপুর উদ্বেগ প্রকাশ করে।

'ভেবো না, ঠিক তোমাকে ট্রেনে তুলে দেব।' কুশল আশ্বাস-বাণী শোনায়।

ক্যানিং লোকাল আসার সময় হয়েছে। কুশল বলে, 'নূপুর, ঠিক আমার পেছনে দাঁড়াও। ছাত্র-জীবনে শক্তিচর্চা করতাম, যা সঞ্চয় করেছিলাম সবটাই নিঃশেষ হয়ে গেছে কিনা আজ তার পরীক্ষা।'

'তা ছাড়া এই মাত্র ফুয়েল নিয়েছ—নেহাৎ কম নয়, আটখানা কচুরি-সিঙ্গাড়া, চারখানা বড় মিষ্টি। পরীক্ষায় ফেল করলে বুঝব তুমি নিতান্তই অসাড়।' নূপুর হাসে।

ট্রেন এসে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াবামাত্র ভিতরের লোকদের নামতে না দিয়েই সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ে। বেশ কিছুক্ষণ চলতে থাকে প্রচণ্ড হুল্লোড়। নূপুর শক্ত ক'রে পেছন থেকে কুশলের জামা মুঠো করে ধরে থাকে, এক সময় তার পেছন-পেছন কখন এবং কিভাবে সে ট্রেনের কামরার মধ্যে ঢুকে যায় বুঝবার অবকাশ পায় না। বেশ কিছুক্ষণ বাদে ঠেলাঠেলি কমলে নূপুর হেসে মন্তব্য করে, 'হ্যাঁ' তোমার সঞ্চয়ের ভাণ্ডারে এখনও বেশ কিছুটা আছে, মানতেই হয়।'

'তুমিও নেহাৎ কম যাও না। আমার সার্টের পেছন দিকে তার প্রমাণ রয়েছে।' কুশল মন্তব্য করে।

এতক্ষণে খেয়াল করে নূপুর। ভিড়ের চাপে যাতে ছিটকে না যায় তার জন্য দুই হাতের মুঠোয় সমস্ত শক্তি জড়ো করে সে চেপে ধরে রেখেছিল কুশলের জামার পেছন দিক, যার ফলে এই অবস্থা। জামাটা আস্ত নেই, ছিঁড়ে ফালা-ফালা হয়ে গেছে। সে হেসে বলে, 'ঠিক আছে, আমি তোমাকে এর চেয়ে ভাল একটা সার্ট প্রেজেণ্ট করব।'

বালীগঞ্জ স্টেশন এসে গেছে। কুশলের নেমে যাবার কথা, কিন্তু সে নামল না। ব্যস্ত হয়ে নূপুর তাকে মনে করিয়ে দেয়, 'এ কি তুমি নামলে না ?'

কুশল হেসে বলল, 'আমি নেমে গেলে তোমাকে যে যাদবপুরের বদলে ক্যানিংয়ে গিয়ে নামতে হবে। ভুলে গেছ, যাদবপুরে আর একবার শক্তির পরীক্ষা দিতে হবে, একা পারবে ?

তাই তো! এতক্ষণে খেয়াল হয় নূপুরের। তার দু চোখে কৃতজ্ঞতা। মনে পড়ে যায়; এমনি ছোট-বড় কত ব্যাপারে কুশল তাকে সাহায্য করেছে। পুরুষহীন সংসারে কত রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তাকে। সব সময় কুশল স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছে। নূপুরও তার ওপর নির্ভর না করে পারেনি।

ঢাকুরিয়া ছাড়িয়ে গেল। এবার যাদবপুর। কুশল আবার শক্তি-পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে বলে, 'ছেঁড়া জামাটার জন্য আর মমতা করে লাভ নেই। শক্ত —মুঠো করে ধরে রাখ, হাত যেন ফসকে না যায়।'

একই কৌশলে সে নূপুরকে নিয়ে ভিড় ভেদ করে নেমে আসে। প্ল্যাট-

ফর্মে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে নূপুর। তার চোখমুখ লাল। রাগে ফুঁসছে।

'কি হল?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে কুশল।

'এই ভিড়ের মধ্যেও একটা অসভ্য লোক—' আর বলতে পারে না নূপুর। না বললেও বুঝতে পারে কুশল। মুহূর্তে তার চোখে আগুন জ্বলে ওঠে।

'তুমি আমাকে দেখিয়ে দিলে না কেন?' গম্ভীরভাবে সে বলে।

নূপুর চুপ করে থাকে। একটু বাদে স্বাভাবিক হয়ে বলে, 'চল, একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক। একটা স্টলের সামনে এসে দাঁড়ায়। চা খেতে-খেতে নূপুর বলে, 'যা ধকল গেল, রক্ষে, কাল রোববার। নইলে ছুটি নিতে হত।'

কুশল কোন কথা না বলে চা খেয়ে যাচ্ছে। নূপুর বলে, 'কি হল, কথা বলছ না যে?'

'আমার রাগ হচ্ছে তোমার ওপর' এতক্ষণে সে বলে, 'তোমার উচিত ছিল তখনই বদমাইশটাকে চিনিয়ে দেওয়া।'

নূপুর বলে, 'তখন কি অবস্থা ছিল বলত? ভিড়ের চাপে নিশ্বাস নিতে পারছি না। কি করে যে বেরিয়েছি—উঃ, এভাবে যাতায়াত করা যায় না।'

ফিরতি ট্রেন আসার ঘোষণা শুনে কুশল বলে, 'তোমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবার দরকার আছে, নাকি এ-ট্রেনে ফিরে যাব?'

'না-না—ফিরে যাও।' নূপুর বলে, 'সময় পেলে কাল এসো। মিমু তোমার কথা খুব বলে।'

রাত্রে বাড়ি ফেরার সঙ্গে-সঙ্গে মিমু ছুটে আসে। মা বলে, 'আজ তোর ফিরতে এত দেরি হল কেন রে? শাড়িটাও তো ভেজা।'

'বাস-ট্রাম চলছে না। বৃষ্টিতে ভিজে হেঁটে শিয়ালদা, তারপর ট্রেনে এলাম। আগে চান করে আসি।' নূপুর ব্যাগ, ছাতা ফেলে আলনা থেকে শাড়ি, ব্লাউজ নিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে বাথরুমে ঢোকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে চান সেরে এসে সে বিছানায় সটান গা এলিয়ে দেয়। এতক্ষণে যেন সমস্ত ক্লান্তি এসে তার দেহে ভর করে। মাথাটা খুব ধরেছে। মিমু মা এর পাশে বসে কথা শুরু করলে নূপুর তাকে বলে, মা-মনি, আমার খুব মাথা ধরেছে। আমি চোখ বুজে একটু বিশ্রাম নিয়ে পরে তোমার সঙ্গে কথা বলব, কেমন?' মিমু ঘাড় নাড়িয়ে সায় দেয়। নূপুর আবার বলে, 'তোমার কুশল মামু তোমাকে যে-ছড়াটা শিখতে বলে গিয়েছিল, সেটা শেখা হয়ে গেছে? না হয়ে থাকলে শিখে ফেল! কাল কিন্তু সে আসবে।'

'তাই নাকি? ওরে বাবা, তাহলে গিয়ে শিখে ফেলি।' মিমু পাশের ঘরে চলে যায়।

এ বাড়িতে মা আর মেয়েকে নিয়ে নূপুর থাকে প্রায় দু'বছর হল। তার বিয়ের এক বছরের মধ্যে স্কুটার একসিডেণ্টে স্বামীর মৃত্যু হবার তিন মাস বাদে মিমুর জন্ম হয়। বাবাকে সে দেখেনি। তখন তার বয়স সাড়ে চার বছর। জ্ঞান হবার পর সে প্রায়ই জিজ্ঞেস করত, 'মামনি, বাপ্পার বাবা আছে, আমার নেই কেন?' বাপ্পা নূপুরের দাদার ছেলে। স্বামীর মৃত্যুর পর দু'মাসও তার পক্ষে শ্বশুরবাড়িতে টিকে থাকা সম্ভব হয়নি। রোজ শাশুড়ি শোনাতেন, সে অপয়া, তার জন্যই তাঁর ছেলের অপঘাত মৃত্যু ঘটেছে। পরিবারের সবাই হঠাৎ কেমন যেন নির্লিপ্ত হয়ে পড়ল তার সম্পর্কে। ভেবে অবাক হত নূপুর, স্বামীর মৃত্যুর আগে যারা তাকে এত আপন ভাবত, তার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে তাদের চোখে সে পর হয়ে গেল কেমন করে? অথচ নূপুর তাদের উপর নির্ভরশীল ছিল না। সে চাকরি করত। নিজের আত্মমর্যাদাবোধ তাকে বাধ্য করল বাবা-মা-এর কাছে চলে আসতে। কিন্তু সে জানত না যে এখানেও তার জন্যে অপেক্ষা করছে বিড়ম্বনা ও উপেক্ষা। যতদিন বাবা বেঁচে ছিলেন ততদিন কোন সমস্যা দেখা দেয়নি, দেখা দিল তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। তখন সংসারে বৌদির ভূমিকাটাই মুখ্য। বাড়িটা যে তাঁর স্বামীর এবং এই বাড়িতে বরাবরের মত নূপুরকে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয়, এই কথাটা তিনি প্রায়ই স্মরণ করিয়ে দিতেন। উপদেশ দিতেন শ্বশুরবাড়িতে চলে যেতে। নূপুর জানত, আজকাল নাকি বাবার সম্পত্তির ওপর মেয়েরও সমান অধিকার, তাই একদিন বৌদির কথা সহ্য করতে না পেরে সেই অধিকারের কথাটা সে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। যে দাদা সাধারণত কিছু বলেন না, বৌদির কাছ থেকে কথাটা শোনার পর তিনি ভীষণ রেগে গিয়ে তাকে বলেছিলেন, 'তুই নাকি এই বাড়ির ওপর তোর অধিকার দাবি করেছিস?'

'দাবি করব কেন,' নূপুর বলেছিল, 'বৌদি সব সময় আমাকে বলছেন শ্বশুর-বাড়িতে চলে যেতে। সেখানে যে যাওয়ার উপায় সেই তিনি জানেন। তাই বলেছি কথাটা।. শুনেছি এ-ধরনের আইন রয়েছে।'

'আইন থাকলেও তোমার ক্ষেত্রে সেটা খাটবে না।'

'কেন?'

'বিয়ের আগে বাবা একটা স্ট্যাম্পড পেপার তোমাকে দিয়ে সই করিয়ে রেখেছিলেন, মনে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা ছিল এই বাড়ি আর বাবার অন্যান্য সম্পত্তির ব্যাপারে তোমার অধিকারের ছাড়পত্র। তোমার বিয়েতে যে এত টাকা খরচ করা হয়েছে, সেটাকে এই সম্পত্তির ওপর তোমার অংশের মূল্যবাবদ দেখানো হয়েছে।'

দাদার কথা শুনে নূপুর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিল।

'বুঝতে পেরেছ ত? এই বাড়ির ওপর তোমার আইনগত অধিকার নেই। দাদা কথাটা বলে চলে যাচ্ছিলেন, নূপুরের মুখ থেকে তখন আপনা থেকে বেরিয়ে এসেছিল, 'কিন্তু তোমার বিয়েতেও তো বাবা অনেক টাকা খরচ করেছেন, তা হলে তিনি তোমাকে দিয়ে ছাড়পত্র সই করাননি কেন?'

দাদার মুখে মৃদু হাসি, তিনি বলেছিলেন, 'বাবা বেঁচে থাকলে তিনিই এর জবাব দিতে পারতেন।'

নূপুর আর কিছু জানাতে চায়নি। বিশেষ করে বাবা নিজে যখন এটা করে গেছেন, তখন এই নিয়ে দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে কি লাভ? সে-রাত্রে ঘুমুতে পারেনি সে। একটা তীব্র যন্ত্রণার অনুভূতি সারা রাত তাকে পীড়া দিয়েছে। তার স্নেহময় বাবা, যাঁকে সে এই বিশ্বসংসারে সবচেয়ে আপন ভেবে এসেছে, মনে হয়, তাঁর স্নেহও পক্ষপাতহীন ছিল না। তিনি পারেননি পুত্র ও কন্যার মধ্যে তাঁর অপত্য স্নেহের ভাণ্ডার সমানভাবে ভাগ করে দিতে। পাল্লা পুত্রের দিকে ভারী হয়ে রইল। এ যদি ঘটতে পারে, তবে আর আপন-পরের ভেদাভেদ নিয়ে নূপুর কোন বিচারে তার স্বামীর পরিজনদের দোষ ধরতে যাবে? তাদের সঙ্গে তার কত দিনের সম্পর্ক! বিশেষত যাঁকে উপলক্ষ করে সম্পর্ক, তিনিই যখন ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন! কিন্তু যে দাদার সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক, এক মা-এর বুকের দুধ খেয়ে বড় হয়েছে, জীবনের কত মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে যাঁর সঙ্গে, তিনিই যদি তাঁর সেদিনের একমাত্র আদরের বোনকে নিরাশ্রয় করে দেবার কথা ভাবতে পারেন, তখন 'আপন' শব্দটাকে অর্থহীন মনে হয়। এই পৃথিবীতে স্বার্থ-নিরপেক্ষ কোন সম্পর্ক কি সত্যিই আছে? নিদ্রাহীন একটি রাত অনেক কিছু নিয়ে ভেবে-ভেবে এক নতুন আত্মপ্রত্যয় নিয়ে খুব ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে নূপুর। কারো ওপর নির্ভর করে কিম্বা কারো গলগ্রহ হয়ে সে বাঁচতে চায় না। পাড়ার এক

বন্ধুর ভাইকে ধরে তার মাধ্যমে এক সপ্তাহের মধ্যে এইবাড়িটায় উঠে এসেছিল সে মা আর মিমুকে নিয়ে। দু'টো মাঝারি ধরনের ঘর, এক ফালি বারান্দা। স্বয়ং সম্পূর্ণ। ভাড়াও তেমন বেশি নয়, নূপুরের আয়ত্তের মধ্যে।

আগের দিন বৃষ্টিতে ভেজার ফল পরের দিন টের পায় নূপুর। তার এমনিতে সর্দির ধাত, এর ওপর কয়েক ঘণ্টা ভেজা কাপড়ে থাকা। সারা শরীরে ভীষণ ব্যথা, এই সঙ্গে সর্দি-জ্বর। জ্বর নিয়েই একটা রিক্সা করে সে ডাক্তারের কাছে যায় এবং ফেরার পথে বাজার করে ফেরে।

বিকেলের দিকে কুশল আসে। নূপুরের বোধহয় একটু তন্দ্রা এসেছিল, কুশলকে ঢুকতে দেখে মিমু আনন্দে চিৎকার করে ওঠে,'মা মনি মামু এসেছে।'

নূপুর এই গরমের মধ্যেও গায়ে চাদর জড়িয়ে শুয়ে ছিল। তাকে দেখেই কুশল অনুমান করতে পারে। সে হেসে বলে, 'বাধিয়ে বসেছ তো! একটু-খানি জলে ভিজেই এই অবস্থা? তোমাদের দিয়ে কিছু হবে না। বৃথাই নারী-স্বাধীনতার জন্য চিৎকার কর তোমরা।'

'শরীরের সঙ্গে নারী-স্বাধীনতার কি সম্পর্ক? তোমাদের বুঝি সর্দিজ্বর হয় না?' নূপুর বলে, 'তা ছাড়া এর জন্য তুমিই দায়ী। কচুড়ি সিঙ্গাড়া খাওয়া চাই। ভিজে কাপড়ে বসে এক ঘণ্টা দোকানের মধ্যে। সব জল বসেছে গায়ে। সর্দি-জ্বরের দোষ কি?'

'আরে এ কিছু না', কুশল উড়িয়ে দেয়, মাঝে-মধ্যে সর্দি-জ্বরকেও চান্স দিতে হয়। ডাক্তার দেখিয়েছ?' কুশল চেয়ারটাকে বিছানার আরও কাছে টেনে নিয়ে বসে।

'হ্যাঁ। তবে কাল বোধহয় অফিসে যেতে পারব না।'

'দরকার কি যাওয়ার? ছুটি পাওনা আছে, শুয়ে-ঘুমিয়ে রেস্ট নাও।'

মিমুর বোধহয় এতক্ষণে ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে, 'মামু, তুমি শুধু মা-মনির সঙ্গে কথা বলছ। আমাবে গল্প শোনাকে কখন?'

'সত্যি বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে', কুশল অপরাধীর ভঙ্গি করে বলে, 'চল, এখন আমাদের কাজে লেগে পড়া যাক। আজ একটা দারুণ গল্প বলব। সেদিনের সেই ছড়াটা শেখা হয়ে গেছে তো?'

'হ্যাঁ। শুনবে তুমি?'

'নিশ্চয়। শুনতেই তো আসা। গল্পের আগে ছড়াটাই হোক।'

চেয়ারটাকে আবার টেবিলের কাছে টেনে নিয়ে যায় কুশল। তারপর

সে মেতে ওঠে মিমুকে নিয়ে। ছড়া, গল্প, ছবি আঁকা এবং আরও কত রকম হাসি-মজা চলতে থাকে। হঠাৎ মাঝখানে এক সময় কুশল ভান করে যেন একটা দারুণ ভুল হয়ে গেছে তার।

'কি ভুলে গেছ?' মিমুর চোখে কৌতূহল।

'কি যেন আনব ভেবেছিলাম। আনা হয়নি।'

কুশল একবার পকেটে হাত ঢোকায়, একবার ঝোলা-ব্যাগের মধ্যে। যেন খুঁজে পাচ্ছে না। এদিকে মিমুর কৌতূহল বাগ মানতে চাইছে না।

'এই যে, একটা।'

একটা বড় চকোলেট। দেখা মাত্র মিমুর চোখে খুশির ঝিলিক, সে ছো মেরে কুশলের হাত থেকে নিয়ে বলতে থাকে, 'কি মজা! কি মজা! আমি ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম, তুমি দুষ্টুমি করছ।'

কুশলের অট্টহাসিতে ঘর ভরে যায়। এরপর সে ব্যাগ থেকে সুকুমার রায়-এর 'আবোল তাবোল' খানা বের করে মিমুকে দেয়। নূপুর মন্তব্য করে, 'একদিনে এত কেন?'

কুশল বলে, 'এটা আমার আর মিমুর ব্যাপার। তুমি কিছু বলবে না।'

নূপুর আর কিছু বলে না। মৃদু হেসে চুপ করে থাকে। কুশল যখন আসে, কিছু না কিছু নিয়ে আসে মিমুর জন্য। দু'জনে ভাবও খুব। একটু লম্বা গ্যাপ গেলে অমনি মিমু বলবে, 'মা-মনি, মামু আসছে না কেন?' নূপুর বোঝে, একটি শিশুর জীবনে সবচেয়ে বড় যে-অভাব, তা যতটা সম্ভব ঘুচিয়ে দেবার সচেতন ইচ্ছা নিয়েই কুশল এ সব করে। বন্ধু হিসেবে সে মনে করে এ যেন তার একটা দায়। প্রথম দিকে নূপুর কিছুটা অস্বস্তি বোধ করত। একদিন সে বলেছে তাকে, 'কেন এত করছ, অযথা অর্থ নষ্ট।' কুশল শোনামাত্র তার চোখে স্থির দৃষ্টি রেখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জবাব দিয়েছে, আমি তো সৈকত নই যে এত হিসেব করে চলব। অর্থ নষ্ট হচ্ছে কিনা ভাবিনি। আমি বুঝতে পারছি তোমার অস্বস্তির কারণ। হয়ত তুমি ভাবছ, আমি করুণা দেখাচ্ছি অথবা এ তোমার অনুগ্রহ পাবার একটা কৌশল। তুমি নিশ্চিন্ত থেক, আমি জানি, কৌশল করে কিছু পাওয়া গেলেও শেষ রক্ষা করা যায় না। আমি তোমার কাছ থেকে অন্তত সেভাবে কিছু পেতে চাইব না। পাই বা না পাই, কিছু চাইতে হলে সরাসরি চাইব, ছলনার আশ্রয় নিয়ে নয়। তা

ছাড়া তুমি মিমুকে শুধু আমার দেওয়াটা দেখছ, কিন্তু তার কাছ থেকে আমার পাওয়াটা যে তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি, সেটা তোমার নজরে পড়ে না ?'

এত কথা এক সঙ্গে বোধ হয় আর কখনও কুশল বলেনি তাকে। নূপুর জবাবে একটি কথাও বলতে পারেনি, সে অনেক চেষ্টায় উদ্‌গত কান্নার আবেগ চেপে রেখেছিল।

সৈকতের সঙ্গে সেদিন নিজের তুলনা করে কুশল বলেছিল, সে তার মত হিসেবি নয়। অথচ একদিন সৈকত ছিল কুশলের বন্ধু। দু'জনে একই সেকশানে কাজ করত। সৈকত নিজে থেকে এসে ঘনিষ্ঠতা করেছিল নূপুরের সঙ্গে, তার সব কথা জানা সত্ত্বেও। প্রথম দিকে তেমন প্রশ্রয় না দিলেও শেষ পর্যন্ত নূপুর তার আকর্ষণ এড়াতে পারেনি। এক এক সময় তাদের ঘনিষ্ঠতার কথা প্রায় সবার মধ্যে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। সৈকতের বন্ধু হিসেবে কুশলের সঙ্গেও তার যথেষ্ট বন্ধুত্বও গড়ে উঠেছিল। অফিসের মধ্যে কেউ কেউ যেমন সৈকতের উদার মানসিকতার প্রশংসা করেছে, আবার অনেকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে এই নিয়ে। সবই নূপুরের কানে আসত। সৈকত তাকে ভরসা দিয়ে বলত, 'ও-সব ব্যাক-ডেটেড লোকদের কথা গ্রাহ্য করো না। ওরা এখনও উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার নিয়ে বসে আছে।' ভাগ্যের এমনই পরিহাস শেষ পর্যন্ত সমালোচনা এবং সংস্কারের ভয়ে পিছিয়ে গেল সৈকত নিজে। ভিতরে ভিতরে তার মধ্যে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া চলছে, বুঝতে পারেনি নূপুর। সে শুধু লক্ষ্য করেছিল, কেমন যেন অন্যমনস্ক দেখাত তাকে মাঝে-মাঝে। আগের মত ছুটির পর বাইরে প্রোগ্রাম করার ব্যাপারেও তার তেমন উৎসাহ ছিল না। জানতে চাইলে শুধু একদিন বলেছিল, 'এই নিয়ে বাড়িতে খুব অশান্তি চলছে। জানতো, আমার বাবা-মা ভীষণ রকমের কনসারভেটিভ। তবে ভেবো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।' নূপুর কি জবাব দেবে ভেবে পায়নি। হঠাৎ একদিন জানা গেল, সৈকতের ট্রান্সফার অর্ডার বেরিয়েছে। এক সপ্তাহের মধ্যে সে চলে গেল সল্টলেক অফিসে। নূপুর আগে জানতে পারেনি যে সৈকতের ইচ্ছা ও বিশেষ চেষ্টার ফল এই ট্রান্সফার। কুশল একদিন গম্ভীরভাবে তার কাছে এসে নিচুস্বরে বলল, 'নূপুর, সৈকত নিজে থেকে ট্রান্সফার নিল কেন ?'

'আমি কেমন করে বলব ?' নূপুর জবাব দিল।

'তুমি জানতে না ?'

'না।'

'তোমাকে কিছু বলেনি এ-সম্পর্কে ?'

'বলেছে, এটা রুটিন ট্রান্সফার। তার কিছু করার নেই।'

সেদিন কুশল আর কোন প্রশ্ন করেনি এবং অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখে ফিরে যায়। কিন্তু এই প্রথম, নূপুরের মনে একটা সংশয় দেখা দিল। একদিন সৈকত ফোন করে বলল, 'নূপুর, আমি প্রচণ্ড প্রেসারের মধ্যে রয়েছি। বাবা শাসিয়েছেন, আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন। কি করব ভেবে পাচ্ছি না। আমার মাথার ঠিক নেই। এ অবস্থায় যদি আমি আমার কমিটমেন্ট রাখতে না পারি, আমাকে ক্ষমা করো।'

নূপুর শুধু বলেছিল, 'এ-সব আগে ভাবলে তোমাকে এত অসুবিধায় পড়তে হতো না। এত চেষ্টা করে এ অফিস থেকে ট্রান্সফারও নিতে হত না। কি আর করবে, বাবার কাছে সুপুত্র হয়ে থেকো, আর ত্যাজ্যপুত্র হবার ভয় থাকবে না।' তাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ফোনটা রেখে দিয়েছিল নূপুর।

তারপর একদিন বিয়ের একটা নিমন্ত্রণপত্র হাতে নিয়ে কুশল এসে বসল নূপুরের টেবিলের সামনে।

'সৈকতের বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র।' কুশল বলল।

'বন্ধুকে বন্ধু তার বিয়েতে নিমন্ত্রণ করবে, এটাই তো স্বাভাবিক।'

'ও আর আমার বন্ধু নয়। ও একটা কাওয়ার্ড। মুখোস-পরা হিপোক্রিট।'

'হঠাৎ এত রেগে গেলে কেন ? বিয়ের ভোজ খেতে যাবে না ?'

'তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ, নূপুর!'

কুশলের মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে যায় নূপুর। সেই মুখে বেদনা ও ক্ষোভের অদ্ভুত সংমিশ্রণ। সে বলে, 'আমাকে বিশ্বাস কর নূপুর, তোমাকে সে যেভাবে অপমান করল, এর জন্য কোনদিন আমি ওই পাপিষ্ঠটাকে ক্ষমা করতে পারব না। আমি এসেছি তোমার অপমানের ভাগ নিতে। আমি চাই, সেই কাপুরুষের সামান্যতম স্মৃতি যেন তোমার মনের কোনে না থাকে, এই হবে তার বিশ্বাসঘাতকতার জবাব। পারবে না ?'

'পারা তো উচিত।' মৃদুস্বরে জবাব দেয় নূপুর।

সেই দিনের পর থেকে তাদের বন্ধুত্ব দিনে-দিনে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। এক সময় এই নিয়েও জল্পনা ও গবেষণা শুরু হয়েছে। বিশেষত মেয়ে

কর্মীদের মধ্যে। তবে কুশলকেও কম শুনতে হয় না। পুরুষদের টিকা-টিপ্পনি নাকি আরও স্থূল এবং কুৎসিত। একসঙ্গে কাজ করতে করতে সবার সঙ্গে সবার সম্পর্ক খোলামেলা হয়ে যায়, তখন আর কোন কথা বলতে মুখে আটকায় না। মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগে। কিন্তু কুশল গ্রাহ্য না করে বলে, 'যার যা খুশি বলুক। যাদের চরিত্র দুর্বল, তারাই এ-সবে ভয় পায়। আমরা পাব কেন?'

তবু নূপুর বুঝতে পারে না, তাদের সম্পর্ক কতদিন এ-রকম চলবে। তারা নিজেরা মনে করে, এ শুধুই বন্ধুত্ব। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও ভাললাগা থেকে এ সম্পর্কের ভিত তৈরি হয়েছে। তারা যে-কোন বিষয়ে খোলামনে কথা বলতে পারে। একজনের আর একজনকে বুঝতে অসুবিধা হয় না। তবু কখনও কখনও ক্ষণিকের তরে একটুখানি অস্পষ্টতার কুয়াশায় দু'জনের মনই কি আচ্ছন্ন হয় না? এ তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শত হলেও সম্পর্কটা একজন নারীর সঙ্গে একজন পুরুষের! তাই অনেক সময়, আজকাল, নূপুরের মনে প্রশ্ন জাগে, তার কাছে কি কুশলের সত্যিই কিছুর প্রত্যাশা নেই! একেবারেই নেই! যদি থাকে, নূপুর কি পারবে তার প্রত্যাশা পূরণ করতে? হয়ত আদৌ তার এ-সব ভাবনার কোন ভিত্তি নেই। এ-ও হতে পারে, নিজের অজ্ঞাতে শুধু তার একার মনে একটা আকাঙ্ক্ষার বীজ উপ্ত হয়েছে। কিন্তু একে প্রশ্রয় দেওয়া নির্বুদ্ধিতা। বিশেষত সৈকতের ঘটনার পর। সে-ও তো একদিন সংস্কারমুক্ত মানসিকতার প্রবক্তা ছিল, কিন্তু তাকেও হোঁচট খেতে হয়েছে শেষপর্যন্ত সংস্কারের কাছে। তাকে দোষ দেওয়া যায় না। যত সাহসই থাক না কেন, পূর্ব স্বামীর সন্তান সহ কোন নারীকে গ্রহণ করার মত অনুকূল পরিবেশ এখনও গড়ে ওঠেনি এদেশে। অথচ এর উল্টোটা কত স্বাভাবিক ভাবে ঘটে এসেছে সেই সুদূর অতীত কাল থেকে আজ অবধি। স্বামীর পূর্ব স্ত্রীর সন্তানদের প্রতি বিমাতার স্নেহ ও ঔদার্যের শত সহস্র গৌরব-কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে কত না সাহিত্য ও মহাকাব্য। নূপুর ভাবে, উদারতা কি শুধু নারীর ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক? পুরুষকে বুঝি উদার হতে নেই?

ভাবতে ভাবতে নূপুর ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন তার ঘুম ভাঙলো, তখন ঘর ফাঁকা। মিমু তার পাশে ঘুমুচ্ছে। তাকে ঘুমুতে দেখে কুশল বোধ হয় তার ঘুম না ভাঙিয়ে নিঃশব্দে চলে গেছে। নূপুরের খুব খারাপ লাগছে।

সে টেরও পায়নি কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। উঠে বসতে গিয়ে হঠাৎ নূপুরের নজর পড়ে তার বালিশের পাশে একটা ভাঁজ করা কাগজের ওপর। কাগজটা হাতে নিয়ে ভাঁজ খুলে দেখে, কুশলের লেখা চিঠি—

নূপুর,

তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ। অনেকক্ষণ ধরে তোমার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আজ আকস্মিকভাবে এক সত্যের সন্ধান পেয়ে শিহরিত হলাম। এই সত্য কত দিন ধরে আমার বুকের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, জানি না। কিন্তু আজ জানার পর আর তাকে অস্বীকার করার শক্তি আমার নেই। এই মুহূর্তে আমি অনুভব করতে পারছি, আমার সমগ্র সত্তা তোমার সত্তার সঙ্গে মিশে গেছে, আমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বলতে আর কিছু রইল না। ভীষণ ইচ্ছা করছে, তোমাকে জাগিয়ে নিজের মন উন্মুক্ত করি, কিন্তু সাহস হল না। তাই মিমুকে বুকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলাম—'মিমু, তুমি আমাকে ভালবাস?' ও মিষ্টি হেসে বলল— খু-উ-ব ভালবাসি।' আপাতত এই পাওনাটুকু আমার কাছে অমূল্য। তোমার আর আমার ভালবাসায় গড়ে তোলা একটি সুখের নীড় মিমুর মত একটি পবিত্র শিশুর প্রাণোচ্ছল কলরবে কলমুখরিত হয়ে উঠবে,— আপাতত এই স্বপ্ন বুকে নিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

যাবার আগে আর একবার তোমাকে দেখছি। আশ্চর্য! এত সুন্দর ও মাধুর্যমণ্ডিত মুখ তোমার—কই, আগে কখনও দেখেছি বলে তো মনে করতে পারছি না! ইতি— কুশল

বারবার চিঠিটা পড়ে নূপুর। একটা আশ্চর্য আবেগের উল্লাসে তার দেহ ও মন অবশ হয়ে আসে। নিজের অন্তরের গভীরে সে দৃষ্টিপাত করে। একটা অস্পষ্ট চেহারা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চিনতে পারে নূপুর, এই তো কুশল। 'কুশল! কুশল!' বারবার অস্ফুটে উচ্চারণ করে সে।

অনুভবের আগে, পরে

সুদর্শন সেনশর্মা

শিশু শল্যবিদ ডাঃ বিনায়ক ভট্টাচার্য মৌলালির কাছে একটা ক্লিনিকে সাড়ে ছ'টা সাতটা পর্যন্ত থাকেন, পারিজাত সেইরকমই বলেছিল—পাতিপুকুরে স্বাগতাদের বাড়ি থেকে সাড়ে তিনটেয় বেরিয়ে মানিকতলার মোড় পৌছতেই বিনোদের পাঁচটা পঁয়ত্রিশ হয়ে গেল। নিশ্চয়ই কোন মিছিল টিছিল আছে, তার ওপর দত্তবাগানের কাছে এক অটো উল্টে যাওয়ায় রাস্তা প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম। এসব পিছলে শ্যামবাজার পৌছতেই বিনোদের দফারফা। এখন মানিকতলার মোড়ে এসে বিনোদ আবার যানজটে। আবার। সেকি বাস থেকে নেমে পড়ে কোন দোকান থেকে একটা ফোনের চেষ্টা করে ডাঃ ভট্টাচার্যকে একটু ওয়েট করতে বলবে? নাকি কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট থুরি বিধান সরণি বা আমহার্স্ট স্ট্রীট ঘুরে মৌলালি পৌছনোর একটা ডেসপারেট···শালার ট্যাক্সি! সে কি আর ধরা যাবে! টালিগঞ্জ বললে তারা টালা যাবে বলে। যেতে চাইলেও দশ বারো টাকা সেলামি ডিমাণ্ড করবে। এতটা লাক্সারি বিনোদ এখন পারবে? অবশ্য অনুভবের জন্য এসব এখন লাক্সারি নয় নেসেসিটি! সে কি স্বাগতার মত কথা বলে ফেলছে। আজ মাসের পনেরো তারিখেই বাইরে থেকে একটা আই. ভি. পি এবং আলট্রাসাউণ্ড করিয়ে বিনোদের মাস মাইনে থেকে তেরশো টাকা বেরিয়ে গেছে। বিনোদের সত্যি এখন জেরবার অবস্থা—বিনোদ ঘড়ি দেখে, পৌনে সাতটার মধ্যে তাকে চেম্বারে না পৌছলেই নয়। সবকিছু আজকেই ঠিক করে ফেলতে হবে—হ্যাঁ আজকেই।

বিনোদ কাল অফিস গিয়েছিল। পি. এফ থেকে কিছু লোন নেয়া যায় কিনা? সবাই অনুভবের খোঁজ নিল। কী হয়েছে? দাদা কি করছেন—উইদ নিউমারাস আনওয়াণ্টেড সাজেশসন্‌স। ইউনিয়নের তালেবড় বিভাস মোদক বলল—হ্যাঁ হ্যাঁ বিনোদ পি. এফটা আমরা দেখছি···তবে অ্যাজ এ ম্যাটার অব ফ্যাক্ট আমার মনে হয় তোমার প্ল্যানিং এ কিছু ভুল আছে। আজকাল ভাই হাসপাতালের ভরসা কেউ করে নাকি? কোনো সা-লা ডাক্তার

সরকারি হাসপাতালে কাজ করে না। খালি ছুতো। এটা নেই সেটা নেই। কী নেই জিজ্ঞেস কর—কিছু বলতে পারবেনা। আরে সবই তো দিয়েছি—তোরা ডাক্তার হয়েছিস আর কি—মাথা কিনে নিয়েছিস। তোদের ডাক্তার বানাতে সরকার কত খরচা করেছে সেটা মনে থাকেনা। আমরা শালা হাতি পুষছি নাকি অ্যাঁ ?

বিনোদ একটু বাধা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে, ছাখ ভাই ক'দিন হাসপাতালে গিয়ে আমার মনে হয়েছে—তোমাদের সবকথাও ঠিক নয়—ডাক্তারদের হাজার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়। ডাক্তারদের বিরুদ্ধে পাবলিক উস্কে দেবারও একটা রিসেন্ট ট্রেণ্ড লক্ষ করা যাচ্ছে। যে যার মত যখন খুশী হাসপাতালে হুজ্জোত করে যাচ্ছে। আর হাসপাতালের পুলিস—থাক সে কথা। হাসপাতালের বিছানায় তারা যেন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য আছে—কোন ঝামেলা হলেই তারা গা ঢাকা দেয়—কালকের একটা গল্প...

বিভাস থামিয়ে দেয়, 'দাঁড়াও বিনোদ, দাঁড়াও—এখনও তোমার ছেলের অপারেশন হয়নি কিন্তু, অথচ বলছ ডাক্তাররা সাংঘাতিক কিছু সাসপেক্ট করছে।

ডাক্তারদের এত সার্টিফিকেট দিচ্ছ—পরে পস্তাতে হতে পারে...'

অ্যাকাউন্টসের পারিজাতের এক খুড়তুতো ভাই ডাক্তার। পারিজাত ও বিনোদকে অনেক খবরাখবর দেয়, দিচ্ছে। পারিজাত খর চোখে বিভাসের দিকে তাকাল। সেদিন ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে পারিজাতের সেই ভাই নাকি হেকেলড্ হয়েছে—পারিজাত বলল—বেশ শ্লেষের গলায় হ্যা, 'হ্যা ঠিকই বলেছ বিভাসদা—ডাক্তারদের তো বাপ-মা নেই তাই তারা সরকারি হাসপাতালে, ইমার্জেন্সিতে সম্মান বিসর্জন দিয়ে—অহোরাত্র খাটবে। আমার ভাই এর বেশ খাটিয়ে সিন্সিয়র বলে খ্যাতি আছে—যাচাই করে আসতে পার—বিনা দোষে, বিনা কারনে কিছু সমাজবিরোধী বেইজ্জত করে গেল—বলে গেল সরকারের ওকে ডাক্তার বানাতে যা খরচ হয়েছে তা নাকি হাসপাতালের বাইরে বেরলেই আদায় করে নেবে—

আর বিভাস মোদকদের হাসপাতালের পুলিস বাপকেলে হাইড্রোসিল নিয়ে, গেটে বাত নিয়ে ফাঁড়িতে স্রেফ লুকিয়ে থাকল...

—থাম থাম ডাক্তাররা যেন সব ধোয়া তুলসী পাতা।

তোমরা সব নেতারা যেমন ?

বিভাস চোখ লাল করে বলল—ব্যক্তিগত কুৎসা এবং আক্রমণ খুব খারাপ কিন্তু পারিজাত। তোমার আঁতে ঘা লেগেছে তাই। ডাক্তারদের জন্য অনেক করা হচ্ছে…

—ছাই করা হচ্ছে…

—না জেনে তর্ক করলেই হবে…

—তুমি সব জেনে বসে আছ না?

এরপর নানাপ্রসঙ্গে প্রায় হাতাহাতির উপক্রম। বিনোদই প্রায় মারামারি ঠেকাল। দুজনকে ঠেলে চেম্বারে পাঠাল। তারপর নিজের টেবিলে বসে ঢক ঢক করে জল গিলল।

আজ সকালে স্বাগতার বাপের বাড়ি পাতিপুকুর থেকে বিনোদ নিজের বাপের বাড়ি হাতিবাগানে এসেছিল। মা দরজা খুলে দিয়ে ডাকলেন আয়, অনুচ্চ গলায় বললেন, শুনছ বিনোদ এসেছে। বাবা তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। অনুভবের বছর দেড়েক বয়সের সময় এ বাড়ি ছেড়ে যেতে হয়েছিল বিনোদের। সেই থেকে একটার পর একটা ঝামেলা সামাল দিতে হচ্ছে বিনোদকে। ফুলার এর কোটেশনটা বিনোদ জানে। ফুলার-এর উপদেশ চোখ খুলে বিয়ে করবে আর বিয়ে হবার পর চোখ বুজে থাকবে। সে কি চোখ বুজে থাকার খেসারত দিচ্ছে এখন। হবে হয়তো। সে যখন স্বাগতার তাড়ায় এবাড়ি ছেড়ে ছিল তখন বাবা, মা মোটেও বাধা দেননি। একটা কথাও বলেননি। স্বাগতা বিনোদের মাকে একদম সহ্য করতে পারে নি: মায়ের ন্যাওটা বলে খ্যাত বিনোদকে বিয়ের তিন বছরের মধ্যে স্বাগতা বগলদাবা করে কসবার ফ্ল্যাটে নিয়ে তুলেছিল। ফ্ল্যাটটাও স্বাগতার বাপের বাড়ির দিককার একজন—পিসতুত দাদা না কে (ওরকম অনেক রকম তুতো স্বাগতার স্বাগতাদের আছে) জুটিয়ে দিয়েছিল।

বাবা-ই একদিন বলেছিলেন যা, স্বাগতা যখন চাইছেনা – যেখানে শান্তিতে থাকবি তার ব্যবস্থা কর। তোর মা-ও কিছু বুঝবেনা…

—মায়ের আমি দোষ দিচ্ছি না।

'আমি দিচ্ছি'—বাবা বলেছিলেন।

বাড়ি ছেড়ে যাবার দিনটা? ভাই, বাবা, মার মুখ একদম থমথমে। স্বাগতা ভ্রুক্ষেপহীন। সে তদারকিতে ব্যস্ত। তার এক খচরা খুড়তুতো ভাই এসে জিনিসপত্র সরিয়ে দিচ্ছিল। ছেলেটাকে ভীষণ অপছন্দ ছিল বিনোদের।

অনুভব বাবার কোল থেকে নামছিল না। কিছুতেই আসবেনা। স্বাগতা একরকম প্রায় ছিনিয়ে আনল—অনুভবের সে কী কান্না! বাবা-মা স্বাগতা-বিনোদদের নিয়ে ট্যাক্সি চলে যাওয়া অব্দি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাত নেড়ে ছিলেন। স্বাগতা তার বাবা মাকে প্রণাম পর্যন্ত করেনি। অনুচ্চগলায় বিনোদ সেকথা বলতে স্বাগতা খেকিয়ে উঠেছিল 'তুমি থামোত।'

বাড়ি ছেড়ে সুখী হয়নি বিনোদ। হয়েছে কি। বাবা মা কোন কথাই বলেননি। বাধাত দেনই নি। শুধু বুড়ি ঠাকুমা (বাবার এক ছোট পিসি) বিনোদকে যে ন্যাংটো অবস্থা থেকে আস্কারা দিয়ে গেছে—ঘর থেকেই বেরয়নি। বিনোদ দেখা করতে গেলে একটাই কথা বলেছিলেন। সেটাকে মিসাইল বলতে পারে বিনোদ।

বউ এর কথায় ওঠ্‌বা আর বসবা—যাতিছ যাও কসবা—দেখি কোন ঘষা ঘষবা!

বাবার এখন স্পষ্ট অভিমান—'তুই আগে একটা খবর পর্যন্ত দিলিনা। দাদু ভাই এর কদ্দিন অসুখ?'

বিনোদ বলল ভাইকে ফোন করে পাইনি। ওর সেন্ট্রাল এভিনিউর অফিসে ফোন করে বলেছিত খবর দিতে। দেয়নি?

না দিলেই ভাল, তুমি তো চিন্তায় চিন্তায়—তোমাদের জন্যে কিছু করতে পারি না শুধু চিন্তায় ফেলা···

মার আবার হাঁটু ফুলছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে বিনোদের পাশে ধুপ করে সোফায় বসে শঙ্কিত গলায় মা জিজ্ঞেস করলেন—কি হয়েছে আমার দাদার?

বাবা বিস্ময়ের গলায় বললেন 'আগে কিছু বুঝতে পারিসনি? বৌমাও খেয়াল করেনি!'

বিনোদ ঢোক গেলে! বাবা, অনুভব ত দিনসাতেক জ্বরে ভুগল। তার-পর হঠাৎ পেটে ব্যথা। বালীগঞ্জের এক পিডিয়াট্রিসিয়ানকে দেখাই সেই প্রথম লাম্পটা নোটিশ করে। আমরা কিস্যু বুঝিনি—ওর ইউরিনারি ট্রাবলও কিছু ছিলনা।

উইলমস' টিউমার মানে তো ক্যানসার। তাই না! ওই তো অফিসের পরমা নন্দর নাতির···বিনোদ মাথা দোলায়।

মা হাউমাউ করে উঠে বলল 'তোমরা কী সব অলুক্ষুনে কথাবার্তা বলছ—

দাদাকে এখানে নিয়ে চলে এস—দাদা কারুর একার নয়…' বাবা মাকে থামিয়ে দেয়। দাঁড়াও আগে সব শুনতে দাও।

বিনোদ এখন ধারাবিবরণী দিতে থাকে। চাইল্ড স্পেশালিষ্টের কথা মত সার্জন কনসাল্‌ট করি, তিনিও ক্যানসার সাসপেক্ট করেন। কেননা ওদের ভাষায় মাসটার একটা সলিড ফিল ছিল যা নাকি টিউ মারেই…

—তারপর?

উনি একটা আই ভি পি করতে বলেন। হাসপাতালের মেশিন খারাপ। আই ভি পি বাইরে করাই। ডানদিকের কিডনিতে ডাইই আসেনি—চব্বিশ ঘণ্টা বাদেও।

—ওসব আমি বুঝিনা। আসল কথা বল।

'দাদার কি কিডনি ড্যামেজ হল'—মায়ের আর্তনাদ।

'আই ভি পি দেখে বিনায়ক ভট্টাচার্য একটু আশার আলো দেখান। বুঝলেন ক্যান্সার নাও হতে পারে। আপনি একটা আলট্রাসাউণ্ড করাতে পারবেন? আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি সনোলজিষ্টকে—কিছু কমে—তারপর ডাক্তার ছবি এঁকে দেখান এই কিডনি, এই রেনাল পেলভিস…তারপর কি—ওহ্‌, বাপস—ইউরেটার—বিনোদ এখন মনে করে মাথা চুলকোয়—ডাক্তার বলেছে এই যে লাম্পটা না, মে বি এ ব্যাগ অব ইউরিন আণ্ডার টেনসন—যার জন্য মাসটাকে বাইরে থেকে সলিড ফার্ম মনে হচ্ছে…'

—আলট্রাসাউণ্ড হয়ে গেছে

—হ্যা গতকাল…

—রিপোর্ট -

—আজ দেবে।

'আমাকে বিনু আজ জানাবি। জানাবি কিন্তু। কাল আমরা যাব।'

বিনোদ বলল—দ্বিধার গলায় বলল, 'ওরা কসবায় নেই। পাতিপুকুরে উঠেছে।'

মা বলল—ওহ্‌।

বাবা ইজিচেয়ারের হাতল থেকে চশমাটা টেনে নিলেন।

গোটা তল্লাট জ্যামে পড়েছে। আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের মুখটায় মানিকতলার মোড় থেকে হেঁটে চলে আসে বিনোদ। সব গাড়ি নট নড়ন চড়ন হয়ে

আছে। এই জট নাকি বিবেকানন্দ রোড ধরে বিধান সরণি অব্দি ছড়িয়ে গেছে। বিনোদ অগত্যা আমহার্স্ট স্ট্রীট ধরেই এগোতে যায়। দুটো ট্যাক্সি মিটারে লাল কাপড় জড়িয়ে বিধান সরণির দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিল। বিনোদ অনুনয় করল, ছেলের অসুখের কথা বলল—যেচে বেশী দিতে চাইল, তাদের মন গলল না। এরই মধ্যে আবার মিছিল চলেছে। আটকে পড়া একটা দুশো চল্লিশ নম্বর বাসের ভেতর থেকে একটা লোক স্পষ্ট বলল, বিনোদ শুনল —শুয়োরের বাচ্চারা কি আয়নায় আজকাল মুখও দেখেনা ?

বিনোদ ছোটা শুরু করেছে। হার্ডওয়ার, লোহা লক্করের দোকান— কুলপির দোকান সে পেরিয়ে যায়। সে ছোটে। তাকে মৌলালি পৌঁছতে হবে। গলির মোড়ে এক বৃদ্ধ আর এক বৃদ্ধকে অনুচ্চ গলায় দুর্নীতি প্রসঙ্গে কিছু বলছেন।

হঠাৎ বিনোদ দেখে, বিনোদ দেখল উস্থমপুর-ধর্মতলার দিকের একটা সাউথ বেঙ্গলের বাস গলিপথে এরাস্তায় এসে উঠল—আমহার্স্ট স্ট্রীট হ্যারিসন হয়ে তিনি শেয়ালদায়—মৌলালিতেও যেতে পারেন···

ভীষণ ভিড়। বিনোদ ওঠে। গুঁতো খায়। হুমড়ি খায়। সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। পকেট থেকে একটা দুটাকার নোট বের করে হাতে নিয়ে কোনমতে দাঁড়ায় বিনোদ। আমহার্স্ট স্ট্রীটের এদিকটা তো বেশ ফাঁকা—বাস চলতে শুরু করেছে। এক মধ্যবয়স্ক গালাগাল দিচ্ছেন। বাসের একদম ভেতর থেকে। বিনোদ তাকে দেখতে পায় না। অন্যরা হাসছে বিনোদ দেখল। 'খালি মিছিল। মিছিল—কাজের অষ্টরম্ভা···

মশয় তিনটেয় ডানলপ থেকে বেরিয়ে সওয়া ছটায় আজকাল অফিস। এক ফচকে ফস করে বলে, 'দাদা উন্নতির লক্ষ্যেই ত কৃচ্ছ্রসাধন !'

বৃদ্ধ বিষোদ্গার করেন—'হাতি ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল ?'

ছেলেটি হাসে—আপনি নিশ্চয়ই—এই মাইরি দাদু অকমিউনিষ্ট।

পথের গ্লানি এবার মজায় মেশাতে চাইছে অনেকে। কে বলল—দাদু কি বি. জে. পি ?

বৃদ্ধ ফের হুঙ্কার ছাড়েন। হ্যা আমি অকমিউনিষ্ট। সেই ভাল। রোম যখন পুড়িতেছিল···যাক সে সব কথা···কমিউনিষ্ট। কে কমিউনিষ্ট ? বৃদ্ধ বিড়বিড় করেন 'আমি কমিউনিস্ট বলতে ভবানী সেনদের জানতাম—বল্লাল সেনদের নয় !'

অম্বিকা চক্রবর্তি কমিউনিষ্ট ছিলেন এখন ভোম্বল চক্রবর্তি—সোমনাথ লাহিড়ি, কংসারি হালদাররাও কমিউনিস্ট ছিলেন এখন বিজ্‌লি চোংদার··· আর কটা একজাম্পল দেব···

—ব্যাস ব্যাস দাদু বুঝে গেছি আপনি আস্‌লে কি...

—আসলে কিছুই না—

ছেলেটা আসলে খুব বদমাশ। বিনোদ ভাবে। বৃদ্ধকে সে খচাতে চাইছে। ছেলেটি বলল দাদু ডেটোরিয়োরেশন তো সব স্ফিয়ারেই হয়েছে এই খেলার মাঠের কথাই ধরুন না—চুনী বলরাম পিকে রামবাহাদুর থঙ্গরাজ খেলে গেছে এখন সব বঙ্গরাজ ঢঙ্গবাজ খেলছে...খালি টাকা—

—বাহ্‌, ভাই বেশ বললে তো...

বিনোদের ভাল লাগেনা এসব। ছ'টা উনচল্লিশ। সে দুটাকার নোটটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কণ্ডাক্টর কোথায় ভিড়ে হারিয়ে গেল। বাসটা হ্যারিসন রোড ঘুরছে? শেয়ালদায় আবার আটকে দেবেনা ত? বিনায়ক ভট্টাচার্য সাড়ে সাতটা অব্দি থাকবেন বললেন তো।

বাবা বলেছেন, দাদুভাই সবার আগে। নার্সিংহোমে করাতে হলেও করা হবে। ন্যাশন্যালে স্ট্রাইক হল। এ হসপিটালও তো বন্ধ হতে পারে। লোডশেডিংএ, ফণ্টে ও,টির এয়ার কণ্ডিশনিং মেসিন-এর ফিউজ পুড়ে ওটি বন্ধ হতে পারে। ধোপা টাকা পয়সা না পেয়ে ঠিক-সময় মত ও-টির চাদর-টাদর লিনেন ফেরৎ না দিলে স্টিম না হলে ও.-টি বন্ধ হতে পারে—'রমেনের বেলা দেখলি না?' বাবা ঠিক একজাম্পল দিয়ে দেবেন।

না শেয়ালদা ফাঁকা হয়েছে। ফ্লাইওভারে গাড়ি উঠতেই বিনোদ গেটের কাছে এগোতে চায়। সে এগোতে পারে না। ভিড়ে গুঁতো খায়। সে হাত তুলে রাখে। দু'আঙুলের ফাঁকে দু টাকার নোট ধরে রাখা আছে। সে 'কণ্ডাক্টর' কণ্ডাক্টর বলে দু'বার ডাকল।

কেউ সাড়া দিল না। পাশ থেকে একজন বলল—'থামুনতো একঘণ্টার পথ চারঘণ্টায় ও যেতে পারে না—টিকিট কেটে কি হবে?'

আচ্ছা এই ভিড়ে নামতে পারব তো। বিনোদ ভাবে। বিনোদ অস্থির হয়। বিনোদ ডাক্তারের কথা ভাবে। ছেলে অনুভবের কথা ভাবে। বাবার কথা ভাবে, মায়ের কথা ভাবে। ভাইএর কথা ভাবে। মৃতা ঠাকুরমার কথা ভাবে। আ মরণ! তুমি আমাদের পাশে কি বসবা! বউ লইয়া

আলাদা হইয়া হ্যাসে কসবা গিয়া ষষবা ? বিনোদ ম্লান হাসে। বাবার পিসিমা কত বয়সে বিধবা হয়েছিলেন ! মিননেসের ছিটে ফোঁটাও সে কখনও দেখেনি। রেড আপটু ক্লাস থ্রি অর ফোর-কিম্বা কিছুই না। আর আজকালকার দেবীরা এত রিসোর্স সত্ত্বেও এত মিন-একটেরে হয় কী করে···যা বাবা আমার কি দোষ ! খেলাটা আমি খেলিনি, তোমরাই দেখে এনেছিলে।

বাস থেকে নামতেই দুটো লোক তাকে ঠেলল, 'এদিকে আসুন।' কণ্ডাক্টর নেই, থাকলেও কোথায় কেউ জানে না—বাসটা মৌলালি দাঁড়ায়। বাস থেকে নেমে বিনোদ টাকাটা উঁচু করে 'কই দাদা টিকিটটা নিন' দুবার বলার পর বাস স্টপে দাঁড়িয়ে থাকা দুটো লোক তাকে ঠেলল 'এদিকে আসুন। টিকিট কাটবেন ত। এদিকে আসুন।' একটু এগলেই হকার্স কর্ণার আর এণ্টালির মধ্যে সেই ক্লিনিক। একটু বাদেই বিনোদ জেনে যাবে, নিশ্চিত জেনে যাবে জীবন না মৃত্যু। অনুভবের ঠিক কী হয়েছে। লোক দুটো একি তাকে ঠেলে ঠেলে কালোজালওয়ালা গাড়ির সামনে নিয়ে আসে। এবার বিনোদ পুলিশ দেখতে পায়। 'উঠুন ভেতরে উঠুন'। বিনোদ বলে 'কী ব্যাপার', একটা লোক তার ঘাড়ে ধাক্কা দেয় 'ভেতরে উঠুন তারপর বুঝিয়ে দিচ্ছি। বাসে টিকিট কাটেন না কেন-রাস্তায় নেমে নক্সা—

—ফেরেব্বাজি—চলুন—চলুন।'

বিনোদ ঘাবড়ে যায়। আবার যায়ও না। দাঁড়াও বেশ কিছু লোক জমে উঠুক—'ইয়ার্কি পেয়েছেন আমার ছেলের ক্যানসার তিনঘণ্টা ধরে শ্যামবাজারে আটকে আছি, দু'টাকার নোট হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে কণ্ডাক্টরের পাত্তা নেই—বাস দাঁড়াতে ভাবলাম—'

বাকীটা কোর্টে গিয়ে ভাববেন চলুন !

—আ-আমি এখন ক্লিনিকে যাব, ক্ষমতা থাকলে আটকান, আমার আড়াই বছরের ছেলের ক্যানসার—কণ্ডাক্টরকে ডেকে ডেকে পাইনি এখন আপনারা আমার সঙ্গে মজা করছেন—আমি আপনাদের নামে কেস করব—আমাকে চেনেন না আমাকে চেনেন না···

বিনোদের হঠাৎ মনে পড়ে, মনে পড়ে যায়। স্বাগতা কসবার ফ্ল্যাটে একবার এরকম চীৎকার করে লোক ডেকেছিল। ফ্ল্যাটে আসার পরপরই। অনুভব তখন হাঁটতে শিখেছে ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ। গ্যাসে দুধ চাপিয়ে 'বাবু আমি এখুনি আসছি।' বলে স্বাগতা বাথরুমে ঢুকেছে আর অনুভবের সঙ্গে কথা

বলছে ভেতর থেকে—অনুভব করেছিল কি বাইরে থেকে হঠাৎ ওর মাকে আটকে দিয়েছিল। বাথরুমে বন্ধ। ছেলেত বন্ধ করা জানে। খোলা শেখেনি। কোনক্রমে বাথরুমের জানলা দিয়ে মুখ গলিয়ে স্বাগতাকে চীৎকার করে লোক ডাকতে হয়েছিল। তারপর সদরের দরজা ভাঙতে হয়েছিল।

বিনোদ এখন দ্বিগুণ আক্রোশে চীৎকার করছে। সত্যি সে এ কালো গাড়ির দরজাও এবার ভেঙে ফেলবে।

মার্কসবাদী রিনাসেন্স?

গোপাল হালদার

মোটামুটি বাংলায় তো নিশ্চয়ই, তা ছাড়া ভারতবর্ষীয় অন্যভাষায় ও ইংরেজি ভাষায় এই শব্দটি চলে; এবং তার 'চরিত্র' নিয়ে তর্ক থাকলেও একটা সাধারণ অর্থে তার প্রয়োগ হয়। সে নিয়ে তর্ক তুললে সবাই বুঝব কি বোঝাচ্ছি, কিন্তু তর্কে তা মানব না, মীমাংসাও হবে না। তর্কে মীমাংসা হয়েও হয় না, তার্কিকদের এই স্বভাব আমরা জানি। তাই তর্ক এড়াবার জন্য বিদেশীয়, প্রায়-স্বভাষায় গৃহীত 'রিনাসেন্স' কথাটিকে ইংরেজিতে বাংলায় নানা বানানে—রিনাসঁস, রেনেসাঁস, রেনেসাঁ—প্রভৃতি একটা সাধারণ অর্থেই প্রয়োগ করি, বলতে পারি, যা অমিত সেন ইংরেজিতে তথ্য ও তত্ত্বজ্ঞাপক শব্দটি তাঁর ছোট্ট 'Notes' নামক বইতে প্রয়োগ করেছেন।

আমি কিন্তু তর্ক এড়াবার জন্য বাংলায় তাই ওই অর্থে প্রয়োগ করি 'বাঙলার জাগরণ'। রিনাসেন্স কথাটির সাধারণ প্রয়োগে আমার যদিও আপত্তি নেই, তবু বাংলা রিনাসেন্স-এর চরিত্র ও বিস্তৃতি নিয়ে তর্ক ওঠে আমি চাই না। বরং উনবিংশ শতকে মোটামুটি সাহিত্য-সংস্কৃতি-সমাজ ও রাজনীতির চিন্তায় ও কর্মে যে আলোড়ন এসেছিল, তাকে তর্ক এড়াবার জন্যই আমি ইংরেজিতে awakening বলতে চাই এবং বাংলায় 'জাগরণ' বলতে চাই—'রিনাসেন্স' কথাটার সঙ্গে জড়িত নানা অর্থে জড়িয়ে পড়তে চাই না বলে।

রিনাসেন্স কি জিনিস?

সংক্ষেপে, রিনাসেন্স-এর নানা অর্থ যা প্রযুক্ত হয়, তা প্রসঙ্গানুযায়ী কোনোটাই অগ্রাহ্য নয়। সংক্ষেপে এই হিসেব নিই—'রিনাসেন্স' মূলত ইংরেজি শব্দ নয়, ইংরেজি অর্থ হল 'নবজন্ম'—একটি সামগ্রিক সংস্কৃতির ভাবধারা যা অতীত, কিন্তু তার 'পুনর্জন্ম' বা পুনরুজ্জীবন (একটু নতুন বেশে নিশ্চয়ই)। ইতালিতে ১৪ শতকে-১৫ শতকে যে অদ্ভুত জীবনধারার উদ্ঘাটন হয়েছে, প্রাচীন গ্রীস ও রোমক সভ্যতার যে কালান্তর মধ্যযুগে ঘটে এবং ঐ সময়ের একটু আগে যে ধারা পুনর্জীবন দানের চেষ্টায় উদ্ভূত হয় তার নতুন

জন্ম প্রধানত ইতালিতে। যুক্তিবাদ, গোঁড়ামি বর্জন, নতুন নন্দনচিন্তা, দিক্-দর্শন আবিষ্কার, সামুদ্রিক যাত্রায় নানাদেশে দুর্জয় অভিযান, নানাদেশ নানা সংস্কৃতি নানা মানুষের সন্ধান, সমুদ্রজয়, পৃথিবী-পরিচয়—এ সবের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন মানবজাতির ও মানব 'সমাজ ও জীবন—জীবনগতির সঙ্গে পরিচয় হলে জীবনাস্বাদের ক্ষেত্রে বিস্ময়ের অন্ত রইল না। কী 'Brave New world', কী বিস্ময়কর মানুষ ও তার জীবন, জ্ঞান-বিজ্ঞান-অনুভূতি সব নিয়ে মানুষ যেন মানবজাতি, যেন বিস্ময়ে ব্যাকুল। রিনাসেন্সের উন্মেষ মানুষের মনে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, পৃথিবীর নানাজাতি নানাদেশের পরিধির সঙ্গে কর্মে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের মাধ্যমে যেন 'নবজন্মে'।

ইতালিয় রিনাসেন্সের নতুন জাবনের দ্যোতনা, আশ্চর্য বিভাস ফুটে উঠল ১৪ শতক ১৫ শতকের ভাস্কর্য ও চিত্রকলার মাধ্যমে মানবরূপের অভূতপূর্ব উন্মোচনে। প্রাচীন প্যাগান-সংস্কৃতির মানবিক বিবর্তন ঘটে গেল মিকাইল অ্যাঞ্জেলো, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, রাফায়েল ও অন্যান্য ভাস্কর-শিল্পীদের হাতে। গোটা ইয়োরোপের শিল্পজীবন ইতালিয় এই রিনাসান্সের নতুন জীবনবোধে নবজন্ম পেল। তা সঞ্চারিত হয়ে গেল এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে।

ইয়োরোপে বিস্তৃত এই ভাবনার নানা পরিবর্তন ঘটে যায়। যার মধ্যে ব্রিটেনে এর ধারা প্রবল না হলেও ক্রমে এরই প্রেরণায় জন্ম হল 'Reformation' বা বরাবর পোপের ধর্ম-আধিপত্যের বিরুদ্ধে মার্টিন লুথার, মর্টিমার, রিড্‌লে প্রমুখের বিদ্রোহে। Reformation-কে ঠিক Renaissance এর মধ্যে গণ্য না করলেও রেনাসেন্সের ঘনিষ্ঠ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। আর Reformation থেকেও কোনো-না-কোনোভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধর্মে সচল চিন্তা এবং নতুন পৃথিবী সন্ধানের প্রেরণা জন্ম নিয়েছিল। আর, এই সন্ধানের বহুগামী পথ বেয়েই শিল্প-বিপ্লবোত্তর 'Modern Age', মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচিতি, ধর্মীয়-সংস্কার, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নানা সংস্কৃতিকে জানা, বিভিন্ন দার্শনিক, শৈল্পিক ও মানববিদ্যা-কেন্দ্রিক ভাবধারার সমন্বয় ইত্যাদির মাধ্যমে অভ্যুদয়ের আলো দেখেছিল।

* * *

বাঙলার রিনাসেন্স কথাটা 'রিনাসেন্স'-এর ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ যেমন অচল নয়, তেমনি তা নিয়ে তর্কেরও শেষ নেই। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই তর্ক এড়াবার জন্য 'বাঙলার জাগরণ'-ই বসাতে চাই। রিনাসেন্স শব্দটির বহু

প্রয়োগও স্বীকার্য, নানা রূপও কাম্য, তবে বাংলায় আমাদের ক্ষেত্র এক সংকীর্ণ ভিতের ওপর স্থাপিত, তবুও বাংলার জাগরণ' কথাটিকে তর্ক এড়িয়ে তার নিজস্ব রূপে বোঝানো যায় — আমার এই ধারণা। আন্তর্জাতিকত, মানবতা ও বিজ্ঞানচেতনার সঙ্গে দেশজ চৈতন্যের সমাহারের প্রয়াসই বস্তুত উনিশ শতকের 'জাগরণ' কথাটিকে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে।

রিনাসেন্স-এর ব্যর্থ আয়োজন ?

শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় দাশ সম্প্রতি 'বাঙলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা'র যে পুঁথিগত ও অসাধারণ সুদীর্ঘ গ্রন্থ (৬০০ পৃষ্ঠার উর্ধ্বে) আমাদের উপহার দিয়েছেন, বাংলা ভাষায় এ-জাতীয় গ্রন্থ আর রচিত হয়েছে বলে জানি না। সম্পূর্ণ গ্রন্থটি অনুধাবন-সহকারে আমি পড়ে উঠতে পারব কিনা জানি না। কিন্তু সুযোগ্য গবেষকেরা তার যথারীতি আলোচনা করবেন, আশা করি। পারলে আমি নিজেই এ-কাজ করতাম। এক্ষেত্রেও, 'রিনাসেন্স' শব্দটিকে কি ভাবে প্রয়োগ করেছিলাম, তা বলতে চাই। কারণ, আরও দু-এক জন বন্ধু তার মর্ম আমার কাছে জানতে চেয়েছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ কালে বামপন্থী নানা আয়োজনকে বলেছিলাম বাঙলার নতুন এক রিনাসেন্স-এর আভাস বা উদ্যোগ। এ-সম্পর্কে ৬০০ পৃষ্ঠাব্যাপী গ্রন্থে বাঙালী লেখকদের বিবিধ প্রসঙ্গে রচনার সংকলন সত্যিই মনস্বিতার পরিচয় দেয়। এই লেখকদের অধিকাংশই শ্রম ও নিষ্ঠা সহকারে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডে মার্কসবাদীদের উদ্যোগের বিচার ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। এই শ্রদ্ধেয় লেখককুলের রচনার বিবরণ রিনাসেন্স-শব্দটিকে নতুন মাত্রা দিতে প্রায়শ সক্ষম হয়েছে।

যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গেই ধনঞ্জয় বাবুর সংকলিত রচনাগুলিতে বিভিন্নমুখী জাগরণের প্রয়াস প্রতিপাদ্য হয়েছে। মার্কসবাদী সাংবাদিকতার ওপর আলোচনা এই কর্মকাণ্ডেরই এক অভিনব মাত্রা হিসেবে যুক্ত হতে পারে। অনেক রচনাতেই পুরোনো বেশ কিছু ভুল ধারণাকে শুদ্ধ করে নেওয়ার সৎ প্রয়াস আছে। জানিনা, আমার এ-উক্তিও অসম্পূর্ণ বা অসার্থক কিনা। এখানে কয়েকটি কথা নিবেদন করতে চাই।

(১) গোড়াতেই লক্ষণীয়, মূলত এ আন্দোলনের সমগ্র আবহ ছিল বাঙালী বামপন্থী রাজনীতিক চেতনা বা ভাবনা। এর আরোহ ছিল আন্তর্জাতিকতায়। কখনো কখনো জাতীয়তাবাদী চেতনা ও আন্দোলনের সঙ্গে

এ-কারণেই বামপন্থীদের সংঘাত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী 'United front' প্রবর্তন ও তার সঙ্গে কংগ্রেসের জাতীয় সংগ্রামের নানামুখী সংঘাত এখান থেকেই ঘটে গেছে। মতাদর্শের নামে বামপন্থীরাও বহু সময় যে পেতি-বুর্জোয়াসুলভ ভ্রান্ত মানসিকতার শিকার হয়েছেন, ইতিহাসের ও কালের বিচারে তা স্বীকার না করলে অপরাধ হবে। বহু সময় আমরা দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও অনুভবের সঙ্গে যুক্ত হতে পারিনি এবং তার ফলে মার্কসবাদী রিনাসেন্স-এর উদ্যোগ যে অনেক পরিমাণে খর্ব ও ব্যর্থ হয়েছে, তাও অস্বীকার করে লাভ নেই।

তবু এই বহুমুখী বামপন্থী আন্দোলন পর্ব (১৯৩০—১৯৪০) নতুন চিন্তা-ভাবনার বিশেষ করে বাংলার সেই 'জাগরণ'-এর এক স্পষ্ট শক্তি। বহুমুখী ধারার সাহিত্য-কবিতা-নাট্য-সঙ্গীত-শিক্ষা ইত্যাদি মাধ্যমে বৃত কর্মীদের চেতনার প্রস্ফুরণ, ভারতে কৃষক-বিপ্লব ও মূল ধনতান্ত্রিক জাতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-বাণিজ্য যখন প্রায় দৃষ্ট হয়নি, তখন শোষিত শ্রমিক-কৃষক (সোভিয়েত-অনুরূপ) বিপ্লবের স্বপ্ন দেখাও ছিল ঐ 'জাগরণ'-এর একটা রূপ।

(২) Progressive writers Association (পরে Anti-Fascist W. A.) ও তৎপ্রেরণার সাহিত্য, কবিতা, উপন্যাস-গল্প, পরে গণনাট্য সঙ্ঘ, তৎসহ নব নৃত্যকলা, লোকনৃত্য, লোকসঙ্গীত প্রভৃতির অভাবিত উদ্বোধন—শহরে, গ্রামে, প্রায় সর্ব অঞ্চলে এসবের প্রসারের উল্লেখ করা এখানে অসম্ভব—সবকথা মনে না থাকলেও তার বিপুল শক্তির কথা ভোলা অসম্ভব। একই সময়ের কংগ্রেসী উদ্যোগ ও বাঙলা সংস্কৃতির সামগ্রিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও কমিউনিস্টদের কর্মে ও ভাবনায় (১৯৪০ থেকে মন্বন্তর-বিরোধী সংগ্রামে) কমিউনিস্টদের (বামপন্থার তো নিশ্চয়ই) দ্বারা অধিকৃত হয়েছে। কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান কোনো ক্ষেত্রেই তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারেনি।

(৩) জাতীয় United front-এর এই প্রয়াসযুক্ত জাগরণ যুদ্ধকালীন আন্তর্জাতিক জটিলতায় ক্রমেই আক্রমণস্থল হয়ে উঠছিল। এই সংকটকে প্রায় বিপর্যয়ের স্তরে নিয়ে গেল উগ্র জাতীয়তাবাদী (কংগ্রেস-পরিচালিত) কুৎসা প্রচার ও প্রত্যাঘাত এবং এর সঙ্গে যুক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সর্বনাশ।

(৪) ১৯৪০-এর পর থেকে বামপন্থী প্রেরণা ও ভাবাদর্শ ক্ষুণ্ণ করার প্রয়াস, People's war-নীতির তীব্র বিরোধিতা, সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে কমিউনিস্টদের

মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর সুপরিকল্পিত আঘাত সৃষ্টি, অপরদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে বামপন্থী মূল্যায়ন ও কর্মোদ্যোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের এক বড় অংশের অবিশ্বাস-সঞ্চার এমনকি কোনো কোনো স্তরে Counter-প্রতিরোধ সংগঠন—সবই এই ন তুন রিনাসেন্স-এর বিপক্ষে বলীয়ান চেহারায় উঠে দাঁড়াল।

(৫) একমাত্র অটুট রইল 'ক্যাডার'-সম্বল কমিউনিস্ট পার্টি বা অন্য কোনো কোনো বামপন্থী দল। স্মরণীয়, বিপুল ভারতীয় জনসমাজে তারা মুষ্টিমেয়। কিন্তু এমন Loyal, প্রাণপণ-কর্মী কোনো পার্টি কি পেয়েছে এ-দেশে? কিম্বা অন্য কোনো কমিউনিস্ট পার্টি, অন্যত্র? তাই C. P. I মন্বন্তরের সময় ছিল জনসমাজের কাছে, ছিল নিজ কর্মপ্রচেষ্টায় ও 'জাগরণ'-মুখী চেষ্টায় জীবিত। কিন্তু 'Quit India' আন্দোলন-বিরোধী হয়ে পার্টি ক্রমশ জাতীয় মূলধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ল। এরপর ইংরাজ-বিরোধী আন্দোলনে কংগ্রেস যখন C. P. I-এর ওপর জেহাদ চালানোর সর্বাত্মক আক্রমণ শুরু করল, তখন নিজস্ব রাজনীতি আশ্রয় করে পার্টির পক্ষে আত্ম-রক্ষাও দুরূহ হয়ে উঠল। ১৯৪৫-এর পর এদেশে মার্কসবাদী রিনাসেন্স-এর উদ্যোগ আর প্রাণবন্ত হতে পারল না এসব কারণেই।

(৬) পরবর্তীকালে রণদিভে-পর্বের হঠকারী কলোসাস চেহারা নিয়ে এই 'জাগরণ'-এর ইতিবাচক ও বহুসঞ্চারী প্রভাবকে সংকীর্ণতার অসুখে একান্ত ক্ষীণ করে তুলল। মার্কসবাদী রিনাসেন্স একটা 'স্বপ্ন'-ই রয়ে গেল, সত্য হয়ে উঠতে পারল না।

বিখণ্ডিত বাংলায় এই 'জাগরণ' স্বভাবতই নিষ্প্রভ হয়ে যায়। দায়বদ্ধতার ও শোষণমুক্তির সংগ্রামে ক্রমশই ভাঁটা পড়তে থাকে। প্রতিক্রিয়া, দেশীয় ও পরবর্তীকালে মাল্টিন্যাশনাল বাণিজ্য-সংস্থাগুলির ব্যাপক চাপ জাতীয় জীবনে তাদের আর্থনীতিক বিজয়ের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আধিপত্য সৃষ্টি, কংগ্রেসের স্ববিরোধী চরিত্রের বিপজ্জনক রূপ এবং মৌলবাদী অশুভ শক্তির ভয়াবহ বিস্তার—এসব কিছুই মার্কসবাদী রিনাসেন্স-এর স্বপ্নকে চূড়ান্ত বিপন্নতার বাস্তবে টেনে নিয়ে গেল।

আমার কথা বলতে চেয়েছি, বোঝাতে পেরেছি কিনা জানি না। আজ জীবনের প্রান্তে এসে স্মরণ করি ১৯৪০-এর সময়ে (মন্বন্তর-এর দিনগুলিতেও) ঐ 'জাগরণ'-এর প্রতিশ্রুতি। তা ব্যর্থ হয়েছে। স্বপ্ন দিয়ে সত্য গড়া যায় নি। তবু তা নতুন কালে নতুন ভাবে, নতুন কর্মে, নতুন ভাবনায় গড়ে উঠুক, এই বিশ্বাসেই আমাদের শেষ বয়স ফের স্বপ্ন দেখুক।

হিমরাত্রির পাঁচালি

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

উদারতাহীন স্রোতের কিনারে পা ঝুলিয়ে বসে আছে
কবন্ধ, তার গলিত দুচোখ ফোলানো পেটের ধারে,
আছি নিরুপাধি বক্ররেখায় বিজ্ঞ বটের কাছে—
সে কিছু বলে না, শুধু মাথা নাড়ে মজা দিঘিটির পাড়ে।

লক্ষ্মীপেঁচাটি ডাক ভুলে গেছে, রাত্রিও তার পর
রঙ্গন ফোটে মগজের টবে—রক্তমাখানো ফুল,
মধ্যরাত্রে নিশিডাক আসে, ওঠে শাদা মরুঝড়,
অন্ধকারের খোঁপা ভেঙে পড়ে, উড়ছে পাতাল, চুল।

তর্জনীকাটা হাতের ঘড়িতে বাজে শুধু অবসান,
তীক্ষ্ণ শলাকা অন্ধ করেছে স্নিগ্ধ ভোরের দূত,
মাস্তুলহীন জাহাজের বুকে মানুষ ইঁদুর চাঁদ—
দিগন্ত-খোলা কালো মেঘ ভেঙে নেমে আসে বিদ্যুৎ।

উজাড় বাগান, উদ্ধার ঘিরে ভগ্ন রাতের হাড়,
মাথার খুলিতে শিশুর দুগ্ধ—ততোধিক যায় শেখা
যতদূর যায় খোলা খড়্গের আপোসবিহীন ধার,—
ঝরাপাতাময় রাত্রির বুকে বৈশ্বানরের রেখা।

ফিরে তাকিয়ো না পেছনের দিকে, সামনে ভাতের থালা—
গ্রাস তুলে নাও, সবলে বাজাও রক্তের কোলাহল,
তুমিতো দেখেছো সে মহাপ্লাবন আগুন চিত্রশালা—
আবার ফেরাও জাগিয়ে বেড়াও বসন্ত-দাবানল।

কে গাইছে অবসানের গান?

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

কে গাইছে অবসানের গান? ধরছে
শব্দের শূন্যপাত্রে মথিত আত্মার-কান্না?
কে ছিঁড়ছে দিনলিপির স্বেদরক্তের পৃষ্ঠাগুলো, আর তা
ছড়িয়ে দিচ্ছে উপত্যকার শূন্যে, দাঁড়িয়ে
পাহাড় চূড়ায় একা?

দাঁড়াও তুমি রোদনশীল মানুষ, আর ছাখো—
ছাখো ওই ভাসমান ধোঁয়ার মেঘ, আর
হিমার্ত পাখিদের ডানা ঝাপটানো, ছাখো—
শাল আর পাইন আর দেবদারুর শিকড়গুচ্ছের
ডানা ঝাপটানোর অভিযান
কেমন পাথর থেকে শুষে নিচ্ছে প্রাণ, আর
ওই পশ্চিমাবায়ুর গতি দিচ্ছে রুখে,
ওদের শিরদাঁড়া নুয়ে পড়তে দেখবে না তুমি
দেখবে না

আর এই ছাখো আমাকে, আমি
ছিন্নমূল একটি মানুষ, কেমন
হেঁটে যাচ্ছি চড়বড়ে রোদে, ছাতা ছাড়াই
আমার গোড়ালি ফেটে রক্ত ঝরছে কালো পিচের রাস্তায়
তবু থামতে পারি না
হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে এই
বৈরী বিশ্বের প্রাণ-ভোমরা খুঁজে ফিরছি, এই—
লালকমল-নীলকমলের দেশে

কে গাইছো অবসানের গান? ধরছো
শব্দের শূন্যপাত্রে মথিত আত্মার কান্না?
নক্ষত্রপতন দেখে ভাবছো

একটি একটি কোরে সবক'টি তারাই
পড়বে খসে, আর
আকাশময়-প্রস্তরিত অন্ধকার
পড়বে ছড়িয়ে, আর
বোবাকালা রাত্রির চোখ থেকে খুবলে নেবে
হিরণ্য-প্রভ মণিদুটোই
নামবে অবসানের অন্ধতা
দুলতে থাকবে রাক্ষুসীরাতের শূন্যতা
হিমমসৃণ পর্দার মতো
সমুদ্রের ঢেউ আর উদ্বেল হাওয়ার কান্না
শুধু শুনতে পাবে তুমি, শুধু
শুনতে পাবে

স্বপ্নের নেই মরণ, তার চলা বিরামহীন, তার
পাপড়ি ঝরাতে ঝরাতে ফুটে ওঠার গল্প
ফুরোয় না কোনোদিন, তার
নিভে যাওয়া সলতেগুলো জ্বলে উঠবে দপ্ কোরে
মুমূর্ষু ওই শরীরময় আঙুল ঘুরবে হাওয়ার
কখন গানে জাগবে চরাচর, তারই জন্যে
প্রতীক্ষা, তারই জন্যে স্বপ্নের এই প্রতীক্ষা

এ-যে বয়সের তোলপাড়

কমলেশ সেন

একটা স্বপ্ন আমার মধ্যে বারবার নেচে ওঠে
আমাকে নাচায়,
আমি প্রেমের জন্যে পাগল হয়ে উঠি।

মেঘের মধ্যে দেখি আমার মুখ জলের ছবি
গাছের হৃদয় থেকে উঠে-আসা গাছের ডালপালা

বাতাস

মাছের স্ফটিক চোখের মতো ভালোবাসা।

আমি রোদের মধ্যে ধরতে চাই রোদের রঙ
বাতাসের মধ্যে গন্ধের হালকা হাওয়া
তোমার চোখের মধ্যে ভাসিয়ে দিই আমার চোখ
আমার কেয়া পাতার নৌকো।

ভালোবাসতে গিয়ে আমি সত্যি ভুলে যাই পিতার আকাঙ্ক্ষা
ভীষণ খিদের স্বপ্ন
আমার গভীর পকেটে-রাখা আর্তস্বর!

মুনিজা, তোমার হাত ধরে আমি আকাশ নাচাই
আকাশ থেকে ঝ'রে পড়ে
বৃষ্টির পৃথিবী রোদের পৃথিবী শীতের পৃথিবী।

ভালোবাসার গভীর মুখ
আমাকে সামনে পেছনে টানে যেন জোয়ারের টান
যেন ভাটার মধ্যে প্রেমের যন্ত্রণা।

আমি ফুল ফোটাই এগাছে সেগাছে, রেণুর গন্ধ নিই
কথার মধ্যে তুলি বাঙ্ময় কথার শব্দ
বুকের মধ্যে নামাই ভরা-যৌবন, নদী।

তোমাকে দিতে চাই আমার বুকের অন্দরে রাখা
ফুসমন্তর-জীবন পাখির কোলাহল।

তুমি বল, আমার প্রেম বড় নচ্ছার
কোনো হিসেব জানে না।

আমি বলি, এ-যে বয়সের তোলপাড়।

নীল হরিণ

ভাস্কর চক্রবর্তী

কালরাতে কী আশ্চর্য নীল একটা হরিণের স্বপ্ন দেখেছি।
ভাবি ভুলে গিয়ে ফের হিসাবের খাতা টেনে নেবো
শতকরা কতো লাভ কতোই বা ক্ষতি
সঞ্চয়-প্রকল্প আর নব-হিমালয় আবাসন
এই আর ছোটা আর ছুটে যাওয়া দ্রুত ছুটে যাওয়া
হনহন করে হাঁটা, ফিরে আসা, চাপা উত্তেজনা
এক ঢোকে গিলে ফেলা
বসে পড়া, শুয়ে থাকা, কপালের ভাঁজে
দেখে কি ফেলেছো তুমি বুঝে কি ফেলেছো কথাগুলো
দিনের গা-বেয়ে নামছে অর্থহীন নিশ্বাসপ্রশ্বাস
রাতের গা-বেয়ে নামছে মরণস্তব্ধতা
কোথা থেকে নীল হরিণ ঘরবাড়ি পেরিয়ে তবু
উড়ে উড়ে আসে ?

কী আছে জীবনে ? আমি ভাবি আর ঢুকে পড়ি জীবনে আবার।

আমার শেষ কবিতা

নবারুণ ভট্টাচার্য

আমার লেখা শেষ কবিতা হবে ঋজু
আমি চাই তার মধ্যে এক একরোখা
ধাতবতা থাকবে
সেখানে অন্ধকারের বারুদ,
বিষণ্ণ হলুদ গন্ধক,
এবড়ো খেবড়ো পাথর,
হেরে যাওয়া মানুষদের হাহুতাশ
এসব থাকবে না
বরং শেষ কবিতায় তাদের দুঃখ যেন
নিস্পৃহ ফলার মত চকচক করে

ঈশ্বর বা প্রকৃতি
কেউই আমাকে খুব কৃপা করেননি
আমার শেষ কবিতায়
তাঁদের জন্যেও কোনো ঝুমঝুমি বাজবে না
আমার শেষ কবিতা
কোনো নিমজ্জিত বালকের জন্য বিলাপ
বা নিহত বালিকার জন্য সেরিনেড হবে না
শেষ কবিতায় কোনো নাটকীয়তা নেই
মঞ্চের মধ্যে আস্ফালন
নাটকের শেষে প্রসিদ্ধ গাধার ক্লান্তি
শেষ কবিতায় কোনো অবিস্মরণীয়
শেষ রজনী নেই
ফাঁকা ফুটবল স্টেডিয়াম,
বাতাসের হাসিমুখ ফটোগ্রাফ,
ধর্মঘটের দিনে শহর,
লোড শেডিং-এর সময় টি ভি-র পর্দা
এসব নিয়ে লেখা তখন আমার পক্ষে
মানাবে না, সম্ভবও হবে না
শেষ কবিতায় অন্তত আমি
অক্ষর ও শব্দদের কষ্ট দেব না
অক্ষরদের বারবার মুড়ি, খৈ বা
নক্ষত্রের মত-ফুটিয়েছি আমি
আতশবাজীর মত অনেক জ্বালিয়েছি
শব্দের ফুল
নিজের দায় ওদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে
আমি রাজী হবো না
যেহেতু অক্ষর ও শব্দরা আমার সঙ্গে পুড়বে না
তাদের অযথা ফ্যাসাদে ফেলে আমি কষ্ট
দিতে পারবো না
অপ্রত্যাশিত শ্যাওলা,

রোদ্দুরের পিঠচাপড়ানি
বৃষ্টির আচমকা চুম্বন
এসব নিয়েও শেষ কবিতায়
কিছু থাকতে পারে না

শুনেছি শুয়ে থাকলে নাকি
সূর্যাস্ত দীর্ঘায়ত হয়
সে যাই হোক,
সাদা চাদর, আগুন, আনুভূমিক শয়ন
এসবের মধ্যে দিয়ে একটা ঋজুতা আসবে
তখন রণ-পা পরে বৃষ্টিরা সাগরে চলেছে
চেতনার মত ঋতু
স্পর্শক অসীমপথ ছুঁয়ে দিতে

শেষ কবিতা
বড় টান টান সে
অনেকটা উর্ধগামী ক্ষেপণাস্ত্র
বা হতভম্ব ঘুড়ির মত দেখতে

যদি

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়

সাধ্য যদি থাকে, তবে হাতের দস্তানা খুলে ছুঁড়ে মারো
পৃথিবীর মুখে—
অসিযুদ্ধ হয়ে যাক, অথবা পিস্তলে কর নির্ভুল নিশানা ঃ
অভিজাত সূর্য আর বিস্মিত সময় যেন সাক্ষী থাকে পাশে—
যত রক্তপাত হোক, হাওয়া যেন ফেটে পড়ে তোমার পিছনে
দর্শকের প্রবল উল্লাসে।
দ্বন্দ্বে যদি জয়ী হও—আরও দূর নক্ষত্রেও একদিন
তুমি দেবে হানা!

নাহলে মৃত্তিকাজাত কৃমি হয়ে কেঁচো হয়ে শঙ্কাতুর হয়ে,
অন্ধকারে থাকো ঘাসে ঢুকে।

বিজয়পতাকা উড়ুক সহস্রারে

শুভ বসু

ঘাবড়াবেন না একদম, ঠিক যেমন বলছি চলুন।

সকালবেলায় কাগজ পড়ুন পারলে এক-আধঘন্টা, কিন্তু
মনে রাখবেন প্রতিটি খবরই গেলবার মত নয়, মনটাকে
বানিয়ে তুলুন প্রবাদ কথার সেই হংসটি, যাতে অনায়াস সাবলীল
প্রচুর ভেজাল থেকেও নিত্য সার খবরটি দিব্যি ছাঁকতে পারেন।

কোনটাই সার কোনটা অসার সঠিক বুঝতে সেকথা
ঠিক করে নিন বিকেল বেলায় কোথায় কোথায় যাবেন।
খোঁজ রাখবেন কোন কোন দিন আমরা দুচার জন
সব-জানা-পীর কোন দপ্তরে যাই।
শুধু আমরাই তো শোনাতে পারি সারকথা,

প্রতিটি বিষয়ে কাগজগুলির প্রতিটি চালাকি ফাঁস করে
পারি আপনার চেতনাকে ঠিক গণতান্ত্রিকে চালাতে।

মনে রাখবেন, সামাজিক দায় আছে আপনার চব্বিশ ঘন্টাই।
সকালে লোকালে মন দিন। স্ট্রীট কর্ণার থাকলে সেখানে জুটুন।
বক্তা নন তা জানি, তবু কিছু পাবলিকও হয় দরকার স্ট্রীট কর্ণারে।
কাগজে মিথ্যে জানার ধন্দ সেখানে থাকলে কাটবে।
তাছাড়া নজরে পড়েওতো যেতে প্যরেন তেমন কেউ কেটার।
কে বলতে পারে সেখানে বক্তা অন্য কোথাও আপনার কোনো ত্রাতা নন?
অফিসে দাদাকে চাইবামাত্র চাঁদা দিন।
সামাজিক দায়, মনে রাখবেন, চব্বিশ ঘন্টাই।
সারকথা এই, গণতান্ত্রিক চেতনাকে আরো বাড়ানোর বাড়া কাজ নেই।

তা বলে খামোকা মুখে মুখে কোনো তর্ক নয়। যেমন বলছি চলুন।
কেননা সেটাই গণতান্ত্রিক মত, আর তার সাথে তর্ক
মানেই স্বৈরতন্ত্রের সাথে হাত মেলাবার কৌশল।

রাত্রে বাড়ি ফেরার সময় মিনিবাসে বাসে ট্রামে
নির্মমভাবে করুন আত্মসমীক্ষা এক মনে,
কোনো গড়বড় হয়ে গেলে যাতে অবশ্য প্রায়শ্চিত্ত
করতে মনের একদিনও দেরি কোনোমতে হয়ে যায় না।

রাত্রিবেলায় ঘুমোতে যাবার আগে
পদ্মাসনে বসুন। প্রাণায়াম ভালো ভালো শরীরের জন্যে।

গূঢ় প্রাণায়ামে মূলাধারটিকে জাগান, সেইতো চেতনার আশ্রয়।
দেখুন সেখানে গণতন্ত্রের বীজমন্ত্রটি নিরন্তর
সহস্রারের দিকে নিজস্ব বিজয়পতাকা ওড়াতে চলেছে কিনা!

মহারৌদ্র

অমিতাভ গুপ্ত

তবুও প্লাবন শেষ হয়
মাটির গভীরে যেন যথারীতি বীজ
আর, বীজের গভীরে
অঙ্কুরের মতন মানুষ
সব জলমগ্নতার অনিশ্চিতি ভেদ ক'রে একটি মিলিত
প্রাণবিশ্বে জেগে ওঠে
এ'কোনো নতুন কথা নয়
যৌথখামারের ওই খড় শুধু নতুন শ্রমিক
ছেয়ে দেয়
নতুন শস্যের ঘ্রাণে অসংখ্য মিলিত হাত
ভরে ওঠে, আর
কতদিন আগেকার কোন্ বিশশতকের অফসেটে ছাপা
বিজ্ঞাপনের গুঁড়ো মিশে যায় পায়ের ধুলোয়
জল হাসে মাটি হাসে
গাছ ফুল লতাপাতা পশুপাখি মানুষের মতো
হেসে ওঠে
কারা চেয়েছিল ওই মেরুর বরফ দিয়ে

সমস্ত জীবন ঢেকে দিতে
কারা চেয়েছিল হিম লোভ দিয়ে ঈর্ষা দিয়ে
প্রতিযোগিতার ইন্দ্রধনু
এঁকে দিতে
আকাশের মতো মুক্ত সোভিয়েতে পূর্ব ইউরোপে
কোন্ এক বিশ শতকের শেষ অন্ধকারে কারা
সাপের চর্বির মতো নির্ভরতা নিয়ে
শীত-আরামের ঘুম স্বপ্নে দেখেছিল
আজ এই মহারৌদ্রে সেইসব প্রেত-মননের ছায়া যদি মনে পড়ে
সূর্য হেসে ওঠে

জিব

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

এই ঘরে রাত গভীর
এই ঘরে এখন দুজন, আমার কলম আর আমি।

কলমকে কাগজে বোলালে
বেরিয়ে আসবে লাল বর্ণমালা
কলমকে গলার নিচে ছুঁড়লে
বেরিয়ে আসবে লাল বর্ণমালা, অথচ
কীভাবে পরীক্ষা করব কলমের ধার, ওরা বলে দেয়নি।

ওরা বলেছে দীর্ঘচোখ আর দরকার নেই
বলেছে, শিরদাঁড়াও জরুরি নয়, কিছুটা মগজই যথেষ্ট।
আমি বলতে চাইছিলাম খুব—
জরুরি নয় উচ্চারণস্পষ্ট জিব ?

কিন্তু আমার বলা হয় না, কারণ
নিঃশব্দ নিয়মে তখনই ফুটে উঠছে অপরাজিতার হালকা নীল
ঘাসের জাজিম জুড়ে শিউলির সাহসী বিন্যাস।

আমার বলা হয় না, কারণ

তখনই তো ঝামরে পড়ে কালো বেরাল, লেপ্টে ওঠে ধোঁয়া
কু-ডাক শুনি ধুকপুকধুক দূরে
আর সামনে ক্রমশ বড় হতে থাকে কলমের জিব
নির্ভুল এগিয়ে আসে ইস্পাতের ফলা, তাক করে আমার আঙুল।

একবার কাগজে হাত রাখি, একবার কণ্ঠনালীতে।

মুক্তি

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

নির্দিষ্ট গোলক থেকে বেরিয়ে
অন্ধকার এতোল বেতোল
হাঁটছিল চোখ দুটো।
ঘরের বাতাসে গা ছম ছম শব্দ,
উরুর নির্দিষ্ট জায়গা থেকে
স্বেচ্ছা-নির্বাসিত পা দুটো
গর্জন ক'রে ছুটছিল রুদ্ধশ্বাসে;
আর মাটি ছুঁয়ে বাতাস
ভেঙে যাচ্ছে বিস্মিত বাগানে
শরীর থেকে অনর্গল বৃষ্টি হতে থাকলো
বুনো আদিম স্রোতে মাটি কাঁপছে
আর আকাশ থেকে পৃথিবী হয়ে
বুকের অনন্ত অতলে পৌঁছে
শতাব্দীর বন্দীদের মুক্তি হচ্ছে
বারুদের মতো আশ্চর্য উজ্জ্বল মুক্তি।

মহাভারতের দিনশেষে

(উৎসর্গ: শাঁওলি মিত্র)

কালীকৃষ্ণ গুহ

আমি রাস্তা খুঁজে খুঁজে সেখানে গিয়েছি
যেন এক জরাগ্রস্ত স্থবির মানুষ;
দেখেছি কান্নার আগে সেই রমণীকে, অত্যাশ্চর্য

মুখ-ব্যাদানের চর্বা শেষ ক'রে যে যাবে দ্বিতীয় প্রশ্নে
মহাভারতের দিনশেষে

কান্না থেকে কান্নার অতীত,

আমি তাকে দেখেছি নিজস্ব মেধা থেকে
বিলুপ্তির অবসাদ থেকে

তার যা বলার কথা, নিসর্গ-নিঃসৃত, শ্রান্ত, হাহাকারময়
নিজেকে বিস্তার ক'রে খোলা-চুলে সে বলেছে অন্তত কিছুটা

আমি জরাগ্রস্ত, দেখি, রাত্রির প্রবাহ...

দিনরাত্রি

নন্দদুলাল আচার্য

হো নীলাকাশ, হো গর্জমান সমুদ্র
হো সজল কাল মেঘ
হো দীর্ঘতম বনাঞ্চল
হো কুষ্ঠরোগী
হো মুগ্ধচোখের তারা
হো পিট মাইন, খোলামুখ খনি
হো ইস্পাত নগরী
হো বারাণসীর গঙ্গা
হো রোগজীর্ণা মা
হো আসক্তি আর নিরাসক্তির যৌথটান
হো চন্দন চর্চিত পুরোহিত,
কালিঝুলি মাখা খনি শ্রমিক
হো প্রভাত আর সন্ধ্যা

কেন একটি শব্দের জন্য রাত্রিময় হোম
অনিদ্র কশাঘাতে কদম কেশরে ভরা শরীর
কিসের টানে ছুটে চলা উত্তেজনা

খ্যাপাটে রক্ত অধীর করে কোন দৈবী অসন্তোষ
কোন কুমারীর উরুতে বসে এই তন্ত্র-চর্যা
এই কঙ্কালসার কবির নিশি পাওয়া দিনরাত্রি।

আমার মোমবাতি

বাসুদেব দেব

এই তো সবে বৃষ্টি হলো
ভিজে মাটির গন্ধ ঝিঁঝি ডাক নরম বাতাস
এখন তোমাদের ছুটি, যাও গো মাধবীমালা যাও
যাও হাসপাতালের নার্স যাও ছিদ্রান্বেষী প্রতিবেশী
যাও দারোয়ান চা-ওয়ালা
তোমাদের ছুটি
এখন ঘুমুতে যাবে আমার মোমবাতি

এসো ফেলে আসা নদীতীর থেকে বাল্যকাল
এসো ঘুমপাড়ানি গান
এসো বাঁশবাগানের ছায়া ঘুঘুর ডাক
জলের ওপর জ্যোৎস্নার কাঁপন
এখন ঘুমুতে যাবে আমার মোমবাতি—

কত যুদ্ধ কত দাঙ্গা কত দুর্ভিক্ষ
কত মানুষের কান্না হাহাকার পরাজয় আর অপমান
আহা কতকাল ঘুমোয়নি সে
আজ সে ঘুমুবে, আমার মোমবাতি—

যাও তোমরা, তোমাদের ছুটি আজ
হে পুরু চশমা ঐতিহাসিক ঘোড়েল মন্ত্রীমহোদয়
হে বাচাল কবি, বিপ্লবী বেকার যুবক
তোমাদের ছুটি, এখন কেবল ফসলের খেতের ওপর
মায়ের মতো কোজাগর পূর্ণিমার চাঁদ

এখন ঘুমুতে যাবে আমার মোমবাতি

নির্মাণ

আনন্দ ঘোষহাজরা

ক্রমশ নির্মাণ করছ আমাদের অন্ধকার ভেঙে
পাহাড় পর্বত ভেঙে জলকাদা ছেনে
আমার সমগ্র তুমি গড়ে তুলছ
বেড়ে উঠছি মর্যাদায়, ধ্যানে।
আলোক বাতাস হিম রোদ্দুরের অনুভূতিমালা
আমাদের শরীর-সঞ্চারী হয়ে অভূতপূর্বতা
এনে দেবে কোনো এক অদ্ভুত সকালে
এমন প্রতিজ্ঞাদীপ্ত হয়ে জ্ব'লে জ্ব'লে ওঠে
তোমার আশ্চর্য শিল্পশালা।

পরিশ্রমী দিন জুড়ে তবুও বিষণ্ণ অবসাদ
অথচ সহসা কেন নেমে আসে অন্তর্বর্তী শীতে
অথচ জড়তা কেন শ্লথ কার প্রতিভাবিন্যাস
কৃতকার্যতার রেখা কেঁপে ওঠে প্লিসটোসিন
সীমার এপারে!

তোমারই নির্মাণ তার দীর্ঘছায়া মেলে ধরে
শিল্পশালা জুড়ে।

স্বপ্নবীজ

প্রভাত চৌধুরী

কে আমায় চেনাবে বালিয়াড়ি
সামুদ্রিক কাঁকড়ার পদচিহ্ন ধরে
আমি হেঁটে যেতে পারি দিগন্তরেখার কাছাকাছি
মাঝে জল কিংবা ঢেউ অনুচ্চ আকাশ
ধরা দেবে, ধরা দিতে পারে ভেবে হাতের মুদ্রায়
আমি অঙ্কন করেছি বিশুদ্ধ ফানুস

কে আমায় চেনাবে বালিয়াড়ি

কোন্ বাতিস্তম্ভ জোনাকির প্রজ্বলিত আলো ধরে
আমি হেঁটে যেতে পারি বিষুবরেখার কাছাকাছি
সেখানেই বালি আছে জানি
আছে ঝিনুকের গর্ভের ভিতর এক স্বপ্নবীজ
সেই বীজ একদিন মহীরুহ হবে।

উঠোনের মৌনে

নীরদ রায়

উঠোনের মৌনে, আবর্জনা ছড়ানো শীতলে বসে থাকে যে বয়স
কাগজে কলমে তার কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই,
সকালের রোদ এসে প্রতিদিন দুহাত দূর দিয়ে চলে দূরে,
সংসারের নানান উত্তেজনা ছড়ায় আগুন চারপাশে
প্রতিদিন কত কথা, সন্দেহের তুমুল ফিসফাস জড়ো হয় এখানে ওখানে
এসবও নাড়ায় না এতোটুকু—
স্বপ্নের যে সব পাখি ও নদীরা এখন গ্রাম ছাড়া—
ধু ধু মাঠের দুরন্ত ছেলেবেলাগুলিও এখন শাদা কাগজের একটি দুটি লাইন
কেউ তাদের মনে রাখে—কেউ রাখে না,
নিয়মের মাইনে করা চাকর হয়ে সময় হয়েছে বড় রুগ্ন—
একটু বিশ্রাম পেলেই হুহু করে ঘুম নেমে আসে তার চোখে,
অথচ তার জন্যে পাশের বাড়ির ছাদে একটি মেয়ে এখনো
রোজ এঁকে যায় অপেক্ষার মুখের ছবি।
উঠোনের মৌনে, শীত গ্রীষ্মে একা বসে থাকে যে বয়স
এসবও ভাবায় না তাকে এতোটুকু—!

দেখা

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

ঘাতকের খুব কাছে যেতে নেই
সে চায় না কেউ তার চোখের ভিতরে চোখ রাখে
কেউ তার উন্মাদ শোণিত শিশি ভরে
অণুবীক্ষণে ফেলুক

বিশ্লিষ্ট হতে দিলে ঘাতকেরা একদিন
হয়ত ভীষণ স্বচ্ছ হয়ে যাবে

দেবতার খুব কাছে গেলে
দেবতাও ক্রুদ্ধ হয়
জ্যোৎস্নার আড়ালে লুকানো যে
খড় ও মাটির শরীর
ইঁদুর ও আকাঙ্ক্ষার ত্রস্ত অবয়ব
ছাঁচে ঢালা ভয় ও বিষাদ
অকস্মাৎ নগ্ন হয়ে যায়

মানুষের খুব কাছে গেলে
জলবসন্তের চিহ্নগুলি বড় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তোমাকে বাঞ্ছা করি

সত্য গুহ

তোমাকে সর্বস্বতা সহ বাঞ্ছা করি
তাই বলে এ নয় যে, কুলি আমি বহন করবো অতি মোট
রক্তের নেশা নিয়ে
বাঘ ছোটে হরিণের বনে

অবশ্য তোমাকে বাঞ্ছা করি আমি
শরীরে শরীর পিষে কাদা কাদা হবার ইচ্ছাও জাগরূক
তাই বলে এ নয় যে, কাঁচা মাংস খাওয়া
ভালো লাগে, শক্তি আছে মাংস প্রতিমা করে তুলে
বণ্টনের বহুজন শিল্প-ক্ষুধিতকে

কুচ্ছিতের প্রতিরোধ আমি
সকল রকমে সত্য এবং স্বজনক্ষম শরীরও তোমাকে
বাঞ্ছা করি, নেশা তো করি না
তোমার প্রতিষ্ঠা চাই শিল্পে—সত্তায়—চেতনায়

ভালোবাসা ব্যাধি ঠিক, স্পর্ধা তার ঈশ্বরী স্বজনে

যাও স্মৃতি

তুলসী মুখোপাধ্যায়

পাঁজরের সিন্দুক থেকে উঠে এসো বাল্যস্মৃতি —
যাও, বাধ্য শিশিরের মতো
সোজা গিয়ে শুয়ে থাকো ঘাসের জাজিমে
তারপর বারোটার রোদে
ভস্ম হয়ে উড়ে যাও শূন্য প্রেতলোকে
যাও, যাও বাল্যস্মৃতি
পাঁজরের গোপন ছেড়ে চলে যাও সটান শ্মশানে।

স্মৃতি বড় নির্দয় ঘাতক
তার মূঢ় সত্তা জুড়ে থাকে
স্বপ্ন প্রেম যুদ্ধ উপাসনা
সে বড় লক্ষ্যভেদী কঠিন করাত
সে বড় ক্ষমাহীন মৃত্যুর যাতনা
রসেবশে বেঁচে থেকে
কে আর স্মৃতির পায়ে দাসখৎ লিখে
চিরকাল রসহীন যোগাভ্যাস করে ?

যাও স্মৃতি, চলে যাও —
লঘুপক্ষ ভ্রমরের মতো
ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে
আমি শুধু পৃথিবীর মধুভাণ্ডে ডুব দিয়ে যাবো।

তবু একদিন

শিশির গুহ

ঘুমিয়ে সাঁতার কাটা বড় ভয়ঙ্কর
মাঝরাতে ঘুম ভেঙে শরীর গুটিয়ে যায়
ধাবমান অশ্ব চেপে বসে বুকের ওপর

সার্কাসের সিংহ, যার পায়ের থাবার নিচে
যুবতীর খিলখিল শরীর দোলানো হাসি কেঁপে-কেঁপে ওঠে।

শামুকের খোলের ভেতরে লুকোন জীবন
সেখানেও ত্রাস, ভয়ের শেকড় ক্রমশই বাড়ে
বীজ থেকে বৃক্ষ, বাকল ও মুকুলে
চিরকাল ক্লান্তিহীন চৈত্রের হুতাশ

হাতের মুদ্রায় বরাভয় চিহ্ন রেখে
যারা খুলেছিল বালা, উল্কি এঁকে বলেছিল
আমরাই ভাঙবো পাহাড়, জংগলের বিশাল প্রাচীর
তারাও তো নিরুদ্দেশ ঘন অন্ধকারে।

কে কার অপেক্ষা করে, কতকাল ?
নিজস্ব নিয়মে ঘোরে গ্রহ-উপগ্রহ
দু'চোখে ধূসর ছোপ তবু একদিন
অক্ষি গোলক থেকে ঝরবে আগুন॥

এক অমানুষের গল্প

কৃষ্ণা বসু

ভালোবাসা না পেয়ে না পেয়ে,
বড় দীর্ঘ দিন ভালোবাসা না পেয়ে না পেয়ে
ছাখো সে কেমন কাঠ হয়ে গেছে।
ভালোবাসা না পেয়ে না পেয়ে
ছাখো সে কেমন কালো হয়ে গেছে !
একটানা উপবাসে থেকে তার খিদে মরে গেছে,
সুখাদ্য বিস্বাদ তার কাছে,
সব আয়োজন প্রহসন হয়ে ওঠে
তার বাঁকা দৃষ্টির ছোঁওয়ায়।
দুটো ভালো কথা কেউ বললেই তার
জ্বলে ওঠে ব্রহ্মতালু, তীব্র ফেটে পড়ে স্নায়ুতন্ত্রী,
থুতু উঠে আসে অনিবার্য জিভের ডগায় তার।

ভালোবাসা না পেয়ে না পেয়ে
কাঠ নয়, কালো নয়, ক্ষ্যাপা ও রোগাটে নয়,
ছাখো সে কেমন অচেনা অদ্ভুত হয়ে গেছে ;
তার গায়ের থেকে খসে পড়ছে ত্বকের চিকন,
অল্প লোমগুলি বড় হয়ে সমস্ত শরীর তার
আচ্ছন্ন করেছে, হাত ও পায়ের নখ
আবিশ্বাস্য তীক্ষ্ণ আর দীর্ঘ হয়ে গেছে।

তার শুধু লোমহর্ষে জেগে আছে প্রাকৃতিক কাম,
আশ্চর্য ম্যাজিক প্রেম তাকে কখনো ছোঁয়নি বলে…

ছবির বিকেলবেলা

সুরজিৎ ঘোষ

ছবির বিকেলবেলা, তোমার গায়ের শেষ রোদ
চিরদিন লেগে থাকে, কোনোদিন ঐখানে যাব
কোনোদিন ঐ আঁকা পথের দুধার
আর দুধারের লালে লাল কৃষ্ণচূড়ার গাছ
খুঁজে পাব, ঠিক খুঁজে পাব।

ছবির বিকেলবেলা তোমার অশ্বত্থের নিচে
চৌকো ছায়াটি আছে চিরদিন, জানি
কেবল গাছের ডালে পাখি নেই, নেই কোনো পাখি
আমি কি সঙ্গে করে নিয়ে যাব আমার দোভাষী
সেই হীরেমন যার পাখায় গানের ঝাপটানি ?

দ্বা সুপর্ণা

জয়া মিত্র

না
পায়ের ভিতর অন্য কারো পা
পাতার আগায় অন্য কারো নখ
আর চোখ

সে যেন কোন সুদূর থেকে দেখে
অন্য কারো দেখা
এদিকে আমি তো একা
পথ চিনে চিনে যেতে চাই
অরণ্য আঁধার ভেঙে
হৃৎপিণ্ড মশালে জ্বালিয়ে
অন্য কোন অন্তর্গত আলো
তোর কি তা ভালোই লাগে না ?
তুই কেন হাত ছেড়ে
হাট বাজারের চকমকে ভিড়ে
কেবলই
ওদিকে পেছনে চোরাবালি
আর সামনে খাদ
তবু তোর এত কি আহ্লাদ
অন্য পদচিহ্ন আঁকা ধুলোয় ফেলতে চাস পা ?
না
টুকরো ভাঙা যাদুর আয়না
চাইনে আমার
দুপুর রোদের বিষ
লাগলে হঠাৎ নিজের চোখেই ঝরুক চোখের জল
যে পাখি বিষফল
ঠুকরিয়ে খায়
বিষে জ্বরে যাক তারই গা
পায়ের ভিতর অন্য কারো পা
হাতের মাথায় অন্য কারো নখ
মাথার ভিতর ছিট্‌কে ভাঙা যাদুর আয়না
সোনার খাটে গা রুপোর খাটে পা।
একই শাখার নীল সবুজে
বিষ রোদ্দুর বিষের ডুমুর মিষ্টিজলের ডাক
হাতের মধ্যে হাত বেঁধে তুই

আমার সঙ্গে থাক।
ঠুনকো আলোর ঠুনকো ভিড়ের মেলায়
তবুও যাবি?
যা।

ভালোবাসা

নন্দিতা চৌধুরী

এলো উঠে ভিক্ষুকের বসন্তে চণ্ডালের নির্মল আগুন।
এলো রক্তাক্ত মৌমাছি, শীতের প্রৌঢ়তা নিয়ে গোলাপ ফোটার আগে।
তবু এখনও সময় আছে জানি, মাংস অথবা ভাতের বিনিময়ে, ভোটকা
মদের গন্ধে। খুনীর মুদী দোকান, ও বস্তির সামনে সবাই ভাবে—নীলাম
হবে, কিন্তু তবু তার মা ও বাবাকে কেমন সংগীতময় মনে হয়। মনে হয়
বিছানার শরীর আলো যা ছিল তাদের দুজনার চোখে, কোথায় গেল?
সেই রথাটে নেশার ঘোর কোথায় গেল? তোমার বুকের কাছে দ্রাবিড়
কন্যার একঢাল খোলা চুল গলাফাটা কর্কশ চীৎকার।
যার অপেক্ষায় আজও কবি, শিল্পী রক্তশূন্য রোগের কারণ, যার অপেক্ষায়
বেশ্যাকে বলেছি, ছুঁয়ে দাও এই হাত তুমি করুণ সমকামী ও তৃষ্ণার্ত।
আর, যদি তাকে কোনদিন ভালোবাসো, তবে যুদ্ধ করো কালো ঘোড়ার
সঙ্গে, কারণ আমার সাম্প্রদায়িকতায় একমাত্র আরাধ্য লাল টকটকে
কয়েকটি জবা।
শুধু তোমার শক্ত চোয়ালের ভাঁজে কাঙালের দাবী—আগুনকে কাছে
টেনে জুতো পরায়। অমনি ভোরের নিস্তব্ধ প্রথম আলো চোখের উপর
থেকে সরে যায়। হঠাৎ গানকে সমীহ করে তুমি দারুণ যন্ত্রণা দিলে। তবু
এখন সময় আছে জানি, লাল-পতাকা উড়িয়ে ফাঁসীর কয়েদীরা আজ
অনেক দূর থেকে এসেছে—আমার শীর্ণ করতলে।
আর একটু বেলা বাড়লে ক্রোধ ও অহংকার, ডাইনির প্রেমালাপ, চাবুকের
হিলহিলে হাত হয়ে আছে। তবুও কুটিল স্তনের বোঁটার স্বরলিপি,
তীক্ষ্ণতা, প্রকৃতি ও ফসলের মগ্নতা। চুমু খেতে খেতে তাকে ছিঁড়ে
ফেলো—একবার নয় যতবার খুশি।

শেষ বসন্ত

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

বুঝি বর্ষশেষের গান
বেজে উঠেছিল বিভ্রমে
সেই অন্ধ, বধির গাছ
ছায়া মৃদঙ্গবাদকেরা
সব একে একে ফিরেছিল
শুরু কোথাও হয় না, শেষ
মেশে বস্তুত কুয়াশায়
শুধু নতুন পথের বাঁকে
পথ তানপুরা বেঁধে রাখে
তুমি ভূতগ্রস্তের মতো
তুমি কাছে ছিলে দূরে ছিলে
শেষ বসন্তবেলাটিকে
সুরে পারাপার করেছিলে

কবিতা লেখার বিরুদ্ধে

অনুরাধা মহাপাত্র

বাকুই ঈশ্বর আর অনাথচালান দেওয়া জন্মের প্রকৃতি
ধর্মজ্ঞানহীন সব অন্ধের প্রণয়ের রীতি প্রাকৃত গাথাই হয় ;
তার বেশী সূর্যোদয় সূর্যাস্তের অভিজ্ঞান আমাদের নেই ;
বৃক্ষ ও বান্ধবহত্যার মতো পরিহাসময় সাপ-সিঁড়ি খেলা,
স্থিরতার, সুস্থিরতার নিষ্ঠুরতা আমাদের চোখ ও
রক্তের ভিতরে আজ—তাই সব শিশু জন্মেই
অন্ধ হয়—সব প্রাণ প্রগাঢ় অশ্লীল কোনো মধ্যরাত্রির ;
সব প্রশ্ন হাহাকারে মিশে যায় উত্তরবিহীন।

শিশিরের মতো চোখ একবার নির্মলতা পায়,
বনকলমী ফুল আজ ভাবে এই কথা—বিস্মৃত
ভোর আর স্মৃতিময় বিকেলের আলোর মিলন

কবে যেন দূর থেকে অজ্ঞাত সাক্ষাতে একবার
দেখা দিয়ে, বাতাসের দূর পারে আবার
গোপন—ফকির ও পাগলের অসহায়
হৃদয়ের ধ্রুব জলধারা শুধু বহে যাবে—
পিপাসা ও স্নান যাদের হৃদয় থেকে মুছে
গেছে—তাদের পাঁচ পা দূরে।

অপমান আর নিদ্রাহীনতার শোক যাদের পাথেয়
বলে অন্ধকার সাপের মুখের দিকে ঠেলে
ব্যর্থ বাজেটের মতো বিবাহবার্ষিকী আর কবিসভা
হবে দিকে দিকে ; মানুষকে মনে হবে
সোনার ঘণ্টার মতো ত্যক্ত ও পরিহাসময়
শুধুই কবি হওয়া—মৃত্যু ও অশ্রুর পিঠে
মুছে যাওয়া অ-প্রেমের একটি আঁচড়—
শ্যামাপোকা, তবুও তো আলোকেই বাঁচা-মরা জানে
শুধুই প্রাণের টানে আজ আর কেউ কারো নয় ;
প্রয়োজনহীন আজ আর হৃদয়ের কোনো দাম নেই ;
দিনান্তের আকাশরাঙানো দেখে কেউ আর ভালোবেসে
অপেক্ষায় পথ চেয়ে নেই ;—অপেক্ষাও অর্থনীতি,
কড়ি খেলবার ঝাঁপি আরও অন্ধকারে ;

জীবন যার কাছে শুধু মদ, নারী ও ঈশ্বর আরও
গভীরতর মদ—আমি তার কাছে অতিরিক্ত বিদ্রোহ প্রায় ;
যাকে পান করেও পান করা যাবে না কিছুতেই।
রক্তকরবীর মতো যার মুখ সকলের জাগরণে, ঘুমের ভিতরে—

সুখী ও খুনী কবিদের আত্মরক্ষার জাল সমুদ্রে ঝড়ের আগে
গুটিয়ে নিয়েছে—তাদের প্রভাত আর সন্ধ্যাকাল
কাগজের প্রতিবাদ ছাড়া আর কোনো আলো—প্রাণের
সন্ধান জানে না—অন্ধকারে গঙ্গাফড়িঙ দু'পায়ে
পিষে, বেঞ্চ থেকে অভুক্ত কুকুরের মতো, রোগা মেয়েটিকে
পরিহাসপ্রিয় একটি দশ পয়সা দিয়ে চলে যেতে বলা ;

—তার কটাক্ষ ও জীবনযাপন নিয়ে কবিতা রচনা ;
অনেক নারীকে পেয়ে ভালোবাসা মনে হবে অভ্যাসের, আঁকড়ে
ধরার কোনো মদ ;—তবু অশ্রু, তবু নিজের ভিতরে নিজে
প্রশ্নের রক্তপাত—ভালোবাসা ছাড়া বাঁচবার, ভালোবাসবার আর কোনো
মানে নেই জেনে

লিবার্টি'র স্ট্যাচু

জয়দেব বসু

সমুদ্রস্নানের পর তোমাকে নোন্‌তা লাগে আরো ;
ঠোঁট প্রায় রক্তহীন, চোখের কুসুম ছাড়া শাদা অংশটি
ওয়াইন-রঙীন আর অ্যাপেটাইজার।
এবং, কাঁধের থেকে স্ট্র্যাপের ইশারা সরে গেলে, যে সময়ে
মাথা তোলে অলিভ-কলার বোন, আর
বাহুর উৎরাই বেয়ে ভেঙে পড়ে রোদ-প্রেসিয়ার
সে সময়ে—'ভ্রষ্ট' কমিউনিস্ট আমি—চেয়ে দেখি
নীল শর্টস্, বালিয়াড়ি, বিয়রের উপুড় বোতল—
এসব ডিটেল থেকে
সহসা বিন্যস্ত হয় লা-ভেগার উৎক্ষিপ্ত বর্ণবিদ্বেষ ॥

ব্যাঙের মহিমা

বিশ্বজিৎ পাণ্ডা

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, ধোঁয়ার পিণ্ড পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে চলেছে
এপার থেকে ওপারে
যেখানেই যাও তোমার পেছনে হর্ন
একটি মরা ব্যাঙ ছেতরে আছে রাস্তায়
আলোর শেষ তরঙ্গ উপচে পড়েছে তার মুখে
এখন তার জীবন বাংলা বিহার উড়িষ্যার নদী পাহাড়ে
বিচরণের মূঢ় আনন্দ নয়
বরং কলকাতার ছিদ্রে ছিদ্রে ইস্কুপের মতো
আটকে থাকার শৌর্য এবং আমোদ

এখন তার জিভের ভাঁজ ঘিরে ফেলেছে সোনালি পিঁপড়ে
এখন তার জিভের ভাঁজ বিষাক্ত বিস্বাদ
এবং এই মুহূর্তের অন্নকূট, চিরমেঘাবৃত।

সিকিম এলিজি

ঋজুরেখ চক্রবর্তী

১.

আজ সারা আকাশ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বসে থাকছি দুহাতে শক্ত করে মুখ ঢেকে এই চাপা অন্ধকারে, আর দুদিকে এলোপাথারি গতিতে পিছনে ছুটে যাচ্ছে সমতলের সংসার, তার অন্ধকার, তার আলো, আর এক গ্রাহ্যতর অন্ধকার নেমে আসছে উত্তর-জানালার দিক থেকে—টের পাচ্ছি—আমরা যতো এগোচ্ছি দিক ঢেকে যাচ্ছে বাতাসের ভিতর থেকে উঠে আসা রুক্ষতায়, আলো ঠিকরে আসছে অন্ধকারকে একটুও সরাতে না পেরে, এ-ই রাত্রি—চোখ বুজে আসছে—দেবদূতের পৃথিবী চারিদিকে নাশকতার মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে বৈভবের সুষমা, নির্জনতার আতঙ্ক, আত্মসুখ থেকে উঠে আসা অপর্যাপ্ত ভয়—আর টের পাচ্ছি—এগুলি আসলে সবই এক—এই সুষমা আর আতঙ্ক আর ভয়—আমাদের যেকটি অবস্থান আমরা জেনেছি, যতোগুলি আত্মীয়তা জেনেছি আর যতগুলি ব্যাখ্যা দিয়েছি সুন্দরের—ফুটে বেরিয়েছে আমাদের অসহায়তার ঐতিহ্য—আমাদের শ্লাঘার ভিতরে ঝরে গেছে আমাদেরই নিরুপায় কাহিনীগুলির সব বীজ—কী সৃষ্টি করেছি আমরা—আজ এখানে কোন বৃক্ষের সামনে মাথা নত করে দাঁড়াব—মাথায় নেব শুভেচ্ছার হাত—আমরা চিৎকার করে উঠছি—আমরা যতো এগোচ্ছি—ছুটে যাচ্ছি অন্ধকারকে মাঝামাঝি চিরে, আর পিছনে আবার জুড়ে যাচ্ছে অন্ধকার, শুনছি অবর্ণনীয় গান, ভিতর থেকে মুচড়ে উঠছে ভয়—সুষমায় ঢেকে যাচ্ছে সামনের ভূমি আরো সামনের ঝলমলে আলো, আরো আরো আরো সামনে উত্তর জানালার আঁকাবাঁকা পথ—আর বৃষ্টি নামছে—হা হা বৃষ্টি নামছে রাস্তা জুড়ে, গাছপালা ভেদ করে, পাথরে পাথরে বিকট গর্জন তুলে, দূরে, কাছে, ঘরে, বাইরে বৃষ্টি নামছে, মেঘ ফেটে যাচ্ছে আভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসে—আর আমরা টের পাচ্ছি সবই এক—ঘর আর বাহির বলে কিছু নেই, কাছে

আর দূরে বলে কিছু নেই, শুধু একাকার হয়ে যাচ্ছে আর ধূ ধূ করছে দিগ্বিদিক—দেবতাদের পৃথিবীতে, দেবদূতদের পৃথিবীতে নেমে আসছে আতঙ্ক—কোন অসহ্য সুন্দরের মুখোমুখি হতে চলেছি আমরা!

২.

কানের পাশ দিয়ে শাঁ শাঁ উড়ে গেল হাওয়া আর আমরা এসে পৌঁছোলাম যেখানে দুধারে ইশকুল-ফেরৎ বালক-বালিকা বাতাসে উড়িয়ে দিচ্ছে সোনালি রিবন, তাতে রোদের গন্ধ—আর বাতাসের টানে ধনুকের মতো বেঁকে যাচ্ছে একটা নিরাকার ইস্পাতের রেখা, একটা ছোবল-মারা হাত—নেমে আসছেন দেবদূত, তাঁর ডানায় ঢেকে যাচ্ছে গোটা শহর—আর একেবারে গভীর থেকে এক টুকরো অসঙ্গত আগুন দাউ দাউ হেসে উঠছে ভীষণ নির্জনে, যার আমরা ব্যবহার জানি না, শুধু হাসতে হাসতে নেমে যাচ্ছি মেঘপুঞ্জের ঢালু ঢালু সমান্তরাল দক্ষিণে, আর উঠে আসছি—আর এইভাবে উঠে আসতে আসতে আর নেমে যেতে যেতে আমাদের ব্যক্তিগত অবস্থানসমূহ ভরে উঠছে নতুন জিজ্ঞাসায়—কীসব সংশয় আমরা ফেলে এসেছি সমতলে, এধারে ওধারে কেমন সব সম্পর্কের টান, কেমন সব চোরা স্রোত আর আমরা, গৃহহীন, ঠিক মতো বাঁচতে পারছি না, বোঝাতে পারছি না এই সংসারপাতির গন্ধ ঠিক কীরকম, বোঝাতে পারছি না নিজেদের কী ভাবে এই গোলমরিচের নতুন গন্ধ আর নতুন টি-শার্টের বিজ্ঞাপন দেওয়া ব্যানার শেষপর্যন্ত আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে একই বিন্দুতে—টেনে নিয়ে যাচ্ছে এক প্যাশনেট রাত্রির দিকে যখন দূরের পাহাড়ে পুঞ্জ পুঞ্জ আলো এক অপূর্ব উত্তেজনায় জ্বলে থাকছে সারারাত—সারারাত—সারারাত!

গৃহী বন্ধুদের প্রতি

জিয়াদ আলী

এখানে জলের মধ্যে স্থায়ী হয়ে গেছে বহু
হাঙরের বাস।
হাঙরের মাংস খাওয়া
অভ্যাস করিনি কোনো দিন
ফলত হাঙর ক্রমে গিলে খায় আমাদের
প্রিয় শিশু মাছ।

এখন এ দুরারোগ্য ভীষণ বাজারে
সস্তায় প্রোটিন পেতে হলে
হাঙরের মাংস খাওয়া শিখে নিন
গেরস্ত বেঁচে যাবে।

একদিন সে পাশ ফিরেছিল

রূপা দাশগুপ্ত

একদিন সে পাশ ফিরেছিল ঘুমের মধ্যে। হে গৃহস্থ ঘরবাড়ি! ঝড় আর বৃষ্টির দোলাচলে রাতগুলি গুমরে উঠলে একদিন সে মুখ দেখতে চেয়েছিল তোমাদের। সেয়ানা হবার কথা ছিল না তার। শুধু তার নিজের লাবণ্যে সে ছুঁতে চেয়েছিল লবণাক্ত উদ্ভিদের ভারী পাগুলি। পাঞ্জাবির কনুইয়ে সে বহন করেছে তেল হলুদের ছোপ। সে দেখেছে, এক একটা নুড়ি কিভাবে টোল ফেলে দেয় বান্‌ডাকা নদীর রহস্যেও। শ্বাস নিতে গিয়ে ক্রমশ শাদা হয়ে আসছিল তার যুবতী-পল্লব। তবু সে ভুলে যেতে চেয়েছিল ঠাণ্ডা বাসী রক্তের পিচ্‌কিরি। ভুলে যেতে চেয়েছিল তার শিকড়হীনতা, প্রিয় কলম আর ছোঁমারা রাত্রি। অথবা কলম নয়, কলমের মত তীক্ষ্ণ-শরীর থেকে প্রতিমুহূর্তের আকাশ বমন। অথচ, চালচুলো পাবার খসড়া ছিল না তার।

আর, তাই ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে উঠেছিল সে। তোমরা তার জিভের নিচ অবধি থার্মোমিটার গুঁজে হেসে উঠেছিলে, তর্কা। তোমরা তার জন্য খোঁজ করেছিলে হাসপাতাল। তার মাথার কাছে সাজিয়ে রেখেছিলে ফুলদানি, আর কেউ কেউ দাঁতে কাটছিলে লম্বা সবুজ ডাঁটি। তাজা শাদা টেবিলক্লথ্‌ থেকে টপ্‌টপ্‌ ঝড়ে পড়ছিল রক্ত। রক্ত যে এত সুগন্ধ দিতে পারে সেকথা সে আগে তো জানতো না।

তারপর থেকে ঘুমের মধ্যে সে কঁকিয়ে ওঠে রোজ নিজের করোটির জন্য। তার মেরুদণ্ডটুকু সরল হতে হতে ছুটে যায় তীরচিহ্ন হাউয়ের মত। আর স্পষ্ট টের পায়, হাউয়ের পেটে ঝুলে আছে তার চোখদুটি, তার পাঁজরগুলি এবং সমস্ত স্নায়ুতন্ত্র…

হে গৃহস্থ ঘরবাড়ি! আজ সে জেনেছে, কেন সে এসেছিল এই শ্মশান ভ্রমণে।

আলজিভ

ব্রত চক্রবর্তী

হল্লা করে কারা ?
যারা এই এইমাত্র এল।

তাঁবু, চিঁড়ে, খই, দই
সকলকে দাও।
আজকে প্রথমদিন।

কী হবে তারপর ?
ঘুরবে, খুঁজবে, ভাঙবে, গড়বে,
খুঁটে খাবে নিজের খাবার।

যারা খুঁজে কিছুই পাবে না ?
দুটি কচ্ছপের মাঝে কাঠি ধরে
আকাশে উড়বে।
যে পাবে কুড়োবে, আগুনে
ঝল্‌সে খাবে।
যা হয়েছে অন্যদের।

কিন্তু এই কচিকাঁচা মুখগুলি
ভাঙা আধো স্বরগুলি
বেশ লাগে।
এরা এত দুঃখ পাবে কেন ?

দুঃখ পাবে কেননা ভাষার
দুঠোঁট দুফাঁক করে
আলজিভ দেখতে চায় !

যাও ছন্দ

প্রবীর ভৌমিক

মাথায় জ্যোৎস্নার বিষ
ছন্দ তুমি অভিসারে যাও—
যাও ছন্দ এইতো নিশীথ
এই তো নিশীথ তুমি অন্ধকারে গিয়ে বলো তাকে—
'গান গাও, গান গাও
আর আমি দুলে-দুলে নাচি।
গান গাও গলায় শরীরে
আকাশে নক্ষত্রে গাও
গেয়ে চলো আকুল সমীরে।
ছন্দ যদি নেচে ওঠে, যদি তাকে একবার
নাচের মুদ্রায় এনে ফেলো
পৃথিবী প্লাবিত তৃষ্ণা
চেনা মানুষের মতো এসে, বসবে দাওয়ায়।'

হাওয়ায়-হাওয়ায় ভাসবে ভূলোকে দ্যুলোকে
শব্দজ্ঞান, বর্ণজ্ঞান, গন্ধজ্ঞান যতো।
বিষ ভাসবে মেঘে-মেঘে
তবেই তো বর্ষা আসবে বলো!
বর্ষার নেপথ্যে জ্যোৎস্না-বিষ জ্যোৎস্না
মেঘের শরীর আহা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যায়।

যাও ছন্দ গাঁয়ে-গাঁয়ে
ছাখো অই মেয়েটির পদ প্রান্ত ছাখো।
ছাখো অই আলতা লাল পুষ্প কারুকাজ
মাথা তুলে টানটান দুলে উঠে।
একবার চুম্বন করো ঐ পুণ্য পাপ।
যাও ছন্দ ডমরু বাজাও।
ছাখো কি প্রবল নৃত্য ঢাক বাজে বাদ্যি বাজে

রক্তে, ছেঁড়া পালে যেন লেগেছে বাতাস।
চুল ওড়ে, ওড়ে ছ্যাখো শাড়ির আঁচল।
চোখে নেশা, মৃত্যু নেশা
স্তনবৃন্ত ফেটে রক্ত নামে।
বজ্রের একাগ্র ফুল এলোকেশে
যাও ছন্দ, নেচে ওঠো,
যদি পূর্ণ হয়ে থাকো যদি পূর্ণ হও
একটি চুম্বন শেষে বলো—

'গান গাও, গান গাও
আর আমি দুলে-দুলে নাচি।
শরীরের ছাইভস্ম হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে
নৃত্যে নৃত্যে বেঁচে উঠি আমি
শ্মশানে-মশানে বাঁচি, ঝোপে ঝাড়ে বাঁচি
গান গাও গলায়, শরীরে
আমি নাচি।'

অবস্থান

অনীক রুদ্র

বগনের পথে পথে তোমাদের সঙ্গে পরিচয়
পৃথিবীর জীবজন্তু, গাছপালা আমাকেও আশ্চর্য করেছে
আমি তো রয়েছি নাদে সর্বহারা, দেবতা যেমন
পাতালে আংশিক ধৃত, ভূ-গোলকে ব্যাখ্যার অতীত
ঋতুর চিত্রল গতি কী করে যে অস্বীকার করি
পরিস্ফুট ছায়াদেশ, তরঙ্গের অংশ করে নাও
এভাবে পারি না মৌল উপেক্ষার গর্ভে মিশে যেতে
গগন রেখার থেকে কেন দিক ছড়ালে আমার
মিতবাক অশ্বগুলি, আর তারা কতদূর গেল
নাভির মৃণাল ছুঁয়ে জাগো এই মহাপ্রাণ জাগো
সহস্রার পদ্মবনে একটি ভ্রমর জন্ম দিলে
অবিরত রেণু লাগে গুঞ্জ, পদে অথবা অ্যারোমা

কৃষ্ণকায় পাখা তার অশেষ গুঞ্জন পেয়ে যাবে
জানি তা শ্রোতব্য নয়, ওদিকে মৃত্যুঞ্জয় ধ্বনি
বেঁধে রাখে অভিসার যাবতীয় হত্যা দৃশ্যাবলি

হাওয়ার ঝাপটা এড়াতে

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

হাওয়ার ঝাপটা এড়াতে
পাতাগুলো মুখ ফেরাল
তাদের তলার শাদা বৃষ্টিভেজা…
কান্নার রঙের মতোন।

আর কেউ না জানুক, তুমি জানো
কান্নাভেজা চোখের আড়ালে
আগুনের গল্প লেখা আছে।

কংক্রিটে বাঁধানো পথ দ্বিপ্রহরে আগুন ছড়ায়
মৃন্ময়ী তুমিও
নীলতারা মেঘে ঢাকো তেড়ে ছিঁড়ে খেতে আসা
দীর্ঘ, শাদা মাঠ।

শব্বাহকেরা ঘরে ফেরে বৃষ্টির জলের ফোঁটা
সারা গায়ে মেখে।

ভুবন

সুমন গুণ

এখন কেমন আছে গরিফার উৎসুক কুসুম—
পথের চকিত ভাঁজে দেখা হতো, রোজ, অনায়াস
হাওয়ায় ছড়িয়ে ছিল সম্ভাবনা, ভবিষ্যৎরঙ।

ব্যাহত শহর জুড়ে, চারপাশে, এখন আশ্বিন।
মনে হয়, মুগ্ধ চরাচরে
কাশের সমস্ত গুচ্ছ একই অভিপ্রায়ে দুলে ওঠে।

স্বপ্নে, একদিন

অভীক ভট্টাচার্য

১

একদিন রাতে স্বপ্নের মধ্যে তুমি দেখলে তোমার মাথার ওপর বিশাল এক ফুটো, ঘুমের মধ্যে, ভয়ে, ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেলো তোমার হাত-পা, তুমি দেখলে অদ্ভুত বেগুনী এক আলো এঁকে বেঁকে নামছে সেই ফুটো দিয়ে, বিপজ্জনক ঝুলে পড়ছে দোতলার ব্যাল্‌কনি, তার ক্যান্টিলিভার চুরচুর হয়ে ঝ'রে পড়ছে তোমার গায়ে

স্বপ্নে তুমি যেন কাউকে চেঁচিয়ে কাঁদতে শুনলে রাস্তায়

স্বপ্নে, সারারাত, তুমি দেখলে একটা মাকড়সা, একটা কাঠের-পা, একটা চোর, একটা পাখি—মরা

২

তুমি দেখলে শহর, আকাশে শুঁড় তুলে প'ড়ে আছে একটা ঘোড়ার গাড়ি, তার পিছনে বিশাল টেলিভিশন-টাওয়ার, তুমি দেখলে অন্য এক চৌরঙ্গী রোড, ক্যাথিড্রালের মাথায় ঝুলে আছে বাসি কুমড়োর ফালির মতো চাঁদ—পাংশুবর্ণ

ট্রাম থেকে নেমে তুমি দৌড়তে লাগলে বাড়ির দিকে, যেন অন্য দিনের চেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরতে না পারলে বিপদ হবে আজ, যেন বাতাসে কিসের একটা খারাপ গন্ধ পেয়েছো তুমি

৩

ভূতে পাওয়ার মতো তুমি পৌঁছলে দোতলার ছাদে, দেখলে ঘুড়িতে কান্নিক লাগাচ্ছে তোমার ছেলে, তার পা বেয়ে বেয়ে সাদা কেন্নের মতো ছত্রাক ক্রমে ছেয়ে ফেলছে তার গা, লাটাই ছুঁয়ে থাকা তার আঙুলগুলো বেঁকে ফুলে উঠছে, হাত বেয়ে গড়িয়ে নামছে মাংস—তেলতেলে—কালো

যাপনচিত্র

প্রবালকুমার বসু

প্রতিরাতে আমার জন্য কেউ মেরে রাখে শুয়োর
ঘুম থেকে উঠে শুয়োর কাটতে কাটতে শুরু হয় আমার দিন
শুয়োরের পাকস্থলী দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারি
পেছনের অংশটায় দুপুরের লাঞ্চ
সন্ধ্যেয় মদের সঙ্গে আমার জন্য বরাদ্দ থাকে শুয়োরের দুটো পা
শুয়োরের বাচ্চাদের সঙ্গে বসে গল্প করতে করতে আমি ঠ্যাঙ খেতে থাকি
রাত্রে সিনহা আর চর্ব্বির স্যুপ
পার করে দেয় আমার এক একটা শুয়োরের দিন

তারপর স্বপ্ন দেখি টারা রাম পাম পাম আমাকেও কাটা হচ্ছে
কয়েকটা চেনা মুখ ব্রেকফাস্ট সারছে আমার পাকস্থলী দিয়ে
দুপুরে লাঞ্চ আর সন্ধ্যেয় মদের সঙ্গে আমার ঠ্যাঙ
অনায়াসে গল্প করতে করতে শুয়োরের বাচ্চারা গ্রাস করে ফেলছে আমায়

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে আবার আমার শুরু হয়ে যায় আর একটা
শুয়োরের দিন

আমাকে যেখানে একা ফেলে গিয়েছিলে

রাহুল পুরকায়স্থ

চোয়ালে ছোবল মেরেছিল যারা সব নেতিয়ে পড়েছে
আরো দূরে দূরে মেঘ লাফিয়ে নামছে সাহেবটিলার পাশে
দুলে ওঠে খুর, চাঁদের আবছা আলো
ওভারকোটের তালি মারা দুটি হাত তালি মারে
ঝরে তোমাদের ক্ষত মুখ

আমি তো কখনো অনুরূপ ভাবিনি
ভাবিনি দু'কষে রক্তের দাপাদাপি
বলিনি কখনো তৃতীয় পৃথিবী
শ্বাসনালি-ছেঁড়া শোনো এই কোলাহল

অসহ্য এক অসহ্য সন্ত্রাস
ঘিরেছে আমাকে, ঘিরছে প্রতিটি দিন…
আজ দেখি দূরে পবিত্র সমাধি
আরো দূরে দূরে লোহিতের শেষ আলো।

অন্ধতা দু'চোখ জুড়ে

অলোককুমার ঘোষ

ভোর ছুঁই ছুঁই রবীন্দ্র সদন
ভেতরে বাজাচ্ছেন রবিশঙ্কর সেতার
শেষ রাতে আলাপ করার পর
এখন মগ্ন হয়েছেন বিস্তারে
উন্মুক্ত ছাদের পাশের গাছটির
নুয়ে পড়া ডালে কোথা থেকে উড়ে আসা
এক কোকিল ডেকে উঠছে—কুহু…
উদাসীন লাল দু'টি চোখ
ভেতরে রবিশঙ্কর বাইরে কোকিল
দু'জনেই ব্যস্ত নিজস্ব নির্মাণে
তুলনায় মুগ্ধ বাইরের শ্রোতাকুল।

হিমে ভেজা ভোরের রাস্তা দাপিয়ে
সমস্ত মুগ্ধতায় চিড় ধরিয়ে টিনের ঠেলাগাড়ি
নিয়ে যাচ্ছে পৌরসভার ঝাড়ুদার, কেউ একজন
ব্যস্ত রাস্তা সাফ-সুরতের কাজে।

এমন সময় সে এসে ডাকলো পেছন থেকে
মগ্নতা কেটে গেল তার এবং আর কারো কারো ;
তার উল্লাসের সাথে মিশে গেল
কারো কারো কটাক্ষ চোখ আর কিছু বক্রোক্তি।
অথচ এ সময়ে সে আসতে পৃথিবী
সুন্দর হয়ে উঠলো ফিরে পেল নিজস্বতা
ওরা উপভোগ করলো না সুন্দরতা
অন্ধতা ওদের দু'চোখ আর হৃদয় জুড়ে।

টানাপোড়েন

অমরেশ বিশ্বাস

সফলতা-ব্যর্থতার মতো
পাশাপাশি দু গলিতে দুই বাসা ।

ছো-এর মুখোশ, পোড়ামাটির অশ্বিনী
নরম সোফার পাশে
জ্যাকসন কখনো সরব ;
সার্ভ ফেরানোর অপেক্ষায়
দেয়ালে প্রতীক্ষমানা স্টেফি
খাবার টেবিলে রকমারি গ্লাডিওরা ।

ও বাসায় ছেঁড়াখোঁড়া মনসার ভাসান
তেপায়া চেয়ার
কাশী থেকে মা-র কেনা সন্দেশের ছাঁচ
আব্বাসের ভাটিয়ালি, পুরোনো দেরখো ।

মাঝে মাঝে মেঘ জমে পশ্চিম আকাশে, বুকে
থৈ থৈ বৃষ্টি এলে ভয়
দু হাতে আঁকড়ে থাকি টানাপোড়েনের পথটুকু ।

পরিচয়

প্রদীপ পাল

বলার মতো বলতে গেলে
আস্ত কাহন, সাত কাহনের রামায়ণ
হিন্দু দর্শন থেকে মুসলিম দর্শন
বংশধারা মুছে যায় সভ্যতার বাড়ন্তে

বলার মতো বলতে গেলে
জাত পাত আর গোষ্ঠি বর্ণ
খৃষ্টান বৌদ্ধ কিংবা আর্য পুরাণ
একটিই পরিচয় 'মানুষ' নামের অন্তে

ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকা অনুপ্রাণিত

রক্তিম অর্কেস্ট্রা

চন্দন সেন

[সূর্যের শিশুআলো জানালার রঙীন কাচের মধ্য দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে ঘরটাতে। ঘরে তাই রঙীন স্বপ্নের প্রতিভাস। শীতের আদুরে সকালে মা উল বুনছে, ঘরে প্রবেশ করে তরুণ ছেলে, কাল যার বিয়ে। অদূরে পাগলাঝোরার শব্দ। দার্জিলিং-এর টয় ট্রেন হুইসিল দিয়ে বের হয়ে গেল শিলিগুড়ির দিকে। এই ট্রেন ধ্বসে আটকে ছিল একরাত আর অর্ধেক দিন]

ছেলে ॥ (একটু উত্তেজিত হয়ে প্রবেশ করে) ধ্বস সরানোয় হাত লাগিয়েছি মা। এই দুটো হাত। হুঁ, হুঁ, আটকে পড়া ট্রেন ছাড়ার খবর শুনে ক্ষুধার্ত ঘুমকাতুরে বাচ্চাগুলো পর্যন্ত হাততালি দিয়ে উঠল। হুঁ, হুঁ, আর দশ-বিশটা লোকের মতো তো নই, কমলালেবুর চোখের জল যত তাড়াতাড়ি বরফে মিশে যেতে পারে তার চাইতেও তাড়াতাড়ি আমি পাহাড়ের মর্জি, আর নাছোড়বান্দা ধ্বসকে বুঝতে পারি মা। (হাসি)—

মা ॥ (হাসি) (গর্বিতভাবে ছেলের দিকে তাকায়)

ছেলে ॥ (সোয়েটারটা মাথায় গলিয়ে দেয়) যাচ্ছি মা—

মা ॥ কোথায় ?

ছেলে ॥ বাগানে। জান মা, সব্বাই বলছে, তোর দ্বারা সব সম্ভব। আপেল ফলিয়েছিস কমলালেবুর মতো, এবার ঐ বাগানটায় নির্ঘাত আঙুর ফলাবি—দেখে নিও ফলাব, ফলাবই।—(চলে যাচ্ছে)

মা ॥ খেয়ে যা—

ছেলে ॥ না, আপেল খাব পেট ভরে—

মা ॥ (হাসি) একদম মিষ্টি না—

ছেলে ॥ খুব টকও নয়। আমার বেশ লাগে। ছুরিটা দাও—

মা ॥ ছুরি কেন? (চমকে ওঠে)

ছেলে ॥ আপেলের জন্যে—(হাসি) এত চমকে যাও অকারণে—!

মা ॥ ছুরি! চমকাব না? ছুরিকে আর যে লোকটা প্রথমছুরি বানিয়েছিল তাকে শাপ দেব না? কেন, তুই জিজ্ঞেস করতে পারলি?

ছেলে ॥ অন্য প্রসংগ বল মা। এসব আজ থাক, কাল যখন এ বাড়িতে— যাক, ছুরি থাক মা—অন্য কথা।

মা ॥ বেশ। বন্দুক,পিস্তল, ক্ষুর, কোদাল, গাঁইতি—কার কথা তুলব তবে? এর যে কোন একটাতেই তো খুন করা যায়, খুন হওয়া যায়।

ছেলে ॥ বল, যা খুশি বল মা, মনটা হালকা কর—। আমি জানি এখন তুমি থামছ না—

মা ॥ একটা মানুষকে হত্যা করা কত সহজ কাজ এখন! একটা সুন্দর সুস্থ মানুষ। কাজের ফাঁকে যে বোলতার মতো সুর তুলে তুলে ছুটে যেত কমলার বাগানে—অথবা পাগলাঝোরার কাছে গিয়ে বসে থাকত যখন সাপের মতো ট্রেন এঁকে বেঁকে ছুটত ঘুমের দিকে—

ছেলে ॥ কাল একটা শুভ কাজ, আজ থাক—

মা ॥ তারপর আর ফিরে এল না। ফিরে এলেও (একই সুরে) তাকে পাম গাছের পাতা আর নুন দিয়ে ঢেকে রাখা হলো, শেষকৃত্য করার আগে যেন না পচে যায়। (ছেলেকে) আমি জানি না, তুই কি করে এরপরও ছুরির কথা তুলিস? লোকটাকে তো ছুরিতেই শেষ করা হয়েছিল? (গলা ভারি হয়)

ছেলে ॥ তোমার কথা শেষ হয়েছে মা? চারবছর ধরে এইভাবে, একইভাবে হা-হুতাশ করে যাচ্ছ। লাভ হচ্ছে কিছু?

মা ॥ হাজার বছর বাঁচলেও একই কথা বলতে হবে। তোর বাবা যেতে না যেতেই গেল তোর ভাই। আঃ আমি জানি না, আমি বুঝি না— কি করে কেন কোন্ যুক্তিতে একটা ছুরি বা একটা রিভলভার— জলজ্যান্ত একটা মানুষকে এমনি করে কেড়ে নেয়? হাসতে হাসতে কথা বলতে বলতে গাইতে গাইতে কারা ছুরিটা বসিয়ে দেয়, তোর বাগানে গিয়ে দেখ—লতা যেভাবে গাছটাকে পেঁচিয়ে রয়েছে, ঠিক

সেইভাবে ছেলেটাকে দুজন পেঁচিয়ে ধরেছিল, তৃতীয়জন একেবারে নিঃশ্বাস-লাগা দূরত্ব থেকে গুলিকরেছিল। ওদের দলের নামে চিৎকার করে জয়ধ্বনি তুলেছিল। আমি তখন পাগলাঝোরার পাশে… গোঙানী সবটুকু শুনতে পাইনি। পেলেই বা কি করতে পারতাম? দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘুরে ঘুরে চলে যায়…যন্ত্রণা যায় কই?

ছেলে ॥ (সামনে এসে মাকে ধরে) ও কথা এবার থাক না মা—

মা ॥ না, থাকবে না। কেউ কি ফিরিয়ে দিতে পারবে তোর বাবাকে,তোর ভাইটাকে? পারবে? যে খুন হলো সে অস্থিমজ্জায় কাঁটার মতো বিঁধে থাকে রক্তমাখা স্মৃতি হয়ে, আর যারা খুন করে তাদের মধ্যে সবাই নয়, হয়তো দু-তিনজন ধরা পড়ে। কিম্বা ধরা দেয়, জেলের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে পরমানন্দে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে দিন কাটায়। আমি জানি, ওরা ছাড়া পেয়ে যাবে একদিন।

ছেলে ॥ বাবা আর ভাই-এর হত্যার শোধ নেব। দেখে নিও, ফিরে এলেই ওদের আমি খুন করব—

মা ॥ না…এসব কথা এত জোরে নয়, এখানে নয়। এত কথা উঠতেই পারে যদি তুই ছুরি নিয়ে এই সাতসকালে—। তোকে আমি ছুরি হাতে কিছুতেই ঐ নির্জন বাগানটায় এখন যেতে দেব না, না, দেব না।

ছেলে ॥ বেশ, এই তোমার পাশে বসলাম ছোট্ট খোকন হয়ে। নাও আদর কর, মাথায় হাত বুলিয়ে দাও।

মা ॥ (চুলে হাত বুলোয়) মাঝে মাঝে ভাবি, যদি তুই মেয়ে হতিস, তাহলে… আমরা দুজনে বসে বসে সেলাই করতাম, উল বুনতাম—

ছেলে ॥ তোমার যত অদ্ভুত ভাবনা। আমায় নিয়ে তুমি এখনো কত কি করতে পার। বাগানে গিয়ে পছন্দমত আপেল পাড়তে পার— কমলা ছিঁড়তে পার…যা খুশি, একেবারে নির্জন বাগান…চেঁচিয়ে গান গাইলেও কেউ চুরি করে শোনার নেই—

মা ॥ এমন বাগানে এই বুড়ি কেন? বিয়ের পর যে কাল তোর কাছে আসবে তাকে নিয়েই যাবি। (গলা নকল করে) একেবারে নির্জন বাগান…চেঁচিয়ে গান গাইলেও কেউ চুরি করে শোনার নেই (দুজনে হাসে) ও বাগানে কোন বুড়ির প্রবেশ নিষেধ—

[ছেলে মাকে পাঁজাকোলা করে তোলে]

ছেলে ॥ আহারে বুড়ি মা আমার।

মা ॥ ছাড়, ছাড়, তোর বাবারও এমন ছেলেমানুষী ছিল। আসলে একটু অদ্ভুত না হলে সে মানুষই নয়, মানে ভালমানুষ নয়। গম গমই, আবার মানুষ মানুষই,—একইভাবে বেড়ে ওঠে না।

ছেলে ॥ তাহলে আমি ভালমানুষ! বেড়ে উঠছি অদ্ভুত হতে হতে।

মা ॥ (হাসি) হ্যাঁ, আজ পর্যন্তই। (দীর্ঘশ্বাস) কাল…কি জানি কি করে বলব?

ছেলে ॥ তুমি জান না? সত্যি বল তুমি ওকে বুঝতে পার নি? ওকে তুমি পছন্দ কর না মা?

মা ॥ (হাসি) তুই হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে গেলি কেন? মেয়েটাকে তো ভালই মনে হয়! ব্যবহার ভাল, খাটতে পারে, রান্নাবান্না জানে, সেলাই টেলাইও ভাল পারে। তবু…তবু তার নাম উচ্চারণ করতে গেলেই মনের মধ্যে একটা পাথরের ঘা খাই—না, না, ঈর্ষা করছি না, বোকামীও নয়, অন্য একটা ভয়—

ছেলে ॥ আমার বিয়েতে ভয়! কিসের ভয়?

মা ॥ একলা হয়ে পড়ার, নিঃসংগ হয়ে পড়ার ভয়। তুই তো আর আমাদের পাগলাঝোরায় থাকছিস না—

ছেলে ॥ থাকব, থাকতেই হবে। তুমি তো জান পাগলাঝোরার গান না শুনে আমি ঘুমুতে পারি না, বাবাও পারত না। যাব কোথায় বিনিদ্র রাত কাটাতে? কোন্ নরকে?

মা ॥ মানুষ গান শুনে আর চাঁদ দেখে কি দিন কাটাতে পারে? নদীর পাশে বসে আমার ভাই কবিতা লিখত, আঁকত প্রতিদিন, শেষে বাড়ির শেষ জলপাইগাছটা যেদিন বিক্রী হয়ে গেল, সেদিনও দেখলাম ভাই খাতা পেন্সিল আর রঙের তুলি নিয়ে নদীর পারে গিয়ে বসেছে। পেন্সিলের শিসটাকে ব্লেড দিয়ে লম্বা করে কেটেছে, ধারালো মুখ তার, তুলির হাতলটাকেও তীক্ষ্ণ করে নিয়েছে। তারপর এক হাঁটু নদীর জলে নেমে একহাতে পেন্সিল আর হাতে তুলি নিয়ে দেহটাকে আধখানা চাঁদের মতো বাঁকিয়ে শকুনের চোখ নিয়ে মাছ খুঁজছে, মাছ। (হাসি) আর কবিতার খাতা? হায়রে, দুটো দামাল পায়ের ভারে নদীর জল ছলাৎ ছলাৎ করে ছিটকে

পড়েছে কবিতার খাতায়। শেষে খাতাটা যখন ভিজে ভারি হয়ে উঠল তখন জলে ভরা সেইসব অস্পষ্ট স্বপ্নপত্র একসংগে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে!

ছেলে॥ তার মানে আমাকেও যেতে হবে কার্সিয়াং। আমার ছোট্ট কমলালেবুর বাগানটা, যেখানে আমি অনেকগুলো আপেল ফলাতে পেরেছি, সেই বাগানটা বিক্রী হবার আগেই চলে যেতে হবে?

মা॥ তাই তো কথা আছে, মানে তুইই তো ওদের তেমনকথা দিয়েছিস। লজ্জা পাচ্ছিস কেন? মানুষতো পিঁপড়ে কিম্বা কেন্নোর মতো সব সময় হিসেব কষতে কষতে চলে না। ভালবাসার আবেগটাই অন্য রকম, বে-হিসেবী। তবে তার মধ্যেও ভিন্ন হিসেব লুকিয়ে থাকে। এসবে কোন পাপ নেই, অস্বাভাবিক কিম্বা অসাধারণ ব্যাপারও নয় কিছু!—তোর শ্বশুর তোকে কার্সিয়াং-এ একটা চা-বাগান দিচ্ছে। সেখানে না গেলে তুই তো সব হারাবি! কাল যে মেয়েটা তোর কাছে আসছে তাকে শুধু কমলালেবুর বাগানে প্রলাপ শুনিয়ে আর আপেল খাইয়ে ধরে রাখতে পারবি?

ছেলে॥ (মাথা নাড়ে) কিন্তু তুমি? মা তুমিও যাবে আমাদের সংগে—

মা॥ এখানে কতগুলো বছর কেটে গেল বল তো। তোর বাবা আর ভাই ঘুমিয়ে আছে এখানে। তাদের ফেলে আমি চলে যেতে পারি? গুরুংরা শাসিয়ে রেখেছে মনে নেই—এই বাড়ি আর ঐ বাগানটাকে ওরা শ্মশান বানাবে। চলে যদি যাই তবে গুরুংদের ভাড়া দেওয়া ভাগাড় হবে এইসব। বরং তুই গিয়ে চা-বাগানে চায়ের পাশাপাশি অন্য কিছু ফলিয়ে ফেল। সুখী হ তোরা—

ছেলে॥ সুখী? তোমায় এখানে ফেলে রেখে?

মা॥ আমি তো মনে মনে প্রস্তুত হয়েই রয়েছি সেই তিনবছর আগে থেকেই। তুই এসে বলি, বরফ পড়ছিল জোর। পাগলাঝোরার গান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সনসন্ বাতাস জানালার কাঁচগুলোতে ধ্বসে ভেঙে পড়া পাথরের চাঁই-এর মতো রাগে আছড়ে পড়ছিল। তুই কমলালেবুর ঝুড়িগুলো বিক্রী করতে গিয়ে তিনদিন তিনরাত পর ঘরে ফিরলি সেই দামাল রাতে। বলি, আমার মেয়ে খোঁজার

দরকার নেই। কার্সিয়াং-এর রাস্তায় তুই তাকে খুঁজে পেয়েছিস। আমি খুশিতে তোকে তোর ভিজে কাপড়েই কোলে তুলতে গেলাম। পারলাম না। মাঝখান থেকে স্কুলে পড়াতে যাবার একমাত্র শাড়িটা ভিজিয়ে ফেল্লাম।

ছেলে ॥ ও মা, তোমার মনেও থাকে—?

মা ॥ মনে থাকবে না? ঐদিন থেকেই তো আমি একা থাকার প্রস্তুতি নিচ্ছি। স্কুলের কচি কচি বাচ্চাদের মধ্য থেকে বাপ-মা মরা দুটো বাচ্চাকে ঠিক করে রেখেছি, তুই চলে গেলেই নিয়ে আসব।—অবশ্য যদি ওদের অভিভাবকরা ওদের খুশি মনে ছাড়তে পারে।

ছেলে ॥ তার মানে, তুমি ধরে নিয়েছ আমি আর আসব না?

মা ॥ আসবি নিশ্চয়ই আসবি। আর আমি জানি, বছর দুয়েকের মধ্যে এমন ব্যবস্থা করবি যাতে ধার করে বাচ্চা আমার আর পালতে না হয়। আমি বাপু বেশিদিন পুষ্যি ছাড়া থাকতে পারব না।—(হাসি)

ছেলে ॥ ও খুব ভাল মেয়ে মা। তোমার কথা ও ভাববে, তোমার কাছে ও থাকতে চাইবে, দেখো তুমি ওকে দেখে খুব খুশি হবে।—আর আমিও তো তোমায় ছাড়া বেশিদিন কোথাও থাকতে পারি না। —তুমি তো জান—

মা ॥ জানি। তোর বৌকে আমি মুক্তোবসানো একজোড়া দুল দিয়ে আশীর্বাদ করব। কোন দুল বলতো? যেটা তোর বাবা বিয়ের পর শিলিগুড়ি থেকে আমায় বানিয়ে এনে দিয়েছিল। ঐ দুল পরার পর আমাদের কাঠের ঘরটায় নতুন কাচের জানালা বসল, তোর বাবা চাবাগানের হিসেবের খাতা লেখার কাজ ছেড়ে বাচ্চাদের পড়াবার কাজ পেল, যে কাজটা তোর বাবা মরে যাবার পর আমি পেয়েছি, আর ঐ শুভ দুলজোড়া পরার ঠিক একবছরের মাথায় তুই এলি এ বাড়িতে।

দেখিস এই দুল তোর বৌ পরলে তার আর তোর দুজনেরই কপাল খুলে যাবে জোর।

ছেলে ॥ আমার লক্ষ্মী মা! —আমি তাহলে বাগানটায় ঘুরে আসি। ছুরিটা দাও। কোন ভয় নেই মা, এখুনি ফিরে আসব।

[মা টেবিলের দেরাজ খুলে ছুরিটা দেয়]

মা ॥ এ ছুরিতে যেন কোন রক্তের দাগ না লাগে দেখিস।

ছেলে ॥ লাগবেই—

মা ॥ লাগবেই ?

ছেলে ॥ হ্যাঁ, কমলালেবুর কিম্বা আমার যত্নে ফলানো আপেলের রক্ত! (হাসি) চলি—

মা ॥ না, দাঁড়া, আপেল ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবি, ফুলের মতো ছিঁড়বি, ছুরিটা দিয়ে দে, দে—[ছেলে ছুরি ফেরত দিয়ে হেসে বের হয়ে যায়। প্রতিবেশী মহিলা প্রবেশ করে]

মা ॥ এসো।

মহিলা ॥ কেমন আছো দিদি ?

মা ॥ ভাল। ছেলের বিয়ের নেমন্তন্ন পাঠিয়েছি। আসবে তো ?

মহিলা ॥ অবশ্যই। তোমার ছেলের বাগানে যে আপেল ফলেছে সেই খবর পৌঁছে গেছে আমার কাছে। (হাসি)

মা ॥ তোমার কাছে খবর না পৌঁছে পারে ?

মহিলা ॥ তা ছেলে কোথায় ছুটল ?

মা ॥ কোথায় আবার ? বাগানে,—কমলালেবুর বাগানে।—দেখছ তো ছেলে আমার বাহাদুর, কমলালেবুর পাশে আপেলও ফলিয়েছে।

মহিলা ॥ কি হবে আর বাহাদুর ছেলে দিয়ে ? শুনেছ তো দিদি, আমাদের পাশের বাড়ির দিলকুমারীর অমন তাজা জোয়ান ছেলেটা, ঐ যে গলা ছেড়ে "সারে জঁহা সে" গান করত দলবল জুটিয়ে, পরশু তার দুটো হাতই কেটে নিয়ে গেছে—

মা ॥ রাজকুমার ? চা বাগানের ছোটবাবুর ছেলে ?

মহিলা ॥ হ্যাঁ—দুটো হাতই—

মা ॥ ছুরিতে ?

মহিলা ॥ মনে হয়। বড় ছুরি হবে হয়তো। এখন আর মানুষ হিসেবে সম্মান দেখিয়ে গুলি বরাদ্দ করা হয় না। হাঁস মুরগী হরিণ পাঁঠার মতো মানুষ মারার কাজ ছুরিতেই মিটে যায়। যে বা যারা কাটে তাদের একটু পরিশ্রম হয়, কিন্তু ভেবে দেখো দিদি, ধ্রুপদী গানের মতো অনেকক্ষণ ধরে আলাপ বিস্তার করে করে কাজটা শেষ হয়।

মা ॥ এভাবে বোলনা,—খুব কষ্ট হচ্ছে!

মহিলা ॥ আমারও। বলতে নয়, দেখতে খুব কষ্ট হয় এসব। জানালাটা একটু ফাঁক করে সেদিন সব দেখেছি। জান তো রাজ আমার আপন কাকার ছেলে! উঃ, কেউ সাক্ষী না দিলেও আমি জানি ওটা গুরুং-এর ছুরি!

মা ॥ (চোখ মোছে) অন্য কথা বল। অন্য কথা,—তাড়াতাড়ি বল—

মহিলা ॥ (দ্রুত প্রসংগ পালটে, চোখ মুছে) বাজনা বলেছ দিদি? বিয়ের বাজনা?

মা ॥ না। ছেলের আপত্তি। বলছে, এত জানান দিয়ে সব কিছু করা ঠিক না।—(দীর্ঘশ্বাস) হয় তো ওর মনে পড়েছে যে কালই ওর বাবার মৃত্যুদিন!

মহিলা ॥ ও! একটা লম্বা বিষাদের ছায়া, ভেবে দেখো দিদি, আমাদের সব সময় গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে থাকে,—এমন কি যখন আমরা ফুর্তিতে হাত পা ছুঁড়ে দৌড়তে চাই তখনও। ছায়াটা তখন আরো ঘন হয়ে গায়ের পাশে ছুটতে থাকে।

মা ॥ তা তুমি তো দুনিয়ার সব খবর রাখো। আমার ছেলের খবর রাখো? খুলে বলতো, যাকে ও বিয়ে করছে সে কেমন, মানে তার ঘর আত্মীয়-স্বজন কেমন?

মহিলা ॥ ভাল। তোমার ছেলে অংকে খুব ভুল করে না।—

মা ॥ (হাসি) ওর বাবা কিন্তু অংকে কাঁচা ছিল।

মহিলা ॥ জীবনটা যে অংক কষে উত্তর মেলাবার খাতা নয় তা কিন্তু তুমিই বাচ্চাদের শেখাও, আমার ফুটফুটে নাতিটা তোমার ক্লাশ করেই একথা শিখেছে।

মা ॥ বুঝেছি। ছেলে আমার ভুল করছে বলতে চাইছ তো?

মহিলা ॥ ভুল! কে জানে? তবে শুনেছি ঐ মেয়েটার জীবনে,—থাক দিদি, এসব আজ বলার নয়।

মা ॥ এসব আজই বলার দিন। সাবধান করে লাভ হবে না হয়তো, কিন্তু সাবধান হবার জন্য কিছু একটা দিতে তো পারব ছেলের হাতে—। তুমি বল। আমি জানি তুমি আমাদের ভাল চাও, বল।

মহিলা ॥ মেয়েটির জীবনে এর আগে একজন এসেছিল। কিন্তু টেকেনি, কেন, কে জানে। টেকেনি।

মা ॥ ভালবেসেছিল ?

মহিলা ॥ হয়তো !

মা ॥ হয়তো ?

মহিলা ॥ হয়তো, পাগলাঝোরার জল প্রচণ্ড শব্দে নেমে আসে দেখতে পাই, ওর গান শুনতে পাই, কিন্তু কোন্ খাদে, কত গভীরে কোথায় সেই জল শেষ নাচটুকু নাচছে, কিম্বা নাচতে গিয়ে ঘুঙুর খুলে থেমে যাচ্ছে, দেখতে পাই না, খবরও রাখি না।

মা ॥ আমার ছেলের জীবনে যদি সেই ঘুঙুর খোলার খেলা নেমে আসে—

মহিলা ॥ আসবে না। মেয়ের বাবা মা আর ওর বেশ প্রতিপত্তিয়ালা আত্মীয় স্বজন তোমার ছেলেকে পছন্দ করেছে, মেয়েতো করেইছে। তুমি তো জানই দিদি, দূরে ঐ কাঞ্চনজংঘার চূড়োয় যে বরফ গলে পড়ছে অহর্নিশ সেই ক্ষয়ে-যাওয়া বরফের জায়গা দখল করে নেয় নতুন তুষার। মেয়েদের মন কখনো ফাঁকা থাকে না।—সেই লোকটার মতো তোমার ছেলের ভাগ্যে যে হতাশা নেই তা তো বুঝেই গেছ। চা-বাগান, কার্সিয়াং-এ নতুন তৈরি ঘর।—

মা ॥ কিন্তু সেই লোকটা—যে মেয়েটার জীবনে একবার এসেছিল, সে ছেড়ে দেবে ?

মহিলা ॥ জানিনা।

মা ॥ তুমি তার নাম জান না ? সেই লোকটার ?

(মহিলা মাথা নীচু করে নীরব হয়ে থাকে)

মা ॥ জান ?

মহিলা ॥ হ্যাঁ।

মা ॥ কি নাম ?

[মহিলা টেবিলের উপর রাখা ছেলের ফেলে যাওয়া ছুরিটা দেখে]

মহিলা ॥ তোমার ছেলের হাতে ছুরিটা সব সময় দিয়ে রেখ, আর ওকে বোলো বিয়ে করতে যেন পাগলাঝোরার পাশ দিয়ে না যায়।

মা ॥ ছুরি ? (ছুরিটা তুলে নেয়) পাগলাঝোরা ?

[মহিলা চলে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়]

মহিলা ॥ ভয় পেয়োনা দিদি। তোমার ছেলে অনেক অসম্ভবকেই সম্ভব

করে। কমলালেবুর বাগানে আপেল, হয়তো আঙুরও ফলবে, তবু ছুরিটা দিয়ে রেখো।

মা ॥ নামটা বলে যাও (চিৎকার)

মহিলা ॥ গুরুং, তুফানলাল গুরুং! (চলে যায়)

[ছেলে প্রবেশ করে। মা একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে মহিলার চলে যাওয়ার দিকে। মুখে তীব্র আতংক]

ছেলে ॥ কাকীর ভয়ে ঢুকিনি। উঃ খবরও রাখেন বটে, দুনিয়ার সব খবর! যাকগে, ছুরিটা দাও, আপেল যে ফুল নয়, সে ভুল তোমার ভাঙা দরকার! শুধু হাতে হবে না—

(মা ছুরিটা ছেলের হাতে দেয়)

মা ॥ এই ছুরিটা আর আমায় ফেরত দিবি না। আর কাল তুই পাগলা-ঝোরার পাশ দিয়ে যাবি না কিছুতেই।

ছেলে ॥ (হাসি) জানি, কিছু সাংঘাতিক শুনিয়ে গেছেন মহিলা। কি হয়েছে মা, কাঁপছ কেন?

মা ॥ এ একটা আশ্চর্য সময়, যখন মা জোর করে অস্ত্র তুলে দেয় ছেলের হাতে। এ এক আশ্চর্য পরিবেশ, যখন ঝর্নার পাশ দিয়ে হাঁটা যায় না। এ এক আশ্চর্য উৎসব-লগ্ন, যখন মংগলঘট ভরে থাকে তাজা রক্তে।

ছেলে ॥ আমি কাল যাব না মা? কোনো অমংগলের শব্দ শুনতে পাচ্ছ? মা, চুপ করে আছ কেন, বল? যাব কাল?

মা ॥ যাবি! যাবি না তো পালাবি কোথায়? যাবি।

ছেলে ॥ তোমার গলা কাঁপছে মা। আমায় সব কিছু বলছ না কেন? বল—

মা ॥ একটু আগে কি যেন বলে গেলি তুই?—ও! কমলালেবুর রক্ত, আপেলের রক্ত। যা মহড়া শুরু কর। যা যত পারিস ছুরিটাতে রক্ত মাখিয়ে আন, ঐ সব রক্ত, যা—

ছেলে ॥ কী যে পাগলামি তোমার চেপে ধরে যখন তখন। যাচ্ছি—

(ছেলে চলে যায়)

[মা জানালা খুলে দেয়। শীতল হাওয়া ঢুকে পড়ে সশব্দে। মা তাকিয়ে থাকে জানালা দিয়ে]

মা ॥ আমি জানি—জানি হে বাতাস, তুমি কি শুনিয়ে যাবে আজ।

একটি বছর পর তুমি সাপের মতো হিস হিস শব্দ আবার বয়ে আনছ। (চিৎকার করে মা পাগলাঝোরার শব্দ আর বাতাসের শনশন্কে ছাপিয়ে যেতে চায়)

আমি জানি, শুধু একটা ছুরিই নায়ক হয়ে ওঠে এ সময়ে, ছোট্ট একটা ছুরি, আগামী দিন নির্ধারিত হয়েছে রক্তঝরা অর্কেস্ট্রার জন্য।

আমি জানি নিষ্ঠুর ভালবাসায় কিম্বা অন্য কোনো হীন আবেগে- ওরা দুজন পরস্পরকে শেষ করবে, করবেই। মাঝে শুধু টিকে থাকবে নিঃশব্দ অন্ধকারের মতো নির্বাক একটা মেয়ে, "পরনে ঢাকাই শাড়ী, কপালে সিঁদুর।"

আমি জানি কেউ ফিরে আসবে না। শুধু নির্ঘুম পাগলাঝোরা মতো এই মা বসে থাকবে একা। সে নিঃসংগ, আর ফিরে আসার কেউ নেই। আছে?

হয়তো আছে, হয়তো কেন নিশ্চয়ই আছে। সেই ছুরি। সে ফিরে আসবে এখানে, অপেক্ষা করবে আবার কিছুদিন। যতক্ষণ না গভীর অন্য কোনো মাংসস্তর ভেদ করে সেই দুর্দম ছুরি বিদ্ধ হয় শোণিতপিপাসু অন্য কোনো জীবনের মূলে। ফিরে এসো তৃষ্ণার্ত ছুরি। আবার ফিরে এসো। (মা বিছানায় লুটিয়ে পড়ে কান্নায়)।

"আগুন আমাদের ভাই
নদী আমাদের বোন
সেই তাপ সেই জল থেকে
আমরা নিংড়ে নিয়েছি বিদ্যুৎ
সেই আমরা......"

(আগুনের নদী : অমিতাভ দাশগুপ্ত)

: প্রগতির প্রতীক :

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

পরিচয়-কে

আন্তরিক শুভেচ্ছা

জনৈক শুভানুধ্যায়ী
শিলিগুড়ি। দার্জিলিং